আমার পূজনীয় আচার্যদেব

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের

স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত।

গ্রন্থকারের অপরাপর গ্রন্থ

১। 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার'

২। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' (প্রথম পর্যায়—চতুর্থ সংস্করণ)

৩। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' (দ্বিতীয় পর্যায়—তৃতীয় সংস্করণ)

'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (আধুনিক পর্যায়)

—ত্রৈবার্ষিক বি. এ. পাঠার্থীদের উপযোগী।

'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-প্রসঙ্গ'

—প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠার্থীদের উপযোগী

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহ ও কৌতূহলের পরিধি অধুনাতনকালে ক্রমেই বেড়ে চলেছে। পণ্ডিতজনের গবেষণা ও বাংলা সাহিত্যে বিশেষ জ্ঞান-লিপ্সু বিশ্ববিদ্যালয়-ছাত্রের পাঠসীমার মধ্যেই আমাদের সাহিত্য-ইতিহাসের চর্চা একদা সীমিত ছিল। অধুনা স্কুলের মাধ্যমিক পর্যায় থেকে কলেজের উচ্চতম পরীক্ষা পর্যন্ত সকল স্তরে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সমগ্র অথবা আংশিকভাবে অবশ্য-পাঠ্য হয়েছে। তাছাড়া, মাতৃভাষার সাহিত্য এবং পূর্বপুরুষের সংস্কৃতির প্রতি সাধারণ পাঠকের শ্রদ্ধান্বিত কৌতূহলও ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এমন কি, অবাঙালি এবং অভারতীয় সমাজেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-পরিচয় জানবার আগ্রহ আজ খুব দুর্লক্ষ্য নয়। এই সব প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রেখে সংক্ষিপ্ত পরিসরে চর্যার যুগ থেকে রবীন্দ্রনাথের কাল পর্যন্ত বাংলা-সাহিত্য-ইতিহাসের একটি মোটামুটি পরিচয় একখণ্ড গ্রন্থের মাধ্যমে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিলাম।

বলাবাহুল্য, তথ্যগত খুঁটিনাটি এবং পণ্ডিতজন-প্রত্যাশিত বিচার-বিতর্কের আড়ম্বর বর্তমান প্রসঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই পরিত্যক্ত হয়েছে। আমাদের সাহিত্য-ইতিহাস আমাদেরই যুগ-যুগ-বিলম্বী প্রাণ-সম্পদের রস-ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে, স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত শিক্ষার্থী এবং দেশি-বিদেশী পাঠক সমাজের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে এই সত্যটুকু অনুভবনীয় করে তোলার আকাঙ্ক্ষাতেই এই গ্রন্থের পরিকল্পনা। দ্বিতীয় সংস্করণের সংশোধন-সংযোজনের কালেও সেই মৌলিক আদর্শবোধ অনুক্ষণ প্রভাবিত করেছে। অতিশয় তথ্যভারাক্রান্ত, অথবা একান্ত তথ্যহীন না করেও একটি জীবন্ত জাতির সাহিত্য-ইতিহাসের পরিচায়নও যে সম্ভব, বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিয়ে এই পরীক্ষা-প্রয়াসে বিন্দুমাত্র সফল হতে পারলেও চরিতার্থ বোধ করব।

প্রথম সংস্করণেই উল্লিখিত হয়েছিল,—এ ধরনের গ্রন্থ প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা বাস্তব রূপ নিতে পেরেছিল বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড-এর সহৃদয় প্রকাশক-গোষ্ঠীর সহযোগিতায়।

এমন কি, স্কুল-কলেজের পরীক্ষার প্রয়োজনেও সাহিত্য পাঠের ফলশ্রুতি যে নীরস তথ্যসমাহরণ নয়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম পাঠ গ্রহণের কালে এই সত্য অনুভব করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার স্নাতক জীবনের আচার্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের স্নিগ্ধ দাক্ষিণ্যে। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশলগ্নেও তাঁকে প্রণাম করি।

*　　　　*　　　　*

শ্রীভূদেব চৌধুরী

প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা
স্বাধীনতা দিবস, ১৯৫৯

সূচীপত্র

বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য

বাংলা দেশ, বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের নামের মূলে রয়েছে বঙ্গ-জাতির প্রভাব। বঙ্গজাতির বাসস্থান বঙ্গদেশ বা বাংলা দেশ নামে পরিচিত হয়; আর বাংলা দেশের লোকেরা যে ভাষা ব্যবহার করেন তাকেই আজ আমরা বাংলা ভাষা নামে অভিহিত করি। বঙ্গজাতি মূলতঃ আর্যেতর বংশজাত ছিলেন বলে মনে হয়। সুপ্রাচীন ঐতরেয় আরণ্যকে এঁদের সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া গেছে। ঐতরেয় আরণ্যক ঋগ্‌বেদের আরণ্যকগুলির একটি; আর ঋগ্‌বেদের গ্রন্থনকাল খ্রীস্টপূর্ব অন্ততঃ ১৫০০ বছরের পরবর্তী নয়। এর থেকেই বঙ্গজাতির প্রাচীনতার পরিচয় অনুমান করা যেতে পারে। বাংলা দেশের যে অঞ্চলকে আজ আমরা পূর্ববঙ্গ বলি, বঙ্গজাতির বাস আসলে ছিল সেখানে; এবং কেবল ঐ অঞ্চলকেই তখন বঙ্গদেশ বলা হত। এখনকার পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে ছিল রাঢ় ও সুহ্মদেশ। উত্তরবঙ্গের নাম ছিল পুণ্ড্রবর্ধন; পুণ্ড্র নামে এক অনার্য জাতি ছিল সেখানকার সুপ্রাচীন অধিবাসী। ক্রমে বঙ্গ, রাঢ় ও সুহ্মদেশ এবং পুণ্ড্রবর্ধন মিলে বর্তমান বাংলাদেশের পত্তন হয়।

বাংলা দেশ ও বাংলা ভাষা

বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীরা সকলেই ছিলেন অনার্য; তাঁদের ভাষাও ছিল অনার্যভাষা। সেই প্রাচীন ভাষা বাংলার মাটি থেকে আজ একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে; কেবল দু-একটি পুরাতন জায়গার নাম অথবা নিত্যব্যবহার্য দু-একটি জিনিসের নামের মধ্যে ঐ সব ভাষার ছিটে-ফোঁটা নিদর্শন এখনও এক-আধটা টিঁকে আছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন ঐ-সব লোকেরা "কোল বা অষ্ট্রিক জাতীয় ভাষা এবং কতকটা দ্রাবিড় ভাষা" বলত।

আদিম বাঙালির ভাষা-পরিচয়

আমাদের এখনকার কালের বাংলা ভাষায় ঐ সব অনার্য ভাষার কোনো ছাপই নেই; এ-ভাষা পুরোপুরি আর্য-সন্তান। আর্যগণের ভারতে আগমনের

বাংলা সাহিত্যের আদিকথা

বাংলা সাহিত্যের জন্ম-উষা অস্পষ্ট রহস্যে আচ্ছন্ন। এই সময়ে রচিত গ্রন্থাদির পরিচয় সুলভ নয়। দু-একটি রচনার আংশিক সন্ধান যা-ও বা আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে বাংলাভাষার স্পষ্টরূপ বড় একটা চোখেই পড়ে না। বাংলা ভাষায় রচিত প্রাচীনতম যে গ্রন্থখানির পরিচয় আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে, তার নাম 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়'। সাধারণভাবে এই গ্রন্থ 'চর্যাপদ' নামে পরিচিত। 'পদ' বলতে স্থূলতম অর্থে বুঝি গীত বা কবিতা ; বাংলা ভাষার এই প্রাচীনতম গ্রন্থও একখানি গীতি-কবিতা-সংকলন।

বাংলাভাষার আদিগ্রন্থ চর্যাপদ

কিন্তু এই কাব্য মোটেই বাংলা ভাষায় রচিত কি না, সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। চর্যা-কবিতার একটি উদাহরণ দিলেই এই সংশয়ের কারণ বোঝা যাবে :—

চর্যাপদে বাংলাভাষা

"সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী॥
বাহতু কামলি গঅণ উবেসেঁ।
গেলী জাম বাহুড়ই কইসেঁ॥
খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি।
বাহতু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছি॥
মাঙ্গত চড়্‌হিলে চউদিস চাহঅ।
কেডুআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ॥
বাম দাহিণ চাপী মিলি মিলি মাঙ্গা।
বাটত মিলিল মহাসুহ সাঙ্গা॥

'—সোনায় ভর্তি আমার করুণা নৌকা ; রূপো রাখবার ঠাঁই নেই তাতে। ওরে কম্বলিপাদ, গগনের (নির্বাণের) উদ্দেশে তুমি বেয়ে চলো। যে জন্ম গেছে, সে ফিরবে কেমন করে ?

[নৌকো বাইতে গিয়ে] খুঁটি উপ্ড়ে ফেলো, কাছি মেলে দাও। সদ্‌গুরুকে জিজ্ঞাসা করে, হে কম্বলিপাদ, তুমি বেয়ে যাও। পথে বেরিয়ে চারদিকে চেয়ে যেয়ো ; কেড়ুয়াল ছাড়া কেউ কি বাইতে পারে ? বাম-ডানে চেপে চেপে পথ বেয়ে গেলে ঐ পথেই মহাসুখের সঙ্গে মিলে যাবে।'

বাংলা দেশের চিরদিনের মনের কথায় ভরা কবিতাটি,—নদীর বুকে প্রাণের সুখে নৌকো বেয়ে চলার মধুময় একটি চিত্র ; ফাঁকে ফাঁকে 'সদ্‌গুরু' 'নির্বাণ' 'মহাপুরুষ-সঙ্গ' এমনি সব মরমিয়া লোক-গীতির সংকেতে-আভাসে ভরা কথা ; সবই মনে হয় একান্ত চেনা-জানা। কিন্তু, মূল কবিতার ভাষাকে কি চিনি ? সঙ্গের 'গদ্যানুবাদ' না থাকলে এমন সুন্দর কথাগুলোর কিছুই বোঝা যেত না। অথচ ভাষার দিক থেকে উদ্ধৃত কবিতাটি একটি একান্ত সহজ-বোধ্য চর্যাপদ ; আর চর্যাপদাবলী নাকি প্রাচীনতম বাংলা ভাষাতে লেখা কবিতার সংকলন। এ কালের বাংলা ভাষার সঙ্গে তার পার্থক্য কত দূরযানী !

চর্যার জীবনাবেদন

এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা বলেছেন, চর্যাপদাবলীর প্রধান অংশ অপভ্রংশ ভাষায় লেখা। আর তাতে মাগধী অপভ্রংশের চেয়ে শৌরসেনী অপভ্রংশের পরিমাণ অনেক বেশি। অথচ ঐ মাগধী অপভ্রংশই বাংলাভাষার পূর্বসূরী। শৌরসেনী আসলে হিন্দীর পূর্বপুরুষ। এ-সব সত্ত্বেও, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বের গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন. চর্যাপদাবলীতে এমন কিছু পরিমাণ শব্দ ও প্রয়োগ রয়েছে, যা কেবল বাংলা ভাষাতেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে,—অন্য কোনো ভাষায় হয় না। তাই, মনে করা হয়েছে যে, অপভ্রংশ ভাষা যখন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত, আর যখন সেই অপভ্রংশের কাঠামোতেই একটি-দুটি করে বাংলা শব্দ ও বাগ্‌ভঙ্গির পরিচয় অঙ্কুরিত হচ্ছিল,—বাংলা ভাষার সেই উষালগ্নের সাহিত্যিক নিদর্শন এই চর্যাপদ।

মোটামুটি একই সময়ে প্রায় অভিন্ন ভাষায় লেখা আরো তিনখানি প্রাচীন পুঁথির পরিচয় পাওয়া গেছে। সবসুদ্ধ এই চারখানি পুঁথিই মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবার-গ্রন্থশালা থেকে একসঙ্গে আবিষ্কার করেন। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে তাঁরই সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে চারখানি পুঁথিই একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল,—"হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা"

ভাষা-বৈশিষ্ট্য

নামে। পুঁথি চারখানির নাম যথাক্রমে :—(১) চর্যাচর্য বিনিশ্চয়, (২) [সংস্কৃত টীকা সহ] সরোজ বজ্রের দোহাকোষ, (৩) [সংস্কৃত টীকাযুক্ত] কৃষ্ণাচার্যের দোহাকোষ, এবং (৪) [সংস্কৃত রচনাংশ সহ] ডাকার্ণব।

চর্যাপদ ছাড়া অপর তিনটি গ্রন্থেরই মূল অংশ মাগধী-বিমিশ্র শৌরসেনী অপভ্রংশ ভাষায় লেখা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভাষাগত এই সাধারণ সাদৃশ্য দেখে সব কয়খানি গ্রন্থকেই "পুরাণ বাঙ্গালা ভাষার" রচনা বলে মনে করেছিলেন। পরে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রতিপন্ন করেছেন, কেবল চর্যাপদই বাংলা ভাষার সাহিত্য; অন্য তিনটি গ্রন্থে বাংলা শব্দ বা বাগ্‌ভঙ্গির কোনো অঙ্কুর-পরিচয়ও লক্ষিত হয় না।

কেবল ভাষার দিক্ থেকেই নয়, ভাবের বিচারেও চর্যাপদাবলী বাংলার লোক-জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সূত্রে বাঁধা। ওপরের কবিতাটিই তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আসলে চর্যাপদ ধর্ম সম্বন্ধীয় কবিতা। বৌদ্ধ মহাযান সাধকদের মধ্যে একদল ছিলেন 'সহজিয়া পন্থী'। দেহের সহজাত বৃত্তিগুলির চরিতার্থতা বিধান করাকেই যাঁরা ধর্মসাধনার উপায় বলে মনে করেন, তাঁদের সহজিয়া সাধক বলা হয়। এ দিক্ থেকে কেবল বৌদ্ধ নয়,—বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও সহজ-সাধক রয়েছেন, মধুর মরমিয়া সংগীতের আকর বাউলরাও সহজ-সাধন-পন্থী। ঐই রকমই এক বৌদ্ধ সহজ-সাধক বজ্রযানী সম্প্রদায়ের গোপন সাধনার ইঙ্গিত লুকানো রয়েছে চর্যা-কবিতাবলীর অন্তরালে। অনেক কয়টি কবিতারই দুটি করে অর্থ হয় : একটি স্পষ্টার্থ,—বাংলার লোক-জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিচিত্র মধুর ছবিতে তা ভরপুর। অপর অর্থটি একান্ত গুহ্য,—সাধকেরা গুরু-পরম্পরায় তার তাৎপর্য জানতে পারতেন। তা ছাড়া, চর্যাপদের পুঁথির মধ্যে বিভিন্ন পদের সংস্কৃত টীকা পাওয়া গেছে। তা থেকে এই গোপন অর্থের আভাস কিছু কিছু অনুভব করা চলে। মূল অর্থটিকে সাংকেতিক ভাষার আবছায়ায় ঢেকে রাখা হয়েছে বলে চর্যার ভাষাকে বলা হয় সন্ধ্যাভাষা। সন্ধ্যাভাষার রহস্য উদ্ভেদ্ করতে না পারলেও সাহিত্য-পাঠকের ক্ষোভের কারণ থাকে না;—বাংলার লোক-জীবনের একটি চিরপরিচিত-হয়েও চির-মধুর জীবন-চিত্রকে প্রত্যক্ষ করে তোলার আনন্দে চর্যাপদাবলী রস-সজীব হয়ে আছে।

চর্যাপদে ধর্মতত্ত্ব ও জীবন-রূপ

আগেই বলেছি চর্যাপদ কবিতা-সংকলন। বাংলায় লেখা ৪৬½টি কবিতার সন্ধান পাওয়া গেছে এতে। মূল পুঁথি খণ্ডিত ছিল বলে আরো কিছু সংখ্যক পদের সন্ধান পাওয়া যায় নি। পরে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, চর্যা-সংকলনে মোট কবিতাসংখ্যা ছিল ৫১। এই সকল পদের ভণিতায় কবি হিসেবে ২৪টি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা মনে করেন অনেক সময়ে একই কবি নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ পদে পৃথক পৃথক্ নামের ভণিতা ব্যবহার করেছেন। যেমন, শান্তিদেব, ভুসুকু এবং রাউতু একই কবির বিচিত্র নাম বলে অনুমিত হয়েছে; আবার লুইপাদ আর মীননাথ নামেও একই ব্যক্তি পরিকল্পিত হয়ে থাকেন। এই সব কবিদের কেউ কেউ ইতিহাস-কীর্তিত ব্যক্তি; যতদূর জানা গেছে, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে দ্বাদশ শতাব্দী কালের মধ্যে এঁদের অনেকে বর্তমান ছিলেন। এই কারণেই চর্যাপদাবলীর রচনাকাল,—তথা বাংলা সাহিত্যের জন্মলগ্ন আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিলম্বিত বলে মনে করা হয়।

চর্যার পদ-পরিচয়

চর্যাগীতির কথা ছেড়ে দিলে এই আদি-কালে রচিত বাংলা সাহিত্যের অপরাপর প্রামাণ্য নিদর্শন প্রচুর নয়। ডঃ সুনীতিকুমার এই ধরনের একটি দুর্লভ তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। রাজা তৃতীয় সোমেশ্বর ভূলোকমল্ল ছিলেন মহারাষ্ট্রের চালুক্য বংশীয় নরপতি। তার পৃষ্ঠ-পোষকতায় ১১২৯ খ্রীস্টাব্দে মানসোল্লাস বা অভিলাষার্থ চিন্তামণি নামে একখানি বিশ্বকোষ-গ্রন্থ সংকলিত হয়। তাতে সংগীত বিষয়ক একটি আলোচনা আছে,—নাম 'গীতবিনোদ'। এই আলোচনার কিছু কিছু শ্লোক আদিম কালের বাংলা ভাষায় লেখা ব'লে ডঃ সুনীতিকুমার উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য পদগুলো কৃষ্ণের অবতার বা গোপী-লীলা বিষয়ক।

মানসোল্লাস-এর রচনাংশ

তা ছাড়া খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে কোনো অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি প্রাকৃত ছন্দ আলোচনার জন্য প্রাকৃত পৈঙ্গল নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাতে অপভ্রংশ কবিতার উদাহরণের মধ্যে কয়েকটি রচনায় ডঃ সুনীতিকুমার বাংলা ভাষার অঙ্কুরাভাস লক্ষ্য করেছেন।

প্রাকৃত পৈঙ্গল

ডঃ সুকুমার সেন নীচের পদটিকে এই ধরনের রচনার এক সার্থক নিদর্শন হিসেবে উদ্ধার করেছেন :—

"আরে রে বাহিহি কাহ্ন নাব ছোটি ডগমগ কুগতি ণ দেহি।
তই ইথ নইহি সন্তাব দেই জো চাহাহি সো লেহি !!"

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, পদটি কৃষ্ণের নৌকা-লীলা বিষয়ক।

এই সব সংক্ষিপ্ত ও অপূর্ণাঙ্গ উপাদান ছাড়া আলোচ্য কালের বাংলা ভাষায় লেখা আর কোনো প্রামাণ্য রচনার সন্ধান পাওয়া যায় নি। কেবল ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন এই যুগের রচনা হিসেবে আরো কিছু কিছু গ্রন্থেব উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর লেখা 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রামাণ্য ইতিহাস। দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থে আলোচিত প্রাচীন বাংলা রচনার তালিকায় আরো আছে 'শূন্যপুরাণ', 'ময়নামতীর গান' ও 'গোরক্ষ বিজয়' ইত্যাদি কাব্যের নাম।

শূন্যপুরাণ রাঢ়ের গ্রামাঞ্চলে পূজিত ধর্মঠাকুরের পূজা-পদ্ধতি। তথাকথিত অন্ত্যজ লোকেরাই প্রথমে এই দেবতার ভক্ত পূজারী ছিলেন। অতএব পূজা-পদ্ধতি ছিল স্থূল লোকাচার-প্রধান, মন্ত্রাদিও ছিল লৌকিক ভাষায় লেখা। এই গ্রন্থের বহুলাংশ রামাই পণ্ডিতের ভণিতায় লেখা। রামাই পণ্ডিত ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রাচীনতম গুরু। তাঁর আবির্ভাবের সময় অনুমান করা হয়েছিল খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী বা নিকটবর্তী কালে। ফলে, আলোচ্য কাব্যটিও এই সময়েই রচিত হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত করা হয়। পরবর্তী গবেষণায় এই মতের বিরোধিতা করা হয়েছে। আজ পর্যন্ত এই কাব্যের যে তিনখানি পুঁথি পাওয়া গেছে, তার কোনোটিই খুব প্রাচীন নয়, কাব্যের ভাষা বিচার করে পণ্ডিতেরা স্থির করেছেন, এর কোনো অংশই ষোড়শ শতকের আগের লেখা নয়,—বহু অংশ আবার অষ্টাদশ শতকেও লিখিত। ভণিতা বিচার করে বলা হয়েছে, শূন্যপুরাণ কোনো এক ব্যক্তির লেখা নয়, বিভিন্ন কবি এর নানা অংশ রচনা করেন,—রচনা-কাল ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে হওয়া সম্ভব। এ-সব তথ্য সত্ত্বেও অনুমান করা যেতে পারে যে, শূন্যপুরাণের মূল কাঠামোটি হয়ত রামাই পণ্ডিতের হাতেই সূচিত হয়েছিল, এবং তিনি একাদশ শতাব্দীর কবি ছিলেন।

শূন্যপুরাণ

শূন্যপুরাণের কোনো পুঁথিই পূর্ণাঙ্গ নয় বলে, কাব্যের মূল নাম জানা যায় নি। সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু কাব্যের বিষয়-সম্মত এই নামকরণ করেন। ১৩১৪ বাংলা সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। শূন্যপুরাণের উল্লেখ্য সাহিত্য মূল্য কিছু নেই।

ময়নামতীর গান-এর কাহিনী সম্বলিত প্রথম কাব্য আবিষ্কার করেছিলেন ডঃ গ্রীয়ার্সন,—১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে। বাংলা ভাষার এই কাব্যখানিকে তিনি রোমান হরফে প্রকাশ করেন "The Song of Manic Chandra" নামে। লৌকিক নাথ-সিদ্ধা সম্প্রদায়ের আচার্যদের জীবনকথার উপভোগ্য আলোচনা, ও সেই সঙ্গে নাথধর্মের মহিমা-কীর্তনই এই শ্রেণীর কাব্য-প্রবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। ময়নামতী ছিলেন মাণিকচন্দ্র রাজার স্ত্রী এবং শ্রেষ্ঠ নাথসিদ্ধাদের একজন। স্বামীর মৃত্যুর পরেও অলৌকিক শক্তিবলে তিনি পুত্রের জননী হতে পেরেছিলেন। রাজা গোবিন্দচন্দ্র তাঁর সেই সন্তান। ময়নামতী ছেলেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করাতে উৎসুক। কারণ, তিনি জানেন,—নাথ সাধনার মধ্য দিয়ে সিদ্ধদেহের অধিকারী হতে না পারলে পুত্রের অকাল-মৃত্যু অনিবার্য! কিন্তু, গোবিন্দচন্দ্র অ-পরিণত যৌবনেই অদুনা ও পদুনা নামে দুই স্ত্রীর সঙ্গ-সুখে বিহ্বল হয়েছিলেন। পুত্র এবং পুত্র-বধূদের প্রতিরোধকে জয় করে ময়নামতী দুঃসহ কষ্টে গোপীচাঁদকে হাড়িপা'র শিষ্যত্বে বৃত করেছিলেন; সন্ন্যাসী গোপীচাঁদ সীমাহীন কৃচ্ছ্রতার মধ্যে 'সিদ্ধাই' লাভের তপস্যা করে চরিতার্থ হয়েছিলেন,—এইটুকুই 'মানিকচাঁদের গান'-এর মূল কথা। ডঃ দীনেশচন্দ্র এবং ডঃ গ্রীয়ার্সন দুজনেই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, আলোচ্য কাব্যের নায়ক এবং 'বঙালরাজ গোপীচন্দ্র' অভিন্ন ব্যক্তি। তাঁদের মতে এই গোপীচাঁদ ছিলেন "একাদশ শতাব্দীর লোক।" অতএব, আলোচ্য কাব্যটিও এর পরে অন্ততঃ এক শতাব্দী কালের মধ্যে রচিত হতে পেরেছিল,—এই যুক্তিতে ডঃ দীনেশচন্দ্র এই কাব্যের প্রাচীনতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

ময়নামতীর গান

পরবর্তী পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তেরও বিরোধিতা করেছেন। কারণ, গ্রীয়ার্সনের পরেও একই কাব্যের নানা রকম পুঁথি আবিষ্কৃত এবং প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু, এদের কোনোটিরই লিপিকাল সপ্তদশ শতকের পূর্বের নয়; ভাষাও অর্বাচীন। তা হলেও, এই শ্রেণীর কাব্যের মূল কাঠামো খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ

শতাব্দীর মধ্যেই সুগঠিত হয়েছিল,—এমন কথা মনে করবার ঐতিহাসিক সমর্থন আছে।

'গোরক্ষবিজয়'-ও নাথধর্ম বিষয়ক কাব্য। নাথ সম্প্রদায়ের আদিগুরু ছিলেন মীননাথ। ভবানীর শাপে তিনি নারী-রাজ্য কদলী দেশে গিয়ে অসংযত-চিত্ত হয়ে সিদ্ধাই-ভ্রষ্ট হন। শিষ্য গোরক্ষনাথ ছদ্মবেশে সেখানে উপস্থিত হয়ে কৌশলে গুরুকে সচেতন করে উদ্ধার কবে আনেন। গোবক্ষবিজয়েব মূল গল্প এইটুকুই। মীননাথ এবং গোরক্ষনাথ এঁরা দুজনেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি; খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দী ছিল এঁদের আবির্ভাব কাল। এই যুক্তিতেই ডঃ দীনেশচন্দ্র এই কাব্য সমষ্টিকে প্রাচীনতম কাব্য-প্রবাহের অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু, গোরক্ষবিজয়ের যত পুঁথি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, তার সব কয়টিরই লিপিকাল ও ভাষা অর্বাচীন। এই যুক্তিতে ডঃ সুকুমার সেন আলোচ্য কাব্যধাবাকে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলে অস্বীকার কবেছেন। কিন্তু, এই কাব্যেরও আদিম কাঠামো খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে গঠিত হয়েছিল বলে অনুমান করা চলে; ডঃ নীহারবঞ্জন রায় 'বাঙালীর ইতিহাস'-এ এই অনুমানেব পোষকতা করেছেন।

গোরক্ষবিজয়

ময়নামতীর গানের জীবন-রূপ স্থূলতাধর্মী হলেও, তাব মানবিক আবেদন মর্মস্পর্শী। কিন্তু গোরক্ষবিজয় মূলত ধর্মগ্রন্থ,—একে "বায়ুবিজয় শাস্ত্র" বলা হয়েছে। ফলে, ময়নামতীর গানে কাব্যেব উপাদান প্রচুর হলেও, গোরক্ষ-বিজয় সাহিত্য-রস-হীন।

এই সব ধর্মকথার অনুমান-নির্ভর আলোচনা ছেড়ে দিলে বাংলা ভাষার আদি যুগে রচিত মানবিক উপাদানে সমৃদ্ধ কাব্য-সাহিত্যের পরিচয়ও কিছু কিছু পাওয়া গেছে। সেকশুভোদয়া নামক একখানি ইতিকথাশ্রিত গ্রন্থ ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। এই পুস্তকের উনবিংশ অধ্যায়ে একটি বাংলা প্রেম-গীতি পাওয়া গেছে; গানটির ভাষা মধ্যযুগের বাংলা ভাষার অনুরূপ। তা হলেও, ডঃ সুনীতিকুমার নানা যুক্তিবিন্যাস করে সিদ্ধান্ত করেছেন এটি বাংলা-দেশে মুসলমান আক্রমণের পূর্বকালের লেখা; অর্থাৎ এই গানেরও রচনাকাল দ্বাদশ শতাব্দীসীমার মধ্যে।

প্রেম-গীতি

বাংলা ভাষায় বাঙালির গল্প রচনার প্রয়াসও এই সময়েই শুরু হয়েছিল,— একথা অনুমান করেছিলেন ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন। তাঁর মতে বাংলা রূপকথা-সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল মুসলমান আক্রমণের পূর্বে।

রূপকথা

ডাক ও খনার বচন

ডাক ও খনার বচন নামে প্রচলিত সুভাষিতাবলী-ও এই "প্রাকৃতুর্কী আমলের প্রবাদ-সংগ্রহ" বলে অনুমিত হয়েছে।

এই সব রচনার আদিরূপের কোনো নিশ্চিত নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় নি। ফলে, সাহিত্য-ইতিহাসে এদের সমুচিত মূল্য নির্ণয় সম্ভব নয়। তবু আনুমানিক বিচারের দ্বারা যতটুকু জানা গেছে, তার থেকেই আলোচ্য যুগের বাঙালি মনের বিচিত্র-চরিত্রতার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লৌকিক বাঙালির ধর্মসাধনা সেদিন ছিল বহুমুখী; আর সেই ধর্ম-কথার প্রতি অনুরাগ-বিশ্বাস সাহিত্যের জগতে নানারূপ সৌন্দর্য রচনা করেছিল। কেবল ধর্ম-বিষয়েই নয়,—প্রেম-গীতি রচনায়, গালগল্পে, এমন কি কৃষি ও সমাজ বিষয়ে সুভাষিত রচনায় সেদিনকার বাঙালি-মন সদা-উৎসাহী হয়েছিল। বাঙালির কণ্ঠে বাংলা ভাষার পরিস্ফুট রূপ যখন জাগে নি,—তখনো সাহিত্যের সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে বাঙালির মন জেগেছিল বহুমুখী প্রসার কামনায়। আদিপর্বের সাহিত্যের এইটুকুই ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি।

আদিযুগের সাহিত্যিক ফলশ্রুতি

বাংলা সাহিত্যের মধ্য-পর্যায়

বাংলা ভাষায় লেখা প্রাচীনতম সাহিত্যগ্রন্থ চর্যাপদ। আগেই বলেছি, চর্যা-কবিতাবলীর রচনাকাল আনুমানিক দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে। ঐ সময়-সীমাকে বাংলা সাহিত্যের আদি পর্যায় বলা যেতে পারে। চর্যাপদ ছাড়াও এ যুগে রচিত বলে আরো যত কাব্য-কবিতার অস্তিত্ব অনুমান বা আবিষ্কার করা হয়েছে, পূর্ব অধ্যায়ে তাদেরও পূর্ণ পরিচয় দিয়েছি। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীর পরে দীর্ঘ দেড়শ বছরের বেশি সময় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চলেছিল একান্ত শূন্যতাময় এক যুগ। পূর্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত আদিম রচনাবলীর পরে যে সব সাহিত্য-কর্মের সন্ধান এ-পর্যন্ত পাওয়া গেছে, তার কোনোটির রচনাকালই চোদ্দ শতকের মাঝামাঝির আগে বলে মনে হয় না।

যুগান্তরের সূত্র

অথচ মধ্যবর্তী প্রায় দেড়শ বছরে বাংলা ভাষায় কোনো কিছুই লেখা হয় নি, একথা মনে করা হয়ত সংগত নয়। কিছু কিছু অপ্রধান রচনার উদ্ভব সম্ভবতঃ হয়েছিল, কালের হাতে যা নষ্ট হয়ে গেছে। তবে, একথা প্রায় নিশ্চিত যে, এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের বৃহত্তর পরিবেশ উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টির উপযোগী ছিল না। বাংলার রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মজীবনে তখন দুর্যোগের ঘনঘটা প্রায় সীমাহীন হয়েছিল, আর তার মূলে ছিল তুর্কী মুসলমানদের দ্বারা বাংলাদেশের আক্রমণ।

১২০২ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে মহম্মদ বিন্ বখতিয়ার খিল্‌জি প্রথমে বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। গৌড়ের রাজা তখন বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন;— বাংলাদেশে এক কালে সেন বংশের রাজারা ছিলেন অমিত প্রতাপশালী হিন্দু-গৌড়াধিপ; লক্ষ্মণ সেন ছিলেন তাঁদেরই শেষ উত্তরসূরী। নবদ্বীপে তাঁর শেষ বয়সের আবাস ছিল; সেখানেই বখ্‌তিয়ার প্রথম আক্রমণ করেন,— অতর্কিত আঘাতে বৃদ্ধ রাজা পলাতক হন। তার পরেই সারা বাংলাদেশে বিভীষিকা আর অরাজকতা দুর্বার হয়ে ওঠে। সেন রাজাদের আগে বৌদ্ধ পাল-রাজারা ছিলেন বাংলার দণ্ডাধিকারী, তাঁরা রাজ্য লাভ করেছিলেন হিন্দু-বর্মণ বংশকে পরাজিত করে।

তুর্কী আক্রমণ

ফলে, রাজশক্তির পরিবর্তন বাংলাদেশে পূর্বাবধিই কিছু আকস্মিক ছিল না। কিন্তু. পুনঃ পুনঃ এই রাজবংশের পরিবর্তনের প্রভাবে বৃহত্তর বাঙালি সাধারণের জীবনযাত্রায় খুব বেশি পরিবর্তন কিছু ঘটে নি। কারণ, রাজারা যে-কোনো ধর্মেই বিশ্বাসী হোন না কেন, সাধারণ বাঙালি-আচার অনুষ্ঠানের প্রতি সকলেরই ছিল সমান আনুগত্য। সমাজের যুগ-প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি তাঁদের মর্যাদাবোধ ছিল গভীর, তাই কোনো রাজশক্তিই চিরাগত জীবনযাত্রা-পদ্ধতির ওপরে আঘাত করেন নি,—বরং সকলেই করেছেন তার পোষকতা। কিন্তু, তুর্কী মুসলমানেরা এদিক থেকে কেবল বিধর্মী ছিলেন না, ছিলেন বিদেশীও। বাংলার জীবনধারা অথবা বাঙালি ঐতিহ্য কোনোটির প্রতিই তখনো তাঁদের কোনো মমতা ছিল না। ফলে, আক্রমণের প্রায় প্রত্যেক স্তরেই বিবেকহীন লুণ্ঠন এবং বিভীষণ হত্যা ও নির্যাতন অবারিত হয়েছিল। অর্থ, মান, প্রাণ,—ধর্ম, আচার, নিষ্ঠা সব কিছুর ওপরেই নির্মম আঘাত এসে পড়ায় বাঙালিব বিবেক তখন বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এখানেই বিনষ্টির শেষ হয় নি। আক্রমণকারী যতই অত্যাচারী হোক, অন্ততঃ প্রয়োজনের তাগিদেও শাসককে মাঝে মাঝে সহৃদয় হতে হয়। বস্তুতঃ বখ্‌তিয়ার খিল্‌জিও আক্রমণকালের এক বছরের মধ্যে শাসকের ভূমিকায় বসে দেশে শান্তিস্থাপনে প্রয়াসী হযেছিলেন। মন্দির ভেঙে মসজিদ, পাঠশালার বদলে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল; তবু তাঁর রাজত্বের স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রাণের ভয় কমেছিল। কিন্তু, প্রায় তিন বছরকালের মধ্যেই ক্ষমতালোলুপ আর এক মুসলমান আততায়ীর হাতে তাঁকে প্রাণ হারাতে হয়। তারপরে নবীন শাসক-সমাজে হত্যা ও প্রতি-হত্যার পাপচক্র পুনঃপুনঃ আবর্তিত হতে থাকে। ফলে, বনেদি বাঙালি অধিবাসীরা ধন-মান-প্রাণ ও জাতির ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন, বঙ্গের পূর্ব ও উত্তর প্রত্যন্তের দুর্গম ভূমিতে। স্বয়ং লক্ষ্মণসেন পদ্মার পরপারে গিয়ে রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। নদী-মাতৃক পূর্ববঙ্গের দুর্গমতায় মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য ছিল না,—তাই দীর্ঘকাল হিন্দুরা সেখানে স্বস্তির আশ্রয় পেয়েছিলেন। এই ধরনের আর একটি নিশ্চিত আশ্রয় ছিল বাংলার শিরোভূমিতে হিমালয়ের গহন-প্রদেশে। দেশ ছেড়ে যাবার সময়ে বাঙালি হিন্দুরা নিজেদের পুঁজিপাটাসহ পুঁথিপত্রও সঙ্গে নিয়েছিলেন।

আক্রমণের বিনষ্টি

প্রধানতঃ এই কারণেই সুপ্রাচীন বাংলা কাব্য-কবিতার বহু দুর্লভ নিদর্শন আবিষ্কৃত হতে পেরেছে পূর্ব ও উত্তর প্রত্যন্ত দেশ থেকে,—এই কারণেই চর্যাপদাবলীও ইতিহাসের বিনষ্টির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে নেপালভূমির সাংস্কৃতিক আতিথ্যে।

যাই হোক, এই সার্বিক বিধ্বংস ও পলায়ন-ত্রস্ততার মধ্যে উৎকৃষ্ট শিল্প সৃষ্টি অসম্ভব ছিল। পূর্বযুগের অনেক সম্পদ এবং এ-যুগের যা-কিছু রচনাও পলায়নের পথে পথে বহুল বিলুপ্ত হয়েছে। প্রধানতঃ এই কারণেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১২০২ থেকে প্রায় ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মোটামুটি এই দেড়শ বছর নিষ্ফলা মরুভূমি হয়ে আছে। ১৩৪২ খ্রীস্টাব্দে ইলিয়াস্ শাহী বংশের রাজ্যাধিকার লাভের পর থেকে বাংলা দেশে আবার সুস্থ জীবনযাত্রা ক্রমশঃ ফিরে আসতে থাকে। জীবনের সার্বিক মুক্তির ক্ষেত্রে নূতন আশ্বাসে নবীন শিল্প-রচনার উদ্যম আবার অঙ্কুরিত হতে থাকে;—দেখা দেয় নবতর সৃষ্টির প্রবাহ।

বিনষ্টি-উত্তর নবজীবনাঙ্কুর

ভাবে এবং ভাষায় এই নূতন সাহিত্য চর্যাপদের সমকালীন রচনা থেকে ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই দেড়শ বছরে ভাষা সুগঠিত হয়েছে; অপভ্রংশ-কণ্টকিত অস্পষ্ট কাকলির পরিবর্তে এবার স্বাধীন স্ব-তন্ত্র বাংলা ভাষায় কাব্য রচিত হতে লাগ্‌ল। বাংলা বাগ্‌ভঙ্গি এবং ছন্দ-শৈলী এখানে আপন ভাবে বিমূর্ত। এই ভাষাগত পরিণতির ঐতিহাসিক পরিচয় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন কাব্যে।

ভাবের দিক থেকেও, তুর্কী আক্রমণের দুর্যোগদিনের অভিজ্ঞতা বাঙালির নবীন সাহিত্যে নূতন সুর যোজনা করেছিল। তুর্কী আক্রমণ-পূর্ব বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি ছিল দ্বিধা বিভক্ত। সমাজের উচ্চমঞ্চে আসীন ছিলেন অভিজাত বংশ-জ ব্রাহ্মণ্য-হিন্দুগণ; তাঁদের সাহিত্য-শৈলীর বাহন ছিল দেবভাষা সংস্কৃত। অপর পক্ষে, তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর বৌদ্ধ, হিন্দু, নাথ-সহজিয়া লোক-সাধকেরা তাঁদের অপরিচ্ছন্ন জীবনবোধকে মুক্তি দিয়েছেন আড়ষ্ট, অ-পূর্ণ অপভ্রংশ ভাষার মধ্য দিয়ে। ফলে, চর্যা-পদাবলী রচনার প্রায় একই সময়ে অভিজাত বাঙালি কবি জয়দেব তাঁর 'মধুর-কান্ত' গীত-গোবিন্দ পদাবলীর অমৃত-সুর-ঝংকার

নবীন রচনা-সম্ভার

সৃষ্টি করেছেন, মধুস্বাদী সংস্কৃত ভাষায়। তুর্কী আক্রমণোত্তর যুগে এই সমাজ ও সংস্কৃতিগত বিভেদ সম্পূর্ণ দূর হল। এ যুগে কবি কৃত্তিবাস ছিলেন সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত; পাণ্ডিত্যের দম্ভও ছিল তাঁর অশেষ। নিজের সম্পর্কে লোক-মুখের প্রশস্তির কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—

অনুবাদ সাহিত্য

"মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে বাখানি কৃত্তিবাস গুণী॥"

কৃত্তিবাসের নিজের মনের কথাও ছিল এটি। কিন্তু এই মহাপণ্ডিত কৃত্তিবাসও বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন,—

"সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥"

এই লোক-বোঝানোর আকাঙ্ক্ষাই তুর্কী আক্রমণের পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইতিহাসের তথ্য থেকে জানা যায়, প্রায় দেড়শ বছরের তুর্কী-নিপীড়নের যুগে বাঙালিরা কোনো উল্লেখ্য প্রতিরোধ রচনা করতে পারে নি। অসহায় প্রাণীর মতই তাদের দিগ্বিদিকে পালাতে হয়েছিল। এই অসহায়তার প্রধান কারণ ছিল বাঙালি সমাজে ঐক্যের অভাব। দীর্ঘদিন ধরে অভিজাত ও অনভিজাতদের মধ্যে বিভেদের দরুণ সমাজ দ্বিধা-ভক্ত হয়েছিল; চরম প্রয়োজনের দিনে আত্মরক্ষার জন্যে তাঁরা একতাবদ্ধ হতে পারেন নি। আক্রমণের পরবর্তী পুনর্গঠনের যুগে বুদ্ধি-জীবী বাঙালিরা এই জাতীয় ত্রুটির কথা অনুভব করেছিলেন বলে মনে হয়। ফলে স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান ও সাহিত্যের সাধনা এ-যুগে একই সঙ্গে চেষ্টা করেছে নিখিল বাঙালি জাতিকে একতাবদ্ধ করতে। তখন বাংলা দেশের অভিজাত সমাজে ব্রাহ্মণ্য-হিন্দু ধর্মেরই একাধিপত্য ছিল। এবারে হিন্দু সমাজপতিগণ দেশের বাহুস্বরূপ তথাকথিত অন্ত্যজদের আহ্বান করে আনলেন নিজেদের ধর্ম-ব্যবস্থার গণ্ডির মধ্যে। মানব-মনকে স্পর্শ করার শ্রেষ্ঠ উপাদান শিল্প-সাহিত্য। তাই, এতদিনের উপেক্ষিত, অশিক্ষা-পীড়িত, মনের কাছে হিন্দু-অভিজাতরা সংস্কৃত শাস্ত্রের জ্ঞান-মনীষার পসরা সাজিয়ে আনলেন বাংলা সাহিত্যের আধারে। আলোচ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সংস্কৃত

ভাষা থেকে অনুবাদ। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও মালাধর বসুর অনুবাদিত বাংলা ভাগবত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' এই অনুবাদ-সাহিত্যের প্রধান উপাদান।

কিন্তু কোনো মিলনই এক তরফা হলে পূর্ণাঙ্গ হয় না। তাই, আলোচ্য যুগের অভিজাত হিন্দুরা নিজেদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জ্ঞান সম্পদকে বাঙালি সাধারণের মনের কাছে পৌঁছে দিয়েই থামেন নি। অপর পক্ষের ধর্ম এবং পূজাচারকে নিজেদের উন্নত রুচি-কল্পনার দ্বারা পরিশোধিত করে হিন্দু সংস্কৃতির অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন। এই চেষ্টার ফলশ্রুতি হিসেবেই বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের পরিণত রূপ সুগঠিত হয়ে ওঠে। সর্প-দেবতা মনসা, এবং পশু-দেবতা মঙ্গলচণ্ডী আর ধর্মঠাকুর, মূলতঃ এঁরা অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেদের দ্বারাই পূজিত হয়েছিলেন। এবারে এঁদের নিয়েও সংস্কৃত ভাষায় ধ্যান-মন্ত্র রচিত হতে লাগল, - পুরাণে মনসা শিবের কন্যা এবং মঙ্গলচণ্ডী শিবের পত্নী হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে এঁদের মঙ্গলকরী শক্তির মহিমাগান করে রচিত হতে লাগল বাংলা মঙ্গলকাব্য।

মঙ্গলকাব্য

এই যুগে আর এক শ্রেণীর গীতি-সাহিত্য রচিত হয়েছিল রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের মধু-নির্ঝরকে কেন্দ্র করে। কৃষ্ণ পৌরাণিক দেবতা; চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্তিতে তাঁর আরাধনা সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলার অভিজাত হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল। গোপী-সঙ্গে কৃষ্ণের মধুর রস-লীলাও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি সংস্কৃত পুরাণ-কাব্যে পুরা-কথিত হয়েছিল। কিন্তু, রাধা-কৃষ্ণ-প্রণয়ের বিশেষ রূপটি বাংলা দেশের লোক-সমাজের কল্পনাতেই প্রথম জন্ম নিয়েছিল বলে পণ্ডিতদের অনুমান। সেই লৌকিক প্রণয়-কাহিনীকে হিন্দু-পুরাণের কৃষ্ণ-কথার সূত্রে গেঁথে নতুন গীতি-কবিতার ধারা প্রবাহিত হতে লাগল। পরে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-উত্তর কালে এই কাব্যগাথা বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য নামে কীর্তিত হয়েছে। আলোচ্য যুগে এই রাধাকৃষ্ণ-লীলা-কীর্তনের চারণ-শ্রেষ্ঠ চিলেন কবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি। অতএব দেখছি, অনুবাদ কাব্য, মঙ্গল-কাব্য এবং রাধাকৃষ্ণ-লীলাকাব্য,—মধ্য পর্যায়ের বাংলা কাব্যপ্রবাহ এই ত্রিধারায় প্রবাহিত ছিল। পরবর্তী আলোচনায় এই সব রচনার বিস্তৃত পরিচয় সন্ধান করা যাবে।

বৈষ্ণবপদ

মধ্যপর্যায়ের অনুবাদ-কাব্য

১। কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুবাদ

বাংলা ভাষায় মুদ্রিত রামায়ণের প্রায় সব কয়খানিই এখন কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত। অথচ, এই সব রচনার কোনো একছত্রও আসলে কৃত্তিবাসের লেখা নয়। এই তথ্য সর্বপ্রথম নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩০১ বাংলা সালে। তা

কৃত্তিবাসের রচনা

সত্ত্বেও, আজও পর্যন্ত কৃত্তিবাসী রামায়ণের কোনো প্রামাণ্য পরিচয় আবিষ্কৃত হয় নি। স্বয়ং হীরেন্দ্রনাথের সম্পাদকতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ১৩০৭ ও ১৩১০ বাংলা সালে কৃত্তিবাসী রামায়ণের অযোধ্যা এবং উত্তরাকাণ্ড যথাক্রমে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ঐ দুটি "কাণ্ড"-ও কৃত্তিবাসী রচনার অকৃত্রিম নিদর্শন নয় বলেই পণ্ডিতেরা মনে করেন। অন্যান্য প্রচেষ্টার মধ্যে ডঃ নলিনী কান্ত ভট্টশালীর গবেষণা এ-বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তাঁর অকাল-মৃত্যুর দরুণ সেই অনুসন্ধান সম্পূর্ণ হতে পারে নি। তবে, ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডের একটি সম্ভাব্য রূপের সম্পাদনা ও প্রকাশ তিনি করে গেছেন। অবশ্য পণ্ডিতদের মধ্যে কেউ কেউ ডঃ ভট্টশালীর গবেষণাকেও প্রামাণ্য বলে স্বীকার করতে পারেন নি। এদিক থেকে কৃত্তিবাসী রামায়ণের পরিচয় অনুসন্ধান বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের এক দুরপণেয় সমস্যা হয়ে আছে।

সমস্যা কেবল কাব্য-বিষয়ে নয়,—কবিকে নিয়েও। কৃত্তিবাসের নিজের লেখা বলে যে রচনাংশটিকে পণ্ডিতেরা প্রায় সকলেই আজ মেনে নিয়েছেন,—সেটি তাঁর 'আত্ম-বিবরণী'; অর্থাৎ, কাব্যাংশের যেখানে কবি নিজের বিস্তৃত পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। অবশ্য কৃত্তিবাসের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী আগাগোড়াই যে তাতে রয়েছে, এমন কথা মনে করবার কারণ নেই। কৃত্তিবাসের বক্তব্য বিষয় ঐ রচনায় মোটামুটি অক্ষুন্ন আছে, এইটুকুই সাধারণ ধারণা।

যাই হোক, সেই সুদীর্ঘ আত্ম-বিবরণী থেকে জানা যায়, কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষেরা পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। সেখানে 'প্রমাদ' অর্থাৎ রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটলে নরসিংহ ওঝা গঙ্গাতীরে 'ফুলিয়া'য় এসে বাসস্থাপন করেন :—সন্তান-সন্ততি ক্রমে নরসিংহের উত্তর পুরুষেরা সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন। কৃত্তিবাসের পিতামহের নাম ছিল মুরারি ওঝা, তাঁর বাবা ছিলেন বনমালী, আর মার নাম ছিল মেনকা। কৃত্তিবাসেরা সাত ভাই ছিলেন, আর ছিলেন তাঁদের এক সতাতো বোন। বার বছর বয়সে কিশোর কৃত্তিবাস "বিদ্যার উদ্ধার" করবার জন্যে দূরদেশে গিয়েছিলেন। নিজের জ্ঞান-প্রকর্ষের পরিচয় দিয়ে তিনি বলেছেন,—

কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণী

"সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
নানা ছন্দ নানা ভাষা আপনা হৈতে স্ফুরে॥"

বিদ্যাভ্যাস সমাপ্ত করে কবি গৌড়েশ্বরের সমীপে এসে উপনীত হন; তাঁর পাণ্ডিত্য দেখে রাজা তাঁকে অশেষ সম্মানে ভূষিত করেন। তারপরে তিনি আরো গৌরব-ভূষিত হলেন বাল্মীকির রামায়ণ অনুবাদ করে। ১

আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, কবি কৃত্তিবাসের জীবন-কথা আগাগোড়াই বুঝি বিবৃত হয়েছে তাঁর সুদীর্ঘ আত্ম-বিবরণীতে। আসলে কিন্তু ইতিহাসের প্রত্যেকটি জিজ্ঞাসার মুখে কবির বাণী আশ্চর্যরূপে মূক হয়ে আছে।৩ সাহিত্য-ইতিহাসের প্রধান কৌতূহল কবির আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে। রচনার পশ্চাৎপট-বর্তী জীবন-ভূমির সন্ধান না পেলে কোনো সৃষ্টিরই পূর্ণ মূল্যায়ন সম্ভব হয় না। অথচ, কৃত্তিবাস নিজের জন্মের মাস, তিথি, বার প্রভৃতির সুনিশ্চিত সংবাদ দিয়েও একেবারে চুপ করেছেন জন্মসাল বিষয়ে। কবি লিখেছেন,—

"আদিত্য বার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥"

এই তথ্য থেকে কবির জন্ম সন আবিষ্কার করা দুরূহ। তাহলেও, এ-বিষয়ে আত্ম-বিবরণীর আর একটি সূত্র বিশেষ সহায়ক হতে পারত। অর্থাৎ, কৃত্তিবাস যদি তাঁর গুণগ্রাহী গৌড়েশ্বরের নামটি মাত্র উল্লেখ করতেন, তা-হলেও তাঁর কাব্য-রচনার কাল অনায়াসে অনুমান করা যেত। কিন্তু কৃত্তিবাস রাজবাড়ির খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়েছেন,—রাজার আশে পাশের পাত্রমিত্রদের আকৃতি-প্রকৃতি,

নাম, সবই উল্লেখ করেছেন,—কেবল স্বয়ং রাজার নামটি সম্পর্কেই রয়েছেন আশ্চর্য রকমে নীরব।

নিরুপায় হয়ে প্রথম যুগের সন্ধানী পণ্ডিতেরা কৃত্তিবাসের জন্ম-বিষয়ক শ্লোকের ওপরেই নির্ভর করেছিলেন। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি গণনা করে নিরূপণ করেন,—১৩৫৪ শক (১৪৩২—৩৩ খ্রীঃ) ২৯শে মাঘ ছিল রবিবার, শ্রীপঞ্চমী এবং মাঘীসংক্রান্তি। অতএব, ঐ সময়কেই প্রথমে কৃত্তিবাসের জন্ম সন বলে সিদ্ধান্ত করা হয়। কিন্তু, অল্প দিনের মধ্যেই পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তের প্রামাণ্য অস্বীকার করতে থাকেন। প্রথমতঃ তাঁদের বক্তব্য,—কৃত্তিবাস প্রদত্ত গৌড়েশ্বর-পুরীর বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, ঐ রাজা ছিলেন হিন্দুধর্মাবলম্বী। অথচ, রাজ-সভাসদদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও ছিলেন, যাঁর হিন্দু নামের সঙ্গে জড়িত ছিল মুসলমান আমলের উপাধি; কেদার খাঁ এঁদের মধ্যে অন্যতম। অতএব, মনে করা চলে, তুর্কী আক্রমণোত্তর বাংলাদেশের কোনো হিন্দু গৌড়েশ্বরের কাছেই কৃত্তিবাস সম্মানিত হয়েছিলেন। আর, মুসলমান আক্রমণের পরে একজন মাত্র হিন্দু শাসক সমগ্র গৌড়ের অধীশ্বর হতে পেরেছিলেন,—তাঁর নাম রাজা গণেশ। রাজা গণেশের গৌড়াধিকারের কাল ১৪১৪ থেকে ১৪১৮ খ্রীস্টাব্দ। অতএব, ১৪৩২-৩৩ খ্রীস্টাব্দে কৃত্তিবাসের জন্মকাল স্বীকার করলে রাজা গণেশের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগ কল্পনা করে চলে না।

আবির্ভাব কাল-বিষয়ক মতভেদ

অন্য পক্ষে, নতুন যুক্তির অবতারণা করা হল যে, প্রাচীন বাংলা পুঁথিতে 'পুণ্য' শব্দটি লেখা হত 'পুন্ন'র মত করে। আর, হিন্দু শাস্ত্র মতে বছরের চারটি পুণ্য মাসের একটি মাঘমাস। তাই অনেকে বলেন, লিপিকরেরা হয়ত ভুল করে 'পুণ্য মাঘমাস' কথাটিকে রূপান্তরিত করে লিখেছেন 'পূর্ণ মাঘমাস'। অতএব, এই অনুমান ঠিক হলে, কৃত্তিবাসের জন্মদিন মাঘমাসের শ্রীপঞ্চমী রবিবারে ছিল, কিন্তু সেদিন সংক্রান্তি ছিল না। এই নিরিখ মত পুনরায় গণনা করে যোগেশচন্দ্র আবিষ্কার করেন, ১৩২০ শকের (১৩৯৮-৯৯ খ্রীঃ) ১৬ই মাঘ রবিবার শ্রীপঞ্চমী ছিল। ঐদিন কৃত্তিবাসের জন্ম তারিখ ধরলে, রাজা গণেশের গৌড়-শাসনের কালে তাঁর বয়স হয় ১৫ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে। এই সময়ে পাঠাভ্যাস শেষ করে কবি বাড়ি ফিরেছিলেন বলে মনে করা কিছু অস্বাভাবিক নয়। তখনই তিনি রাজা গণেশের দরবারে উপনীত হয়েছিলেন। সকল

দিকের সংগতি দেখে তখনকার মত পণ্ডিতেরা ১৩২০ শককেই কৃত্তিবাসের জন্মসাল বলে গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু তাতেও নতুন সংশয় দেখা দিয়েছে। প্রথমত, কৃত্তিবাস যে রাজা গণেশের সভাতেই সম্বধিত হয়েছিলেন, তাতেই আপত্তি। আত্মবিবরণীতে রাজপুরীর যে বর্ণনা আছে, পাঠানযুগের মুসলমান গৌড়েশ্বরেরাও সে-রকম প্রাসাদে বাস করেছেন। ঐ প্রাসাদের শৈলী ছিল তৎকালীন বাঙালির সাধারণ শিল্প-সম্পদ। তাছাড়া, রাজার নাম যখন পাওয়া যায় না, তখন কবির আত্মবিবরণীতে প্রাপ্ত পাত্রমিত্রদের নাম-পরিচয় অনুসরণ করে রাজার পরিচয় আবিষ্ক'রের চেষ্টা করা হয়েছে। কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের এগারজন হিন্দু পাত্রের নাম উল্লেখ করেছেন; অনেক সময় একজনের নামই হয়ত একাধিক বানানে লেখা হয়েছে। ফলে, কৃত্তিবাসের বর্ণিত লোকসংখ্যা এগারজনের চেয়েও কমে যায়। তাঁদের মধ্যে অন্তত: জনা-তিনেকের পরিচয় নানা স্থত্র থেকে পাওয়া গেছে,—এঁরা সকলেই পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগের লোক;—এবং হয়ত পাঠান গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দিন বারবক শাহের (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রীঃ) রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। এই রুকনুদ্দিন প্রথম বাংলা ভাগবত রচনারও পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। ফলকথা, রাজা যিনিই হোন্, কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীতে বর্ণিত তাঁর পার্শ্বচরের অনেকেই পঞ্চদশ শতকের লোক ছিলেন। অতএব, কবিকেও এই সময়ের লোক বলে অনুমান করতে হয়। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে কৃত্তিবাসের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায়। এই কাব্য ষোড়শ শতকের মধ্যভাগের লেখা, কৃত্তিবাস তাঁর ৫০।৬০ বছর আগেকার লোক হলেও পঞ্চদশ শতকের প্রান্তসীমায় নিশ্চয়ই তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল। অধুনা পণ্ডিতেরা পঞ্চদশ শতককেই কৃত্তিবাসের আবির্ভাব কাল বলে নির্দেশ করেছেন। নতুন তথ্যসন্ধানীদের মধ্যে অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় এবং ডঃ সুকুমার সেন প্রধান। জয়ানন্দের কাব্য, ধ্রুবানন্দের মহাবংশ এবং কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীর খণ্ড তথ্যাংশকে গ্রথিত করে অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় এই সিদ্ধান্তকে আরো দৃঢ়মূল করে তুলেছেন।

যাই হোক্, কৃত্তিবাসের জন্মকালের এই নূতন আনুমানিক হিসাব আপাতত স্বীকার করে নিলেও, তাঁর কবিকীর্তির মূল্যায়ন সংশয়ে আবৃত হয়ে

থাকে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের পরিচয়ে যে-সব কাব্য আজ বাজারে চালু আছে, তাঁর সঙ্গে বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণের যোগ খুব বেশি নয়। বাশিষ্ঠ রামাযণের সঙ্গে সংস্কৃত অদ্ভুত-রামায়ণ এবং অন্যান্য রাম-কথার স্বাধীন সংমিশ্রণে এই নবীন কাব্য-কাহিনীর উদ্ভব ঘটেছে। অনুমান করা হয়, অদ্ভুতাচার্য নামে এক বাঙাল কবির রচনার কাঠামোই বর্তমানকালেব কৃত্তিবাসী রামায়ণ সমূহের প্রধান আদর্শ। এমন অবস্থায় কৃত্তিবাসের মূল রচনার স্বভাব নির্ণয় কষ্টকর। ডঃ ভট্টশালী কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ড সম্পাদনা শেষ করে তা প্রকাশও করেছেন। তাতে দেখা গেছে, বাল্মীকির রচনার আদিকাণ্ডের বিষয়-সূচির সঙ্গে কৃত্তিবাসের আদিকাণ্ডের প্রায় হুবহু মিল রয়েছে। ভাষার মধ্যেও রয়েছে সংস্কৃত ভাষার গাম্ভীর্য আর ওজস্বিতা। ডঃ ভট্টশালীর সম্পাদিত গ্রন্থ কৃত্তিবাসী রচনার একটি মোটামুটি পরিচয় বলেও যদি গ্রহণ কবা যায়, তা হলেও স্বীকার করতে হবে, নিজের সম্বন্ধে কবি যথার্থ উক্তিই করে গেছেন :—

কাব্য ও কবি-পরিচয়

"মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে বাখানি কৃত্তিবাস গুণী॥
বাপমায়ের আশীর্বাদ গুরুর কল্যাণ।
বাল্মীকি প্রসাদে রচে রামায়ণ গান॥
সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥"

কেবল ভাষা এবং বিষয়ের দিক্ থেকেই নয়, বাল্মীকির ভাব বস্তুকেও 'লোক'-সমাজের সম্মুখে হৃদয়গ্রাহী রূপ দিয়েছেন কবি কৃত্তিবাস। হয়ত, এই মৌলিক দানের কথা স্মরণ করেই বাঙালি লোক-সাধারণ তাঁর কাব্য-পরিচয় হারিয়ে ফেলেও কবিত্ব-স্মৃতিকে বরণ করে রেখেছে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে।

কৃত্তিবাসের জীবৎকাল সম্বন্ধেও সংশয় আছে। কারো কারো মতে অন্ততঃ সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

২। মালাধর বসুর ভাগবত-অনুবাদ (শ্রীকৃষ্ণবিজয়)

সংস্কৃত ভাষার শ্রীমদ্ভাগবত একাধারে পুরাণ, কাব্য এবং হিন্দুর পূজ্য ধর্মগ্রন্থও। বাংলাভাষায় এই কাব্যের প্রথম অনুবাদ করেন মালাধর বসু।

আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের যত অনুবাদ হয়েছে, তারও পথিকৃৎ-এর মর্যাদা এই কবিরই প্রাপ্য। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের আর এক অতুল্য গৌরব,—এই বাংলা কাব্যেই রচনাকালের নির্দিষ্ট সন সর্বপ্রথম উল্লিখিত হয়েছে :—

"তেরশ পচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দশ দুই শকে হইল সমাপন॥"

মালাধারের ভাগবত অনুবাদ

পণ্ডিতেরা এই তারিখের প্রামাণ্য অস্বীকার করেন নি। অন্য দিকে নিজের কবি-কীর্তির প্রসঙ্গে মালাধর কোনো এক গৌড়েশ্বরের মহানুভবতার উল্লেখ করেছেন,—

"গুণ নাই, অধম মুই, নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান॥"

কাব্যের প্রায় আগাগোড়া ভণিতাতেই কবি 'গুণরাজখান' উপাধি সগৌরবে ব্যবহার করেছেন। ইতিহাসের সন তারিখ হিসাব করলে দেখা যায়,—শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় কাব্যের রচনা আরম্ভ হয় পাঠান সুলতান রুকনুদ্দিন বারবক্ শাহের (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রীঃ) রাজত্বকালে; রচনা সমাপ্তিকালে গৌড়েশ্বর ছিলেন সামসুদ্দিন ইউসুফ্ শাহ (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রীঃ)। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের একেবারে সুরুতেই "গুণরাজ খান" উপাধির ব্যবহার আছে বলে মনে হয়, প্রথমোক্ত সুলতানই হয়ত কবির গুণগ্রাহী ছিলেন।

মালাধর বসুর বাসভূমি ছিল বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামে। তাঁর বাবার নাম ভগীরথ বসু;—মা ছিলেন ইন্দুমতী। এঁদের বংশের আদি পুরুষ দশরথ বসু। কান্যকুব্জ থেকে আদিশূর যে পাঁচজন সৎকায়স্থকে আনিয়েছিলেন; এই দশরথ ছিলেন তাঁদের একজন। বল্লালসেন এই বংশকে 'কুলীন'-এর মর্যাদা দিয়েছিলেন।

কবি-পরিচয়

মালাধরের কাব্যের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য, শ্রীমদ্ভাগবতের মূলানুবাদ করেছিলেন তিনি। পরবর্তী সময়ের অনেক বাংলা 'ভাগবত-অনুবাদ-কাব্যে'ই শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষা বা কাহিনীর অনুবর্তন ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। মালাধর তাঁর কাব্যে দাবি করেছেন,—

"ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বাঁধিয়া।
লোক নিস্তারিতে কহি পাঁচালী রচিয়া॥"

এই প্রতিশ্রুতি তিনি প্রায় সর্বাংশে রক্ষা করছেন,—মূল কাব্যের অর্থ-পরিস্ফুটনেই মালাধরের কবি-কৃতির যথার্থ সার্থকতা। অবশ্য গোটা কাব্যের অনুবাদ তিনি করেন নি। সংস্কৃত শ্রীমদ্ভাগবত বারটি "স্কন্ধে" বিভক্ত; মালাধর কেবল দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ করেছেন; —এই অংশে কৃষ্ণের শৌর্য,—তথা তাঁর "ঐশ্বর্য-শক্তি" বিশেষ প্রকাশ পেয়েছে। তুর্কী আক্রমণোত্তর ত্রস্ত বাঙালি জাতির সামনে মালাধর শ্রীকৃষ্ণকে শৌর্যের বিগ্রহরূপে বিমূর্ত করে তুলেছিলেন,—এখানেই তাঁর সৃষ্টির ঐতিহাসিক উৎকর্ষ।

কাব্য-পরিচয়

কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মূল্যের মর্যাদাও লাভ করেছিল মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের হাতে। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' মহাগ্রন্থের লেখক কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী জানিয়েছেন,—মহাপ্রভু নাকি কুলীন-গ্রামবাসীদের সম্মানিত করে বলেছিলেন,—

"গুণরাজখান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাঁহা এক বাক্য আছে মহা প্রেমময়॥
'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।'
এই বাক্যে বিকাইলাম তাঁর বংশের হাত॥
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয় হয় অন্যে বহু দূর॥"

মালাধরের ঐশ্বর্য-গুণান্বিত কাব্য মহাপ্রভুর এই স্বীকৃতির মাধ্যমে বৈষ্ণব মহাজনের ভক্তি-নিষিক্ত মধুর রসে মণ্ডিত হয়েছে। উৎকৃষ্ট সাহিত্য "সহৃদয় হৃদয়ের" সুন্দরতাবোধে সুন্দরতর হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

মধ্যপর্যায়ের মঙ্গলকাব্য

অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে মধ্যযুগের ইতিহাস আলোচনায় মঙ্গলকাব্য নামে এক ধরনের প্রাচীন বাংলা কাব্যকে পৃথক শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। এই শ্রেণীর মধ্যে তিন রকমের কাব্য-কাহিনী প্রধান :—(১) পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, (২) মঙ্গলচণ্ডীর গীত বা চণ্ডীমঙ্গল এবং (৩) ধর্মমঙ্গল। বিভিন্ন দেবতা এবং বিচিত্র রকমের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে এই সব কাব্য গড়ে উঠেছে। তবু, এদের যে একই নামের বন্ধনে বাঁধা হয়ে থাকে, তার প্রধান কারণ দুটি। —প্রথমতঃ এই সব কাব্যের উদ্ভব হয়েছে সমাজের একই অনভিজাত স্তর থেকে ; দ্বিতীয়, এদের বাহ্য রূপাঙ্গিকেও একটা মোটামুটি সাদৃশ্য রয়েছে।

আগে বলেছি, মধ্যপর্যায়ের বাংলা সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য—সমাজের উচ্চ এবং নিম্ন স্তরের ভাব-কল্পনার মধ্যে মিলন সাধন। এই সময়েই অভিজাত হিন্দুর শ্রেষ্ঠ পুরাণ-কাব্য বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল ; পূর্বের অধ্যায়ে তার পরিচয় গ্রহণ করা গেছে। অন্যদিকে আলোচ্য মঙ্গলকাব্য সমূহে মনসা, মঙ্গল-

মঙ্গলকাব্যের স্বরূপ

চণ্ডী এবং ধর্মঠাকুর প্রভৃতি সমাজের অপেক্ষাকৃত নীচের তলার দেবতাদেরই মাহাত্ম্য গান করা হয়েছে। এই সব দেবতারা হিন্দু-অভিজাত সমাজে আগে ছিলেন অপাংক্তেয়। এবারে তাঁদের নিয়ে অর্বাচীন পুরাণাদিতে সংস্কৃত শ্লোক-গাথাও রচিত হতে লাগল। অনুমান করা হয়, এই সব লোক-দেবতাদের মহিমা গেয়ে ছোট ছোট আকারের পাঁচালিকাব্য আগে থেকে রচিত হয়ে আসছিল। এবারে উচ্চ-কোটির হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষায় এই সব দেবতাদের ভক্তগণ নিজ নিজ দেব-গুণ গান করে বড় বড় কাব্য রচনা করতে লাগলেন। ঐরূপ বৃহদাকার কাব্যসমষ্টিকেই 'মঙ্গলকাব্য' নাম দেওয়া হয়েছে।

এই নাম-করণের একটি তাৎপর্য আছে। তুর্কী আক্রমণের পরে সমগ্র বাংলাদেশের সমাজে অমঙ্গলের আশংকা প্রায় সর্বব্যাপক হয়েছিল। তাই, আলোচ্য দেবগুণ-গায়ক কবিরা লিখতে লাগ্‌লেন,—তাঁদের পূজিত দেবতার আরাধনা করলে, কিংবা তাঁর মহিমা-কাব্য পাঠ করলে,—এমন কি, তা ঘরে

রাখলেও লোকের অশেষ মঙ্গল হতে পারে; আর তা না করলে হয় একান্ত অমঙ্গল। অতএব, সাধারণ অর্থে যে মঙ্গলময় দেবতার মাহাত্ম্যকাব্য পাঠ বা রক্ষণ করলেও জীবের মঙ্গল হয়, সেই সব কাব্যকেই **'মঙ্গলকাব্য'** বলা হয়েছে।

এই সমস্ত কাব্যের বহিরঙ্গ রূপেও একটা সাধারণ সমতা লক্ষ্য করা যায়। মঙ্গল-কবিরা তাঁদের রচনায় সংস্কৃত পুরাণের কাঠামোকে কিছু কিছু অনুসরণ করেছেন। ফলে, প্রতিকাব্যেই পুরাণের মত সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা করা হয়েছে; সেই সঙ্গে আছে দেব ও নরলোককে ব্যাপ্ত করে দেবতার বিচিত্র লীলা-কথা। প্রায় সকল মঙ্গলকাব্যেই খুব মোটা রকমের চারটি ভাগ দেখা যায়;—(১) **বন্দনাংশ:**—কাব্যারম্ভে প্রায় সর্বত্রই বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা ও কৃপা কামনা করা হয়। (২) **গ্রন্থোৎপত্তির কারণ ও কবির আত্মপরিচয়:**—প্রাচীন পুরাণাদির মত এই অংশে কবিরা দাবি করেছেন যে, তাঁরা স্বেচ্ছায় কাব্য রচনা করেন নি। আলোচ্য দেবতার প্রত্যক্ষ নির্দেশ, স্বপ্নাদেশ, অথবা দৈববাণী শুনে দেব-কৃপার বলেই তাঁরা কাব্যের রচনা সাঙ্গ করতে পেরেছেন। এরূপ বর্ণনার ফলে কাব্য-কথার প্রতি সরল-বিশ্বাসী শ্রোতাদের ভক্তি ও অনুরাগ বেড়ে যেত। আর, দেবতা যে সত্যই গ্রন্থ রচনার মূলে ছিলেন, একথা বিশ্বাসযোগ্য করে তোলবার জন্য কবিরা তাঁদের জীবন-চরিতের একটি খুঁটিনাটি বাস্তব বর্ণনাও প্রায়ই উপস্থিত করতেন এই অংশে। দেখাতেন,—জীবনের কোন্ অবস্থায়, কখন, কিভাবে দেবতা আবির্ভূত হয়েছিলেন, তারই একটি বিশ্বাস্ত চিত্র। এই প্রচেষ্টার কল্যাণে বহু প্রাচীন কবির জীবনের প্রামাণ্য ইতিহাস আমাদের গোচর হয়েছে। (৩) **দেবখণ্ড ও সৃষ্টিতত্ত্ব:**—এই অংশে পুরাণের আদর্শমত সৃষ্টির কাহিনী, এবং দেবলোকে আলোচ্য দেবতার লীলা-কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এই সব কাহিনী প্রায়ই লৌকিক বিশ্বাসের অনুসরণে লেখা;—ফলে, এদের সঙ্গে পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্বের কোনো যোগ নেই এবং গল্পগুলি প্রায়ই অদ্ভুত-অবিশ্বাস্য। (৪) **নরখণ্ড**—এই অংশে নরলোকে মঙ্গলদেবতার পূজা প্রচারের গল্প সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

রূপাঙ্গিক

ধর্মমঙ্গল কাব্যে এই সংগঠনের কিছু কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। তা ছাড়া, কবি ও কাব্য-ভেদেও রচনার আকৃতি-প্রকৃতিতে কিছু কিছু পার্থক্য

ঘটেছে। মঙ্গলকাব্যগুলি সাধারণতঃ আসরে গাইবার জন্য পালা গানের মত সাজানো হত। প্রায়ই আট দিনরাত্রি ধরে পালাগান চলত বলে এই কাব্য-প্রবাহকে অষ্টমঙ্গলাও বলা হয়।

১। মধ্যপর্যায়ের মনসামঙ্গল কাব্য

বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মনসামঙ্গলই হয়ত রচনাকালের বিচারে সুপ্রাচীন। এই কাব্যের গল্প লোক-বাংলার মর্ম মথিত করে জন্ম নিয়েছিল; তাই এর জীবনাবেদন বাঙালির মনোলোকে সুচিরস্থায়ী হয়েছে। ফলে অন্যান্য লোক-কাব্যেও পরবর্তীকালে এই কাহিনীর ছায়াপাত ঘটেছে। মনসামঙ্গলের সুপরিচিত গল্পে মনসার দৈবীমহিমার চেয়ে চন্দ্রধর বণিক আর তার পুত্রবধূ বেহুলার মানবী শক্তির জয়গানই করা হয়েছে বেশি।

চন্দ্রধর বা চাঁদ সদাগর ছিল চম্পকনগরের ধন-শ্রী-পুষ্ট বণিক। ছয় পুত্র, পুত্রবধূ আর পতিপ্রাণা স্ত্রী সনকাকে নিয়ে সুখে তার দিন কাটে। দেবী মনসা শিবের কন্যা, কিন্তু তাঁর জন্মের অনৈসর্গিক কাহিনী দেব-সমাজে তাঁকে অপাংক্তেয় করেছিল। অবশেষে স্থির হয়, চন্দ্রধর মনসাকে পুজো করলে তবেই পৃথিবীতে তাঁর দেবমহিমা স্বীকৃত হবে,—দেবলোকেও তাঁর মর্যাদা হবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু চাঁদ সদাগর শিবের পরম ভক্ত;—মনসার পূজা করতে সে অস্বীকৃত হল; ফলে চাঁদে-মনসায় বাঁধলো বিবাদ।

মনসামঙ্গলের কাহিনী

মনসা সর্প-দেবী। চাঁদ সদাগরের রাজত্বে তিনি সাপের উপদ্রব সৃষ্টি করতে লাগলেন। ধন্বন্তরী ছিল চাঁদ সদাগরের পরম বন্ধু এবং শ্রেষ্ঠ সর্প-বৈদ্য। সাপে-কাটা মানুষকে বারে বারে সে বাঁচিয়ে দিতে লাগল। শেষে একদিন কৌশলে ধন্বন্তরীরই জীবন নাশ করলেন মনসা তারপর চাঁদের রাজ্যে চললো অবাধ সর্প-নির্যাতন। একে একে চাঁদের ছয়টি ছেলে সাপের বিষে মারা গেল,—পুত্রবধূরা বিধবা হল। সনকা আর্তনাদ করে উঠলেন। চাঁদের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই কোনো দিকে। সনকার মনসা-পূজার ঘট সে গুঁড়ো করে দিল,—হিন্তাল লাঠির আঘাতে মনসার কাঁকাল দিল ভেঙে, সাপে-কাটা ছয় ছেলের শবকে ভাসিয়ে দিল নদীর জলে।

ঘরের শান্তি তখন বিনষ্ট হয়েছে। চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজিয়ে চাঁদ-সদাগর

এবার বাণিজ্যে চললো সমুদ্রের পথে। কালিদহের জলে প্রবল ঝড় তুলে মনসা লোকজন-ধনরত্ন-পসরা সহ তার সব কয়টি নৌকা ডুবিয়ে দিলেন। ঝড়ের সমুদ্রে একা ভেসে চল্‌লো চাঁদ। মনসা দৈববাণী করলেন,—তাঁর পূজা করতে স্বীকৃত হলে এখনই সব কিছু সে ফিরে পাবে,—তার দুর্গতির হবে অবসান। কিন্তু দুরন্ত চন্দ্রধর কঠিন কুবাক্যে মনসার সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো।—অকূল সমুদ্রের পরমাশ্রয় পদ্মবনের ওপরে কুলকুচি ছুঁড়ে ফেল্‌লো। কারণ, পদ্মা-নামের সঙ্গে যোগ রয়েছে 'পদ্ম'র। তারপর একাকী ভেসে চল্‌লো সে উত্তাল ঢেউ-এর তালে তালে। প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় অবশেষে তীরের 'পরে আছড়ে পড়লো চাঁদ,—পথে পথে মনসার হাতে অকথ্য নির্যাতন সয়ে অনেক বছর পরে ফিরে এলো নিজের বাড়িতে। তার বাণিজ্য-যাত্রার সময়ে সনকা ছিলেন সন্তান-সম্ভবা; বাড়ি ফিরে এবারে চাঁদ তাই নবযুবক সপ্তম পুত্রের মুখ দেখতে পেলো। লক্ষ্মীযুক্ত ছেলে,—নাম তার লক্ষ্মীধর বা লখিন্দর। চাঁদ এবার লখিন্দরের বিবাহের ব্যবস্থায় তৎপর হয়ে উঠলো।

উজানি নগরের ধনবান শাহ্‌বেনের কন্যা বেহুলা অপূর্ব রূপ-গুণবতী, তার সঙ্গে লখিন্দরের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হল। কিন্তু বিয়ের রাতে দেখা দিল দুর্যোগ। বারবার তিনবার লখিন্দর সর্পভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লো বিয়ের পিঁড়িতে; প্রতিবার বেহুলা নিজ শক্তিতে তার প্রাণ ফিরিয়ে আন্‌ল। ত্রস্ত চন্দ্রধর বিবাহের অনুষ্ঠান কোনো রকমে শেষ করে চম্পক নগরে লোহার বাসরে নিয়ে এল বর-বধূকে। মনসা আগে থেকে শাসিয়ে রেখেছিলেন, তাঁকে পূজো না করে লখিন্দরের বিয়ে দিতে গেলে বিয়ের বাসরেই সাপে কাটবে তাকে। চাঁদ লোহার বাসর তৈরি করেছিল, সাপের পথরোধ করবার জন্যে। কিন্তু দেবতার কূটকৌশল এমন কি লোহার বাসরের গোপন কোণেও ছিদ্র রচনা করে; ঊষা-পূর্ব-লগ্নে বেহুলার ক্ষণিক তন্দ্রালুতার সুযোগ নিয়ে কালোনাগ কেটে গেল লখিন্দরকে। স্বামীর মৃতদেহ কলার ভেলায় নিয়ে বেহুলা ভেসে গেল দেবলোকে। দেবতাদের তুষ্ট করে স্বামী ও ছয় ভাসুরের জীবন এবং সেই সঙ্গে লোক-লস্করসহ শ্বশুরের চৌদ্দ ডিঙ্গা উদ্ধার করে আবার স্বদেশে ফিরে এল সে। মনসা সঙ্গে এলেন পুরাণো আব্দার নিয়ে,—চাঁদের হাতে তাঁকে পূজা পাইয়ে দিতে হবে। দেবতার নির্যাতনে চাঁদ কখনো মাথা নত

করেনি,—কিন্তু বিজয়িনী বধূর প্রতি মমতায় মন টল্‌লো তার। স্থির হল, বাঁ হাতে পিছন ফিরে মনসাকে একটি পুষ্পাঞ্জলি ছুঁড়ে দেবে সে,—মনসা তাতেই রাজি। এমনি করে দেব-মানবের বিরোধের অবসান হল, মানব-শক্তিরই জয় ঘোষণা করে। পরিশেষে মনসা-পূজা প্রচার করে লখিন্দর ও বেহুলা স্বর্গে গেল স-শরীরে। তারা ছিল স্বর্গের গন্ধর্ব-গন্ধর্বী অনিরুদ্ধ-উষা।

আদি কবি কানা হরিদত্ত

মনসামঙ্গলের আদি-কবি রূপে কানা হরিদত্তের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। একাধিক মনসামঙ্গল-কবি তাঁকে আদিস্রষ্টার মর্যাদা দিয়েছেন। কানা হরিদত্তের আবির্ভাব-সময় বা তাঁর রচনার কোনো নিশ্চিত পরিচয় এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। নানা পণ্ডিত কবিকে নানা সময়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে ইনি যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগে, অথবা চতুর্দশ শতকের পরে আবির্ভূত হন নি,—এমন কথা বলা যেতে পারে। অনেকে মনে করেন কবি ময়মনসিংহ জেলার লোক ছিলেন।

হরি দত্তর রচিত কাব্যের কোনো পৃথক পূর্ণাঙ্গ পুঁথি পাওয়া যায় নি। অন্যান্য কবির নামে প্রচলিত কাব্যে এখানে-ওখানে হরি দত্তের ভণিতায় একটি-দুটি রচনাংশ পাওয়া গেছে। ঐ সব টুকরো লেখা থেকে কবির প্রকাশভঙ্গির সরল সরসতা এবং সাবলীলতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যেতে পারে:—

"ওলা শুনি আস্তের কাহিনী।
মুই হেন সেবক শরণ লইলাম গো
ঘটে লামি লও ফুল-পাণি॥
নেতা বলে বিষহরি এথা রহিয়া কি করি
মর্ত্য ভুবনে চল যাই
মর্ত্য ভুবনে যাইয়া ছাগ মহিষ বলি খাইয়া
সেবকেরে বর দিতে চাই॥"

হরি দত্তের পরেই মনসামঙ্গলের স্মরণীয় প্রাচীন কবি নারায়ণ দেব। ইনি মনসামঙ্গলের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীও। এঁর জনপ্রিয়তা বাংলার প্রাদেশিক সীমাকেও অতিক্রম করে কালজয়ী হয়েছে। আসামের সুদূর প্রত্যন্তে অসমীয়া

ভাষায় লেখা পদ্মাপুরাণের পুঁথি নারায়ণ দেবের নামে প্রচলিত হয়ে আছে। অথচ, এমন জনপ্রিয় কাব্যেরও আদি-অন্তে সম্পূর্ণ একখানি পুঁথিও এখনো পাওয়া যায় নি। কবির আবির্ভাব এবং গ্রন্থ রচনার কাল সম্বন্ধেও পণ্ডিতদের মহলে দূরপ্রসারী মতভেদ রয়েছে। তবে নারায়ণ দেব যে মনসা-মঙ্গলের আরো একজন বিখ্যাত কবি বিজয় গুপ্তের পূর্ববর্তী ছিলেন,—এমন অনুমান অসংগত বলে মনে হয় না; বিজয় গুপ্ত পনেরো শতকের শেষ ভাগের কবি ছিলেন।

নারায়ণ দেব

নিজের পরিচয় সম্পর্কে নারায়ণ দেব কোনো সংশয়ের অবকাশ রাখেন নি। তাঁর আত্ম-বিবরণী থেকে জানা যায় যে, মৌদ্‌গোল্য গোত্রের কায়স্থ বংশে তাঁর জন্ম হয়েছিল, পিতার নাম ছিল নরসিংহ, মা ছিলেন রুক্মিণী। কবির পূর্ব-পুরুষের অধিষ্ঠান ছিল রাঢ়ে, পরে এঁদের "বসতি" হয় বোরগ্রামে। এই গ্রাম এখন ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন।

গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে কবি বলেছেন:—

"পদ্মপুরাণের কথা শ্লোক করা আছে।
নারায়ণ দেবে তারে পাঁচালী রচিছে॥"

এর থেকে মনে হয়, নারায়ণ দেব হয়ত সংস্কৃত পুরাণ ও কাব্যাদির সূত্র থেকে নিজের রচনার উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন; সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কবির মৌলিক কল্পনা। এই কল্পনার মধ্যে আদিমতার স্বভাব বর্তমান ছিল। নারায়ণ দেবের ভাষায় সূক্ষ্ম কারুকার্য নেই; কিন্তু স্থূল, রুক্ষ বাচনভঙ্গির মধ্যে জড়িয়ে আছে মহাকাব্যোচিত দার্ঢ্য এবং ওজস্বিতা। লখিন্দরের মৃত্যুতে শোকার্ত চন্দ্রধরের ক্ষোভের উত্তাপ চিত্রিত করে কবি বলেছেন,—

"কথোক্ষণ থাকি চান্দে স্থির কৈল মন।
পদ্মাকে মন্দ বলে কঠোর বচন॥
পুত্র মৈল খোটা জদি দেয় মোরে কানি।
তাহার যতেক গুণ আমি তারে জানি॥
পদ্মবনে পরিহাস্য করিল শঙ্করে।
সেই দুরাক্ষর বানি ঘোষয়ে সংসারে॥
পথে আনিতে বাছাই করিতে চাইল বল।
ঘরে আসি খাইল তবে সতাইর ঠোকর॥

দেব করিয়া বুলিতে লজ্জা নাহি কানি।
এক রাত্রি বিহা করি ছাড়ি গেল মুনি ॥
হাসান-হোসেন লাজ দিল বিধি মতে।

* * *

হেমতালে কাকালি ভাঙ্গিল মোর হাতে ॥
যদি কানির লাইগ পাম একবার
কাটিয়া সুজিব আমি মরা পুত্রের ধার ॥
জে করিমু কানিরে আমার মনে জাগে।
নাগের উৎসিষ্ট পুত্র ভাসাও নিয়া গাঙ্গে ॥"

প্রবল শোকের সঙ্গে উৎকট অসূয়া বুদ্ধির এই বিমিশ্রতা চাঁদ সদাগরের চরিত্রকে আদিম রুক্ষতার সঙ্গে মহাকাব্যিক উদাত্ততায় উদ্ভাসিত করেছে। কেবল ক্ষুব্ধ-বিদ্বেষ বর্ণনাতেই নয়, করুণরস রচনাতেও নারায়ণ দেবের কবি-কৃতির গম্ভীর সংহতি একটুও নষ্ট হয় নি। আর, পণ্ডিতেরা স্বীকার করেছেন, "করুণ রসের স্বাভাবিক বর্ণনায় নারায়ণ দেবের সমকক্ষ বড কেহ নাই।"

নারায়ণ দেবের পরেই মনসা-মঙ্গলের উল্লেখযোগ্য কবি বিজয় গুপ্ত। তিনি নিজেই তাঁর কাব্য রচনাকাল নির্দেশ করে গেছেন :—

"ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হুসেন সাহা নৃপতি তিলক ॥"

১৪১৬ শকে সুলতান হুসেন শাহের রাজত্বকালে বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল রচিত হয়েছিল। ঐ শকে, অর্থাৎ ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহও গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন; পণ্ডিতেরা বিজয় গুপ্তের প্রদত্ত এই তারিখের প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন। কাব্যাংশের আত্মবিবরণী থেকে কবির বিস্তারিত ব্যক্তি-পরিচয়ও জানা যায়। বাখরগঞ্জ জেলার গৈলা-ফুল্লশ্রী গ্রামে বিজয় গুপ্তের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম সনাতন, মা ছিলেন রুক্মিণী। এঁরা বৈদ্য বংশীয়। ফুল্লশ্রী গ্রামে বিজয় গুপ্তের পূজিত মনসা মূর্তি আজও রক্ষিত আছে।

বিজয় গুপ্ত

বিজয় গুপ্তের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল অলংকার-সম্মত সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস। তাঁর কাব্যে নারায়ণ দেবের রচনার স্থূলতা যেমন নেই, তেমনি গাম্ভীর্যেরও অভাব আছে। কিন্তু, গল্প বলার আশ্চর্য দক্ষতা ছিল বিজয়

গুপ্তের। মনসা-মঙ্গলের টুকরো টুকরো উপাখ্যান নিয়ে তিনি একটি করে পূর্ণাঙ্গ সরস গল্প গড়ে তুলেছেন। তাঁর বাচনভঙ্গিতে পণ্ডিতের বিদগ্ধতা ছিল, সেই সঙ্গে ছিল হাস্যকৌতুক আর রসিকতা। মাঝে মাঝে এই রসিকতা শ্লীলতার মাত্রাও যে অতিক্রম করেনি, এমন কথা বলা চলে না। তাহলেও রচনার দৃঢ় বাঁধুনি, সুমিত শব্দ প্রয়োগের সুষমা, কবি-চিত্তের সহজ সহৃদয়তা সব কিছু মিলে বিজয় গুপ্তের কাব্যের প্রসন্ন পরিচ্ছন্নতা কোথাও নষ্ট হয় নি। ফলে, রসিক কবির হাতে সকরুণ বেদনা-চিত্রও আন্তরিকতায় স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে :—

"জনম দুঃখিনী আমি দুঃখে গেল কাল।
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল॥
শীতল ভাবিয়া যদি পাষাণ লই কোলে।
পাষাণ আগুন হয় মোর কর্মফলে॥
কারে কি বলিব মোর নিজ কর্মফল।
দেব কন্যা হইয়া স্বর্গে না হইল স্থল॥
ডাকিবার লক্ষ্য নাই শুন গো জননী।
বিধাতা করিল মোরে জনম দুঃখিনী॥"

বেহুলার বিলাপের এই বর্ণনা কেবল দক্ষ রচনাশৈলীর প্রভাবেই মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। বিজয় গুপ্তের রচনার মুন্সিয়ানার এক শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই যে, তাঁর কাব্যের বহু অংশ আজও লোক-প্রবচনের মর্যাদা নিয়ে সাধারণ বাঙালির মুখে মুখে ফিরছে :—

"অতি কোপে করিলে কাজ ঠেকে আথান্তর।
অতি বড় গাঙ্গ হইলে ঝাঁটে পড়ে চর॥"
"যেই মুখে কণ্টক বসে সেই মুখে খসে।"

মধ্য পর্যায়ের বাঙালি মঙ্গল-কবিদের মধ্যে রচনার মুন্সিয়ানায় ও আলংকারিক প্রকাশরীতির দক্ষতায় বিজয় গুপ্ত অন্যতম শ্রেষ্ঠ।

এই সময়কার মনসামঙ্গলের আর একজন কবি ছিলেন বিপ্রদাস পিপিলাই। এঁর লেখা কাব্যের দুখানি মাত্র পুঁথি পাওয়া গেছে। দুটি পুঁথিই নিতান্ত

খণ্ডিত,—কোনোটিতেই বেহুলা-লখিন্দরের গল্প আরম্ভও হতে পারে নি। কিন্তু আত্মবিবরণী-অংশ থেকে কবির নিঃসংশয় পরিচয় এবং কাব্য-রচনাকালের সন্ধান পাওয়া গেছে। রচনাকাল সম্বন্ধে কবি লিখেছেন,—"সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ"। এই তারিখ ঠিক হলে বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়' রচিত হয়েছিল বিজয় গুপ্তের কাব্যের মাত্র এক বছর পরে। হুসেন শাহ্ তখনও গৌড়ের সুলতান; কবি নিজেও তার উল্লেখ করেছেন।

বিপ্রদাস পিপিলাই

নিজের বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে বিপ্রদাস জানিয়েছেন,—তিনি সামবেদীয় ব্রাহ্মণ, তাঁর গোত্র বাৎস্য, কৌথম শাখা, পাঁচ প্রবর এবং পিপিলাই গাঁই। তাঁর পূর্বপুরুষেরা অনেক দিন ধরে বাদুড্যা বটগ্রামে বাস করছিলেন। কবির রচনার যৎসামান্য পরিচয় যা পাওয়া গেছে, তার থেকে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার অধিকার তিনি দাবি করতে পারেন না।

২। মধ্যপর্যায়ের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

চণ্ডীমঙ্গল অর্থে বুঝি মঙ্গলচণ্ডীর লীলা-কথা। মূলত ইনি অনার্য-কল্পিত দেবতা ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। পরবর্তীকালে মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী, আর দেবী দুর্গার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে এই দেবী শিবের গার্হস্থ্যের অধিকার দাবি করেছেন। ফলে চণ্ডীমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্ব এবং শিব-দুর্গার পরিবার-চিত্র বর্ণনায় আর্য-অনার্য কল্পনার বিমিশ্রতা ঘটেছে। শুধু তাই নয়, "নরখণ্ডের" কাহিনীতেও এই মিশ্র স্বভাব সহজেই লক্ষণীয়।

চণ্ডী ও মঙ্গলচণ্ডী

চণ্ডীমঙ্গলের "নরখণ্ডের" দুটি গল্প। প্রথমটি কালকেতু-ফুল্লরার। পণ্ডিতেরা মনে করেন এইটিই আলোচ্য বিষয়ের প্রাচীনতর গল্প; শিল্পকর্ম,—তথা জীবন-রূপায়ণের দিক থেকেও এই কাহিনীটিই নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্টতর। কালকেতু এবং ফুল্লরা ব্যাধ-দম্পতি; দারিদ্র্য লাঞ্ছিত জীবনে তাদের সুখ না থাকলেও শান্তির অভাব ছিল না। পশুবধে কালকেতু ছিল অব্যর্থলক্ষ্য, ফুল্লরাও পরিশ্রমে ছিল অকুণ্ঠ। দিনান্তে অনেক বন্যপশু বধ করে কালকেতু ঘরে ফিরত, গৃহকর্মের ফাঁকে ফাঁকে পশুমাংস বিক্রয় করে ফুল্লরা স্বামীকে সাহায্য করত। দিন তাদের

চণ্ডীমঙ্গলের দুটি গল্প

ভালই কাটছিল। কিন্তু বনের পশুরা কালকেতুর হনন-পটুতায় ভীত হয়ে মঙ্গলচণ্ডীর শরণ ভিক্ষা করল। দেবী তাদের অভয় দিয়ে লুকিয়ে রাখলেন কালকেতুর দৃষ্টির অন্তরালে। দিনের পর দিন ব্যাধের ভাগ্যে শিকার জোটে না; ঘরের বাসি মাংসও নিঃশেষিত হয়ে যায়। ক্ষুধার তাড়নায় কালকেতুর হিতাহিত জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়। এমন দিনে স্বর্ণ-গোধিকার বেশ ধরে দেবী আসেন তার ঘরে। কালকেতু-ফুল্লরার কর্তব্য ও সত্যনিষ্ঠায় প্রীত হয়ে তিনি তাদের অনেক সম্পদ দান করেন;—সেই ধন দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে নূতন নগর পত্তন করে কালকেতু রাজা হয়ে বসে। সম্পদ এবং সুখ এবার সত্যিই অকল্পনীয় হয়েছিল। কিন্তু, সুদিনে দেবীর কৃপা-কথা বিস্মৃত হল কালকেতু। ফলে, ভাড়ু দত্ত নামক বঞ্চকের কৌশলে কলিঙ্গরাজ এসে আক্রমণ করলেন তার নূতন নগরী; কালকেতু পরাজিত এবং বিড়ম্বিত হল। দুর্দিনে আবার দেবীর করুণার কথা মনে পড়ে। তখন মঙ্গলচণ্ডীর আরাধনা করে কালকেতু-ফুল্লরা আবার হারানো রাজ্য ফিরে পায়;—দেবী-মহিমারও ঘটে পরম প্রকাশ। এমনি করে মর্ত্যে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রচার করে সপত্নীক কালকেতু সশরীরে স্বর্গে ফিরে যায়। আসলে, সে ছিল দেবরাজ ইন্দ্রের শাপভ্রষ্ট পুত্র নীলাম্বর।

চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিতীয় গল্পটি সমাজের অসুস্থ জীবন-ব্যবস্থার চিত্র। তা ছাড়া এই গল্পে মনসামঙ্গলের চন্দ্রধর উপাখ্যানেরও ছায়া পড়েছে; অথচ তাও খুব দুর্বল। ধনপতি সদাগর যেমন ধনবান ছিলেন, তেমনি ছিলেন বিলাসী কামাতুর। পায়রা ওড়ানো ছিল তার অবকাশ কালের একটি সুখক্রীড়া। একদিন এক পায়রা উড়ে গিয়ে পড়লো তার জ্ঞাতি-শ্যালিকা খুল্লনার কোলে। পায়রা ছাড়াতে গিয়ে সদাগর ধনপতি বালিকা খুল্লনার রূপে মোহিত হন এবং তাকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। বিয়ের পরই ধনপতিকে বাণিজ্যযাত্রা করতে হয় দূরদেশে। প্রথমা স্ত্রী লহনার হাতে খুল্লনাকে সঁপে দিয়ে তিনি দেশ ত্যাগ করেন। কিন্তু, দুষ্টা দাসী দুর্বলার দুর্বুদ্ধি পেয়ে খুল্লনার ওপরে অত্যাচার করতে থাকে লহনা। চেলি পরিয়ে তাকে বনে পাঠানো হল ছাগল চরাতে। সেখানে চরম ক্লেশ ও দুর্যোগের মুখে বন-মহিলাদের মঙ্গলচণ্ডীর পুজো করতে দেখে খুল্লনা। দেবীর মহিমায় তারও মন সশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে এবং দেবীর পূজা করে বিপদ থেকে মুক্ত হয়; দেবীর

স্বপ্নাদেশ পেয়ে বিলাসমত্ত ধনপতিও দেশে ফিরে আসেন। স্বামীর প্রেম-সহৃদয়তায় খুল্লনার জীবন এবার ভরপুর হয়ে উঠলো। সে সন্তান-সম্ভবা হয়। এই সময়ে ধনপতি আবার বাণিজ্যযাত্রা করেন। যাবার সময়ে "স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা" মঙ্গলচণ্ডীকে তিনি উপেক্ষা করে যান; আসলে তিনি ছিলেন শিবের ভক্ত। কিন্তু চণ্ডীকে উপেক্ষার ফলে বিদেশে গিয়ে কারারুদ্ধ হন। এদিকে চণ্ডীর কৃপায় খুল্লনার নবজাত পুত্র শ্রীমন্ত দিনে দিনে বড় হয়ে ওঠে। দেবীর প্রতি তার অশেষ ভক্তি। অবশেষে বাণিজ্যযাত্রায় বেরিয়ে সেই নিখোঁজ পিতাকে উদ্ধার করে আনে। এই প্রসঙ্গে চণ্ডীর কৃপা-মাহাত্ম্য দেখে ধনপতিও সশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন,—দেবীর পূজা প্রচারিত হয় পৃথিবীতে।

আগেই বলেছি, দ্বিতীয় গল্পটিতে সমাজের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার ছবি প্রধান স্থান অধিকার করেছে। ধনপতির বিলাসিতা এবং নারী-রূপ-লোলুপতা নীতিজ্ঞান-হীনতারই নামান্তর। অথচ কালকেতু ও ফুল্লরা দরিদ্র নিষাদ হলেও তাদের দাম্পত্য-জীবন ছিল সহৃদয় বিশ্বস্ততায় পরিপূর্ণ। বাংলা দেশের কবি সংসার-জীবনের সেই মধুর চিত্রকেই অক্ষয় অক্ষরে রচনা করেছেন "আপন মনের মাধুরী মিশায়ে।" সামাজিক দুর্নীতি আর গ্লানির রূপায়ণে তাঁদের লেখনী স্বভাব-কুণ্ঠিত হয়েছিল।

মাণিক দত্ত,—চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি (?)

যাই হোক, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কোনো প্রাচীন নিদর্শনই প্রায় পাওয়া যায় নি। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন চক্রবর্তী মুকুন্দরাম। সমগ্র মঙ্গলকাব্য-সাহিত্যেরও সর্বশ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা এঁরই প্রাপ্য। ষোড়শ শতাব্দীতে তাঁর আবির্ভাবকাল। কাব্যমধ্যে মুকুন্দরাম নিজে বলেছেন,—

"মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।
যাহা হইতে হইল গীত-পথ পরিচয়॥"

মনে করা হয়, মাণিক দত্তই ছিলেন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রথম কবি। এঁর আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে তিনি পঞ্চদশ শতকের পরের কবি নন বলে মনে করা যেতে পারে। মাণিক দত্তের কাব্যের একখানি মাত্র পুঁথি পাওয়া গেছে,—তাও নিতান্ত অর্বাচীন কালের লেখা। তাই, সে-পুঁথির নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। যাই হোক ঐ পুঁথিতে প্রাপ্ত সংক্ষিপ্ত কবি-পরিচিতি অংশ থেকে জানা যায়,—

কবির বাস ছিল ফুলুয়া নগরে। অনেকে ফুলুয়া অর্থে মালদহ জেলার ফুলবাড়িকে নির্দেশ করে থাকেন। কবি জানিয়েছেন, প্রথম জীবনে তিনি কানা এবং খোঁড়া ছিলেন। দেবীর কৃপায় তাঁর সকল বিকল অঙ্গ সুস্থ হয়ে ওঠে। দেবীর আদেশেই তিনি কাব্য-রচনায় বৃত্ত হয়েছিলেন।

উপকরণের অভাবে মাণিক দত্তের কবি-কৃতির পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কারণ, যে একখানিমাত্র পুঁথি পাওয়া গেছে তাতেও অপরাপর কবিদের রচনার পরিমাণই বেশি।

৩। মধ্যপর্যায়ের ধর্মমঙ্গল কাব্য

মনসা ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের জনপ্রীতি বাংলাদেশের সকল অঞ্চলেই ব্যাপক ছিল। এদিক থেকে ধর্মঠাকুরের পূজা, এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যের রচনা ও প্রসার ছিল একান্ত সীমাবদ্ধ,—রাঢ় ভূমির বাইরে এই দেবতা ও কাব্যের বিস্তার কখনোই ঘটেনি। আর রাঢ় বলতে তখন বোঝাত,—"পূর্বে ভাগীরথী, উত্তরে ময়ূরাক্ষী, দক্ষিণে দামোদর ও পশ্চিমে ছোট নাগপুরের পার্বত্যভূমি" দিয়ে ঘেরা ভূভাগকে। সেদিনকার রাঢ় এখন হুগলী, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় ছড়িয়ে আছে। এই রাঢ় অঞ্চলে বহুদিন অনার্য আচার একচ্ছত্র অধিকারে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফলে, রাঢ় দেবতা ধর্মঠাকুরের রূপ-কল্পনা এবং পূজা-পদ্ধতিতেও অনার্য ঐতিহ্যের ছাপ ব্যাপক। মূলতঃ তথাকথিত অন্ত্যজদের দ্বারাই ধর্মঠাকুর পূজিত হতেন। মনসা বা চণ্ডী যখন হিন্দু পৌরাণিক সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন,—ধর্মঠাকুর তখনো উচ্চকোটির সমাজে ছিলেন অপাংক্তেয়। এমন কি খ্রীষ্টীয় সতেরোর শতকেও ব্রাহ্মণ-কবি রূপরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল রচনা করার অপরাধে সমাজে পতিত হয়েছিলেন।

ধর্মপূজার ঐতিহাসিক পটভূমি

বাংলা ভাষায় ধর্মদেবতাকে নিয়ে রচিত কাব্য-সাহিত্য প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত:—(১) ধর্মপূজার পদ্ধতি,—এবং (২) ধর্মমঙ্গল কাব্য। রামাই পণ্ডিতকে ধর্ম-পূজক আদি পুরোহিতের সম্মান দেওয়া হয়। ধর্মঠাকুরের পূজা-পদ্ধতিও আসলে তাঁর লেখা বলেই কথিত হয়ে থাকে।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আলোচনাকালে শূন্য-পুরাণের প্রসঙ্গে রামাই পণ্ডিত এবং ধর্মপূজা-বিধির পরিচয় দিয়েছি।

ধর্মঠাকুর সম্পর্কে বাংলা দেশে প্রথম উল্লেখ্য আলোচনা করেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। 'ধর্ম'কে তিনি বৌদ্ধ দেবতা বলে মনে করেছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'ধর্মে'র প্রতীক রূপে একটি কূর্মাকৃতি পাথর পূজিত হয়ে থাকেন। আর সেই পাথরটি অনেক সময়ে আরো তিনটি পাথরের পায়ার ওপরে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। শাস্ত্রীমশায় ঐ তিনটিকে বৌদ্ধদের ত্রিশরণের প্রতীক বলে মনে করেছিলেন,—'ধর্ম' নামটিও তো বৌদ্ধ ত্রিশরণের একটি। পরবর্তীকালের পণ্ডিতেরা কিন্তু ধর্মঠাকুরের ধ্যান-কল্পনার ব্যাখ্যা করে তাতে বৈদিক সূর্য এবং পৌরাণিক বিষ্ণু, যম প্রভৃতি হিন্দু দেবতার স্বভাব-ধর্ম আবিষ্কার করেছেন। আসল কথা ধর্ম মূলতঃ ছিলেন অনার্য অন্ত্যজদের দেবতা। তাই. তাঁর রূপ-কল্পনায় নানা রকম আজগুবি কাহিনী ও তত্ত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে মূল অনার্য দেবতার উপাখ্যানের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার বৌদ্ধ ও হিন্দু দেব-কল্পনা যুক্ত হয়েছে।

ধর্ম-দেবতার উৎস-পরিচয়

ধর্মমঙ্গলের প্রধান কাহিনীর নায়ক লাউসেন। তবে কোনো কোনো কাব্যে হরিশ্চন্দ্র রাজার স্ত্রী মদনার ধর্মপূজার কাহিনীও উল্লিখিত হয়েছে; তিনি নাকি ধর্মকে তুষ্ট করবার জন্যে "শালে ভর" দিয়ে আরাধনা করেছিলেন। অবশ্য অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ছাড়া এই গল্পের আর কোনো বিস্তৃত পরিচয় জানা যায় না। কেউ কেউ মনে করেন রামায়ণ কাব্যের হরিশ্চন্দ্রকে কেন্দ্র করে ধর্মপূজার এক লৌকিক উপাখ্যান প্রথমে প্রচলিত ছিল। পরে লাউসেনের গল্প জনপ্রিয়তা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন গল্প ক্রমশঃ লুপ্ত হয়েছে।

ধর্ম মঙ্গলের কাহিনী

লাউসেন-এর কাহিনী আকারে দীর্ঘ; এবং বিভিন্ন পালায় বিভক্ত। গল্পের মূল কাঠামো গড়ে উঠেছে গৌড়ের রাজা, তাঁর শ্যালক মন্ত্রী মহামদ পাত্র, মহামদের অনুজা রঞ্জাবতী এবং রঞ্জাবতীর প্রবীণ স্বামী কর্ণসেনকে কেন্দ্র করে। রঞ্জাবতীর পুত্র লাউসেন-এর জন্মের পরে সে-ই গল্পের অদ্বিতীয় নায়ক হয়ে উঠেছে।

কর্ণসেন ছিলেন গৌড়েশ্বরের একান্ত অনুগত অমাত্য; ত্রিষষ্ঠীর গড়ে তিনি রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন। অন্যপক্ষে গৌড়ের রাজধানীতে সোমঘোষ নামে একটি রাজ-ভক্ত প্রজা মন্ত্রী মহামদের হাতে কেবলই পীড়িত হচ্ছিল। রাজা তাকে ত্রিষষ্ঠীর গড়ে পালিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। কালক্রমে সোমঘোষের ছেলে ইছাই ঘোষ পার্বতীর বর পেয়ে দুর্বিনীত হয়ে ওঠে। কর্ণসেনকে পদচ্যুত করে সে স্বাধীন শাসকের পদবী গ্রহণ করে; ত্রিষষ্ঠী গড়ের নূতন নামকরণ করে ঢেঁকুর। স্বয়ং গৌড়েশ্বর ইছাইর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে পরাজিত হন। কর্ণসেনের ছয়টি পুত্র সেই যুদ্ধে প্রাণ হারায় এবং তাদের পত্নীরা অনুমৃতা হয়। কর্ণসেনের স্ত্রীও পুত্রশোকে মৃত্যু বরণ করেন।

বৃদ্ধ কর্ণসেনের দুঃখে রাজা ও রানী বেদনা বোধ করেন; রানীর অনুজা রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের আবার বিবাহ দেবার সংকল্প করেন তারা। কিন্তু বুড়ো বরের সঙ্গে ছোটবোনের বিয়ে দিতে মহামদ-র প্রবল আপত্তি। ফলে, রাজধানী থেকে তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে রাজারানী একদিন কর্ণসেন ও রঞ্জাবতীর বিয়ে দিয়ে সুদূর ময়নাপুর রাজ্যে পাঠিয়ে দেন তাদের। মহামদ ফিরে এসে একান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন, এবং প্রতিজ্ঞা করেন জীবনে আর কখনো তিনি রঞ্জাবতীর মুখ দেখবেন না।

এদিকে কর্ণসেন-রঞ্জাবতীর দিন সুখেই কাটছিল, কেবল একমাত্র দুঃখ, তাদের কোনো সন্তান হয় না। কর্ণসেন একবার রাজধানীতে এসেছিলেন। মহামদ তখন রাগে অন্ধ হয়ে রঞ্জাবতীকে বন্ধ্যা বলে বিদ্রূপ করে। ব্যথিত-চিত্তে কর্ণসেন ফিরে যান ময়নাপুরে। অগ্রজের ব্যঙ্গ-কথা শুনে রঞ্জাবতী পুত্র প্রার্থনায় ধর্মের আরাধনায় বৃত হন। হরিশ্চন্দ্র রাজার স্ত্রী মদনার মত তিনি শালে ভর দিয়ে ধর্মকে সন্তুষ্ট করেন এবং তাঁর কৃপায় লাউসেন নামক পুত্রের জননী হন। মহামদ-র নির্দেশে শিশু লাউসেনকে চুরি করে ইন্দামেটে। কিন্তু, ধর্মের হুকুমে হনুমান তাকে উদ্ধার করে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেন। লাউসেনের খেলার সাথী রূপে ধর্মঠাকুর এবারে কর্পূরসেন নামে তার নূতন এক সহোদর পাঠিয়ে দিলেন।

দুই ভাইকে মল্লবিদ্যায় শিক্ষিত করে তুললেন হনুমান। লাউসেন নিজের চরিত্রবলে পার্বতীকে খুশি করে তাঁর কাছ থেকে এক অজেয় অসি

লাভ করেন। তারপর তিনি গৌড়ে চললেন ছোটভাই কর্পূরসেনকে সঙ্গে নিয়ে। বাঘ এবং কুমীর পথ রোধ করে দাঁড়াল। জাঁমতি আর গোলাহাটে রূপবিলাসিনী নারীরা পেতে ধরল দুরপনেয় যৌবনের ফাঁদ। কিন্তু দেহ, মন এবং চরিত্রের শক্তিতে সকল বাধাকেই অতিক্রম করে লাউসেন গৌড়ে উপস্থিত হন। সেখানে পৌঁছাতেই মহামদ তাকে চোর বলে কারারুদ্ধ করেন; দাদাকে ছেড়ে কর্পূর তখন পালিয়ে গেল। কিন্তু ধর্মের কৃপায় লাউসেন অবিলম্বে মুক্ত হন এবং অলৌকিক শক্তি দেখিয়ে রাজার কাছ থেকে একটি বল-দৃপ্ত অশ্ব আর কালু প্রভৃতি বারজন ডোম বীরকে সঙ্গী হিসেবে লাভ করেন।

এবার বাড়ি ফিরে লাউসেনকে রাজার আদেশে কামরূপ যেতে হয়। দৈবী শক্তিতে বলবান কামরূপ রাজ্যকে জয় করা এক বি-ভীষণ ব্যাপার ছিল। একথা জেনেও লাউসেনকে নষ্ট করবার জন্মেই মহামদ তাকে এই দুঃসাধ্য সাধনে পাঠিয়েছিল। ধর্মের কৃপায় লাউসেন অনায়াসে কামরূপ জয় করেন এবং রাজকুমারী কলিঙ্গাকে লাভ করেন পত্নীরূপে। ফেরার পথে মঙ্গলকোট ও বর্ধমানের রাজকন্যা অমলা আর বিমলাও লাউসেনের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন।

এবারে লাউসেনের জীবনে নূতন দুর্বিপাক সৃষ্টি করতে চান মহামদ। সিমুলার রাজকন্যা কানড়া ছিলেন অপূর্ব রূপ গুণবতী। গৌড়েশ্বর তাকে বিবাহ করতে চান; কিন্তু রাজা বৃদ্ধ হয়েছিলেন বলে কানড়া সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ক্রুদ্ধ গৌড়েশ্বর নবলক্ষ সৈন্য নিয়ে সিমুলায় যুদ্ধযাত্রা করেন। কানড়া যুদ্ধের আগেই একটা লৌহগণ্ডা উপস্থিত করে বলেন,—এক আঘাতে যে এই গণ্ডা দুভাগ করতে পারবে, তাকেই তিনি পতিরূপে বরণ করবেন। বৃদ্ধ রাজা ব্যর্থ চেষ্টা করে উপহাসের ভাজন হন। অথচ, লাউসেন অনায়াসে সেই গণ্ডা দুভাগ করেন। প্রথমে অবশ্য রাজার ঈর্ষা উদ্দীপ্ত হয়েছিল। কিন্তু ধর্মের কৃপায় আবার সব ঠিক হয়ে যায়; লাউসেন কানড়াকে বিবাহ করেন।

এবারে ইছাই-পরাভবের পালা। লাউসেন প্রবল যুদ্ধ করে ইছাইর সেনাপতি লোহটাবজ্জরকে বধ করেন। মৃত লোহটার মুণ্ড দিয়ে মহামদ কৌশলে লাউসেনের ছিন্নমুণ্ড প্রস্তুত করে ময়নাপুরে পাঠিয়ে দেন। কর্ণসেন

আর রঞ্জাবতী শোকে আভিভূত হন, বধূরা প্রস্তুত হন অনুমৃতা হতে। এমন সময় হনুমান এসে সত্য প্রকাশ করে দেন।

এদিকে ইছাইর সঙ্গে লাউসেনের যুদ্ধ চলতে থাকে; ইছাইর রথে পার্বতী, আর লাউসেনের পক্ষে ধর্মঠাকুর লড়তে থাকেন। অবশেষে লাউসেনের জয় হয়। এই যুদ্ধে কালুডোম প্রবল বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

সবশেষে লাউসেনের চরম পরীক্ষা হয় পশ্চিমোদয় সাধনে। গৌড়েশ্বর ধর্মপূজার আয়োজন করেন। কিন্তু নানা কারণে ধর্মঠাকুর ক্রুদ্ধ হন,—রাজ্যে দেখা দেয় ঝড় বৃষ্টির প্রবল দুর্যোগ। সেই পাপ বিদূরণের জন্য লাউসেন 'হাকন্দ' যান পশ্চিম-উদয় সাধনে। এই সুযোগে মহামদ লাউসেনের রাজ্য আক্রমণ করেন। লাখাই ডোমনী এবং লাউসেন-পত্নী কানড়ার বীরত্বে মহামদের সৈন্যদল পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। মহামদকে বন্দী করে কানড়া তার গালে চুণকালী মেখে দিয়ে তাড়িয়ে দেন। এই যুদ্ধে লাউসেন-ভক্ত কালুডোমের প্রাণান্ত ঘটে।

এদিকে লাউসেনের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ধর্মঠাকুর অমাবস্যার রাত্রে সূর্যকে পশ্চিম আকাশে উদিত হতে আদেশ করেন; পশ্চিমোদয় সাধিত হয়। কিন্তু, দুরাশয় মহামদ এবারেও লাউসেনের সিদ্ধি মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করে। ফলে, ক্রুদ্ধ ধর্মঠাকুর তার সারাদেহে গলিত কুষ্ঠ ছড়িয়ে দেন। লাউসেনের প্রার্থনায় তার রোগমুক্তি ঘটে। কিন্তু পাপের চিহ্নরূপে মুখে কুষ্ঠরোগের একটি দাগ থেকে যায়। লাউসেন ধর্মপূজা প্রচার করে সশরীরে স্বর্গে গমন করেন। এখানেই ধর্মমঙ্গলের 'নরখণ্ড' শেষ হয়েছে।

মনসামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গলের গল্পে বাঙালি জীবনের স্পর্শকাতর অনুভূতি ও আবেগ কাব্যরূপ পেয়েছে। ধর্মমঙ্গলের কাহিনীতে তেমন শিল্প-রচনার অবকাশ প্রচুর ছিল না। যুদ্ধ-ঝঞ্ঝার ষড়যন্ত্রে বিধ্বস্ত এই কাব্য-কথায় ডিটেকটিভ গল্পের স্বাদই বেশি। বলা বাহুল্য, এই প্রচেষ্টায় রাঢ়ের বীর্যবান্ শিল্পীরা প্রায়ই অসার্থক হননি।

ধর্মমঙ্গলের শিল্প-গুণ

চণ্ডীমঙ্গলের মত ধর্মমঙ্গলেরও প্রথম কবির নিশ্চিত পরিচয় জানা যায়

না। এই কাব্যধারার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তী "বন্দনা" অংশে লিখেছেন,—

"ময়ূর ভট্টে বন্দিব সঙ্গীত আদ্য কবি।"

অন্যত্র তিনি লিখেছেন :—

"হাকন্দ পুরাণ মতে ময়ূর ভট্টের পথে
জ্ঞানগম্য শ্রীধর্মসভায়।"

এর থেকে মনে করা হয়েছে ময়ূরভট্ট ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদিকবি ছিলেন ; আর তাঁর কাব্যের নাম ছিল হাকন্দপুরাণ। ধর্মমঙ্গলের অন্যান্য একাধিক কবিও ময়ূরভট্টের বন্দনা করেছেন দেখে এ অনুমান আরো দৃঢ় হয়েছে। কিন্তু কবির আবির্ভাবকাল বা রচনার নিশ্চিত কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পঞ্চদশ শতকে অনুলিখিত ময়ূরভট্টের কাব্যের একখানি পুঁথি দেখেছিলেন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু পরে সে পুঁথির আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। অনেকে সংস্কৃত "সূর্যশতক"-এর কবি ময়ূরভট্ট এবং ধর্মমঙ্গলের আদি কবিকে অভিন্ন বলে মনে করেছেন। এই অনুমান কতদূর সংগত বলা কঠিন।

ময়ূর ভট্ট ধর্মমঙ্গলের আদ্য কবি (?)

মধ্যপর্যায়ের বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য

'বৈষ্ণব' অর্থে বুঝি 'বিষ্ণু সম্বন্ধীয়'। কিন্তু, বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের উপজীব্য পৌরাণিক বিষ্ণু-কথা নয়,—কৃষ্ণলীলা;—এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাধা-কৃষ্ণলীলা। কৃষ্ণ হিন্দুপৌরাণিক দেবতা; কিন্তু রাধার উল্লেখ কোনো প্রাচীন পুরাণেই পাওয়া যায় না। কাব্যে রাধা-কৃষ্ণলীলার প্রাচীনতম বর্ণনা পাই গাথা সপ্তশতীর একটি মাত্র পদে। অন্তত: খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের আগে যে এই পদটি রচিত হয়েছিল, তাতে সংশয় নেই। এই পদ অপভ্রংশ-প্রাকৃত ভাষায় লেখা। এর থেকে মনে হওয়া অসংগত নয় যে, রাধার কল্পনা প্রথম জন্ম নিয়েছিল 'প্রাকৃত'-লৌকিক সমাজেই। পণ্ডিতেরাও এই অনুমান সমর্থন করেছেন; তাঁদের মতে সেন আমলের লোক-বাংলাতেই রাধা-প্রেম-কথার প্রথম উদ্ভব ঘটেছিল।

বৈষ্ণব-পদে বৈষ্ণবতা

ঐ পর্যায়ের রাধা-কৃষ্ণলীলায় অসামাজিক প্রণয়ের সংকেত ছিল সুস্পষ্ট। স্বামি-শাশুড়ী-ননদে পরিপূর্ণ গৃহধর্ম থেকে পালিয়ে গৃহিণী নারীর পর-পুরুষের সঙ্গ-লুব্ধতার অবৈধ কাহিনী আস্বাদনই লৌকিক রাধা-কথার মুখ্য বিষয় ছিল। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম-চিন্তা এই গল্পের মূলগত অবৈধতার লৌকিক উত্তেজনাকে পরিশ্রুত (sublimate) করে' দেহাতীত প্রেমের এক আলৌকিক আর্তিকে রস-ঘনিষ্ট করে তুলেছে। অতএব রাধা-কৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক যে-কোনো কবিতাকেই বৈষ্ণব কবিতা বলা চলে না। দেহের বাসনা, এবং অবৈধ প্রণয়ের উত্তেজনা যেখানে আত্মদানের উৎকণ্ঠা এবং সর্বস্ব সমর্পণের দৃঢ়তায় অচঞ্চল প্রশান্তি পেয়েছে, সেখানেই লোক-কাব্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে বৈষ্ণব কবিতার প্রাণ-স্বরূপ। প্রাচীন লোকগাথায় নবীন ভক্তির প্রাণ-সঞ্চারণের শ্রেষ্ঠ গৌরব মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের। তাঁর জীবন-লীলাকে আশ্রয় করেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মচিন্তার বিকাশ এবং পরিণতি ঘটেছে।

রাধাকৃষ্ণ প্রণয়-কথার উৎস

চৈতন্য-পরবর্তীকালের বাংলা বৈষ্ণব কবিতায় এই ধর্মতত্ত্বের ছাপ পড়েছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে। শুধু তাই নয়, চৈতন্যদেবের সমকালে রচিত বৈষ্ণব কবিতারও একমাত্র ভাব-প্রেরণা ছিল তাঁর প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ জীবন-সাধনা ;—গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের জন্ম তখনো হয় নি।

কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম চিন্তা, এবং বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর এই একমাত্র পরমাশ্রয় মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগেও বাংলা বৈষ্ণব কবিতার অস্তিত্ব ছিল বলে কল্পনা করা হয়ে থাকে। অবশ্য, এই বিশ্বাসের মূলেও চৈতন্য-ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব যুগে জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি রাধা-কৃষ্ণ-লীলা বর্ণনা করে পদ রচনা করেছিলেন। জয়দেবের মধুরকান্ত পদাবলী সংস্কৃত ভাষায় লেখা ; চণ্ডীদাস পদ লিখেছিলেন বাংলায়। বিদ্যাপতি বহু গ্রন্থের লেখক ছিলেন,—তিনি ছিলেন বিচিত্র ভাষার শিল্পী। রাধা-কৃষ্ণ-লীলার কয়েকটি পদ তিনি লিখেছিলেন নিজের মাতৃভাষা মৈথিলীতে ; বাকি অধিকাংশ পদ পাওয়া গেছে অবহট্‌ঠা ব্রজবুলি ভাষায়। বিদ্যাপতি অ-বাংলা ভাষার কবি হলেও, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর প্রতিষ্ঠা অক্ষয় হয়ে আছে। আর এঁরা তিন জনেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে বৈষ্ণব কবিতার আদিগুরু রূপে নিত্য বন্দিত। কারণ, চৈতন্যদেবের শ্রেষ্ঠ জীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজও লিখেছেন :—

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-চেতনার পরমাশ্রয় শ্রীচৈতন্য

"চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ।"

চৈতন্যপূর্ব বৈষ্ণব পদকর্তা

অন্যান্য চৈতন্য-জীবনী এবং বৈষ্ণব ইতিহাসেও এই তথ্য সমর্থিত হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায়, লৌকিক যে রাধা-কৃষ্ণ-গীতিকে মহাপ্রভু ভক্তিরসে সঞ্জীবিত করে লোকাতীত সৌন্দর্যে উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন,—চৈতন্য-পূর্ব কবিত্রয় জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি তাঁদের ব্যক্তিগত অনুভবের দ্বারা তার প্রথম পরিস্ফুতি সাধন করেছিলেন। এই অর্থেই বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যের উৎস-গোমুখী জয়দেব, চণ্ডীদাস আর বিদ্যাপতি ; চৈতন্য-জীবন-সাধনার সাগর-সংগমে এই ধারার মহত্তম পরিণতি।

১। জয়দেব

সেন রাজবংশের শেষ প্রতিভূ লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন জয়দেব। এদিক থেকে তিনি তুর্কী আক্রমণের পূর্বকালের কবি। আগেই বলেছি, তাঁর পদাবলী রচনার ভাষা ছিল সংস্কৃত। কিন্তু পণ্ডিতেরা দেখিয়েছেন "গীতগোবিন্দ" এর যে অংশে সুললিত পদ রচিত হয়েছে, তার সবটুকুই বাগ ভঙ্গী, রচনাশৈলী ও ছন্দ-প্রকৃতিতে বাংলা কবিতার স্বভাব বিশিষ্ট। আর শ্রীচৈতন্যদেবের আস্বাদন মহিমার প্রভাবে আজ তা বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর শিরোমণি হয়ে আছে। সাধারণ বাঙালির কাছেও বাংলা ঢং-এ উচ্চারিত এই সংস্কৃত কবিতার স্বাদ একান্ত মর্মস্পর্শী :—

জয়দেব

"ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধি রত্নং
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনীং
তত্র মম হৃদয়মতি যত্নং।"

২। চণ্ডীদাস

চণ্ডীদাস-পদাবলীর কাব্যাস্বাদ বাঙালির হৃদয় মনোহারী।

"সই, কে বা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

চণ্ডীদাসের পদ

অথবা,

"বঁধু! কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইয়ো তুমি॥"

ইত্যাদি নিত্যশ্রুত মধুগীতি অজস্র প্রবাহে বাংলার আকাশে বাতাসে সঞ্চরণ করে ফিরছে অজ্ঞাত কাল থেকে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, আবালবৃদ্ধ নরনারীর পরম প্রীতিরসে মণ্ডিত চণ্ডীদাস-পদাবলী বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। তাই বহু "মন্দঃ কবি-যশঃপ্রার্থী" বাংলা পদ রচনা করে চণ্ডীদাসের নামে তা পরিচায়িত করে গেছেন। ফলে চণ্ডীদাসের ভণিতায়

বহু উৎকৃষ্ট কবিতা যেমন পাওয়া গেছে ; তেমনি, তাঁর নামে চালু দ্বিতীয়, এমন কি নিতান্ত তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর নিকৃষ্ট পদেরও অভাব নেই'। চণ্ডীদাস-প্রতিভার অমূল্যতা এবং চৈতন্যদেবের চণ্ডীদাস-আস্বাদনের কাহিনীকে কেন্দ্র করে বাঙালি পাঠকের মনে এককালে ভক্তির উচ্ছ্বাস সকল জিজ্ঞাসার অতীত হয়েছিল। ফলে, চণ্ডীদাসের ভণিতা দেখলেই তখন ভালমন্দ-নির্বিশেষে সকল পদকেই মহাজন-কবির রচনা বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা হত। ক্রমশঃ এবিষয়ে সন্দেহ দেখা দিতে থাকে :—চণ্ডীদাসের নামে চলিত *সকল পদই এক চণ্ডীদাসের লেখা নয়,—অনেকে এমন সংশয় পোষণ করতে* আরম্ভ করেন। তখন প্রশ্ন দেখা দেয়,—চণ্ডীদাস তবে কয়জন? বড়ু চণ্ডীদাসের লেখা কৃষ্ণকীর্তন কাব্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এই জিজ্ঞাসা জটিলতর আকার ধারণ করে।

বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এককালে প্রাচীন পুঁথির সন্ধান করে ফিরছিলেন। এমন সময় ১৩১৬ বাংলা সালে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের কাকিলা। গ্রামে এক গৃহস্থ বাড়ির গোয়ালঘর থেকে তিনি কৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি আবিষ্কার করেন। পুঁথির আদি এবং অন্ত খণ্ডিত, মাঝেরও কিছু কিছু অংশ পাওয়া যায় নি। তাই কাব্যের নাম, রচনাকাল, এবং বিস্তারিত কবি-পরিচয়, কিছুই জানা যায় না। রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা কাব্যের উপজীব্য এবং গোটা কাব্যটি পদকীর্তনের আকারে লেখা ;—প্রত্যেকটি পদের ওপরে গেয় সুরেরও উল্লেখ রয়েছে। তাই সম্পাদক বসন্তরঞ্জন কাব্যের নাম রাখেন কৃষ্ণকীর্তন। ১৩২৩ বাংলা সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে পুঁথিখানি প্রকাশিত হয়ে সর্বজনের গোচর হয়। তখন কাব্যটির সুপ্রাচীনতা সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে সংশয়ের কোনো অবকাশ থাকে না। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে দেখা যায়,—চর্যাপদের ঠিক পরবর্তী স্তরের বাংলা ভাষার বিকাশ-লক্ষণ এই কাব্যে প্রস্ফুট। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই কাব্যের ভাষাকে খ্রীস্টীয় বারো থেকে পনের'র শতকের বাংলা ভাষার প্রতিনিধি বলে মনে করেছেন। লিপিতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে কৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি "১৩৮৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে, সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত" হয়েছিল। অথচ পুঁথির লিপিতে একাধিক হাতের লেখা রয়েছে। তাতে

মনে হয়, পুঁথিটি কবির হাতের মূল রচনা নয়,—পরবর্তী কালের একটি অনুলিপি। এই সিদ্ধান্ত সত্য হলে, কৃষ্ণকীর্তনের রচনা-কাল আরো আগে বলে অনুমান করতে হয়। পরবর্তীকালের পণ্ডিতগণ অবশ্য কৃষ্ণকীর্তন-পুঁথির অত প্রাচীনতার দাবি স্বীকার করেন না। তাহলেও, পুঁথির লিপিকাল যখনই হোক্, কাব্যখানি আসলে পঞ্চদশ শতকের পরের রচনা নয় বলেই মনে হয়।

কৃষ্ণকীর্তনের এই প্রাচীনতার দাবি স্বীকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'চণ্ডীদাস সমস্যা'র উদ্ভব হয়। কাব্যের আগাগোড়া ভণিতা দেখে জানা যায়, কবির নাম ছিল অনন্ত বড়ুচণ্ডীদাস এবং ইনি দেবী বাসলীর একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। কিন্তু এঁর কাব্যের সঙ্গে পদাবলীর চিরাগত রূপ-কল্পনার কোনো সাদৃশ্য নেই। বিষয়বস্তুতেও রয়েছে পার্থক্য। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলীর একটিমাত্র পদের আদিম ভাষা-রূপ পাওয়া গেছে এই কাব্যে; বিখ্যাততম চণ্ডীদাস-পদাবলীর একটিও এতে নাই। অতএব অনন্ত বড়ুচণ্ডীদাস আর পদাবলী-খ্যাত চণ্ডীদাস যে একই ব্যক্তি নন, তাতে সন্দেহ থাকে না। এবারে জিজ্ঞাস্য, চণ্ডীদাস কয়জন ছিলেন, আর এঁদের মধ্যে কার রচনা মহাপ্রভু আস্বাদন করেছিলেন!

চণ্ডীদাস সমস্যার মূল

কৃষ্ণকীর্তন চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগে রচিত হয়েছিল বলে, বড়ু-চণ্ডীদাসকেই চৈতন্যদেব আস্বাদন করেছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করা অসংগত নয়। কিন্তু বৈষ্ণব রসদৃষ্টির পক্ষ থেকে এ-বিষয়ে প্রবল আপত্তি করা হয়েছে। এঁদের প্রথম কথা, কৃষ্ণকীর্তন রাধাকৃষ্ণের লৌকিক প্রেম-গাথা। এতে দেহের আকৃতিই প্রধান স্থান পেয়েছে। বৈষ্ণব কবিতার ভাব-শুদ্ধি এই কাব্যে একেবারেই নেই। মহাপ্রভুর পক্ষে এমন রচনা আস্বাদন করা অসম্ভব। বস্তুতঃ, কৃষ্ণকীর্তন এগারটি 'খণ্ড' বা অধ্যায়ে বিভক্ত। তার মধ্যে সর্বপ্রথম কেবল জন্মখণ্ডে কৃষ্ণজন্মের একটি পৌরাণিক কাহিনী উদ্ধৃত হয়েছে। পাপ-পীড়িত পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য স্বয়ং নারায়ণ কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাছাড়া, রাধাকেও পৌরাণিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। কবি বলেছেন, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীই কৃষ্ণ-সুখের জন্য রাধারূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। এই সূত্র ধরে

কৃষ্ণকীর্তন পরিচয়

তিনি পরবর্তী বিভিন্ন "খণ্ডে" রাধা কৃষ্ণের অবৈধ মিলন-চিত্রকে, নীতি-অনুমোদিত করার চেষ্টা করেছেন। তা না হলে, জন্মখণ্ড এবং যমুনাখণ্ডের 'কালীয়-দমন' অংশ ছাড়া কৃষ্ণকীর্তনে পুরাণ-কথার কোনো অস্তিত্ব নেই। বাকি অংশে লৌকিক প্রণয়-কথার মাধ্যমে দেহের বুভুক্ষ, বলাৎকার এবং অবৈধ আসঙ্গ-চিত্রই পুনঃ পুনঃ উপস্থাপিত করা হয়েছে দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড ইত্যাদি বিভিন্ন অধ্যায়ে। এই সব রচনা-চিত্রণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই কেউ কেউ কৃষ্ণকীর্তনকে সহজিয়া কবিতা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, "বংশী" ও "বিরহ"—এই শেষ খণ্ড দুটি এ বিষয়ে ব্যতিক্রম। বিরহার্তা রাধার প্রণয়-বেদনা দেহসীমাকে অতিক্রম করে এই পর্যায়ে বৃন্দাবনের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। দুর্বল ভাষা এবং লৌকিক কল্পনার সীমায়তি সত্ত্বেও প্রেম-ব্যথিত হৃদয়ের স্পন্দনটি করুণাঘন গভীর সুরে অবিকল ধরা পড়েছে। বংশীখণ্ডে রাধা বল্ছেন—

"কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ-গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মোর আউলাইলোঁ রান্ধন ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হঞাঁ তার পায়ে নিশিবোঁ আপনা ॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পানী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারাইলোঁ পরাণী ॥"

স্পষ্টই বোঝা যাবে,—এই ভাবকে একটু ভাষান্তরিত করে নিলেই আমাদের পরিচিত বৈষ্ণব পদাবলীর সুর তাতে ধ্বনিত হয়ে উঠতে পারে। বস্তুতঃ কৃষ্ণকীর্তনের আর একটি পদ এইভাবেই বৈষ্ণব সাহিত্যে অটুট আসন অধিকার করে নিয়েছে। চণ্ডীদাসের ভণিতায় পরিচিত একটি পদের সূচনা হয়েছে নিম্নরূপ :—

বড়ু চণ্ডীদাস বনাম পদকর্তা চণ্ডীদাস

"প্রথম প্রহর নিশি সুস্বপন দেখি বসি,
সব কথা কহি হে তোমারে।
বসিয়া কদম্ব তলে, সে কানু করেছে কোলে
চুম্ব দিয়া বদন উপরে ॥"

এই পদটিরই আদিরূপ আবিষ্কৃত হয়েছে কৃষ্ণকীর্তনে :—

"দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপণ সুন তোঁ বসী
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।
বসিআ কদম তলে সে কাহ্ন করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে।"

এর পরে স্বীকার করতেই হয়,—কৃষ্ণকীর্তনের সমাপ্তি পর্যায়ে বৈষ্ণব কবিতার জন্মলগ্নের শুভ-শংখ নিঃসন্দেহে ধ্বনিত হয়েছে।

তাছাড়া, চণ্ডীদাসের রচিত দানখণ্ড, নৌকাখণ্ডাদির পরিচয়ও যে বৈষ্ণব গোস্বামীদের নিকট অনাদৃত ছিল না, তারও প্রমাণ আছে। মহাপ্রভুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পারিষদ ছিলেন সনাতন গোস্বামী। বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের উদ্গাতা ষড়্ গোস্বামীর মধ্যেও ইনি একজন। এই সনাতন শ্রীমদ্ভাগবতের "বৈষ্ণব তোষণী" টীকা রচনা করেন। তাতে উৎকৃষ্ট কাব্যের নিদর্শন হিসেবে অন্যান্যের মধ্যে চণ্ডীদাসের বর্ণিত দানখণ্ড, নৌকাখণ্ডের উল্লেখও রয়েছে। এমন অবস্থায়, শ্রীচৈতন্যদেব বড়ুচণ্ডীদাসের কাব্যই আস্বাদন করেছিলেন, এরূপ অনুমান নিতান্ত অসম্ভব বলে মনে হয় না।

কিন্তু যা-কিছু সম্ভব, তাই সত্য হয় না সব সময়ে। বড়ুচণ্ডীদাস ছাড়া আরো একজন পদকর্তা চণ্ডীদাসও ছিলেন চৈতন্য-পূর্বকালে ; আর মহাপ্রভু তাঁর রচিত পদই আস্বাদন করতেন,—এমন অনুমানের সংগত কারণ খুঁজে পাওয়া গেছে। চৈতন্য চরিতামৃত সর্বশ্রেষ্ঠ চৈতন্য-জীবনীগ্রন্থ। তাতে মহাপ্রভুর আস্বাদিত একটি পদ্যাংশ উদ্ধৃত হয়েছে। পরে পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সেই গোটা পদটি চণ্ডীদাসের ভণিতায় আবিষ্কার করেন। অধুনা, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার নূতন যুক্তি-তথ্য সহযোগে প্রমাণ করেছেন,—এই চণ্ডীদাস 'বড়ু' থেকে পৃথক্ কবি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ থেকে এই চৈতন্য-আস্বাদিত কবি চণ্ডীদাসের এক অনুমান-নির্ভর পদসংকলন তিনি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন।)

চৈতন্য পূর্বনী পদকর্তা চণ্ডীদাস (?)

এ-ছাড়াও, আরো একাধিক পদকর্তা চণ্ডীদাসের পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁরা সকলেই চৈতন্য-পরবর্তী কবি বলে অনুমিত হয়ে থাকেন। এই

চণ্ডীদাস-কবিকুলের মধ্যে প্রথমে স্মরণীয় কবি দীনচণ্ডীদাস ;—কারণ এঁর রচিত পদাবলীর একাধিক প্রামাণ্য পুঁথি পাওয়া গেছে।

দীনচণ্ডীদাসের পদাবলী

প্রথম পুঁথিটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় ২৩৮৯ সংখ্যা-চিহ্নিত হয়ে আছে। অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু এই পুঁথির পদগুলি অন্যান্য সূত্র থেকে সংগৃহীত আরো বহু চণ্ডীদাস-পদাবলীর সঙ্গে দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন,—দীনচণ্ডীদাসের পদাবলী নামে। মূল পুঁথির পদগুলি বিভিন্ন পালায় বিভক্ত, প্রায় সর্বত্র চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে। পালাবিভাগের পদ্ধতি এবং পদ-বিষয়ের কল্পনা-বৈশিষ্ট্য বিচার করে অধ্যাপক বসু প্রমাণ করেছিলেন দীনচণ্ডীদাসের পদাবলীতে চৈতন্য-পরবর্তী কালের বৈষ্ণব দর্শন ও অলংকার শাস্ত্রের প্রভাব সর্বত্র সংশয়াতীত। ফলে, দীনচণ্ডীদাস চৈতন্যোত্তর পদকর্তারূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

বনপাশ পুঁথি

দীনচণ্ডীদাসের রচিত সকল পদই তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর নিকৃষ্ট রচনা, উৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর পদ তাতে একটিও নেই। এঁর উন্নততর রচনার নতুন কিছু পরিচয় পাওয়া গিয়েছে বর্ধমানের বনপাশ গ্রাম থেকে আবিষ্কৃত এক নূতন পুঁথিতে। এতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিতে ধৃত সব কয়টি পদই আছে। নূতন পদ আছে ৩৭৭টি, তাতে কিছু উৎকৃষ্টতর রচনাকর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ পুঁথির পদসংখ্যা থেকে জানা যায়, যে-সব পৃষ্ঠা খণ্ডিত, তাতে দীনচণ্ডীদাসের আরো ৬৫০টি পদ খোয়া গেছে।

দ্বিজচণ্ডীদাস

চৈতন্য-পরবর্তী আরো একজন চণ্ডীদাস-কবির অস্তিত্ব অনুমান করা হয়; যদিও তাঁর লেখা পদাবলীর কোনো প্রামাণ্য পুঁথি পাওয়া যায় নি। ইনি দ্বিজচণ্ডীদাস নামে পরিচিত। বৈষ্ণব পদাবলীতে অনেক চমৎকার পদ চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া গেছে, যেগুলির বিষয়-পরিকল্পনাতে চৈতন্য-পরবর্তী কালের ভক্তি-দর্শনের গভীর প্রভাব রয়েছে :—

"আজু কে গো মুরলী বাজায়।
সে তো কভু নহে শ্যামরায়॥"...

ইত্যাদি বিখ্যাত পদটিও চৈতন্য-পরবর্তী চণ্ডীদাস-ভাবনার এক সার্থক

নিদর্শন। অথচ, দীনচণ্ডীদাসের কাব্য-পুঁথিতে এই সব স্মরণীয় রচনার একটিও নেই। অন্য পক্ষে এই সব পদের অনেক কয়টিতে দ্বিজ-চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া যায়। অতএব, চৈতন্য-পরবর্তী কালোত্তীর্ণ চণ্ডীদাস-পদাবলীর স্রষ্টারূপে দ্বিজচণ্ডীদাসের অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়েছে।

এই সূত্রে চণ্ডীদাস-সম্পর্কিত আর একটি বিতর্কের সমাধানও সম্ভব হতে পারে। বিশ্বভারতী পুঁথিশালার একটি প্রাচীন (অষ্টাদশ শতকের) পুঁথি থেকে জানা যায় :—নান্নুর গ্রামের বিশালাক্ষীপূজক কবি চণ্ডীদাসের দেহান্ত হয়েছিল কীর্ণাহার গ্রামে। দ্বিজচণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত অনেক কয়টি পদও বীরভূমে পাওয়া গেছে। অতএব, এই বিখ্যাত চৈতন্যোত্তর কবি চণ্ডীদাস নান্নুরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই অনুমান অপ্রামাণিক নয়। অন্যপক্ষে, কবি বড়ু চণ্ডীদাস হয়ত বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামে বাসলীর সেবক ছিলেন। কৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুঁথি ঐ অঞ্চলেই পাওয়া গেছে; আর সে কাব্যে বাসলীকে কবি বার বার বন্দনা করেছেন। এইভাবে, চণ্ডীদাসের উত্তরাধিকার নিয়ে নান্নুর ও ছাতনার পরস্পর বিরোধী দাবির ঐতিহাসিক সামঞ্জস্য বিহিত হতে পারে।

চণ্ডীদাসের বাসভূমি, নান্নুর বনাম ছাতনা

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার দাবি করেছেন, তাঁর অনুমিত চৈতন্যপূর্ব পদকর্তা চণ্ডীদাসই নান্নুরে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

এই সব ইতিহাস-বিশ্রুত বৈষ্ণব চণ্ডীদাস-কবিদের প্রসঙ্গ ছেড়ে দিলেও আরো অনেক সহজিয়া চণ্ডীদাস-কবি আছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম তরণী, অথবা তরুণীরমণ। তাঁর ভণিতাতেই সুদীর্ঘ রামী-উপাখ্যান পাওয়া গেছে। অতএব, রামীঘটিত কিংবদন্তীর আকর হয়ত ছিলেন এক সহজিয়া চণ্ডীদাস।

চণ্ডীদাস ও রামী

ফলকথা, বৈষ্ণব পদসাহিত্যে চণ্ডীদাস নামধেয় অসংখ্য কবি-পরিচিতির মধ্যে ঐতিহাসিক স্মরণীয়তা চারজনের। এঁদের দুজন চৈতন্য-পূর্ববর্তী এবং আরো দুজন চৈতন্য-পরবর্তী। প্রত্যেক যুগে একজন করে কবির লেখার প্রামাণ্য পুঁথি-পরিচয় পাওয়া গেছে,—প্রতি যুগে আরো একজন

করে কবির অস্তিত্ব অনুমান করতে হয়েছে পারিপার্শ্বিক তথ্য-বিচারের সহযোগে। বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্বকালে ছাতনায় আবির্ভূত হয়ে কৃষ্ণকীর্তন রচনা করেন। দ্বিজ চণ্ডীদাস ছিলেন নান্নুরের চৈতন্যোত্তর কবি। 'চণ্ডীদাস-দ্বিজ' চৈতন্য-পূর্ববর্তীকালে আবির্ভূত হয়ে হয়ত চৈতন্যদেবের আস্বাদন-ধন্য পদ রচনা করে রেখে গিয়েছিলেন। দীনচণ্ডীদাস চৈতন্যোত্তর কালের সহস্রাধিক প্রামাণ্য পদের রচয়িতা কবি,—যদিও পদগুলি উৎকৃষ্ট সৃষ্টিগুণের অধিকারী নয়। এইরূপেই বহুবিতর্কিত বিচিত্র চণ্ডীদাস-সমস্যার আপাত-সমাধান করা যেতে পারে।

চণ্ডীদাস সমস্যা ও সমাধান

৩। বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার কবি। তাঁর প্রতিভাও ছিল বিচিত্রমুখী। স্মৃতিশাস্ত্র, পৌরাণিক পূজাপদ্ধতি ও সাধনগ্রন্থ, ইতিহাস, ভূগোল, অংলকার শাস্ত্র, কথাসাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন; তা ছাড়াও পদগীতি রচনা করেছিলেন হর-গৌরী ও রাধা-কৃষ্ণের লীলা-প্রসঙ্গ নিয়ে। বিভিন্ন ভাষাতেও বিদ্যাপতির অধিকার ছিল সুগভীর। তাঁর স্মৃতি ও ধর্মগ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায় লেখা, পুরুষপরীক্ষা নামক কথাসাহিত্যও তাই। কীর্তিলতা আর কীর্তিপতাকা, এই দুখানি ইতিহাস-গ্রন্থ লেখা হয়েছিল 'অবহট্‌ঠা' ভাষায়। 'অবহট্‌ঠা' অর্থে বুঝি 'অর্বাচীন' অপভ্রংশ ভাষা। হর-গৌরী বিষয়ক পদ কবি তাঁর মাতৃভাষা 'মৈথিল'-এর মাধ্যমে রচনা করেছিলেন। রাধাকৃষ্ণ-লীলার কিছু সংখ্যক পদও মিথিলা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে,—মৈথিল ভাষায় লেখা। কিন্তু মিথিলায় প্রাপ্ত বিদ্যাপতির রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদের সংখ্যা একশ-ও নয়; আর তাদের সাহিত্যিক উৎকর্ষও প্রায় অনুল্লেখ্য। বস্তুতঃ, রস-মধুর যে পদগুলির জন্য বিদ্যাপতি আজ কবি-কুলপতি, তার প্রায় সব কয়টিই বাংলাদেশে পাওয়া গেছে। বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর নানা প্রাচীন সংকলনে এই পদগুলি এক বিচিত্রতর ভাষায় লেখা আছে,—একালে তার নূতন নাম দেওয়া হয়েছে ব্রজবুলি ভাষা।

কবি বিদ্যাপতি

ব্রজবুলি কোনো দেশের কোনো লোকেরই মাতৃভাষা নয়। মূলতঃ "বাংলা-মৈথিল পদাবলীর মিশ্রণে এবং অবহট্‌ঠার ঠাটে ব্রজবুলির উৎপত্তি" হয়েছিল। মনে হয়, এই বিমিশ্র ভাষাকে আশ্রয় করেই বিদ্যাপতি অধিক সংখ্যক বৈষ্ণব কবিতা লিখেছিলেন। কিন্তু, সে ভাষা অধুনা-দৃষ্ট বিদ্যাপতির পদে যে অনেকটাই পাল্‌টে গেছে, তাতে সন্দেহ নেই।

বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাপতির ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা

প্রাচীন বাংলাদেশে কাব্য-কবিতার চর্চা লিখিতভাবে বড় একটা হত না; যত হত মৌখিক আবৃত্তি বা গানের মধ্য দিয়ে। ফলে, কালে কালে কথ্য ভাষার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গায়েনদের কণ্ঠে মূল পদের ভাষাতেও পরিবর্তন ঘটেছে, তাতে লেগেছে যুগের কথ্য-ভঙ্গির ছাপ। তবু, ব্রজবুলি কবিতার মূল কাঠামোটি হয়ত বিদ্যাপতির হাতেই প্রথম গড়ে উঠেছিল। পরে—চৈতন্য-উত্তর কালে বাংলার শ্রেষ্ঠ এক বৈষ্ণব পদকর্তা বিদ্যাপতির অনুসরণ করে আগাগোড়া এই ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করে গেছেন; এই জন্য তাঁকে "দ্বিতীয় বিদ্যাপতি" আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। এই কবির নাম গোবিন্দদাস কবিরাজ। এ ছাড়াও বহু বাঙালি কবি ব্রজবুলি ভাষায় উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব পদ লিখেছেন। বাঙালির লেখা ব্রজবুলি বৈষ্ণব কবিতার আদিগুরু রূপেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাপতির অক্ষয় প্রতিষ্ঠা। মহাপ্রভুর প্রীতি-পক্ষপাত তাঁর পদাবলীকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে কেবল আস্বাদনীয় নয়, পূজনীয় করে তুলেছিল। এই জন্যই মূল রচনার পটভূমি মিথিলায় বিদ্যাপতির বৈষ্ণব কবিতা লুপ্তপ্রায় হয়ে গেলেও, বাংলাদেশেই তা একান্ত যত্ন সহকারে রক্ষিত হয়েছে। বাঙালির ভাব-ভক্তি-বিশ্বাস বিদ্যাপতির কবি-কীর্তিকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে। তাঁর রচনাশৈলী ও ভাষাপ্রকৃতি বাঙালি কবিকে উদ্বুদ্ধ করেছে নবীন কাব্য-রচনায়,—এই পারস্পরিক হৃদ্যতা ও পরিপূরকতার প্রীতি-সূত্রেই মিথিলার কবি বাংলার সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

বিদ্যাপতি কেবল মিথিলার সন্তানই ছিলেন না, সেখানকার রাজকুল বংশ-পরম্পরায় তাঁর পাণ্ডিত্য ও শিল্পসাধনার ধাত্রীত্ব করেছিল। তীরভুক্তির অন্ততঃ পাঁচজন শাসকের রাজসভা তিনি অলংকৃত করেছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রথম, কীর্তিসিংহের শাসনকাল খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতকের শেষে বলে অনুমিত হয়। সর্বশেষ যে রাজার সভায় বিদ্যাপতির সন্ধান পাওয়া যায়,

তিনি নরসিংহ। এই কাল-বিচার এবং অন্যান্য তথ্যাদির থেকে অনুমান করা হয়েছে যে, কবি চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগ থেকে "অন্ততঃ ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দ অবধি জীবিত ছিলেন।"

কবির ব্যক্তি-পরিচয়

সে যাই হোক,—বিশেষভাবে রাধাকৃষ্ণ-লীলা-পদ রচনার কালে রাজা শিবসিংহই বিদ্যাপতির প্রধান সহায়ক ছিলেন বলে মনে হয়;—অধিকাংশ পদের ভনিতায় কবির নামের সঙ্গে রাজার নাম উল্লিখিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে আবার শিবসিংহের সঙ্গে রানা লছিমাকেও কবি স্মরণ করেছেন।

সংস্কৃত অলংকার এবং কাব্যশাস্ত্রে বিদ্যাপতির প্রগাঢ় অধিকার ছিল। রাধাকৃষ্ণের প্রেম-চিত্রণে তিনি সেই জ্ঞান-সম্পদকে প্রথম শ্রেণীর শিল্প-প্রতিভার গুণে মণ্ডিত করেছিলেন। একদিকে প্রণয়-কলা বিষয়ে সংস্কৃত অলংকার ও কাব্য-কবিতাকে মন্থন করা সৌন্দর্য-ক্রম, আর এক দিকে প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট দেহাকৃতি ও হৃদয়ার্তির যুগপৎ জীবন্ত রূপ-বিন্যাস তাঁর রচনাকে অতুল্য সম্পদে ভরে তুলেছে। তাছাড়া সংস্কৃত কাব্যের অনুরূপ লঘু-গুরু মাত্রায় বিকম্পিত ছন্দ-প্রকৃতি কবি-চেতনার পক্ষে অনায়াসে আয়ত্ত হয়েছিল। বিকচযৌবনা রাধার চল-চঞ্চল প্রণয়-কৌতুক এবং কৌতূহল ব্রজবুলির ছন্দ-প্রক্রমে নেচে ছুটে চলেছে যেন;—

"খনে খনে নয়ন কোন অনুসরঈ
খনে খনে বসন-ধূলি তনু ভরঈ॥
খনে খনে দসন ছটাছুট হাস।
খনে খনে অধর আগে করু বাস॥
চউকি চলএ খনে খনে চলু মন্দ।
মনমথ-পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥
হিরদয় মুকুল হেরি হেরি থোর।
খনে আঁচর দএ খনে হোয় ভোর॥
বালা সৈসব তারুন ভেট।
লখএ ন পারিএ জেঠ কনেঠ॥
বিদ্যাপতি কহ সুন বরকান।
তরুনিম সৈসব চিহ্নই ন জান॥"

কবি-কীর্তির ঐতিহাসিক স্বভাব

বিদ্যাপতিকে প্রধান ভাবে "বয়ঃসন্ধির" কবি বলা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ বয়ঃসন্ধির রাধিকাব ছবি এঁকে বলেছিলেন,—"বিদ্যাপতির রাধা অল্পে অল্পে মুকুলিত বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, সৌন্দর্য ঢল ঢল করিতেছে। খানিকটা হাসি খানিকটা ছলনা, খানিকটা আডচক্ষে দৃষ্টি।···আপনাকে আধখানা প্রকাশ এবং আধখানা গোপন, কেবল উদ্দাম বাতাসের আন্দোলনে অমনি খানিকটা উন্মেষিত হইয়া পডে।·· কেবল চম্পক অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া অতি সাবধানে অপরিচিত প্রেমকে একটুমাত্র স্পর্শ করিয়া অমনি পলায়নপর হইতেছে।···তখন সকলই রহস্যে পরিপূর্ণ।" এই রহস্যচপল প্রণয়-কলা-কুতুহলের একটি উৎকৃষ্ট ছবি :—

"খেলত ন খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত ন হেরত সহচরী মাঝ॥
শুন শুন মাধব তোরি দোহাই।
বড অপরূপ আজু পেখল রাই॥
মুখরুচি মনোহর অধর সুরঙ্গ।
ফুটল বান্ধুলি কমলক সঙ্গ॥
লোচন যুগল ভৃঙ্গ অকার।
মধু মাতল কিয়ে উডন ন পার॥
ভাঙক ভঙিম থোরি জনু।
কাজরে সাজল মদন ধনু॥
ভণই বিদ্যাপতি দোতিক বচনে।
বিকশিল অঙ্গ না যাওত ধরণে॥"

কিন্তু কেবল চপলতার রূপসজ্জাতেই নয়,—বিপ্রলব্ধ। প্রেমের গভীর বেদনার্তিকেও তিনি ভাষায় বিমূর্ত করে তুল্‌তে পেরেছিলেন :—

"সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেহো পিরিত অনুরাগ বখানি এ
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল।

সেহো মধু বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতি পথ পরস ন গেল ॥
কত মধু জামিনি রভস গমাওল
ন বুঝল কৈসন কেল।
লাখ লাখ জুগ হিয় হিয় রাখল
তই হিয় জুড়ন না গেল ॥
কত বিদগধ জন রস আমোদঈ
অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ-জুড়াএত
লাখ না মিলল এক ॥"

কবি-প্রাণের এই ভাব সমাহিতির এক পরম পরিচয় রয়েছে তাঁর প্রার্থনা-পদাবলীতে। অপরাপর বহু পদে আপন প্রাণের অনুভবকে কবি রাধার হৃদয়ার্তির আবরণে সজ্জিত করে নিবেদন করেছেন। কিন্তু প্রার্থনার পদে তাঁর আত্ম-নিবেদন নিরাবরণ নিরাভরণ সত্যরূপে অভিব্যক্তি পেয়েছে ঃ—

"মাধব বহুত মিনতি করি তোয়
দ-এ তুলসী-তিল এ দেহ সোপলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয় ॥"

বিদ্যাপতির প্রার্থনা-পদের সংখ্যা বেশি নয়। তা' হলেও, এই পর্যায়ের পদে তাঁর উপলব্ধির গভীরতা দেখে অনেকে মনে করেছেন,—তিনি ছিলেন বৈষ্ণব। ইতিহাসের বহিরঙ্গ উপাদান কিন্তু এই সিদ্ধান্তের অনুকূল নয়।

শৈব বিদ্যাপতির কৃষ্ণানুরক্তি

কবির পিতৃবংশ এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষক তীরভুক্তির রাজবংশ, উভয়েরই কৌল-বিশ্বাস ছিল শৈব ধর্মে। বিদ্যাপতির পিতা গণপতি ঠাকুর পরম পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান শৈব ছিলেন। কবির নিজের পূজিত শিবলিঙ্গও এখনও মিথিলায় রয়েছে। এমন অবস্থায় তাঁকে আনুষ্ঠানিক বৈষ্ণব বলে অভিহিত করা সম্ভব নয়। কিন্তু রাধাকৃষ্ণ-লীলার প্রতি কবির অন্তরের অনুরাগ যে অকৃত্রিম ছিল;—তাঁর কালজয়ী পদ-সাহিত্যেই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। আর কৃষ্ণচরণারবিন্দের প্রতি কবির ব্যক্তিমনের নিভৃত আকুতির শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁর প্রার্থনা-পদাবলী।

মধ্যপর্যায়ের পরিণতি ঃ চৈতন্যোত্তর বাংলা সাহিত্য

মধ্যপর্যায়ের বাংলা সাহিত্যের নূতন পরিণতির সুর জেগেছে খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথম থেকে। এ-পর্যন্ত পরিচিত মধ্যযুগের সাহিত্য-কর্মের থেকে এই নূতন রচনা-প্রবাহে কোনো পৃথক্ ভাব, বা অজ্ঞাত-পূর্ব জীবন-প্রকৃতির বিকাশ লক্ষ্য করা যায় না। কেবল, তুর্কী আক্রমণোত্তর বাংলা-সাহিত্যের স্বভাব-ধর্ম এই কালসীমায় নূতন পূর্ণতার,—নবীনতর মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে। আর এই মুক্তি-চেতনার প্রাণকেন্দ্র ছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য।

মধ্যপর্যায়ের সাহিত্যে জীবনমুক্তি

পূর্বে দেখেছি,(তুর্কী আক্রমণোত্তর বাংলা সাহিত্যের সাধারণ আকাঙ্ক্ষা ছিল সার্বিক মিলনের অভিমুখী। সমাজের উচ্চ এবং নীচ, শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল ব্যক্তিকে একই আদর্শ ও উদ্দেশ্যের বাঁধনে বেঁধে দেওয়াই ছিল সেকালের সাহিত্যের প্রধান চেষ্টা। এই মিলন-সাধনের জন্য ধর্ম-প্রেরণা ও দৈবীভক্তির বন্ধন-রচনার দিকেই এ-পর্যন্ত আলোচিত বাংলা সাহিত্যের ঝোঁক ছিল একান্ত। ফলে ধর্মীয় মিলনের নামে সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতাও কম প্রবল হয়েছিল না। মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলের কবি শিব-ভক্তের ওপরে নিজ নিজ দেবীর অত্যাচার-প্রকোপের কাহিনীকে সকল তীব্রতার সঙ্গে অঙ্কিত করেছেন। উদ্দেশ্য ছিল,—ভয়াতুর লোক-সাধারণ যেন উৎপীড়নের আশংকাতেও দেবীর ভজনা করে। একই উদ্দেশ্যে ধর্মমঙ্গলের কবি ধর্ম-সাধক লাউসেনের হাতে পার্বতী-ভক্ত ইছাই ঘোষের পরাভব-কথা চিত্রিত করেছেন। এ-সময়ে দেব-দেবীর মধ্যে সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের জন্যে যেন এক লড়াই বেঁধে গিয়েছিল। সেকালের সামাজিক বিশ্বাস এবং পরিবেশও অবশ্য এর জন্যে কম দায়ী ছিল না। দীর্ঘস্থায়ী তুর্কী আক্রমণের আঘাতে দুর্বল জাতির আত্ম-বিশ্বাস বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল,—আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে দেবতার কৃপাকেই তারা একমাত্র সম্বল বলে জেনেছিল। অন্যদিকে ন, জদের যুগ-স্বভাব এবং যুগশক্তির ওপরেও কোনো আস্থা তাদের ছিল

মুক্তিদূত-শ্রীচৈতন্য

না। ফলে দেবতার কৃপায়, সম্ভব-অসম্ভব পথে, কোনো এক সত্যযুগের আগমন-কামনায় তারা বুভুক্ষু হয়ে থাকৃত। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য তাঁর সারা জীবনের সাধনা দিয়ে এই অসম্ভবের প্রত্যাশা,—এই দেব-কৃপা-বুভুক্ষার অন্ধতাকে বিদূরিত করলেন; জাগিয়ে তুললেন মানব-শক্তির প্রতি অপূর্ব শ্রদ্ধা এবং নিজের কাল সম্বন্ধে অপরিসীম বিশ্বাস। তাঁর প্রাণ-জ্যোতির বিভায় মণ্ডিত হয়ে ভক্ত-কবি উদাত্ত কণ্ঠে কলিযুগের বন্দনা করলেন—"প্রণমহো কলিযুগ সর্বযুগসার।" তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাঙালি সাধারণ কায়মনে বিশ্বাস করলো,—

"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।"

এই বিশ্বাসে বলিষ্ঠ চৈতন্যোত্তর কালের বাংলা সাহিত্যে মানব-স্বীকৃতির প্রথম পীঠ-রচনা হল; মানবিক প্রীতির উৎসাহে দীপ্ত নবীন সৃজন-প্রবাহে পুরাতন মিলন-বাসনা নবতর মৌলিক রূপে হয়ে উঠল বিভাসিত। তুর্কী আক্রমণোত্তর বাংলা সাহিত্য চৈতন্যোত্তর কালের মোহনায় মুক্তির নূতন সংগম-তীর্থ খুঁজে পেল।)

মহাপ্রভু চৈতন্যের জন্ম হয়েছিল ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দে ফাল্গুনী দোল-পূর্ণিমার দিনে। তাঁর পিতা ছিলেন শ্রীহট্টের জগন্নাথ মিশ্র, মা ছিলেন শচী দেবী। দরিদ্র জগন্নাথ প্রথম বয়সেই সেকালের বাংলার সারস্বত তীর্থ নবদ্বীপে এসে বসতি স্থাপন করেন,—নবদ্বীপই মহাপ্রভুর পুণ্য জন্মভূমি। তাঁর পিতার দেওয়া নাম ছিল বিশ্বম্ভর,—ডাক নাম ছিল নিমাই। তপ্ত-কাঞ্চন বর্ণের জন্য বালককে গৌরাঙ্গ বলেও ডাকা হত। শিশু গৌরাঙ্গ যেমন অবাধ্য দুরন্ত ছিলেন, তেমনি নির্বাধ ছিল তাঁর মেধা ও বিদ্যোৎসাহ। নিতান্ত অল্পবয়সেই ব্যাকরণ ও অন্যান্য শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে নিজে তিনি টোল স্থাপন করেন। এর মধ্যে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। বিশ্বম্ভর প্রথমে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু, পদ্মাতীরের প্রবাসে নিমাই যখন পাণ্ডিত্যের মায়াজাল বিস্তার করে ফিরছিলেন, তখনই একদা সর্পাঘাতে নবদ্বীপে লক্ষ্মীর মৃত্যু হয়। পত্নী-বিয়োগের খবর বিশ্বম্ভর জানতে পারেন বাড়ি পৌঁছোবার পরে। দ্বিতীয়বার তাঁর বিয়ে হয় বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে। এর পক্ষে

চৈতন্য-জীবনী

মহাপ্রভু পিতার গয়াপিণ্ড দেবার জন্য গয়ায় যান। সেখানে ঈশ্বরপুরীর অলৌকিক শক্তি দেখে তিনি অভিভূত হন এবং তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তারপরে অ-পূর্ব এক ভাব-তদ্গত প্রাণ নিয়ে বিশ্বম্ভর ফিরে আসেন নবদ্বীপে। কিছুদিন পরে কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে তিনি সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৪ বছর।

সন্ন্যাস গ্রহণের পরই মহাপ্রভু বাংলা, উড়িষ্যা,—তথা সারা ভারতে ধর্ম প্রচারে মনোযোগী হন। তাঁর প্রচারের উদ্দেশ্য সর্বাংশে আধ্যাত্মিক ছিল না, সমকালীন জাতির তন্দ্রাজড়িত আধিভৌতিক জীবনও চৈতন্য-চেতনার স্পর্শে জাগরণ-চকিত হয়ে উঠেছিল। শ্রীচৈতন্যের ধর্মপ্রচারের মূলগত প্রেরণাকে ব্যাখ্যা করে ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন,—"শ্রীচৈতন্য দেখিলেন যে সমগ্র বাংলাদেশে এবং বাংলার বাহিরেও এই ধর্ম প্রচার করা আবশ্যক, বিভিন্ন আচার-ব্যবহারে এবং অনাচার-অধর্মে আচ্ছন্ন খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বাঙালি জনসাধারণ জাতিগত ঐক্যলাভ করিতে কখনই সমর্থ হইবে না। উপরন্তু সমস্ত দেশ ম্লেচ্ছ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে।"

আগে বলেছি, তুর্কী আক্রমণের পর থেকেই খণ্ড-বিচ্ছিন্ন বাঙালি জাতির মধ্যে ঐক্যলাভের আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু বাইরের আঘাতকে রোধ করার জন্যে যে একতা-বোধের জন্ম, তা ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। হৃদয়ের সহজ আন্তরিকতায় পুষ্ট না হলে ঐক্যের বন্ধন হয় কৃত্রিম এবং দুর্বল। মহাপ্রভু জাতীয় ঐক্যবিধানের আকাঙ্ক্ষায় বাঙালির মনোবলের উদ্দীপনে ব্রতী হলেন। নানা জাতি ও সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্ন সমাজকে তিনি জানালেন,—'হরিভক্তিপরায়ণ হলে, চণ্ডালও দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ হতে পারে'; অস্বীকার করলেন জন্মগত জাতিভেদ প্রথার যুক্তিযুক্ততা। "হরিভক্তি" বলতেও মহাপ্রভু কোনো নৈষ্ঠিক ধর্মাচরণের কথা ভাবেন নি ; বলেছেন,—

চৈতন্য-জীবনে যুগ-বাণী

"অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান-কর্ম।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥
এই শুদ্ধভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥" [চৈতন্য চরিতামৃত]

আর, চৈতন্য-প্রচারিত ধর্মের আদর্শে "প্রেম"-ই হচ্ছে "সর্বসাধ্য-সার"। "প্রেম" বল্‌তে অবশ্য "অ-হেতুক প্রেম"-এর কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু, সে প্রেমও মানবিক হৃদয়ানুকূলতারই উৎস-জাত,—তারই পরমা-পরিণতি। "শুদ্ধাভক্তি", তথা "অহেতুক প্রেম" সাধনার পাঁচটি উপায় নির্দেশ করা হয়েছে,—যথাক্রমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবাশ্রিত পাঁচটি উপায়। "শান্ত" বল্‌তে বুঝি নিস্তব্ধ হৃদয়ের প্রেমাকুতি; "দাস্যে" রয়েছে প্রিয় এবং প্রীতিমান্‌-এর মধ্যে প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের আকর্ষণ, "সখ্যে" আছে সমতা-বুদ্ধি,—সখা-প্রীতি; "বাৎসল্যে" প্রেমের গরিষ্ঠতাবোধ,—প্রিয় এখানে জননীসুলভ স্নেহের বন্ধনে বাঁধা; সর্বশেষে "মধুর-ভাবের" মধ্যে অভিন্নতার চেতনা সুমহত্তম; প্রিয় এখানে প্রীতিমান-এর "দেহে আর মনে-প্রাণে একাকার হয়ে", তার সারা "অঙ্গ" জুড়ে "অপরূপ লীলা" করে ফেরেন। এদিক থেকে,—বৈষ্ণব প্রেম-সাধনার আশ্রয়স্বরূপ প্রতিটি ভাবই মানবিক অনুভবের উৎস থেকে জাত। কিন্তু মানব-প্রেমের কেন্দ্রে সর্বত্রই সুপ্ত হয়ে রয়েছে কোনো-না-কোনো "হেতু"। আমাদের কোনো প্রীতিই একেবারে অকারণ নয়, "অ-হেতুক" নয়। এমনকি মাতৃ-স্নেহের অলৌকিক মহিমার মূলেও "হেতু" রয়েছে বলে মনে করা হয়;—কেবল পুত্রের জন্যেই জননী পুত্রকে ভালবাসেন না পুত্রকে ভালবেসে তাঁর আত্মার পরমানন্দ, তাই তিনি পুত্রকে ভালবাসেন। কিন্তু বৈষ্ণবের কল্পিত "অ-হেতুক" প্রেমের সাধনায় ঐ আত্মার আনন্দ লাভের আকাঙ্ক্ষাটুকুকেও উন্মূলিত করতে হবে। মানব-অনুভূতিতে প্রেমের এই একান্ত তন্ময়তা সম্ভব নয়; তবু মানবিক প্রেমকে অন্তরের নিষ্ঠা দিয়ে পরিস্রুত (sublimate) করে করে সেই অলৌকিক প্রেম-সিদ্ধির জগতে পৌঁছুতে হয়। বৈষ্ণব ধর্মের পরিভাষায় সেই পরিস্রুততম প্রেম-রসের বিমূর্ত যুগলরূপ রাধা ও কৃষ্ণ,—"রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্‌।"—শ্রীচৈতন্যদেব নিখিল মানবকে এই পূর্ণ প্রেম-শক্তি সাধনের জীবন-বাণীই দান করেছেন। চৈতন্য-ধর্মের এইটিই সার সত্য।

আর এই ধর্মপ্রচার উপলক্ষ্যে কখনো মহাপ্রভু তত্ত্ব-ব্যাখ্যা বা শাস্ত্রীয় প্রমাণবিচার উদ্ধার করেন নি। তাঁর স্বভাব-বৈশিষ্ট্য ছিল;—"আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়।" যবন হরিদাসকে তিনি কেবল কোল দেন

নি, তাঁকে ভক্তকুল-শিরোমণির পূজনীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিতও করেছিলেন। মহাপাষণ্ড, নবদ্বীপের হিংসা-মত্ত কোটাল-ভ্রাতৃদ্বয় জগাই-মাধাইকে করে তুলেছিলেন পরম প্রেমিক। তাঁর হেম-জ্যোতি-পুঞ্জিত দেহে অকারণ প্রেমের আকৃতি যেন মূর্তি ধরে ফিরত। (তাই একদিকে তাঁর জীবনাচরণে মানব-শক্তির বিকচ মহিমা লক্ষ্য করে সেকালের আত্ম-বিশ্বাসহীন বাঙালি মানুষের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠলো। ফলে বাংলা-সাহিত্যে প্রথম মানব-কেন্দ্রিক কাব্য রচনার ধারা সূচিত হল চৈতন্য-জীবনকে আশ্রয় করে। অন্য দিকে তুর্কী আক্রমণোত্তর বাংলার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ঐক্য-কামনার স্থলে অ-হেতুক প্রেমের সহজ আকুলতায় উদ্বোধিত হল নিখিল বাঙালিমানস। ফলে, কেবল চৈতন্য-জীবনী বা বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যেই নয়, বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য সকল শাখাতেই মানব-প্রেমের উৎকণ্ঠা একান্ত প্রাধান্য লাভ করেছিল।) এই মানবিক বিশ্বাস ও মানব-প্রেমের একান্ততাই চৈতন্য-উত্তর যুগের বাংলা সাহিত্যে মহৎ পরিণতি লাভ করেছে।

চৈতন্য-প্রভাবিত বাঙালি জীবনের ঐতিহাসিক রূপ

চৈতন্য-পূর্ব যুগের তুলনায় চৈতন্য-পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যে একটিমাত্র উল্লেখযোগ্য নূতন শাখার প্রবর্তন ঘটেছিল। আগেই বলেছি,—সেটি জীবনী-সাহিত্যের শাখা। মহাপ্রভুর জীবন-বৈভবকে শিরোধার্য করে এই রচনা-প্রবাহের উদ্ভব,—ক্রমশঃ অদ্বৈত আচার্য, সীতাদেবী প্রভৃতি মহামানব-মানবীর জীবন-কথা জীবনী-কাব্যের উপাদান রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। পরে রচিত হতে থাকে বৈষ্ণব ধর্ম এবং বৈষ্ণব মহাজনের জীবনাশ্রিত ইতিহাস-কাব্য। মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ক্রমশঃ মানব-ইতিহাসের প্রতি কৌতূহল জাগিয়ে তোলে;—শুরু হয় ইতিহাসাশ্রিত বাংলা-কবিতার রচনা।

চৈতন্য-যুগের বাংলা সাহিত্য

কিন্তু কেবল ঐটুকুই বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য-চেতনার একমাত্র দান নয়। পূর্বাবধি প্রচলিত বিভিন্ন রচনা-প্রবাহও মানব-স্বীকৃতি এবং প্রেমানুভূতির দ্বারা নূতন ভাব-রূপে সঞ্জীবিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক প্রণোদনায় উদ্বোধিত মঙ্গলকাব্যে দেবতার মহিমাকে ছাপিয়ে মানুষের

সংগ্রামী শক্তির পরিচয় দীপ্ত হয়ে উঠ্‌লো, মানবিক প্রীতির আনুকূল্যে সর্বধর্মের প্রতি দেখা দিল সহজ সহৃদয়তা। অনুবাদ কাব্যের ঐশ্বর্যের দীপ্তিকে ছাপিয়ে উঠলো করুণাঘন মাধুর্যের কোমল সহৃদয় বংশী-নিনাদ। বাংলা সাহিত্যের দিকে দিকে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌লো মানব-মহিমার হৃদয়-মনোহারী মহিমা-গাথা। চৈতন্য ঐতিহ্যের এইটুকুই শ্রেষ্ঠদান।

১৫০৯ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। ফলে ষোড়শ শতকের একেবারে প্রথম থেকেই বাংলা-সাহিত্যে চৈতন্য-প্রভাবের পরিচয় ক্রমশঃ প্রস্ফুট হতে আরম্ভ হয়েছে। ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে ৪৮ বছর বয়সে তাঁর তিরোভাব ঘটে। কিন্তু তারও পরে গোটা ষোড়শ শতাব্দী এবং সপ্তদশ শতকের প্রায় প্রথমার্ধ অবধি বাংলার সমাজ ও সাহিত্য-জীবনে চৈতন্য-প্রভাব নানা পর্যায়ে বিচিত্র পরিমাণে কার্যকরী হয়েছিল। পরবর্তী আলোচনায় চৈতন্যোত্তর বাংলা সাহিত্যের সেই ইতিহাসেরই সন্ধান করব।

বৈষ্ণব জীবনী-সাহিত্য

বারে বারে বলেছি,—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবন-কথাকে আশ্রয় করেই বাংলা সাহিত্যে মানব-কেন্দ্রিকতার সূচনা ;—চৈতন্যজীবনীই বাংলা ভাষার প্রথম জীবনী-গ্রন্থ। সাধারণতঃ ব্যক্তি-বিশেষের জীবনাবসানের পরেই তা ইতিহাসের সামগ্রী হয়। আর ঐতিহাসিক জীবন-উপাদানের ওপরে অলৌকিক বিভূতি মণ্ডিত করে প্রাচীন কাব্যে মানব জীবনকে সাহিত্যিক রূপ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মহাপ্রভুর ব্যক্তিত্বের ইতিহাস-দুর্লভ মহিমা তাঁহার জীবদ্দশাতেই প্রত্যক্ষদর্শী-দের অনুভবকে শ্রদ্ধা-বিনত করেছিল ; তাঁর চরিত্রের অতুল্য বৈভব বহু কবির কল্পনাকে করেছিল দীপ্ত-সচল। একদিকে বৈষ্ণব পদাবলীর গৌরচন্দ্রিকা এবং গৌরাঙ্গবিষয়ক কবিতায় সেই লোকোত্তর মানব-মহিমা কীর্তিত হয়েছে,—অজস্র সংগীত ধারায়। অন্যদিকে চৈতন্যের বাস্তব জীবনের প্রতিদিনকার কাহিনী সুখপাঠ্য কথা-সাহিত্যের আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে অসংখ্য জীবনী-কাব্যে। অবশ্য এই সকল কাব্য-কবিতায় মানবের মহিমাকে দেবতার গৌরবে ভূষিত করে চিত্রিত করা হয়েছে। চৈতন্য-পূর্ব বাংলাদেশে কোনো সদ্‌গুণ—কোনো মহৎ বৈভবের অস্তিত্ব-মাত্রই মানুষের মধ্যে কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। সকল সম্ভব-অসম্ভব গুণ ও শক্তির আধার রূপে সেদিন দেবতার বন্দনা করা হয়েছিল। এবারে, চৈতন্য-চরিত্রে সেই অতুল্য শক্তি ও সম্পদ প্রত্যক্ষ করে চৈতন্য-উত্তর বাঙালি মানুষের মধ্যেই দেবগুণকে আবিষ্কার করল। চৈতন্যদেব তাঁর জীবদ্দশাতেই ভগবানের অবতার রূপে পূজিত হতে থাকেন। ফলে, কি গৌর-পদাবলীতে, কি জীবনী-সাহিত্যে,—তাঁর জীবনের চোখে-দেখা ঘটনার সঙ্গে কবির ভগবৎ ধ্যানের আকৃতি যুক্ত হয়ে এক অপূর্ব বিমিশ্র শিল্পরূপ গড়ে তুলেছে। চৈতন্যজীবনী-গ্রন্থে মানুষের দেহে দেবতার বিভা জাগিয়ে তোলার এই শিল্প-প্রয়াস প্রথম থেকেই সুপরিস্ফুট।

চৈতন্য-জীবন ও জীবনী

প্রতীচ্য পারিভাষিক নিরিখে এই শ্রেণীর রচনা hagiography নামে পরিচিত। বিশুদ্ধ তথ্যনিষ্ঠ জীবনী যেমন biography, তেমনি কল্পনা-বিমিশ্র অতিলৌকিক রহস্যজড়িত জীবন-কথার নাম hagiography.— বর্তমান প্রসঙ্গে সবিশেষ স্মরণযোগ্য তথ্য এই যে, চৈতন্য-জীবনীগুলির অলৌকিক চিত্র অনায়াসে পরিহার করেও তাঁর জীবনের বাস্তব ঘটনাবলীর একটি স্পষ্ট মানচিত্র এই সব গ্রন্থ থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। আদর্শ biography রচনার দায়িত্ব অন্ততঃ কয়েকটি চৈতন্য-জীবনী গ্রন্থে পরিত্যক্ত হয় নি।

এই ধরনের প্রথম গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লেখা। লেখক ছিলেন চৈতন্য-পার্ষদ মুরারিগুপ্ত। ইনি মহাপ্রভুর চেয়ে বয়ঃজ্যেষ্ঠ হলেও তাঁর সহপাঠী ছিলেন, তাঁর মূল বসতি ছিল চৈতন্যের পিতৃভূমি শ্রীহট্টে। মুরারি গুপ্তের 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত' সংস্কৃত মহাকাব্যের আকারে লেখা; মহাপ্রভুর অন্ত্য-লীলা পর্যন্ত সম্পূর্ণ জীবন-কথার তথ্যবহুল বর্ণনা রয়েছে এতে। অবশ্য বাস্তব তথ্যের ফাঁকে ফাঁকে কবির কল্পনা চৈতন্য-চরিত্রে আলৌকিক দেব-মহিমারও আরোপ করেছে। মুরারির এই কাব্য পরবর্তী কালের বাংলা চৈতন্য-জীবনী গ্রন্থের প্রায় সব কয়খানির ওপরেই উল্লেখ্য প্রভাব বিস্তার করেছে। 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামেই গ্রন্থখানি সাধারণভাবে পরিচিত। এই কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতমহলে মতপার্থক্য আছে। তবে, চৈতন্য-জীবনকালের সীমায় অথবা তাঁর তিরোভাবের স্বল্পকাল মধ্যেই গ্রন্থরচনা সমাপ্ত হয়েছিল নিঃসন্দেহে।

সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্য-জীবনী

মুরারি গুপ্তের রচনা ছাড়া সংস্কৃত ভাষায় লেখা চৈতন্য-কথাশ্রিত রচনা হিসাবে আরো তিনখানি গ্রন্থ সমুল্লেখ্য। তিনখানিরই লেখক ছিলেন পরমানন্দ সেন;—এঁর উপাধি ছিল কবিকর্ণপূর। পরমানন্দের প্রথম গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মহাকাব্য ১৫৪২ খ্রীস্টাব্দে রচিত হয়। এই গ্রন্থের প্রথম এগারটি সর্গে মুরারি গুপ্তের প্রভাব বহু ব্যাপক। পরমানন্দের দ্বিতীয় রচনা চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে কোনো সময়ে রচিত হয়। মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ কাহিনী থেকে আরম্ভ করে গম্ভীরা-লীলা পর্যন্ত জীবন-কথা এই নাটকের উপজীব্য বিষয়। কর্ণপূরের তৃতীয় গ্রন্থ "গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা"-তে (১৫৭৬ খ্রীঃ) গৌর-প্রবর্তিত ধর্মের দার্শনিক পটভূমি বিস্তৃত

ব্যাখ্যাত হয়েছে। গৌর-পার্ষদগণের সম্পর্কে গ্রন্থটির ঐতিহাসিক তথ্যমূল্যও প্রচুর। কবিকর্ণপূর এই পরমানন্দ ছিলেন গৌড়লীলায় মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শিবানন্দ সেনের পুত্র।

বাংলা চৈতন্য-জীবনী গ্রন্থ

১। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবত

বাংলা ভাষায় প্রথম প্রামাণ্য চৈতন্য-জীবনী লিখেছিলেন বৃন্দাবন দাস। এঁর কাব্যের নাম প্রথমে ছিল চৈতন্য মঙ্গল; পরে সে নাম পরিবর্তন করে নূতন নামকরণ হয় চৈতন্য ভাগবত। এ সম্বন্ধে 'প্রেমবিলাস' নামক বৈষ্ণব ঐতিহাসিক কাব্যে বলা হয়েছে :—

বাংলা ভাষায় প্রথম চৈতন্য-জীবনী

"চৈতন্য ভাগবতের নাম চৈতন্য মঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনে গোস্বামীরা ভাগবত আখ্যা দিল॥"

নূতন নামটি কাব্য-ভাবের পক্ষে সুপ্রযুক্ত হয়েছিল;—কারণ, বৃন্দাবন দাস চৈতন্য-লীলার কাহিনী বিন্যাসে শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণ-লীলা বর্ণনার আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন।

বৃন্দাবনদাসের ব্যক্তি-পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না;—এই কবি আত্ম-প্রকাশে ছিলেন স্বভাব-কুণ্ঠ। কাব্যের মধ্যে তিনি তাঁর জননী এবং গুরুর নামোল্লেখ করেছেন। এর থেকে জানা যায়, নারায়ণী ছিলেন তাঁর মাতা; আর কবি ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর "সর্বশেষ্ ভৃত্য"—অর্থাৎ শেষ জীবনের শিষ্য। নারায়ণী চৈতন্য-পার্ষদ শ্রীবাস পণ্ডিতের "ভ্রাতৃসুতা" ছিলেন।

কবি-পরিচয়

কবির আবির্ভাব কাল সম্বন্ধেও নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। অনুমান করা হয়, ১৫১৮ খ্রীস্টাব্দের নিকটবর্তী কোনো সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন; আর কাব্য-রচনা সমাপ্ত হয়েছিল ১৫৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। মহাপ্রভুর জীবদ্দশায় জন্মে থাকলেও, তাঁর দর্শন লাভে বৃন্দাবন দাস চিরবঞ্চিত হয়েছিলেন। এই ভাগ্যহীনতার কথা তিনি সখেদে উল্লেখ করেছেন,—

"হৈল পাপিষ্ঠ জন্ম নহিল তখনে।
হইয়াও বঞ্চিত সে লীলা দরশনে॥"

তাহলেও বৃন্দাবনের রচনায় মহাপ্রভুর গৌড়লীলার একটি একান্ত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনা পাওয়া যায়; কারণ অন্তরঙ্গতম প্রত্যক্ষদর্শী-দের কাছ থেকে তথ্য আহরণের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। কবি জানিয়েছেন;—নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশেই তিনি চৈতন্য-জীবন-বৃত্তান্ত রচনায় ব্রতী হন। এই রচনা-প্রসঙ্গে সর্বাধিক তথ্য তাঁকে যুগিয়ে ছিলেন স্বয়ং প্রভু নিত্যানন্দ। তাছাড়া জননী নারায়ণী এবং শ্রীবাসাদির কাছ থেকেও বৃন্দাবন কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। গৌড়লীলায় নিত্যানন্দের চেয়ে অন্তরঙ্গ চৈতন্য-পার্ষদের কথা কল্পনাও করা যায় না। নারায়ণীও আবাল্য ছিলেন মহাপ্রভুতে সমর্পিতপ্রাণা; শ্রীবাসের তো কথা নেই। এই কারণে বৃন্দাবনের কাব্যে গৌড়লীলা বর্ণনা যেমন প্রামাণ্য হয়েছে, তেমান হয়েছে পুঙ্খানুপঙ্খ। তাছাড়া, কেবল গৌর-জীবন-কেন্দ্রেই চৈতন্যভাগবতের বর্ণনা একান্ত সীমাবদ্ধ ছিল না। বৃন্দাবনের প্রতিভার মধ্যে ঐতিহাসিকোচিত পরিবেশ-সচেতনতাও ছিল গভীর। ফলে চৈতন্য-লীলার পটভূমি স্বরূপ নবদ্বীপের অবস্থান, এবং সেখানকার সামাজিক ও নৈতিক আচার-অনুষ্ঠানেরও খুঁটি-নাটি পরিচয় তিনি দিয়েছেন। এদিক থেকে চৈতন্য-পূর্ব নবদ্বীপ-বর্ণন বিশেষ মূল্যবান্; তৎকালীন বাংলার সমাজ-জীবনের একটি অখণ্ড প্রতিরূপ যেন চুম্বক আকারে চিহ্নিত হয়েছে তাতে :—

কাব্য-বৈশিষ্ট্য

"নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
বিবিধ বৈসয়ে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী প্রসাদে সভাই মহাদক্ষ॥
সভে মহা অধ্যাপক বলি গর্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য সনে কক্ষা করে॥
নানা দেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়॥
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারসে পায়॥"

আবার লিখেছেন :—

নবদ্বীপে,—"রমাদৃষ্টিপাতে সর্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে॥
কৃষ্ণ নাম ভক্তি-শূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম কর্ম লোক সভে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি পূজয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র-কন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥"

কিন্তু কেবল তথ্যসমাকুল ঐতিহাসিক উপাদানই চৈতন্যভাগবতের একমাত্র সম্পদ নয়। বৃন্দাবনের কবি-দৃষ্টি তাঁর রচনাকে সুঠাম মানব-রসের সিঞ্চনে হৃদ্য করে তুলেছে। বিদ্যালয়-প্রত্যাগত গৌরাঙ্গের রূপ বর্ণনা করে কবি লিখছেন,—

"আর পথে ঘরে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
হাথেতে মোহন পুথি যেন শশধর॥
লিখন কালির বিন্দু শোভে গৌর অঙ্গে।
চম্পকে লাগিল যেন চারি দিকে ভৃঙ্গে॥
জননী বলিয়া প্রভু লাগিল ডাকিতে।
তৈল দেহ মোরে, যাই সিনান করিতে॥

বালক গৌরাঙ্গের দুরন্তপনার বিবৃতি প্রসঙ্গে নিতান্ত সংক্ষিপ্ত একটি বর্ণনা। কিন্তু তাতেই কালি-বিন্দু-বিকম্পিত গৌরমূর্তি যেন জীবন্ত চিত্রিত হয়ে উঠেছে। এখানেই বৃন্দাবনের কবি-কর্মের বৈশিষ্ট্য ;—অনাড়ম্বর সহজ কথায় তিনি হৃদয়-স্পর্শী শিল্প-রচনা করতে পেরেছেন।

তাছাড়া লোকোত্তর ভক্তি-রসের অবতারণাতেও কবির প্রবণতা ছিল আন্তরিক। মহাপ্রভুকে তিনি কৃষ্ণের অবতার বলে বিশ্বাস করতেন। আর সেই কারণে শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণ-লীলার অনুরূপ করেই চৈতন্য-লীলা বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ফলে কৃষ্ণ-জীবন-কথার মতই চৈতন্য-জীবনীতেও বহু

অলৌকিক দৈবী কাহিনীর অবতারণা করেছেন। ভাগবত-পুরাণে দেখি, দেবকীর অষ্টম গর্ভস্থ সন্তান শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করবার জন্যে স্বর্গের দেবতারা কংসের কারাগারে নেমে এসেছিলেন। বৃন্দাবনদাসও চৈতন্যাধার শচীর গর্ভ বন্দনার জন্যে দেবতাদের মর্ত্যে আবির্ভূত করিয়েছেন তাঁর কাব্যে। এই ধরনের অলৌকিক গল্প চৈতন্য-ভাগবতে অজস্র সংখ্যায় রয়েছে। ফলে কোনো কোনো পণ্ডিত এই কাব্যের ঐতিহাসিক প্রামাণ্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এরূপ সন্দেহের কোনো যুক্তি-সংগত কারণ নেই। ইতিহাসের যথার্থ তথ্যকে লোক-হৃদয়ের অন্তরঙ্গ বিশ্বাসের সূত্রে গেঁথে বৃন্দাবন দাস তাঁর জীবনী-কাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু সেই কাব্য-মালিকার সূত্র থেকে মণিকে পৃথক্ করা কঠিন নয়। কবি কখনো তাঁর ভক্তি দিয়ে বাস্তব তথ্যকে আচ্ছন্ন করেন নি। ফলে, মানবিক সত্য-কাহিনীর পাশে পাশে চলেছে অলৌকিক ভক্তিশ্লোকের ধারা। দেখলেই বোঝা যায় কোন্‌টি ইতিহাস এবং কোন্‌টি কাব্য। বৃন্দাবনদাস চৈতন্য-জীবন আশ্রয় করে ইতিহাসাশ্রিত কাব্য রচনা করেছেন,—বাংলা চৈতন্য-জীবনীর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক কবি তিনি।

চৈতন্য-ভাগবতে অলৌকিকতা

অবশ্য প্রামাণ্যতার বিচারে বৃন্দাবনের বর্ণিত গৌড়লীলা অংশই সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য। মুরারি গুপ্তের কড়চার অনুসরণ করে তাঁর কাব্যকেও তিনটি খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে,—আদি, মধ্য এবং অন্ত্যখণ্ডে। আদিখণ্ডে মহাপ্রভুর জন্ম থেকে গয়া গমন পর্যন্ত অংশের বর্ণনা আছে,—মধ্যখণ্ডে আছে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত জীবন-কথা। অন্ত্যখণ্ডটি অসম্পূর্ণ; এতে সন্ন্যাসোত্তর কাল থেকে আরম্ভ করে নীলাচল-বাসের কিছু কিছু কাহিনী বিবৃত হয়েছে। আগেই বলেছি, কেবল গৌড়-লীলা বিষয়েই কবি প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে বিবরণ পেয়েছিলেন। এমন অবস্থায় নীলাচলবাস-কথার বর্ণনায় তাঁকে পরোক্ষ সূত্রের ওপরে অনেকটাই নির্ভর করতে হয়েছিল। এই জন্যে ঐ প্রসঙ্গের অধিকাংশই আবেগ-পূর্ণ কবি-কর্মে ঋদ্ধ। অনেকটা এই কারণেও বৃন্দাবনের নীলাচল-লীলার পরিচয় যেমন সংক্ষিপ্ত, তেম্‌নি হয়েছে অকস্মাৎ-খণ্ডিত। অবশ্য চৈতন্যভাগবতের আকস্মিক অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে অন্যতর তথ্যও জানা

চৈতন্য-ভাগবতের প্রামাণ্য

যায়। শ্রীচৈতন্যের প্রামাণ্যতম জীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এ-বিষয়ে লিখেছেন,—

"নিত্যানন্দ লীলা বর্ণনে হৈল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ॥" [চৈতন্যচরিতামৃত]

চৈতন্যভাগবতের অনেক স্থলে বৃন্দাবনদাস নিজের গুরু নিত্যানন্দকে বন্দনা করেছেন,—নিত্যানন্দলীলা বর্ণনা করতে করতে তিনি মূল প্রসঙ্গকেও অনেক সময়ে বিস্মৃত হয়েছেন। কাব্য-শেষে অনুরূপ গুরু-কথা-বর্ণনায় আবিষ্ট হয়ে পড়ে গৌর-কথার প্রসঙ্গ আর শেষ করে উঠতে পারেন নি কবি। তবু ঐ অ-পূর্ণ কাব্য-কীর্তির জন্যই তিনি "চৈতন্যলীলার ব্যাস" নামে স-শ্রদ্ধায় পরিকীর্তিত হয়েছেন।

২। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল এককালে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রবল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। এতে শ্রীচৈতন্যের জীবনের কয়েকটি অপরিজ্ঞাত সংবাদ এবং সুপরিজ্ঞাত তথ্যের স্থলে নূতন তথ্য সরবরাহের দাবি উপস্থাপিত হয়েছে। মহাপ্রভুর তিরোভাবের কোনো বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা এযাবৎ পাওয়া যায়নি; চৈতন্য ইতিহাসের এটি এক শ্রেষ্ঠ অভাব। যথার্থ সংবাদ সংগ্রহ করতে না পেরে বিভিন্ন জীবনীকার বিচিত্র অলৌকিক গল্পের অবতারণা করেছেন। কেবল জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলেই এ-বিষয়ে একমাত্র বিশ্বাস্য কাহিনীটি পাওয়া যায়। কবি বলেছেন,—

জয়ানন্দের কাব্যের আপাত-বৈশিষ্ট্য

"আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে।
ইটল বাজিল বাম পা'এ আচম্বিতে॥
চরণ বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষ্য টোটায় শরণ অবশেষে॥"

এই বহু-কাম্য তথ্যটি পেয়ে বাংলা সাহিত্যের ভক্ত-ঐতিহাসিক ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন পুলকিত-চিত্ত হয়েছিলেন। অপার আনন্দের বশে তিনি জয়ানন্দের কাব্যকে প্রামাণ্যতম চৈতন্য-জীবনী বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু পরবর্তী বিচারে এই সিদ্ধান্ত যথার্থ মনে হয়নি। ঐ একটি প্রসঙ্গ ছাড়াও অন্যান্য উপলক্ষ্যে জয়ানন্দ আরো কিছু কিছু নূতন তথ্য-জানিয়েছেন। কিন্তু

চৈতন্যের পিতৃভূমি, তাঁর পূর্ব-পুরুষের মূল অবস্থান, ইত্যাদি বিষয়ে জয়ানন্দের তথ্য প্রামাণ্য নয় বলে জানা গেছে। এমন অবস্থায় বিশ্বাস্য হলেও চৈতন্যের তিরোভাব-সম্বন্ধীয় কাহিনী কবির কপোল-কল্পিত কিনা, অসংশয়ে বলা চলে না।

আসল কথা, চৈতন্যের জীবনী অবলম্বন করে জয়ানন্দ লোক-বিমোহন কাব্য রচনা করতে চেয়েছিলেন,—ঐতিহাসিক সত্যাসত্য নিরূপণের কোনো আকাঙ্ক্ষাই তাঁব ছিল না। চৈতন্য-জীবনীর একজন পেশাদার গায়েন ছিলেন তিনি। কাব্যের কাহিনী যত অভিনব ও বিস্ময়কর হবে, তাঁর উপার্জনও ততই বৃদ্ধি পাবে। এই উদ্দেশ্যে, নিছক চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্যই তিনি সুযোগ বুঝে চৈতন্য-জীবন নিয়ে অভিনব সব কাহিনীর মালা গেঁথেছেন,—সচেতন কৌশলে সে-সব গল্পকে করে তুলেছেন বিশ্বসনীয়। উদ্দেশ্যগত এই দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য রেখে জয়ানন্দের কাব্যেব কোনো নূতন তথ্যকে নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করতে পারা কঠিন। অন্যপক্ষে গীত হবার জন্যে রচিত হয়েছিল বলে কাব্যটি অনেকটা মঙ্গলকাব্যের আকারে লেখা এবং পালাগানের আকারে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত।

জয়ানন্দের কবি-স্বভাব

কাব্যমধ্যে প্রাপ্ত আত্মবিবরণী থেকে জানা যায়,—বর্ধমান জেলার আমাইপুরা গ্রামে কবির জন্ম হয়েছিল। তাঁর পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র এবং মা ছিলেন রোদনী। কবির পিতৃদত্ত নাম ছিল গুইঞা। কবির এক বছর বয়সে মহাপ্রভু নাকি সুবুদ্ধি মিশ্রের অতিথি হয়েছিলেন এবং তিনি স্বয়ং শিশু-কবির নূতন নাম রাখেন জয়ানন্দ। জয়ানন্দের কাব্য ষোড়শ শতকের শেষভাগে রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

ব্যক্তি-পরিচয় ও রচনাকাল

৩। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল

জয়ানন্দের কাব্যের মতই লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলও মূলতঃ পালাগান হিসেবে কল্পিত হয়েছিল। কিন্তু লোচনের চৈতন্য-নিষ্ঠা অকৃত্রিম ছিল। তাই, মহাপ্রভুর ব্যক্তি-জীবন-কথার ওপরে কল্পনার তুলি তিনি যদিও বুলিয়েছেন, তবু কোথাও সে-কল্পনাকে সত্য বলে চালাবার চেষ্টা করেন

নি। অপর পক্ষে কবি-মনের ভাবনাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বাস্তব তথ্যকেও লোচন আচ্ছন্ন করে ফেলেন নি কোথাও। তাঁর কাব্যের কাহিনী-বিন্যাস এবং শিল্প-রচনার সকল অভিনবতার মূলে রয়েছে কবির নিষ্ঠা-পূত পরিকল্পনা এবং তাঁর গুরু-গত বিশ্বাসের স্বতন্ত্রতা।

কাব্য-পরিচয়

লোচনদাস ছিলেন মহাপ্রভুর পার্ষদ নরহরি ঠাকুরের শিষ্য। আর নরহরি ছিলেন 'গৌর-নাগরিয়া' ভাবের প্রবর্তক। গৌরকে 'নাগর'ভাবে ভজনা করা, তথা,—ব্রজগোপীরা যে ভাবে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণ-ভজনা করেছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই মহাপ্রভুর স্বরূপ আস্বাদন করা নরহরির প্রবর্তিত সাধনের মুখ্য কথা। অথচ, চৈতন্য-অবতারে নারী-সংস্পর্শ সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছিল, এইটিই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের সাধারণ ধারণা। ইতিহাসের তথ্যও এই সিদ্ধান্তের পোষকতা করে। তাহলেও লোচন গুরুর প্রবর্তিত বিশ্বাসের অনুসরণ করে মহাপ্রভুর জন্ম এবং বিবাহ-প্রসঙ্গে নবদ্বীপ-নারীগণের দেহ-মনোগত বিভঙ্গের অভিনব চিত্র এঁকেছেন। মাঝে মাঝে কল্পনার সৌষ্ঠবে তিনি একটি-দুটি মুহূর্তকে গীতি-কবিতার সুষমায় মণ্ডিত করেছেন। কিন্তু সেই কবি-কর্মের মর্যাদা রাখবার জন্য কোথাও তথ্যকে আচ্ছন্ন হতে দেন নি।

কবি মনোভাব

লোচনের চৈতন্যমঙ্গল বৃন্দাবনদাসের কাব্যের পরে এবং জয়ানন্দের প্রায় সম-সময়ে রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। কবি স্বয়ং গ্রন্থমধ্যে বৃন্দাবনের ঋণ স্বীকার করেছেন। তাছাড়া, মুরারি গুপ্তের কড়চার কাহিনী-পরিকল্পনার দ্বারাও কবি প্রভাবিত হয়েছিলেন। অবশ্য আগাগোড়া কাব্যই পাঁচালীর আকারে গীত হবার জন্যে লিখিত।

রচনাকাল

কবির ব্যক্তি-পরিচয় সম্বন্ধে জানা যায়,—তাঁর বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলার কোগ্রামে,—পিতা ছিলেন কমলাকর দাস, সদানন্দী,—পাঠান্তরে, অরুন্ধতী ছিলেন কবি-জননী। এঁরা বৈদ্যবংশীয় ছিলেন।

কবি-পরিচয়

৪। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত চৈতন্যজীবনীর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ; শুধু তাই নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই মহাগ্রন্থ প্রায় তুলনারহিত। মহাপ্রভুর জীবনের প্রামাণ্য ইতিহাস এতে লিপিবদ্ধ হয়েছে,—বৈষ্ণব নিষ্ঠা-ভক্তির পরাকাষ্ঠা ধরেছে কাব্য-রূপ। সবচেয়ে বড় কথা, দার্শনিক পাণ্ডিত্য ও মননে এমন সমৃদ্ধ রচনা বাংলা ভাষায় আর নেই। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন,—"একাধারে ইতিহাস, দর্শন ও কাব্যের এমন অপরূপ সমন্বয় আর কোন দেশের সাহিত্যে দেখা গিয়াছে কিনা সন্দেহ।"

চৈতন্যচরিতামৃতের অতুল্যতা

কৃষ্ণদাসের সুবৃহৎ কাব্যে তাঁর ব্যক্তি-পরিচয় সামান্যই উদ্ধৃত হয়েছে। কবি জানিয়েছেন,—তাঁব বাড়ি ছিল নৈহাটির কাছে ঝামটপুর গ্রামে। পণ্ডিতেরা অবশ্য এখন স্থির করেছেন, ঝামটপুর ছিল বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে। যাই হোক, ত্রিশ বছরের নিকটবর্তী সময়ে কবি একদিন স্বপ্নে নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রত্যক্ষ করেন এবং তাঁর আদেশেই বৃন্দাবন-যাত্রা কবেন। বৃন্দাবনে তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মহাপীঠ রচিত হয়েছে। মহাপ্রভুর তিরোধানের পরে প্রখ্যাততম ষড়্ গোস্বামী এবং তাঁদের সর্বভারতীয় ভক্ত-পণ্ডিতেরা মিলে চৈতন্য-জীবন-বাণীকে দর্শন, ধর্মশাস্ত্র ও কাব্যালংকার শাস্ত্রের পটভূমিতে প্রকাশিত করছিলেন। নিত্যানন্দের কাছে স্বপ্নাদেশ পেয়ে কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে এসে এই ষড়্ গোস্বামীর চরণাশ্রিত হলেন। ছয় জন গোস্বামি-প্রধানের মধ্যে চার জন ছিলেন বাঙালি,—আর দুজন এসেছিলেন দক্ষিণ দেশ থেকে। এঁরা হচ্ছেন দুই ভাই রূপ ও সনাতন; তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব, আর ছিলেন রঘুনাথ দাস। দক্ষিণী গোস্বামী দু'জন হচ্ছেন রঘুনাথ ভট্ট ও গোপাল ভট্ট। বৃন্দাবনে পৌঁছে কৃষ্ণদাস রূপ ও সনাতনের কাছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। এঁদের তিরোধনের পর তিনি রঘুনাথ দাসের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। অনেকে মনে করেন কৃষ্ণদাস রঘুনাথ ভট্টের কাছে দীক্ষাও নিয়েছিলেন।

কবি-পরিচয়

চৈতন্যধর্মের প্রতি কৃষ্ণদাসের নিষ্ঠা যেমন ছিল আ-মূল, তেমনি বিশুদ্ধ

জ্ঞানের প্রতিও ছিল তাঁর আন্তরিক আগ্রহ। তাই অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সে পৌঁছালেও তরুণ পড়ুয়ার মত তিনি সর্বশাস্ত্র মন্থন করেছিলেন ধ্যানীর একান্ততা নিয়ে। সকল চেষ্টারই লক্ষ্য ছিল অনন্য,—চৈতন্য ধর্মের নিঃশেষ অধিকার অর্জন। কৃষ্ণদাসের পূর্বে সংস্কৃত, বাংলা এবং অপরাপর ভারতীয় ভাষাতেও চৈতন্য-জীবনী গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের কোনোটিতেই মহাপ্রভুর শেষ বারো বছরের নীলাচলবাসের কাহিনা সু-বিবৃত হয় নি। অথচ বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে ঐ সময়কার লীলা-কথাই সবচেয়ে লোভনীয়; কারণ মহাপ্রভুর প্রায় প্রতিটি দিন তখন বাহ্যজ্ঞানরহিত দিব্যোন্মাদ আবেশে অতিবাহিত হত,—রাধাকৃষ্ণ-রতির পরা-মূর্তি ধারণ করেছিলেন তিনি তখন। এই কারণে বৃন্দাবনের গোস্বামী ও মহাজনেরা বিশেষ করে মহাপ্রভুর শেষ বারো বছরের জীবন-বৃত্তান্ত রচনার জন্যে কৃষ্ণদাসকে অনুরোধ করেছিলেন। এ-বিষয়ে তথ্য আহরণের দুর্লভ সুযোগও তিনি পেয়েছিলেন। রঘুনাথ দাস মহাপ্রভুর তিরোভাব-পূর্ব লীলার অতি অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিলেন। রঘুনাথ যখন ছিলেন না, তখনও নীলাচল-লীলায় নিত্য-সঙ্গী ছিলেন তাঁর গুরু স্বরূপ দামোদর। অতএব, চৈতন্যের শেষ জীবনের দুর্লভতম তথ্যেরও সন্ধান জানা ছিল দাস রঘুনাথের। আর কৃষ্ণদাস ছিলেন তাঁর পরিকর; বলা বাহুল্য এই মহত্তম সুযোগের সদ্ব্যবহারও তিনি করেছেন।

কবি-প্রতিভা

কিন্তু, সহজলভ্যকে নিয়ে কৃষ্ণদাস সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি; তাঁর চৈতন্যনিষ্ঠা তাঁকে দুরবগাহ জ্ঞানের তপস্যায় নিমগ্ন করেছিল। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ থেকে ব্যাকরণ, দর্শন, স্মৃতি-শ্রুতির এমন অনিঃশেষ অধিকার একজন ব্যক্তির মধ্যে পুঞ্জীভূত হতে পেরেছিল ভেবেও বিস্মিত হতে হয়। আর কবি এই সর্বশাস্ত্র-মন্থন-করা জ্ঞানামৃত আহরণ করেছিলেন একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষায়।—চৈতন্য-জীবনী,—তাঁর জীবন-বাণী, তথা মহাপ্রভুর প্রবর্তিত ধর্ম-শাস্ত্রকে তিনি তর্কাতীত শ্রেষ্ঠতার মহামর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

চৈতন্যচরিতামৃতে ঐতিহাসিকের তথ্য-প্রমাণ, দার্শনিক পণ্ডিতের শাস্ত্র বিচার এবং একনিষ্ঠ ভক্তের কবি-প্রাণতার ত্রিবেণী-তীর্থ রচিত হয়েছে। গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে কবি জানিয়েছেন :—

"শাকে সিন্ধ্বগ্নি বাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্যেঽহ্ন্যসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥"

অর্থাৎ, ১৫৩৭ শক, তথা, ১৬১৫ খ্রীস্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণা পঞ্চমী রবিবার দিন বৃন্দাবনে চৈতন্যচরিতামৃত মহাগ্রন্থ রচনা শেষ হয়েছিল। কবি কৃষ্ণদাস পূর্বসূরীদের মতই চৈতন্য-জীবন-কথাকে তিনটি ভাগে বিন্যস্ত করে প্রকাশ করেছেন। আদিলীলায় মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত কাহিনী বিবৃত হয়েছে,—তাতে পরিচ্ছেদ সংখ্যা সতেরটি। মধ্যলীলায় পঁচিশটি পরিচ্ছেদ আছে। সন্ন্যাস গ্রহণের পরে মহাপ্রভু দুই দফায় ভারত ভ্রমণ করেছিলেন প্রায় ছয় বছর ধরে। প্রথম বারে গিয়েছিলেন দক্ষিণে, দ্বিতীয় বার কাশী-বৃন্দাবনসহ পশ্চিম ভারতে। মধ্যলীলায় এই ছয় বৎসরের ভ্রমণ-কথা বর্ণিত হয়েছে। অন্ত্যলীলাখণ্ডের কুড়িটি পরিচ্ছেদ-ব্যাপী প্রধানভাবে মহাপ্রভুর নীলাচল বাসের অন্তরঙ্গ-লীলার শিল্প-রূপ রচনা করেছেন ভক্ত-কবি কৃষ্ণদাস। কিন্তু, চৈতন্য-জীবনের তথ্য পরিবেশন করাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। আগেই বলেছি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তর্কাতীত মহিমার প্রতিষ্ঠাই চৈতন্যচরিতামৃতের মহত্তম কীর্তি;—দার্শনিক বিচার-সিদ্ধান্তের পরাকাষ্ঠাতেই কবিরাজ-গোস্বামীর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ। তাই, প্রত্যেক লীলা-খণ্ডেই দার্শনিক আলোচনা ও শাস্ত্রীয় বিচার-প্রসঙ্গ ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। আদি-লীলার সতেরো পরিচ্ছেদের মধ্যে প্রথম নয়টি সম্পূর্ণই এই উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়েছে। তাছাড়া, নিতান্ত বৃদ্ধ বয়সে কৃষ্ণদাস চৈতন্য-চরিত-কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাই, ভয় ছিল, অন্ত্যলীলা বর্ণনা শেষ হবার আগেই যদি তাঁর জীবনান্ত ঘটে! অথচ, ঐটুকুই ছিল কাব্য-রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই কারণে, কবি আদি লীলাংশেই মহাপ্রভুর অন্ত্য জীবনের অন্তরঙ্গ লীলা একবার সূত্রাকারে ব্যাখ্যা করে নিয়েছিলেন। মধ্য এবং অন্ত্য-লীলাখণ্ডেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের পটভূমি এবং যৌক্তিকতা ব্যাখ্যাতে দীর্ঘ অংশ ব্যয়িত হয়েছে। এই সব আলোচনায় কৃষ্ণদাসের পাণ্ডিত্য প্রায় নিরবধি। এই কল্পনাতীত ব্যাপ্তির একটি সামান্য উদাহরণ হিসাবে বলা চলে, কবি তাঁর বাংলা কাব্যে ১০১১ বার সংস্কৃত বা প্রাকৃত শ্লোক উদ্ধার করেছেন।

কাব্য রচনার কাল

কবি-পরিচয়

কোনো কোনো শ্লোক একবারের বেশিও উদ্ধৃত হয়েছে; তাই নতুন শ্লোকের মোট সংখ্যা আছে ৭৬৩টি। তার ১০১টি স্বয়ং কবির রচনা; বাকি ৬৬২টি বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

(তা হলেও, দার্শনিক মূল্যই কৃষ্ণদাসের মহাগ্রন্থের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়; তার ঐতিহাসিক মূল্য বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ-বিধির বৈশিষ্ট্যে অনন্য। প্রথমত, চৈতন্য-জীবনের শেষ বারো বছরের প্রামাণ্য তথ্য কেবল চৈতন্যচরিতামৃততেই পাওয়া যায়। তাছাড়া, অন্যান্য পূর্ব-কবিদের রচনায় যেসব তথ্য যথাযথ উপস্থাপিত হয় নি, কিংবা যে-সব তথ্য বাদ পড়েছে, তার অনেকখানির পাদপূরণ করেছেন কবি কৃষ্ণদাস। অথচ, এই সব বিতর্কিত প্রসঙ্গেই, তথ্য বর্ণনার প্রতি পদক্ষেপে তিনি নিঃসংশয় প্রমাণ-সূত্রাদি উল্লেখ করেছেন। কার কাছে, কি ভাবে কোন্ তথ্য আহৃত হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। অথচ, অপার বিনয়-বশে নূতন তথ্য আবিষ্কার বা পরিবেশন করার গৌরব কখনো দাবি করেন নি। তিনি মহাপ্রভুর গৌড়লীলা বর্ণনা করলে বৃন্দাবনদাসের কাব্যের মর্যাদা হানি হতে পারে, [অথচ ঐ অংশের ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা স্বীকারযোগ্য] এ-কথা ভেবে কেবল পূর্বসূরীর মর্যাদা-বৃদ্ধির জন্য কৃষ্ণদাস নিজে সে-অংশের বিস্তারিত আলোচনাই করেন নি; সূত্রাকারে বিবৃতিমাত্র উপস্থিত করে বিরত হয়েছেন।

কবি-কর্মে ঐতিহাসিক কীর্তির স্বরূপ

চৈতন্যচরিতামৃতের সাহিত্যগত উৎকর্ষই সর্বাপেক্ষা দুর্বল। সৃষ্টির ক্ষেত্রে কৃষ্ণদাস প্রধানতঃ ছিলেন জ্ঞানযোগী। একনিষ্ঠ ভক্তের সহজ ভাবানুভূতি তাঁর রচনার স্থানে স্থানে উদ্বেলিত হয়েছে; এবং গোটা কাব্যে অনুরূপ অংশ খুব কম নয়। তা হলেও, তাঁর লেখনী ছিল দার্শনিকের ভাবচিন্তায় ধ্যান-তন্ময়;—ধীর-মন্থর। বৃন্দাবনদাস যেমন তাঁর কাব্যে সহজাত অনুভূতিকে নিরাবরণ ভাষায় প্রকাশ করেও স্বভাব-কবিতার সৃষ্টি করেছেন, কৃষ্ণদাসের পক্ষে তা সম্ভব হয় নি। তাঁর প্রকাশ আবেগাকুল মুহূর্তেও চিন্তা-ভার-মন্থর।

তবু, ডঃ সুকুমার সেনের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত অস্বীকার করার উপায় নেই,—"চৈতন্য-চরিত হিসাবে কি ঐতিহাসিক তথ্য, কি রসজ্ঞতা, কি দার্শনিক তত্ত্ব-বিচার, সব দিক দিয়াই চৈতন্যচরিতামৃত শ্রেষ্ঠ।"

৫। গোবিন্দদাসের কড়চা

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের মতই 'গোবিন্দদাসের কড়চা'ও চৈতন্যচরিত কাব্যের ইতিহাসে একদা প্রবল কৌতুহলের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু, প্রথম কৌতুহলীদের প্রত্যাশা কাব্যটি শেষ পর্যন্ত পূরণ করতে পারে নি। ডঃ দীনেশচন্দ্র এই গ্রন্থটিকেই বাংলা ভাষায় চৈতন্যের প্রাচীনতম জীবনীগ্রন্থ বলে নির্দেশ করেছিলেন। কাব্যটির যে গুণে তিনি প্রধানতঃ মুগ্ধ হয়েছিলেন, তা হচ্ছে চৈতন্যচরিতের দুর্জ্ঞেয় তথ্যের প্রামাণ্য উপস্থাপন। কবি দাবি করেছেন, মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে তিনি সঙ্গী হয়েছিলেন। কড়চাতে ঐ সময়কার তথ্য দিনলিপির আকারে লিখিত। এদিক থেকে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের এটিই একমাত্র প্রামাণ্য বর্ণনা; এই জন্যেই ডঃ দীনেশচন্দ্রের উৎসাহ ছিল অত প্রবল।

গোবিন্দ দাসের কড়চা

কিন্তু দীনেশচন্দ্রের কোনো সিদ্ধান্তই বিচারে টেঁকেনি। গ্রন্থ-বিষয়ের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়,—কড়চাটি একেবারে সম্পূর্ণই জাল যদি না হয়, তবু তাতে প্রক্ষেপের ভার এত জমেছে যে, প্রামাণ্য তথ্যের ছিঁটে ফোঁটা খুঁজে বার করাও দুষ্কর।

গোবিন্দদাস তাঁর জীবন-কথা সম্বন্ধে জানিয়েছেন,—জাতিতে তিনি কর্মকার ছিলেন; বাড়ি ছিল বর্ধমানের কাঞ্চনপুরে। তাঁর বাবার নাম ছিল শ্যামদাস কর্মকার; মা ছিলেন মাধবী। কবি-পত্নী শশিমুখী ছিলেন পরুষ-স্বভাবা। স্ত্রীর হাতে একদিন লাঞ্ছিত হয়ে কবি মনের দুঃখে গৃহত্যাগ করেন। কাটোয়ায় পৌঁছে তিনি চৈতন্য-মহিমা জ্ঞাত হন,—এবং নবদ্বীপে গিয়ে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেন। তখন থেকে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় পর্যন্ত তিনি মহাপ্রভুর পরিচারক হয়েছিলেন। দক্ষিণাপথ থেকে নীলাচলে ফিরে আসবার মুখে প্রভুই তাঁকে অদ্বৈত প্রভুর কাছে শান্তিপুরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তার আগে গোবিন্দ তাঁর চৈতন্য-সান্নিধ্য-কালের স্মৃতি-কথা 'কড়চা' বা দিনলিপির আকারে লিখে রেখেছিলেন। শান্তিপুর গমনের মুখে এসে কড়চাটি খণ্ডিত হয়ে আছে।

ইতিহাস হিসেবে গোবিন্দের এই কড়চা-কাব্য যেমন নির্ভর-যোগ্য নয়,—কাব্য হিসেবেও তেমনি তা অনুৎকৃষ্ট।

৬। চূড়ামণিদাসের গৌরাঙ্গবিজয়

চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়ে'র সন্ধান আবিষ্কার করেছেন ডঃ সুকুমার সেন। তিনখণ্ডে কাব্য সমাপ্ত করার পরিকল্পনা গ্রন্থারম্ভেই কবি দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু, এসিয়াটিক সোসাইটিতে কেবল প্রথমখণ্ডেরই একখানি মাত্র পুঁথি পাওয়া গেছে।

চূড়ামণিদাস ও গৌরাঙ্গবিজয়

চূড়ামণিদাস ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। নিত্যানন্দের কাছে স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি গ্রন্থ-রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন। শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ এবং মাধবেন্দ্রপুরী সম্বন্ধে কিছু কিছু নূতন খবর এই কাব্যে পাওয়া যায়। ডঃ সেন জানিয়েছেন,—গৌরাঙ্গবিজয় কাব্য ষোড়শ শতকে রচিত হয়েছিল ; আলোচ্য পুঁথিটি অবশ্য সপ্তদশ শতকে লেখা।)

অন্যান্য বৈষ্ণব-জীবনী-গ্রন্থ

মহাপ্রভুকে আশ্রয় করে বাংলা সাহিত্যে যে মানব-কথা-রচনার ধারা সূচিত হয়েছিল, তারই ঐতিহাসিক পরিণতি লক্ষ্য করি অন্যান্য বৈষ্ণব জীবনী-গ্রন্থ রচনার ধারায়। মহাপ্রভুকে দেবতার অবতার বলে বিশ্বাস করেই বৈষ্ণব কবিরা প্রথমে তাঁর জীবনী-রচনায় বৃত হয়েছিলেন। ক্রমে তাঁদের মানবিক কৌতূহল চৈতন্য-পার্ষদ ও পরবর্তী বৈষ্ণব মনুষ্য-মহিমার প্রতি আকৃষ্ট হয় ; আরো পরে বৈষ্ণবতার ইতিহাস রচনায় তাঁদের আগ্রহ জন্মে। এমনি করে মহাপ্রভুর অলৌকিক মনুষ্যত্ব-প্রীতির পথ বেয়ে বাংলা সাহিত্য ক্রমশঃ নেমে এল সহজ মানবতার রাজপথে।

ঐতিহাসিক তাৎপর্য

চৈতন্য-পার্ষদদের মধ্যে অদ্বৈত আচার্যকে নিয়েই বেশি সংখ্যক জীবনী-কাব্য লেখা হয়েছে। এঁদের মধ্যে প্রথমে উল্লেখ্য ঈশান নাগরের লেখা অদ্বৈত প্রকাশ। কবির মূল বাস ছিল শ্রীহট্টের লাউড়ে। পাঁচ বছর বয়সে তিনি তাঁর মা'র সঙ্গে শান্তিপুরে আসেন এবং অদ্বৈত প্রভুর আশ্রয় লাভ করেন। মাতা-পুত্র দুজনেই আচার্যের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। ঈশানের শ্রেষ্ঠ গৌরব,—তিনি মহাপ্রভুর দর্শন-লাভ করেছিলেন,—তাঁর পদ-সংবাহনেরও অধিকার পেয়েছিলেন।

অদ্বৈতপ্রকাশ

মৃত্যুর পূর্বে অদ্বৈত আচার্য ঈশানকে শ্রীহট্টে ফিরে গিয়ে চৈতন্য-লীলা প্রচারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আরো পরে,—প্রায় সত্তর বছর বয়সে কবি দার-গ্রহণ করেছিলেন,—অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবীর আদেশে।

অদ্বৈত প্রকাশের রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিত মহলে মতভেদ রয়েছে। ইদানীন্তন কালে কাব্যটির কোনো পুঁথিও আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে, মূল রচনার অস্তিত্ব সম্পর্কেও সন্দেহ উত্থাপিত হয়েছে। মুদ্রিত কাব্যই এখন ইতিহাস-আলোচকের একমাত্র ভরসা। তাতে কিছু কিছু নূতন তথ্য আছে। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটেছিল এই প্রচলিত জনশ্রুতিটিরও উৎস মুদ্রিত অদ্বৈতপ্রকাশ। কিন্তু এসব তথ্যের প্রামাণ্য সম্পর্কে আজ আর নিঃসন্দিগ্ধ হবার উপায় নেই।

হরিচরণ দাস অদ্বৈত-জীবনীর আর একজন কবি,—তাঁর কাব্যের নাম অদ্বৈত-মঙ্গল। ইনিও শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন। অদ্বৈত প্রভুর শেষ বয়সের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন তিনি। ফলে, তাঁর বাল্যজীবন সম্বন্ধে কবির কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না। বিজয়পুরী নামে প্রভুর এক জ্ঞাতি-মাতুলের কাছ থেকে তিনি এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।

অদ্বৈত মঙ্গল

হরিচরণের কাব্যে কিছু কিছু নূতন খবর পাওযা যায়। এরূপ একটি মূল্যবান্ তথ্য হচ্ছে,—মহাপ্রভু নাকি নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতকে নিয়ে শান্তিপুরে একবার দানলীলার অভিনয় করেছিলেন। নবদ্বীপে দানলীলা অভিনয়ের সংবাদ একাধিক চৈতন্য-চরিতে রয়েছে। কিন্তু, শান্তিপুরের অভিনয়-কাহিনীর কথা কেবল হরিচরণই উল্লেখ করেছেন। এইরূপ আরো কিছু কিছু নূতন খবর সরবরাহ করা ছাড়া অদ্বৈতমঙ্গলের উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য আর কিছু নেই।

নরহরি দাসের অদ্বৈত-বিলাস-এ আচার্যের বাল্যলীলার কাহিনীই কেবল আলোচিত হয়েছে। এই কাব্য সতেরো অথবা আঠারোর শতকে লিখিত হয়েছিল।

অদ্বৈত-বিলাস

অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবীর জীবনী নিয়ে লেখা দুখানি সংক্ষিপ্ত কাব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রথমখানি লোকনাথ দাসের 'সীতাচরিত্র'। এই কাব্যে বৃন্দাবন দাস এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের উল্লেখ আছে,—তাঁদের

রচনা থেকেও উদ্ধৃতি রয়েছে। এর থেকে মনে হয়, কাব্যটি চৈতন্য-চরিতামৃতের পরের লেখা। এই কাব্যের উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। সীতাদেবী ও তাঁর দুই শিষ্যা নন্দিনী আর জাঙ্গলীর অলৌকিক মাহাত্ম্যের কীর্তন করা হয়েছে প্রায় আগাগোড়া।

সীতাচরিত্র

'সীতাগুণ-কদম্ব' রচনা করেছিলেন সীতাদেবীর এক শিষ্য বিষ্ণুদাস আচার্য। ফুলিয়ার কাছে বিষ্ণুপুরে কবির নিবাস ছিল; পিতার নাম মাধবেন্দ্র আচার্য। কাব্যের রচনা-আরম্ভ কাল ১৪৪৩ শকাব্দ। পণ্ডিতেরা অবশ্য এই তারিখের প্রামাণ্য নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে থাকেন।

সীতাগুণ-কদম্ব

চৈতন্য-পরিকর ছাড়া আরো যে সকল বৈষ্ণব মহাজনকে নিয়ে জীবনী-কাব্য রচিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে সমুল্লেখ্য শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ। মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরে বাংলাদেশে প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্মের ক্রমবিনষ্টি দেখা দিয়েছিল। আলোচ্য যুগন্ধর তিনজন বৃন্দাবনে গোস্বামিগণের কাছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম-শাস্ত্রে বিশেষ দার্শনিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। সহজ-ভক্তির সঙ্গে বিদগ্ধ পাণ্ডিত্যের যোগসাধন করে তাঁরা সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলায় চৈতন্য-ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। বৃন্দাবনে গোস্বামিগণ প্রবর্তিত দার্শনিকতার আলোকে বঙ্গভূমিতে চৈতন্য-ধর্মের প্রতিষ্ঠা বিধানের পথিকৃৎ এঁরা। বিশেষ করে শ্রীনিবাস আচার্যই বৃন্দাবনে রচিত বৈষ্ণবশাস্ত্রের দুর্লভ পুঁথিসমূহ বাংলাদেশে বয়ে এনেছিলেন। বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্মের নব প্রবর্তয়িতা হিসেবে শ্রীনিবাসকে মহাপ্রভুর অবতার বলে কল্পনা করা হয়েছে। নরোত্তম এবং শ্যামানন্দ শ্রীনিবাসের সঙ্গীই শুধু ছিলেন না; স্বতন্ত্রভাবে তাঁরাও এই নবধর্ম প্রবর্তনের সফল সাধনা করেছিলেন।

চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবধর্মে ত্রয়ী

মহাপ্রভুর জীবদ্দশাতেই শ্রীনিবাসের জন্ম হয়, কিন্তু মহাপ্রভুর দর্শনলাভ ঘটেনি তাঁর জীবনে। নরহরি সরকারের প্রভাবে ইনি বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং চৈতন্য-দর্শনের আশায় নীলাচল যাত্রা করেন। কিন্তু পথেই খবর পান,—মহাপ্রভু তিরোহিত হয়েছেন। পরে তিনি বৃন্দাবনে গোস্বামীদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীজীব তাঁকে ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা দেন। বৃন্দাবন থেকে ফিরে আসবার পথে গোস্বামিগণ ও অপরাপর মহাজনদের

লেখা বহুমূল্য গ্রন্থরাজির মূলপুঁথি শ্রীনিবাস গাড়ি বোঝাই করে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। বাঙালির শিথিল ভক্তি-চেতনাকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করে তোলাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। পথে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের অনার্য রাজা বীর হাম্বীরের চরেরা গাড়ি লুঠ করে সকল অমূল্য গ্রন্থ কেড়ে নেয়। লুণ্ঠিত পুস্তক-ভাণ্ডারের মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতেরও মূল পুঁথিখানি ছিল। সারাজীবনের দুঃসহ সাধনার অমর কীর্তি বিনষ্ট হয়েছে জেনে, শোকার্ত বৃদ্ধ কবিরাজ-গোস্বামী দেহত্যাগ করেন। অবশ্য এই প্রচলিত লোক-কথার সত্যতা বিষয়ে পণ্ডিতেরা অধুনা সংশয় প্রকাশ করে থাকেন। যাই হোক্, শ্রীনিবাস এমন অ-পূর্ব জ্ঞান-সম্পদ্‌কে যথার্থ-ই নষ্ট হতে দেন নি। বীর হাম্বীরের অরণ্য-রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, ক্রমশঃ রাজা এবং রাজ্যের হৃদয় জয় করলেন তিনি; হিংস্র দস্যু-নেতা বৈষ্ণব-ভক্তির অহিংস প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। শ্রীনিবাস সমস্ত পুঁথিপত্র আবার গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে ফিরে এলেন সমতল বাংলার মাটিতে। প্রবল উদ্দীপনা নিয়ে আরম্ভ করলেন বৈষ্ণব ধর্মের পুনঃপ্রচার। তাঁর প্রখ্যাত শিষ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদকর্তাও কয়েকজন ছিলেন।

শ্রীনিবাস

এবারে নরোত্তম-প্রসঙ্গ। এঁর বাড়ি ছিল রাজসাহী জেলার খেতুরীতে। প্রখ্যাত জমিদার বংশের সন্তান ছিলেন নরোত্তম,—চৈতন্য-প্রেমে বৈরাগ্য গ্রহণ করেন। শ্রেষ্ঠ পদকর্তাও ছিলেন তিনি। তাছাড়া—বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম পুনঃ প্রবর্তনেরও একজন শ্রেষ্ঠগুরু যে তিনি ছিলেন, সে কথা বলেছি। এ বিষয়ে তাঁর সুমহৎ কীর্তি "খেতুরীর মহোৎসব"। ষোড়শ শতকের একেবারে শেষ অথবা সপ্তদশ শতকের সুরুতে কোনো সময়ে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নিজের পিতৃভূমিতে ছয়টি দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে নরোত্তম যে বৃহৎ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন, বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে তা অনন্যতুল্য। সেকালের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি, ধর্মগুরু এবং মহাপুরুষেরা প্রায় সকলেই এই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন।

নরোত্তম

শ্যামানন্দের বাসভূমি ছিল মেদিনীপুরের দণ্ডেশ্বর গ্রামে। তাঁর বাবা ছিলেন কৃষ্ণমণ্ডল, মা দুরিকা। বৃন্দাবনে গিয়ে তাঁর নূতন নামকরণ হয় শ্যামানন্দ। বৃন্দাবনের আদর্শে বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মের পুনরুজ্জীবনে তাঁরও এক প্রধান ভূমিকা ছিল।

শ্যামানন্দ

শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ এই ত্রয়ীকে নিয়ে যাঁরা জীবনীকাব্য রচনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছিলেন নরহরি চক্রবর্তী। ইনি বহু গ্রন্থের লেখক। তাঁর প্রায় সকল রচনার কেন্দ্রেই ছিলেন গুরু নরোত্তম।

ভক্তি-রত্নাকর

নরহরির গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা ভক্তি-রত্নাকর; একাধারে শ্রেষ্ঠ মহাজন-জীবনী এবং বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপক ইতিহাস হিসেবে গ্রন্থখানি অমূল্য। সুদীর্ঘ পনেরোটি তরঙ্গ বা অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থে বিচিত্র প্রসঙ্গাবলী বর্ণিত রয়েছে। যথা,—জীবগোস্বামীর পূর্বপুরুষদের কথা, বৃন্দাবনের গোস্বামীদের গ্রন্থ-পরিচিতি, শ্রীনিবাস আচার্য ও তাঁর পিতার জীবন-কাহিনী, বৃন্দাবন থেকে বাংলাদেশে গ্রন্থ প্রেরণ, বীর হাম্বীরের গ্রন্থ-লুণ্ঠন ও পরিশেষে তাঁর বৈষ্ণবদীক্ষা গ্রহণ; খেতুরীর মহোৎসব;—এবং আরো বহু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সমকালীন ঘটনা। তাছাড়া, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার বহু গ্রন্থ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে এই কাব্যে; নানা রাগ-রাগিণীর বর্ণনাও আছে।

নরোত্তম-বিলাস

নরহরির লেখা দ্বিতীয় উল্লেখ্য গ্রন্থ নরোত্তম-বিলাস। সংক্ষেপে হলেও নরোত্তমের গোটা জীবন-চিত্রকে জীবন্ত রূপ দিয়েছেন কবি এই কাব্যে। সেই প্রসঙ্গে সমকালীন বৈষ্ণবতার ঐতিহাসিক পরিচয়ও আছে বিস্তর। নরোত্তম-বিলাস ১২টি "বিলাস" বা অধ্যায়ে সম্পূর্ণ।

অপরাপর রচনা

নরহরির "গৌর-চরিত চিন্তামণি" সংগীতের আকারে লেখা, এবং নানা রাগ-রাগিণীর উল্লেখ রয়েছে এতে। "শ্রীনিবাস-চরিত" কাব্যাকারে শ্রীনিবাসের জীবন-চরিত। এই কবির অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে,—গীতচন্দ্রোদয়, ছন্দঃসমুদ্র, প্রক্রিয়া-পদ্ধতি ইত্যাদি।

প্রেমবিলাস

নরহরির ঐতিহাসিক রচনাবলীর কথা ছেড়ে দিলে বিশেষভাবে উল্লেখ্য নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস। এতে শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের জীবন-কথা প্রধানভাবে বর্ণিত হয়েছে। কবি স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভুর বংশধর ছিলেন;—বাড়ি ছিল শ্রীখণ্ডে। তাঁর পিতার নাম আত্মারাম দাস,—মা ছিলেন সৌদামিনী। বৈষ্ণব ধর্ম, সাহিত্য ও ইতিহাস বিষয়ে প্রেমবিলাসে বর্ণিত তথ্য বিশেষ প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত হয়।

চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদাবলী

মুখ্যত: চৈতন্য-জীবনের বাস্তব তথ্যাবলীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বৈষ্ণব জীবনী সাহিত্যের ভিত্তিভূমি, তেমনি তাঁর লোকোত্তর চরিত্রের ভাব-বিভূতিকে আশ্রয় করেই চৈতন্যোত্তর কালের বৈষ্ণব পদাবলী নবজন্ম নিয়েছিল। আগে বলেছি, নর-নারীর দেহাশ্রিত প্রেমাকৃতিকে বৈদেহ পরিস্রুতি দানেই চৈতন্য-জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা। আর প্রেম যেখানে দেহের বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়েছে, সেখানে বিশেষ নর ও নারীর দেহ-কেন্দ্রকে পেরিয়ে তা ব্যাপ্ত হয়েছে সর্বভূতে। মানব-প্রেমের এই সার্বিক প্রসারের পরম পরিণাম মূর্তিরূপ পেয়েছিল চৈতন্য-ব্যক্তিত্বের কেন্দ্রমূলে। আবার এই মানবিক প্রেমের লোকোত্তর ভাব পরিস্রুতির বিগ্রহ বলেই রাধা-কৃষ্ণের দ্বৈতাদ্বৈত স্বরূপকে চৈতন্যদেব বন্দনা করলেন। চৈতন্য-চরিতামৃত শ্রীরাধার ভাব-স্বভাব বর্ণনা করে বলেছেন :—

চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবপদের ভাবভূমি

> "কৃষ্ণতে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
> সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥
> সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন
> ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ ॥
> হ্লাদিনীর সার অংশ ধরে প্রেম নাম।
> আনন্দ-বিস্ময়-রস প্রেমের আখ্যান ॥
> প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
> সেই মহাভাব-রূপা রাধা ঠাকুরাণী ॥"

বলা বাহুল্য রাধা রূপের এই ব্যাখ্যা চৈতন্য-পরিকল্পনারই অনুসারী। আবার চৈতন্যপ্রভু স্বয়ং ছিলেন "প্রেমের পরম সার"-স্বরূপ। এই কারণেই ভক্ত বৈষ্ণবেরা তাঁকে কৃষ্ণের অবতার, তথা একই দেহে রাধা-কৃষ্ণের সম্মিলিত রস-মূর্তি রূপে অনুভব করেছেন। চৈতন্য-চরিতামৃত তাঁর সম্বন্ধে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করে বলেছেন—রাধা আসলে কৃষ্ণের প্রণয়-বিকৃতি,—অর্থাৎ কৃষ্ণ-প্রণয়ের ভাবান্তরিত রূপমূর্তি,—কৃষ্ণের

হ্লাদিনী শক্তি তিনি। এঁরা [কৃষ্ণ এবং রাধা] একাত্ম হওয়া সত্ত্বেও পুরাকালে দেহভেদ গ্রহণ করেছিলেন। এখন সেই দুইই ঐক্যপ্রাপ্ত হয়ে চৈতন্য নামে প্রকট হয়েছেন। রাধার ভাব-দ্যুতি-সুবলিত সেই কৃষ্ণ-স্বরূপকে প্রণাম করি।"

বস্তুতঃ, মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কখনো তাঁর মধ্যে প্রকট হত কৃষ্ণ-স্বভাব, কখনো বা প্রকাশ পেত রাধা-ভাব। অতএব, সমসাময়িক ভক্ত কবিরা তাঁর মধ্যে লোকোত্তর প্রেমের বিভূতি অনুভব ও আস্বাদন করে তারই তন্ময় কাব্যরূপ রচনা করেছেন। তাঁদের রচনার বিষয় ছিল দ্বিবিধ। এক শ্রেণীর কবিতার মধ্যে চৈতন্য-জীবনের প্রত্যক্ষ-লীলা-কথাই রস-রূপ পেয়েছে। আরো এক শ্রেণীর রচনার উপজীব্য ছিল রাধা-কৃষ্ণের-প্রেম-মহিমা,—অবশ্য চৈতন্য-সমকালীন কবিদের বর্ণিত রাধাকৃষ্ণ-লীলা-কথাতেও রাধা অথবা কৃষ্ণভাবে ভাবিত গৌরাঙ্গরূপের ভাব-জ্যোতিই বিকিরিত হয়েছে। গৌর-ভাবনাই চৈতন্য-সমকালীন বৈষ্ণব কবিতার প্রাণ।

চৈতন্য-তিরোভাবোত্তর কালের অনেক বৈষ্ণব কবি মহাপ্রভুকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান নি। তাহলেও তাঁদের সকল রচনাতেই চৈতন্য-মহিমার ভাব-বিভূতি নবরূপে কীর্তিত হয়েছে। বৃন্দাবনের গোস্বামিকুল এবং তাঁদের শিষ্যানুশিষ্যরা তখন চৈতন্য-জীবনের তত্ত্বরূপ,—তাঁর দৈবী মহিমার স্বভাব ব্যাখ্যা করছিলেন,—অসংখ্য জীবনী, ধর্মশাস্ত্র, অলংকার গ্রন্থ, স্তব-স্তোত্র মন্ত্র কবিতাবলীর মাধ্যমে। প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা, ভক্ত-হৃদয়ের একান্ত নিষ্ঠা, পণ্ডিতের বিচার-ব্যাখ্যা এবং ভাবুকের ধ্যান-তন্ময়তার সম্মিলনে ঐ সকল রচনায় চৈতন্য-জীবন যেন নবজন্ম লাভ করেছিল। চৈতন্যোত্তর কালের বৈষ্ণব পদকর্তাগণ এই নবীন চৈতন্য-কল্পনার কল্পতীর্থে অবগাহন করে তাঁদের কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই কারণে, এ-কালের বৈষ্ণব-পদাবলীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মচেতনার ভাবব্যঞ্জনা, উজ্জ্বল নীলমণি প্রভৃতি বৈষ্ণব অলংকার-গ্রন্থের প্রভাবিত আঙ্গিক-সুষমা এবং জ্ঞান-নিয়মিত ভক্তির সুমিত জ্যোতি এক নবতর শিল্প-রূপের জন্ম দিয়েছে।

চৈতন্য-সমসাময়িক প্রাচীন বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একজন ছিলেন শ্রীহট্টের মুরারি গুপ্ত। আগে বলেছি, চৈতন্যের প্রথম প্রামাণ্য জীবনী

রচনার গৌরবও এঁকেই দেওয়া হয়। মুরারি গুপ্ত প্রধানভাবে রাধাকৃষ্ণ-লীলা নিয়ে কবিতা লিখেছেন। কিন্তু, তাঁর কবিতার প্রায় সর্বত্র রাধার প্রেমার্তির অতলে গুহায়িত রয়েছে দিব্যোন্মাদ গৌরাঙ্গের প্রেম-বেদনার আনন্দ-বিভূতি। তাঁর গৌর-পদেও প্রত্যক্ষ অনুভবের বেদনা উন্মথিত ব্যাকুল রূপ ধরেছে :—

মুরারি গুপ্ত

"ধর ধর ধর ওরে নিতাই
আমার গৌরে ধর।
আছাড সময়ে অনুজ বালয়া
বারেক করুণা কর॥
আচায গোসাঞি দেখিহ নিতাই
আমার আঁখির তারা।
না জানি কি খেনে নাচিতে কীর্তনে
পরাণে হইব হারা॥
শুনহ শ্রীবাস কৈরাছে সন্ন্যাস
ভূমি তলে গড়ি যায়।
সোনার বরণ ননীব পুতলি
ব্যথা না লাগয়ে গায়॥
শুন ভক্তগণ রাখহ কীর্তন
হৈল অধিক নিশা।
কহয়ে মুরারি শুন গৌরহরি
দেখহ মায়ের দশা॥"

একান্ত ভাবে গৌরাঙ্গ-কথা নিয়ে প্রথম বৈষ্ণবপদ রচনার অতুল্য কীর্তি নরহরি সরকারের। অদ্বৈত-প্রভুই গৌর-সংকীর্তনের সর্বপ্রথম প্রবর্তক ছিলেন বলে জানা যায় ; আর গৌরলীলা-গীতি প্রথমে লিখেছিলেন নরহরি। আগে বলেছি, নরহরি গৌর নাগরী' ভাবেরও প্রবর্তক ছিলেন। এঁর বাড়ি ছিল শ্রীখণ্ডে.—পিতার নাম ছিল নারায়ণ। ১৪৭৮ থেকে ১৫৪০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত নরহরি জীবিত ছিলেন। তাঁর লেখা গৌরলীলার পদটি :—

"গৌরলীলা দরশনে ইচ্ছা বড় হয় মনে
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।

মুঞি ত অতি অধম লিখিতে না জানি ক্রম,
কেমন করিয়া তাহা লিখি ॥
এ গ্রন্থ লিখিবে যে, এখনও জন্মে নাই সে
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় রচনা হৈলে বুঝিবে লোক সকলে,
কবে বাঞ্ছা পুরাবেন পহু ॥

নরহরি সরকার

* * *

কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহা কেহ দেখি
প্রকাশ করয়ে প্রভু লীলা।
নরহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের দুখ
গ্রন্থ গানে দরবিবে শিলা ॥

নরহরির যোগ্য শিষ্য লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গল রচনা করে গুরুর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছিলেন।

চৈতন্য-সমকালীন যুগে গৌর-পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন বাসুদেব ঘোষ। তাঁর লেখা অধিকাংশ পদই গৌরাঙ্গ-বিষয়ক। এই সব পদের উৎকর্ষ সম্বন্ধে চৈতন্য-চরিতামৃতকার জানিয়েছেন :—

"বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে ॥"

বাসুঘোষের আরো দুই সহোদর ছিলেন গোবিন্দ ঘোষ ও মাধব ঘোষ। তিন জনেই চৈতন্য-পরিকর এবং বৈষ্ণব পদ-কর্তা ছিলেন। গৌর-বর্ণনা করে বাসুঘোষ একটি পদে লিখেছেন :—

"গৌরাঙ্গ বিহরই পরম আনন্দে।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে গঙ্গা পুলিনে রঙ্গে
হরি হরি বলে নিজ বৃন্দে ॥
কাঁচা কাঞ্চন মণি গোরা রূপ তাহা জিনি
ডগমগি-প্রেম-তরঙ্গে।
ও নব-কুসুম-দাম গলে দোলে অনুপাম
হেলন নরহরি অঙ্গে ॥

বাসুঘোষ ও সহোদরগণ

প্রিয়তম গদাধর ধরিয়া সে বাম কর
নিজগুণ গাওয়ে গোবিন্দে।
ভাবে ভরল তনু পুলক কদম্ব জনু
গরজন যৈছন সিংহে ॥
ঈষত হাসিয়া ক্ষণে অরুণ-নয়ন-কোণে
রোয়ত কিবা অভিলাষে।
সোঙরি সেসব খেলা বৃন্দাবন-রসলীলা
কি বলিব বাসুদেব ঘোষে ॥"

পদটি পডলেই বোঝা যায়, নরহরির মত কবি বাসুদেব ঘোষও ছিলেন 'গৌরনাগরী' ভাবের সাধক।

'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'-এর কবি মালাধর বসুর পৌত্র রামানন্দ বসু মহাপ্রভুর পারিষদ ছিলেন। ইনি বাংলা ও ব্রজবুলি, উভয় ভাষাতেই কিছু কিছু পদ রচনা করেছিলেন।

রামানন্দ বসু

ব্রজবুলি ভাষায় পদ-রচয়িতা প্রথম বাঙালি কবি ছিলেন যশোরাজ খান। ভনিতায় তিনি হুসেন শাহের উল্লেখ করেছেন। তাই, অনুমান করা হয়, কবিতাটি হুসেন-এরই রাজত্বকালের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) কোনো সময়ে রচিত। যশোরাজ খানের লেখা প্রথম ব্রজবুলি পদ নিম্নরূপ :—

"এক পয়োধর চন্দন লেপিত আরে সহজেই গোর।
হিম ধরাধর কনক ভূধর কোরে মিলল জোর ॥
মাধব, তুয়া দরশন কাজে
আধ পদচারি করত সুন্দরী বাহির দেহলী মাঝে।
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত ধবল রহল বাম।
নীল ধবল কমল যুগলে চাঁদ পূজল কাম ॥
শ্রীযুত হুসন জগত-ভূষণ সোহ এ রস-জান
পঞ্চগৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর ভনে যশোরাজ খান ॥"

ব্রজবুলি পদের প্রথম বাঙালি কবি

চৈতন্য-পারিষদ্দের মধ্যে বংশীবদন চট্ট একজন প্রসিদ্ধ পদকর্তা ছিলেন। এঁর বহু পদ চৈতন্যোত্তর কালের কবি বংশীদাসের রচনার সঙ্গে মিশে গেছে। বংশীদাস শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য এবং সপ্তদশ শতকের কবি ছিলেন।

বংশীবদন ও বংশীদাস

কিন্তু তার আগে চৈতন্যোত্তর যুগের প্রথম উল্লেখ্য কবি হিসেবে স্মরণীয় হচ্ছেন জ্ঞানদাস। চৈতন্য-সমকালীনদের মধ্যে পদকর্তা আরো অনেকে ছিলেন, ইতিহাসের ক্রম-অগ্রসৃতির পক্ষে তাঁদের উল্লেখ আবশ্যিক নয়।

জ্ঞানদাস

জ্ঞানদাসের ব্যক্তি-পরিচয় সম্বন্ধে সকল কথা জানা যায় নি। মোটামুটি জানা যায়, বর্ধমানের কাঁদড়া গ্রামে কবির জন্ম হয়েছিল ১৫৩০ খ্রীস্টাব্দে। জাতিতে এঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। নিত্যানন্দের দ্বিতীয়া পত্নী জাহ্নবীদেবী কবির গুরু ছিলেন। সে যুগের আরো দুই শ্রেষ্ঠ পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজ ও বলরামদাসের সঙ্গে কবি জ্ঞানদাসও খেতুরীর উৎসবে উপস্থিত হয়েছিলেন।

কবি পরিচয়

বাংলা, ব্রজবুলি এবং বাংলা-ব্রজবুলি-বিমিশ্র ভাষাতে জ্ঞানদাস কবিতা রচনা করেছিলেন। অবশ্য পদকর্তা হিসেবে আজ তাঁর খ্যাতি প্রধানতঃ বাংলা পদগুলির জন্যেই। সহজ ভাবের একান্ততা ও প্রকাশের আড়ম্বর-হীনতাই ঐ সব পদের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। মনের গভীর অনুভবকে তিনি নিরাভরণ ভাষায় হৃদ্য করে তুলতে পেরেছেন। তাই জ্ঞানদাসকে মধুস্বাদী হৃদয়ানুভবের কবি চণ্ডীদাসের সমধর্মী বলা হয়। বস্তুতঃ এঁদের দুজনের কবি-কর্মের তফাৎ ততটা স্বভাবগত নয়, যতটা কালগত। চণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্বকালের কবি ; এক জয়দেব গোস্বামীর সংস্কৃত পদাবলী ছাড়া তাঁর রচনার কোনো পূর্বাদর্শ ছিল না। অন্যপক্ষে জয়দেবের অলংকার-বিক্রীড়িত কবি-কর্ম চণ্ডীদাসের মৌলিক হৃদ্‌বৃত্তিকে যে প্রভাবিত করতে পারে নি, তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ উভয়ের কবিতার স্বভাবগত পার্থক্যে। বস্তুতঃ চণ্ডীদাস তাঁর ব্যক্তি-মনের সহজ আকুতিকে একমাত্র অবলম্বন করে পদ রচনা করেছিলেন। ফলে, তাঁর মনের অসংবৃত ভাব যেখানে বন্ধনহীন স্বেচ্ছা-মুক্তি পেয়েছে,—সেখানে অনির্বাচ্য অনুভূতির অনাবিল প্রকাশেই জন্ম হয়েছে শ্রেষ্ঠ কাব্যোৎকর্ষের। চণ্ডীদাসের কলা-কর্মের কোথাও সচেতন কৌশলের প্রয়োগ নেই ; মুক্ত মনের স্বভাব-উক্তিতেই তাঁর শিল্প-কৃতির উৎকর্ষ।

কাব্য রূপ

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ?"

এখানে শ্যাম-নামের অনির্বাচ্য মর্ম-স্পর্শিতার রসানুভূতি কবির স্বাভাবিক উক্তির মধ্যেই অসীম ব্যঞ্জনাময় হয়েছে। জ্ঞানদাসের কবিতার উৎকর্ষও এই মর্মানুভূতির একান্ততায়। কিন্তু, তিনি চৈতন্য-পরবর্তী কালের কবি। ফলে, বৈষ্ণব দর্শন ও অলংকার শাস্ত্রের গোষ্ঠিগত শিক্ষা (schooling) তাঁর কবি-প্রাণের পক্ষে স্বভাব-সিদ্ধ হয়েছিল। তাই, মনের সহজ ভাবকে প্রকাশ করতে গিয়েও সহজেই এসে পড়েছে আলংকারিক সুমিত ভাষণ। অনাডম্বর হয়েও মণ্ডন-স্নিগ্ধ জ্ঞানদাস রচনার একটি সুন্দর নিদর্শন :—

"চূড়াটি বাঁধিয়া উচ্চ কে দিল ময়ূর পুচ্ছ
ভালে সে রমণী-মনলোভা।
আকাশ চাহিতে কিবা ইন্দ্রের ধনুকখানি
নবমেঘে করিয়াছে শোভা॥
মল্লিকা মালতী মালে গাঁথনি গাঁথিয়া ভালে
কেবা দিল চূড়াটি বেড়িয়া।

কবি স্বভাব

হেন মনে অনুমানি বহিতেছে সুরধুনী
নীলগিরির শিখর ঘিরিয়া॥
কালার কপালে চাঁদ চন্দনের ঝিকি মিকি
কেবা দিল ফাগু রঙিয়া।
রজতের পাতে কেবা কালিন্দী পূজিল গো
জবা কুসুম তাহে দিয়া॥
হিঙুল গুলিয়া কালার অঙ্গে কে দিয়াছে গো
কালিন্দী পূজিল করবীরে।
জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন লয়
শ্যামরূপ দেখি ধীরে ধীরে॥"

ফলকথা, মনের সহজ অনুভবকে এইরূপ অনায়াসে মণ্ডিত করে প্রকাশ করার দিকেই জ্ঞানদাসের ঝোঁক ছিল। কিন্তু মণ্ডন-কর্ম যেখানে হৃদয়ের আর্তির সূত্রে গাঁথা পড়ে নি, জ্ঞানদাসের পদ সেখানে নিষ্প্রাণ। ফলে, কেলি-কলা-কুতূহল শব্দের চপল ভঙ্গিযুক্ত হয়েও আর্তপ্রাণের আকূতি-বিহীন,—কেবল এই কারণেই ব্রজবুলি পদের আলংকারিক সুগঠন সত্ত্বেও জ্ঞানদাসের রচনায় তা হৃদয়স্পর্শী হয় নি প্রায়ই :—

"খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ॥
বোলইতে বচন অলপ অবগাই।
হাসত না হাসত্ মুখ মুচকাই॥
এ সখি এ সখি দেখলু নারী।
হেরইতে হরখে হরল যুগ চারি॥"

বৈষ্ণব-পদ-সাহিত্যে অনাবিল অন্তরানুভূতিকে সহজ প্রকাশ দানের প্রবণতায় জ্ঞানদাস যথার্থই চণ্ডীদাসের অনুসারী।

চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে ষোড়শ শতকের আর একজন সমুল্লেখ্য কবি বলরাম দাস। বলরাম নামে বৈষ্ণব পদাবলীর একাধিক কবি ছিলেন। আলোচ্য বলরাম হয়ত চৈতন্য-নিত্যানন্দের সমসাময়িক। জাতিতে ইনি ব্রাহ্মণ; বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলার দোগাছিয়া গ্রামে। এই বলরাম-কবি ব্রজবুলি এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই পদ লিখেছিলেন; তার মধ্যে বাংলা পদগুলিই ছিল উৎকৃষ্টতর। বাৎসল্য রসের কবি হিসাবে ইনি বিখ্যাত:—

বলরামদাস

"গোষ্ঠে আমি যাব মা গো, গোষ্ঠে আমি যাব।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরি চরাব॥
চূড়া বান্ধি দে গো মা, মুরলী দে মোর হাতে।
আমার লাগিয়া শ্রীদাম দাড়াঞা রাজপথে॥
পীত ধড়া দে গো মা, গলায় দেহ মালা।
মনে পড়ি গেল মোর কদম্বের তলা॥
শুনিয়া গোপালের কথা মাতা যশোমতী।
সাজায় বিবিধ বেশে মনের আরতি॥"

* * *

বলরাম দাস কয় সাজাইয়া রানী।
নেহারে গোপাল-মুখ কাতর পরাণি॥"

চৈতন্যোত্তর বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদ রচনার গৌরব গোবিন্দদাস কবিরাজের। ষোড়শ শতকের তৃতীয় দশক, বা তার কাছাকাছি সময়ে এঁর জন্ম হয়েছিল মাতুলগৃহ শ্রীখণ্ডে। তাঁর পিতার নাম ছিল চিরঞ্জীব,

মা ছিলেন সুনন্দা। পিতামহ ছিলেন "সংগীত দামোদর" নামক বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা দামোদর। ইনি ঘোর শাক্তপন্থী সাধক ছিলেন। গোবিন্দ এবং তাঁর অগ্রজ রামচন্দ্র কবিরাজ মাতামহের প্রভাবে প্রথমে শাক্ত আচার গ্রহণ করেছিলেন। পরে দুজনেই বৈষ্ণব ধর্মে একান্ত আসক্ত হয়ে পড়েন:—রামচন্দ্র সংস্কৃত কবিতা লিখেছিলেন বৈষ্ণবী নিষ্ঠার প্রকাশ করে। গোবিন্দদাস কবিরাজের বৈষ্ণব ধর্মাসক্তি সম্বন্ধে কৌতুকজনক লোক-প্রবাদ রয়েছে। অপেক্ষাকৃত প্রবীণ বয়সে তিনি দুরারোগ্য গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। কৃষ্ণচরণে আত্মসমর্পণ করলে সুস্থ হতে পারবেন,—দেবীর কাছে এই স্বপ্নাদেশ পেয়েই নাকি তিনি বৈষ্ণব দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গুরু ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য। কবির বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের কাল ১৫৭৭ খ্রীস্টাব্দ; তাঁর দেহান্ত হয় ১৬১৩ খ্রীস্টাব্দে। এই সময়-সীমার মধ্যেই গোবিন্দদাসের বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হয়েছিল। এদিক থেকে কিছু সংখ্যক পদ সপ্তদশ শতকের রচনা হওয়াও সম্ভব।

গোবিন্দদাস কবিরাজ

গোবিন্দদাস কবিরাজ কেবল ব্রজবুলি ভাষাতেই পদ লিখেছিলেন বলে মনে করা হয়। অবশ্য, গোবিন্দদাস ভণিতায় কিছু সংখ্যক বাংলা পদও পাওয়া গেছে। তার সব কয়টিই গোবিন্দদাস চক্রবর্তী নামক অপর এক কবির রচনা বলে অনুমিত হয়েছে। ভাষা, এবং ভাব-কল্পনার দিক থেকেও কবিরাজ গোবিন্দদাসকে বিদ্যাপতির অনুসারী বলে মনে করা হয়:

"দ্বিতীয় বিদ্যাপতি"

"ব্রজের মধুর লীলা যা শুনি দরবে শিলা
গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হৈতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্বগুণ
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি॥"

বিদ্যাপতির প্রতি গোবিন্দদাসের অনুরক্তির সুবিদিত পরিচয় রয়েছে:—বিদ্যাপতির লেখা "ত্রিচরণ"-পদ প্রাপ্ত হয়ে তার চতুর্থ পাদ পূরণ করেছিলেন তিনি। তাছাড়া, এই দুই কবির যুক্ত ভণিতায় একাধিক ব্রজবুলি পদও পাওয়া গেছে। তবু বলব,—বিদ্যাপতির সঙ্গে গোবিন্দদাসের প্রকাশ-শৈলীর সাদৃশ্যই বেশি। ভাবের বিচারে তাঁর অনুভব বিদ্যাপতির

চেয়ে গভীরতর বলে মনে করি; আর তার মূলে ছিল কবি-প্রাণের চৈতন্য-ভক্তি-সন্নতি।

আগে বলেছি, শ্রীনিবাস আচার্যের মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন কবিরাজ গোবিন্দদাস; —আর, আপন স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে শ্রীনিবাস চৈতন্যের অবতার বলে পূজিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশে বৃন্দাবনের আদর্শানুমত চৈতন্য-ধর্মের পুনরুজ্জীবনের তিনি ছিলেন প্রাণ-কেন্দ্র। গুরুপরম্পরায় সেই প্রাণ-দীপ্তি যোগ্যতম শিষ্যে উদ্ভাসিত হয়েছিল। গোবিন্দদাস মহাপ্রভুকে প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য পান নি। সেই দুঃখের গহনে তাঁর কবি-প্রাণ সর্বদা নিমগ্ন হয়েছিল। পদ লিখে, চৈতন্য-লীলা কথা স্মরণ করতে গিয়ে তিনি আক্ষেপ করেছেন,—সেই প্রেমজগৎ থেকে "গোবিন্দদাস রহু দূর"। কিন্তু কালের ব্যবধানের ওপরে ধ্যানী মনের একান্ত নিষ্ঠা সেতু-বন্ধন রচনা করেছিল। গোবিন্দদাসের কবি-কল্পনা যেন দূর-গমনের তপস্যা করেছিল, ফলে, কৃষ্ণ অথবা চৈতন্য-লীলার যে-কোনো অংশের রূপ-রচনা করতে গিয়ে কবি তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েছেন। মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ মনের প্রেমাকূতি, রাধার অদম্য কৃষ্ণ-পিপাসা, কৃষ্ণের লীলা-কৌতুকের মাধুরী,—কবি তাঁর ব্যক্তি-মনের সকল নিবিড়তা নিয়ে অনুভব করেছিলেন। মনের সেই দুর্মদ আকুলতা লোক-দুর্লভ কলাকৌশলের সূত্রে বাঁধা পড়ে এক অনন্যতুল্য প্রেম-মালিকা রচনা করেছে গোবিন্দদাসের কবিতায়। বিদ্যাপতির ব্রজবুলি পদে প্রেমের লাস্যময় রূপ তরঙ্গায়িত হয়েছে; গোবিন্দদাসের ধ্যান ব্রজবুলির চলিষ্ণু ছন্দঃ-স্রোতে ভাবের সমুদ্র-প্রতিম গভীরতা সঞ্চার করেছে। ফলে ধ্বনিমাত্রিক প্রকাশ বিভঙ্গের সঙ্গে অনুভব-নিমগ্নতা যুক্ত হয়ে তাঁর পদে যেন মন্ত্রের মহিমা সঞ্চার করেছে। গোবিন্দদাসের রচিত কৃষ্ণের রূপারাধনার একটি পদ:—

গোবিন্দদাসের কবি-প্রাণ

"শ্যাম সুধাকর ভুবন মনোহর
রঙ্গিণী মোহন নটবর॥
সজল জলদ তনু ঘন রসময় জনু।
রূপে জিতল কত কোটি কুসুমধনু॥
থল-কমলদল অরুণ চরণ-তল।
নখমণি রঞ্জিত মঞ্জু মঞ্জীর-কল॥

প্রেম ভরে অন্তর গতি অতি মন্থর
অধর মুরলি ধনি মন্মথ মন্তর ॥
অভিনব নাগর গুণমণি সাগর।
গোবিন্দদাস চিতে নিতি নিতি জাগর ॥"

কল্লোলিত ছন্দোঝংকার অলংকার-শাস্ত্র-মণ্ডিত রূপরচনার দক্ষতা,—বিদ্যাপতি-প্রতিভার সকল বৈশিষ্ট্য রয়েছে পদটিতে। কিন্তু, এর শ্রেষ্ঠ রস-মূল্যের ব্যঞ্জনা ঘটেছে কবির কৃষ্ণলীলা-নিলীন চৈতন্যের ধ্যান-মগ্নতায়।

প্রধানভাবে অভিসারের কবি হিসেবেই গোবিন্দদাস সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। কিন্তু, তাঁর পদে অভিসারের মিলন-উৎকণ্ঠা রূপ-বুভুক্ষায় পুলক-কণ্টকিত হয়ে ওঠেনি। মিলনের জন্য সর্বস্বপণ সাধনার ত্যাগ ও বেদনাকেই তিনি তপস্যার মহিমায় মণ্ডিত করে উপস্থিত করেছিলেন। তাঁর অভিসার-উৎকণ্ঠিতা রাধা সখীর সাবধানবাণীর উত্তরে ব্যাকুল কণ্ঠে বলেন :—

"কুলবতী কঠিন কবাট উদ্ঘাটলুঁ
তাহে কি কণ্টক বাধা।
নিজ মরিয়াদ সিন্ধু সঞে ডারলু
তাহে কি তটিনী অগাধা ॥
সজনি, মঝু পরিখন করু দূর।
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর ॥
কোটি কুসুম শর বরিখয়ে যছু পর
তাহে কি জলদ-জল লাগি।
প্রেম-দহন-দহ যাক হৃদয়ে সহ
তাহে কি বজর কি আগি ॥
যছু পদতলে হাম জীবন সোঁপলু
তাহে কি তনু অনুরোধ।
গোবিন্দ দাস কহই ধনি অভিসর
সহচরী পাওল বোধ ॥"

কবিকর্মের অতুল্য সম্পদ

আবার, নিজের গোপন ঘরে দুঃসাধ্য অভিসার-সাধনের এই অভ্যাসে সিদ্ধ হয়ে গোবিন্দদাসের রাধা যেদিন যথার্থ অভিসারের পথে বেরিয়েছেন, সেদিনও তিনি বলেন :—

"মাধব কি কহব দৈব বিপাক।
পথ আগমন কথা কত না কহিব হে,
যদি হয় মুখ লাখ লাখ ॥
মন্দির তেজি যব পদ চারি আওলুঁ
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারিয়ে
পদ যুগে বেঢ়ল ভূজঙ্গ ॥
একে কুল কামিনী তাহে কুহু যামিনী
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর
হাম যাওব কোন্ পুর ॥
একে পদ পঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জরজর ভেল।
তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলুঁ
চির দুখ অব দূরে গেল ॥
তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল
ছোডলুঁ গৃহ-সুখ-আশ।
পন্থক দুখ তৃণ করি গণলুঁ
কহতহি গোবিন্দদাস ॥"

লক্ষ্য করা উচিত,—এ কেবল গোবিন্দদাসের রাধারই কথা নয়,—রাধার উপলব্ধির সঙ্গে আপন হৃদয়ের গোপন আকাঙ্ক্ষাকেও কবি জড়িয়ে বি-লীন করে দিয়েছেন। কৃষ্ণ-মিলন-সুখের উৎকণ্ঠায় গোবিন্দদাসের কবি-প্রাণ অভিসারের পথে চির-পথিক হয়ে বেরিয়েছে। ব্রজবুলির দৈহিক সৌষ্ঠবের মধ্যে ধ্যানী-কল্পনার ভাব-জ্যোতি এক অপরূপ কলারূপ রচনা করেছে;—বস্তুতঃ বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর ইতিহাসে কবিরাজ গোবিন্দদাস প্রায় অনন্যতুল্য।

আগে বলেছি, গোবিন্দদাসের ভনিতায় প্রচলিত সকল বাংলা পদাবলীর কবি হিসেবে গোবিন্দ চক্রবর্তীকেই পরিচিত করা হয়েছে। ইনিও শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ছিলেন,—তাঁর বাড়ি ছিল বোরাকুল গ্রামে। গোবিন্দ চক্রবর্তী কিছু কিছু ব্রজবুলি পদও লিখেছিলেন—কিন্তু সে সবও কবিরাজ গোবিন্দদাসের রচনার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। অবশ্য এঁর লেখা বাংলা পদেও কাব্যিক উৎকর্ষ মাঝে মাঝে চোখে পড়ে।

গোবিন্দ চক্রবর্তী

চৈতন্যমঙ্গলের কবি, নরহরি-শিষ্য লোচনদাস পদকর্তা হিসাবেও সুখ্যাতি লাভ করেন। আগে বলেছি, গুরুর প্রভাবে লোচন গৌর-নাগরভাবের অনুরক্ত হয়েছিলেন। হাল্কা লঘু ছন্দে পদ লিখে তিনি 'নাগরী' ভাবের কৌতুক চপলতাকে ব্যক্ত করেছেন।

লোচনদাস

পদকর্তা অনন্তদাস ছিলেন আচার্য অদ্বৈতের শিষ্য। এঁর লেখা অল্প কয়টি মাত্র ব্রজবুলি পদ পাওয়া গেছে। কিন্তু ঐ সীমিত কয়টি পদের গুণেই তিনি বৈষ্ণব পদকর্তা রূপে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

অনন্তদাস

সপ্তদশ শতকের বৈষ্ণব ধর্মগুরু নরোত্তমও কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদের লেখক। তাঁর পদে চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব দর্শন জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির সার্থক যোগ ঘটেছে। একটি পদের শুরু হয়েছে,—

কবি নরোত্তম

"হরি হরি আর কবে এমন দশা হবে।
ছাড়িয়া পুরুষ দেহ কবে বা প্রকৃতি হব,
দোঁহারে নূপুর পরাইব॥
টানিয়া বাঁধিব চূড়া তাহে দিব গুঞ্জাবেড়া
নানা ফুলে গাঁথি দিব হার।
পীতাম্বর বাস অঙ্গে পরাইব সখা সঙ্গে
বদনে তাম্বুল দিব আর॥"

শ্রীনিবাস আচার্যও কিছু কিছু পদ রচনা করেছিলেন। তবে শ্রেষ্ঠ পদ-কর্তাগণের গুরু হিসাবে তাঁর খ্যাতি যত—স্বয়ং কবি হিসেবে ততটা প্রতিষ্ঠা তিনি অর্জন করতে পারেন নি।

চৈতন্যোত্তর পদসাহিত্যের ইতিহাসে দীনচণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাসের প্রসঙ্গ অবশ্য স্মরণীয়। এঁদের বিস্তারিত পরিচয় উদ্ধার করেছি চৈতন্য-পূর্ব চণ্ডীদাস-কবির আলোচনা প্রসঙ্গে।

চণ্ডীদাস কবিগোষ্ঠী

চণ্ডীদাসের মত বিদ্যাপতির কবিকীর্তিকেও আচ্ছন্ন করেছেন একই নামের আরো একাধিক পদকর্তা। এঁদের মধ্যে শ্রীখণ্ডের 'কবিরঞ্জন' সমুল্লেখ্য; এঁকে বাঙালি বিদ্যাপতিও বলা হয়। বিদ্যাপতির ভনিতায় কিছু কিছু বাংলা পদ পাওয়া গেছে;—সেগুলি এঁরই রচনা বলে মনে করা হয়েছে। ভনিতায় "কবি রঞ্জন" এবং "বিদ্যাপতি" উভয় অভিধারই ব্যবহার রয়েছে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে। এঁর লেখা ব্রজবুলি পদগুলি মিথিলার কবি বিদ্যাপতির রচনার মধ্যে মিশে গেছে। অথচ কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি ছিলেন ষোড়শ শতকের পদকর্তা;—আর রঘুনন্দন ছিলেন তাঁর গুরু।

বিদ্যাপতি-গোষ্ঠি

রায়শেখর নাম বা উপাধি-যুক্ত আরো একজন কবির রচনা মৈথিল কবি বিদ্যাপতির পদের সঙ্গে মিশে গেছে। এঁর পদে রায়শেখর, শেখররায় দুখিয়া শেখর, শেখর ইত্যাদি বিচিত্র রকমের ভনিতা পাওয়া যায়। ইনিও ষোড়শ শতকের কবি ও রঘুনন্দনের শিষ্য। ব্রজবুলি রচনাতেই এঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল।

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রথম সংগ্রহ-গ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল সপ্তদশ শতকে। সংকলন করেছিলেন বিখ্যাত বৈষ্ণব দার্শনিক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী,—সংকলনের নাম ছিল ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি। এতে ৪৫ জন কবির লেখা ৩০৯টি পদ সংগৃহীত হয়ে আছে।

প্রথম বৈষ্ণব পদসংগ্রহ

চৈতন্য-উত্তর অনুবাদ-সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ-কাব্য রচনা শুরু হয়েছিল তুর্কী আক্রমণোত্তর কালে; সেদিন তার উদ্দেশ্য ছিল লোক-চিত্তের প্রবোধন। সেই সঙ্গে বাংলা ভাষার সু-গঠনেও এই সব অনুবাদ-সাহিত্য যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। সংস্কৃতের ভাষা-সম্পদ ও প্রকাশভঙ্গির বলিষ্ঠতা কৃত্তিবাস বা মালাধরের রচিত বাংলা কাব্যে এক নূতন শক্তির সঞ্চার করেছিল। বড়ুচণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে তুলনা করলেই এই তথ্য স্পষ্ট প্রতিপন্ন হবে। অথচ, বড়ুচণ্ডীদাসও সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও অলংকার শাস্ত্রে সুপণ্ডিত যে ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তা হলেও, বাংলা কাব্যে প্রথম ওজস্বিতার সৃষ্টি হয়েছিল অনুবাদ কাব্যেরই মাধমে। তার কারণ, এই সব অনুবাদে কৃত্তিবাস-মালাধর মূলের কাহিনীই কেবল অনুসরণ করেন নি; ভাষা ও বাগ্‌ভঙ্গিরও যথাসম্ভব অনুবর্তন করেছেন। এ ছাড়া তখন উপায়ও আর কিছু ছিল না, বাংলা সাহিত্যের নিজের বল্‌বার কথা তখনো অ-প্রচুর; ভাষা-শৈলী এবং শব্দ-সম্পদও ছিল একান্ত দুর্বল। ফলে, বাংলা সাহিত্যের গঠমানতার আদি-মধ্য পর্যায়ে সংস্কৃত সাহিত্যের মূলানুবাদ নবীন কলাকর্মে বলাধান করেছে।

বাংলা অনুবাদ-কাব্যের মৌল বৈশিষ্ট্য

কিন্তু, চৈতন্যোত্তর কালের অনুবাদ-সাহিত্যকে এই অর্থে যথার্থ "অনুবাদ" বলা উচিত কি না, তাতে সংশয় আছে। চৈতন্যোত্তর বাংলা সাহিত্য সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ-বহুল হলেও তার স্বতন্ত্র দেহ সুগঠিত হয়েছিল। ফলে, ভাষা ও প্রকাশের জন্য পরমুখাপেক্ষিতার প্রয়োজন আর তত ছিল না। অন্য দিকে, মহাপ্রভুর জীবন-সাধনা বাঙালিকে দিয়েছিল এক নবীন মূল্যবোধ। অ-হেতুক অনুরাগের প্রেমাবেগে দীপ্ত এই নূতন মূল্য-চেতনা চৈতন্যোত্তর বাংলার পরিবার, সমাজ ধর্ম ও সাহিত্য-জীবনে প্রায় একচ্ছত্র প্রাধান্য পেয়েছিল। তাই স্বাধীন প্রকাশ-ভঙ্গির মত, চৈতন্যোত্তর

চৈতন্যোত্তর অনুবাদ-কাব্যের বিশিষ্টতা

বাঙালির চেতনায় স্ব-তন্ত্র এক জীবন-বাচ্যও দেখা দিয়েছিল। এ-কালের অনুবাদ-কবিরা সংস্কৃত কাব্য-কথাকে উপলক্ষ্য করে এই নূতন জীবন-বাণীকেই নব-রূপ দিয়েছেন। এ-যেন পুরাতন কাব্যের কাঠামোয় নব-যুগ-ভাবনাব প্রাণ-সঞ্চার। ফলে, কোনো কোনো কবি যে-কোনো একটি কাব্যের আগাগোড়া অনুবাদ কবে তৃপ্ত হন্ নি; একই বিষয়ের একাধিক সংস্কৃত কাব্য-কবিতা থেকে পছন্দ মত কাহিনী আহরণ করে তাতে "আপন মনের মাধুরি" মিশিয়ে বচনা করেছেন নবরূপ। বস্তুতঃ, তাতে অকৃত্রিম অনুবাদ-কাব্যের সৃষ্টি না হয়ে, অনেক সময়ে জন্ম নিয়েছে স্বতন্ত্র নূতন কাব্য। যেখানে বাঙালি কবি বিচিত্র কাব্যসূত্রের সন্ধান করেন নি, সেখানেও একটি মাত্র সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ করতে গিয়ে নবীন যুগ-ভাবনার স্বতন্ত্রতা কাব্যকে নবরূপ দিয়েছে। চৈতন্য-উত্তর কালের এই নবীন সাহিত্য-প্রবাহ প্রধানতঃ তিনটি পৃথক্ ধারায প্রবাহিত হয়েছে,—এরা রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতেব অনুবাদ-কাব্য নামেই ইতিহাসে পরিচিত।

১। চৈতন্যোত্তর যুগের রামায়ণ কাব্য

চৈতন্যোত্তব কালের রামায়ণ কাব্যেব প্রথম উল্লেখ্য কবি অদ্ভুতাচার্য। এঁর রচনাব মধ্যে আলোচ্য কালের অনুবাদ-কাব্যের স্বভাব-ধর্ম উজ্জ্বলতম প্রকাশ লাভ করেছে। অদ্ভুতাচার্যেব রামায়ণে বাল্মীকি-রামায়ণ ছাড়াও সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, রঘুবংশ ইত্যাদি রাম-বিষয়ক বিচিত্র পুরাণ ও কাব্য-কথা থেকে কবির পছন্দমত গল্পের টুক্‌রা বিচ্ছিন্নভাবে আহৃত হয়েছে; সেই বিচ্ছিন্নতাকে অপার ঐক্যে বেঁধে তুলেছেন কবি তাঁর বাঙালি-স্বভাবিত কল্পনা-ধর্মের দ্বারা। অদ্ভুতাচার্যের এই স্বাধীন কবি-কর্ম বাংলার রস-লোকে কালজয়ী হয়েছে। একালে কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলে পরিচিত বাজার-চল্‌তি অসংখ্য কাব্যের প্রধান উৎস যে অদ্ভুতাচার্যের রচিত রামায়ণ, পণ্ডিতেরা এ-কথা স্বীকার করেছেন। কবির নামকে হারিয়েও তাঁর সৃষ্টিকে রস-চিন্তার এবং নিত্যদিনের জীবন-চর্চার সঙ্গী করে নিয়েছে বহু শতকের বাঙালি পাঠক। এখানেই অদ্ভুতাচার্যের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ

অদ্ভুতাচাযের রামাযণ কাব্য

প্রতিষ্ঠা। অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণকে অনুবাদ না বলে বিভিন্ন সংস্কৃত রাম-কথার আশ্রয়ে লেখা মৌলিক সৃষ্টি বলাও কিছু অসঙ্গত নয়।

অদ্ভুতাচার্য মোটামুটি ষোড়শ শতকের কবি ছিলেন বলে মনে হয়। এঁর প্রচলিত অভিধা সম্পর্কেও অদ্ভুত জনপ্রবাদ আছে। কবির পিতৃদত্ত নাম ছিল নিত্যানন্দ; জাতিতে এঁরা ব্রাহ্মণ। পাবনা জেলায় অমৃতকুণ্ডা গ্রামে কবির বাসভূমি ছিল;—শ্রীনিবাস আচার্য,—মতান্তরে কাশী আচার্য ছিলেন, তাঁর পিতা, মা ছিলেন মেনকা দেবী। কবির সাত বছর বয়সের সময় নাকি স্বয়ং রামচন্দ্র আবির্ভূত হয়ে তাঁর জিহ্বায় তীর দিয়ে মহামন্ত্র লিখে দিয়েছিলেন। আর তারই প্রভাবে নিত্যানন্দ নিতান্ত অল্প বয়সে তাঁর মধুস্বাদী রামায়ণ রচনা শেষ করেন। এই অদ্ভুত কার্য সমাধা করতে পারার দরুণই তাঁর নাম নাকি হয়েছিল অদ্ভুতাচার্য। এই গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে সংশয় আছে।

কবি-পরিচিতি

কৈলাস বসু রামায়ণ লিখেছিলেন সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকের একেবারে শেষ ভাগে। ইনি সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণের মূলানুগ অনুবাদ করতে চেষ্টা করেছিলেন। একই কবির ভণিতায় চলিত মহাভাগবত পুরাণ-এর রচনাকাল ১৫৬৮ খ্রীস্টাব্দ বলে অনুমিত হয়েছে।

কৈলাস বসু

চৈতন্যোত্তর রামায়ণের কবি হিসাবে চন্দ্রাবতী সুখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি নিজেই যে কেবল কাব্য রচনা করেছিলেন, তা নয়। তাঁর জীবনী পূর্ববঙ্গের উৎকৃষ্ট লোক-গাথার প্রাণ-কেন্দ্র হয়ে আছে আজও। চৈতন্যোত্তর মনসামঙ্গলের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি বংশীদাস ছিলেন চন্দ্রাবতীর পিতা।

এঁদের বাড়ি ছিল মৈমনসিংহে। চন্দ্রাবতীর শৈশব-সঙ্গী ছিলেন ব্রাহ্মণ-কুমার জয়চন্দ্র। যৌবন-সীমায় পৌঁছে দুজনে দুজনের প্রতি প্রণয়াসক্ত হন। জয়চন্দ্র বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করলে উভয় পক্ষের অভিভাবক তা সমর্থন করেন। কন্যাপক্ষে বিয়ের প্রস্তুতি যখন সম্পূর্ণ হয়েছে, তখন বিয়ের দিনে খবর আসে জয়চন্দ্র একটি মুসলমান রমণীর রূপমুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করেছেন, নিজে ইসলাম ধর্ম পরিগ্রহ করে। প্রণয়-উপেক্ষিতা

কবি চন্দ্রাবতীর পরিচয়

চন্দ্রাবতী হন যৌবনে যোগিনী; চিরকুমারীর ব্রত নিয়ে রুদ্র-মন্দিরের উপাসিকা হয়ে যান তিনি। এদিকে জয়চন্দ্রের রূপ-মোহ দিনে দিনে স্তিমিত হযে আসে; পুরাতন প্রণয়ের বেদনা মনের গহনে নূতন যাতনার সৃষ্টি করে। অপরাধী মন নিযে তিনি তখন চন্দ্রাবতীর কাছে ছুটে আসেন, কিন্তু রুদ্র-মন্দিরেব দ্বাব তখন রুদ্ধ; প্রণয়ীর আকুল আহ্বানের উত্তরে চন্দ্রাবতীকে কঠিন, নিশ্চল হযে থাক্‌তে হয় পিতার আদেশে। প্রত্যাখ্যাত জয়চন্দ্র নদীর জলে প্রাণ সমর্পণ করেন,- রুদ্রের সাধনায় চন্দ্রাবতী করেন দেহত্যাগ। জযচন্দ্র-চন্দ্রাবতীর এই প্রেম-করুণ জীবন-কথা পূর্ববাংলার লোকমুখে আজও প্রায় নিত্যগীত হয়ে চলেছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মৈমনসিংহ-গীতিকায় এই গাথা-কাব্যকেও সংকলিত করেছেন।

চন্দ্রাবতীব রামায়ণ কাব্যেব কোনো লিখিত পুঁথি পাওয়া যায় নি; কিন্তু মৈমনসিংহের মহিলা-কণ্ঠে এই কাব্য নিত্য-গীত হয়ে ফিরত। বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল চন্দ্রাবতীর রামায়ণ-গান।

এই অতি-প্রচলনের জন্য মূল রচনার বিশুদ্ধি রক্ষিত হয়ে পারে নি। কালে কালে বহু লেখক ও গায়িকার ভাল-মন্দ রচনা চন্দ্রাবতীর কাব্যের সঙ্গে মিশে গেছে। ৺চন্দ্রনাথ দে এই অবস্থাতেই মহিলাদের মুখ থেকে গোটা কাব্যটি লিখে আনেন। তাতে অনেক অর্বাচীনতার ছাপ আছে; এমন কি, মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের রচনাংশও কিছু কিছু রূপান্তরিত হয়ে গৃহীত হয়েছে এতে। তবে কাব্য-কাহিনীর বর্ণনা এবং ভাষার প্রয়োগে নারী-হস্তের কোমল-করুণ বিন্যাসের পরিচয় আছে।

ভিষক্ রামশংকর দত্ত রামায়ণ লিখেছিলেন সপ্তদশ শতকের একেবারে শেষ, অথবা অষ্টাদশ শতকের শুরুতে। কবির বাড়ি ছিল মাণিকগঞ্জের বায়রা গ্রামে। ইনি কৃত্তিবাস ও অদ্ভুতাচার্যের বিভিন্ন রচনাংশকে মিশিয়ে কাব্য রচনা করেছিলেন। তা ছাড়া, সংস্কৃত অধ্যাত্ম-রামায়ণের প্রভাবও কিছু কিছু আছে।

রামশংকর দত্ত

ভবানীদাসের লেখা লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়, শত্রুঘ্ন দিগ্বিজয়, রামের স্বর্গারোহণ ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ে লেখা বিভিন্ন পালাগানের পুঁথি পাওয়া গেছে। ভবানীদাস সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতকের কবি। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি

সময় থেকে বাংলা সাহিত্যে এক নূতনতর রচনা-প্রকৃতির উদ্ভব হয়।

ভবানীদাস

চৈতন্য-প্রভাবিত সমাজ-ধর্ম, মানব-প্রেম এবং জীবন-মহিমাবোধ ততদিনে ক্রমশঃ শিথিল হয়ে এসেছে: নূতন আদর্শ ও কল্পনার জন্ম হয় নি। বাঙালি-সংস্কৃতির সে ছিল এক বিনষ্টির যুগ। এই বিনাশের ইতিহাস পরে আলোচনা করব। আপাততঃ জেনে রাখা ভাল যে, এই যুগে অনুভবের গভীরতা যত কমেছে, বৈচিত্র্য ও পরিহাস-প্রিয়তার প্রতি আকর্ষণ ততই গিয়েছিল বেড়ে। তাই একখানি অখণ্ড-সম্পূর্ণ রামায়ণ বা মহাভারত কাব্য-রচনার চেয়ে তারই টুকরো টুকরো কাহিনী নিয়ে এক একটি স্বতন্ত্র-পৃথক্ কাব্য সৃষ্টির দিকেই ঝোঁক ছিল বেশি। আর ঐ সব গল্পে নানা রকমের উপকাহিনী জুড়ে দিয়ে তাতে বিচিত্র সরসতার সৃষ্টি করা হত। কখনো লঘু পরিহাস, কখনো বা যুদ্ধ-বিগ্রহের উত্তেজনা, কৌতুক-রচনা অথবা ডিটেকৃটিভ গল্পের স্বাদ সৃষ্টি করত।

লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন-দিগ্বিজয়ের মূল আখ্যানভাগ রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের বিভিন্ন অংশ নিয়ে লেখা। অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া রক্ষা করবার ভার ছিল লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের ওপর। সেই প্রসঙ্গে তাঁরা কোথায় কত যুদ্ধ করেছিলেন,

"দিগ্বিজয়"-কাব্য

কত দেশ জয় করেছিলেন,—বিনাযুদ্ধে কত রাজ্য অধিকার করেছিলেন, দিগ্বিজয় কাব্য-প্রবাহের ঐটুকু ছিল মূল বক্তব্য বিষয়। সে ছাড়া ঐসব উত্তেজক গল্পের মধ্যে বিচিত্রতা সৃষ্টি করেছিল নায়কদের প্রণয়-মিলন-বিরহের নানা ছোট-বড় উপাখ্যান। ভবানীদাস এই শ্রেণীর কাব্য-রচনা করে ব্যাপক জন-প্রীতি লাভ করেছিলেন। মালদহ থেকে শ্রীহট্ট পর্যন্ত নানা জায়গায় এঁর কাব্যের পুঁথি পাওয়া গেছে। কবির নিজের বাড়ি ছিল পাওুয়া গ্রামে; তাঁর বাবা ছিলেন যাদবানন্দ; মা যশোদা।

দ্বিজ-লক্ষ্মণও রামায়ণ ও মহাভারতের খণ্ড উপাখ্যান নিয়ে বিচিত্র

দ্বিজ-লক্ষ্মণ

পালাগান লিখেছিলেন। তার মধ্যে রামায়ণ প্রসঙ্গে সংস্কৃত অধ্যাত্ম রামায়ণের আদিকাণ্ড ও শিবরামের যুদ্ধ-পালা উল্লেখ্য। কবি বন্দ্যঘটি ব্রাহ্মণ ছিলেন।

অষ্টাদশ শতক ও নিকটবর্তী সময়ের রামায়ণ-রচনার ধারায় যুগানুগ

আরো এক বিচিত্রতার সৃষ্টি করেছিল 'রায়বার' কাব্যসমূহ। "রাজদ্বার" শব্দ থেকে 'রায়বার' কথার উৎপত্তি। রাবণের রাজদ্বারে বানর-রাজকুমার অঙ্গদকে পাঠিয়েছিলেন রামচন্দ্র। সেখানে পৌঁছে নানারকম কৌতুক ও ব্যঙ্গপূর্ণ ভাষায় সে রাবণকে ভৎর্সনা করে।

রামায়ণ কাব্যে ঐ অংশ অঙ্গদ-রায়বার নামে পরিচিত; এতে গ্রাম্য-কবির সহজ,—pun-রচনার মধ্যে মাঝেমাঝে wit-এর দীপ্তিও চোখে পড়ে। অঙ্গদ-রায়বার-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য,—ভাঁড়ামি, কৌতুক, ও ব্যঙ্গ-মিশ্রিত উদ্দাম হাস্যরস। তাকেই আরো লঘু এবং তরলিত করে স্বতন্ত্র-বিচ্ছিন্ন রায়বার-কাব্যের সৃষ্টি হয়। ফকির রাম, কাশীনাথ এবং দ্বিজতুলসী রায়বায়-কবিদের মধ্যে সমুল্লেখ্য।

রায়বার কাব্য

'কবিচন্দ্র' শংকর চক্রবর্তী রামায়ণ ছাড়াও শিবায়ন, ভাগবতামৃত, মহাভারত, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ইত্যাদি কাব্য রচনা করেছিলেন। কবির বাড়ি ছিল মল্লভূমে,—মুনিরাম চক্রবর্তী ছিলেন তাঁর পিতা। বাজার-চলতি বাংলা রামায়ণের 'অঙ্গদ-রায়বার' 'তরণীসেন বধ' ইত্যাদি প্রসঙ্গ এই কবির রচনার দ্বারা প্রভাবিত।

শংকর চক্রবর্তী

সেকালে রামায়ণ লিখে লাভজনক পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন কবি 'দ্বিজ ভবানীনাথ'। ইনি সংস্কৃত অধ্যাত্ম-রামায়ণ অবলম্বন করে কাব্য লিখেছিলেন,—রাজা জয়চন্দ্রের আদেশে। এজন্য রাজা তাঁকে প্রতিদিন দশমুদ্রা করে পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন।

দ্বিজ ভবানীনাথ

রামানন্দ ঘোষের রামায়ণ কাব্যের উল্লেখ্য তেমন কোনো চমৎকৃতি নেই; কিন্তু নিজের সম্বন্ধে কৌতুককর গল্প ফেঁদেছেন তিনি। নিজেকে কবি "বুদ্ধাবতার" বলে ঘোষণা করেছেন। দেশে তখন স্বেচ্ছাচার প্রবল হয়েছিল বলে, তা দূর করার জন্যেই স্বয়ং বুদ্ধদেব নাকি রামানন্দ ঘোষ হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন। আরো কিছু কিছু উদ্ভট কল্পনা ছাড়া কাব্যের বৈশিষ্ট্য বা কবি-পরিচয় আর কিছু নেই।

রামানন্দ ঘোষ

পিতা-পুত্র জগদ্রাম ও রামপ্রসাদ রায়ের যৌথ চেষ্টায় লেখা রামায়ণের বিষয়-বর্ণনা এবং আখ্যান-বিন্যাসে অভিনবতা আছে। এটি অষ্টকাণ্ড

রামায়ণ। প্রচলিত রামায়ণের সাতটি কাণ্ড ছাড়া অতিরিক্ত কাণ্ডটির নাম পুষ্করকাণ্ড। তাছাড়াও, আর একটি খণ্ড আছে "রামরাস"। অতএব, সবসুদ্ধ নয়টি প্রধান বিভাগে এই রামায়ণের কাহিনী বিভক্ত হয়েছে। নূতন দুইটি খণ্ডে নানারকম পুরাণ-কথার উল্লেখ করে অভিনব বিচিত্রতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

জগদ্রাম ও রামপ্রসাদ রায়

এঁদের বাড়ি ছিল রানীগঞ্জের কাছে,—দামোদরের উল্‌টো পারে ভুলুই গ্রামে। জগদ্রাম গোটা কাব্যটি রচনা করে লঙ্কা ও উত্তরাকাণ্ড বিস্তারিত করবার ভার দিয়েছিলেন পুত্রের ওপরে। এই কাব্য-রচনা শেষ হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের একেবারে শেষ ভাগে। রামায়ণ ছাড়াও জগদ্রাম ও রামপ্রসাদ যুক্তভাবে 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি' লিখে শেষ করেছিলেন ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে। রামের দুর্গোৎসবের কাহিনী কাব্যটির বিষয়বস্তু। পিতা-পুত্র দুজনেরই রচনায় উল্লেখ্য সরসতা ছিল।

রঘুনন্দনের রামায়ণ

অর্বাচীন বাংলা রাম-কাব্যকারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন রঘুনন্দন গোস্বামী, তাঁর কাব্যের নাম ছিল রামরসায়ন। রঘুনন্দন উনিশ শতকের কবি ছিলেন; কিন্তু রামরসায়ন কেবল ঐ শতকেরই নয়,—সমগ্র অনাধুনিক বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের একখানি বহুখ্যাত কাব্য।

রঘুনন্দনের রাম-রসায়ন

রঘুনন্দন নিত্যানন্দের বংশধর ছিলেন,—বাড়ি ছিল বর্ধমানের মাড গ্রামে। গ্রন্থ-শেষের কবি-পরিচিতি থেকে জানা যায়,—কবির পিতার নাম ছিল কিশোরীমোহন—মা ছিলেন উষা; আর বংশীমোহন ছিলেন তাঁর গুরু।

রামরসায়ন-এর আকার ছিল সুবৃহৎ। বস্তুতঃ রঘুনন্দন তাঁর রচনায় পূর্ববর্তী কোনো রাম-কাব্যের কাহিনীই অবর্ণিত রাখেন নি। ফলে মূল কাব্য সাত খণ্ডে বিভক্ত হলেও, প্রতিটি কাণ্ড আবার অসংখ্য পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রায় প্রতি পরিচ্ছেদে কবি-যে কেবল নূতন গল্প শুনিয়েছেন, তাই নয়, রচনার ছত্রে ছত্রে তাঁর আলংকারিক বিদগ্ধতা এবং দুরবগাহ পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও সুস্পষ্ট হয়েছে। রাম-রসায়ন বাংলা ভাষার বৃহত্তম গ্রন্থগুলির একটি,—অথচ এর প্রতিটি ছত্র সুলিখিত। তা ছাড়া, এর কথাংশে বহু সংস্কৃত পুরাণ-কাব্যের পূর্বৈতিহ্য দক্ষতার সঙ্গে বিন্যস্ত হয়েছে।

তবে ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কারের প্রকরণগত দীপ্তি যত, রাম-রসায়নে অনুভবের গভীরতা তত নেই।

এই সুবৃহৎ কাব্য ছাড়াও রঘুনন্দন রাধামাধবোদয় এবং গীতমালা নামে আরো দুখানি বাংলা-কাব্য লিখেছিলেন।

কুচবিহারের প্রাচীন রাজকুল রামায়ণ-মহাভারত রচনায় পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। এঁদের প্রবর্তনায় অন্ততঃ নয়খানি রামায়ণ-কাব্য রচিত হয়েছিল বলে জানা যায়। শুধু তাই নয়,—রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ স্বয়ং একখানি বাংলা কাব্যে মূল বাল্মীকি-রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদের চেষ্টা করেছিলেন।

কুচবিহার রাজসভায় রামায়ণ-কাব্য

তাছাড়া, ক্রিয়াযোগসাগর, বৃহদ্ধর্মপুরাণ প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যেরও মূলানুবাদ ইনি করেছেন।

২। বাংলা মহাভারত

বাংলা ভাষায় রামায়ণ এবং ভাগবত-কাব্যের প্রথম অনুবাদ হয়েছিল চৈতন্য আবির্ভাবের পূর্বে,—অন্ততঃ পঞ্চদশ শতকের পরে নয়। কিন্তু প্রথম বাংলা মহাভারত কাব্যের রচনা ষোড়শ শতকের আগে হয় নি। অন্যদিকে কৃত্তিবাসের রামায়ণ, আর মালাধর বসুর ভাগবত প্রথম অনূদিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপক জন-প্রীতি লাভ করেছিল। কিন্তু মহাভারত কাব্য সর্বজনীন রস-রূপ লাভ করতে পেরেছিল কেবল সপ্তদশ শতকে এসে,—কাশীরামের যুগান্তকারী রচনার কল্যাণে।

প্রাক্‌কথন

প্রথম মহাভারত কাব্য-রচনার প্রবর্তনা এসেছিল পূর্ববঙ্গের এক মুসলমান শাসকের কাছ থেকে। হুসেন শাহ ছিলেন গৌড়বঙ্গের বিদ্যোৎসাহী, বদান্য পাঠান নবাব (১৪৯৩—১৫১৮ খ্রীঃ)। চট্টগ্রাম জয় করে নবাব হুসেন তাঁর এক 'লস্কর' পরাগল খাঁকে সেখানকার শাসনাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করেন। মহাভারতের টুকরা গল্প শুনে পরাগল মুগ্ধ হয়েছিলেন। ফলে গোটা কাহিনী জানবার জন্যে তাঁর আগ্রহ জন্মে। তখঁন "কবীন্দ্র" পরমেশ্বর দাসকে তিনি আদেশ করেছিলেন "দিনেকে" শোনবার উপযোগী করে একখানি গোটা মহাভারত রচনা

প্রথম বাংলা-মহাভারত

করতে। কবীন্দ্রের কাব্য সম্পূর্ণ হয়েছিল কিনা সে সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। তাহলেও নিছক সূত্রাকারে লেখা রচনাটির জায়গায় জায়গায় উৎকৃষ্ট কবি-কর্মের ছাপ আছে। কবীন্দ্রের কাব্যের নাম ছিল 'পাণ্ডব-বিজয়'—পরাগলের উৎসাহে লিখিত হয়েছিল বলে সাহিত্যের ইতিহাসে কাব্যটি 'পরাগলী মহাভারত' নামেও খ্যাত।

মহাভারত প্রসঙ্গে বাংলা ভাষার দ্বিতীয় কাব্যের প্রবর্তক ছিলেন পরাগল-পুত্র ছুটি খাঁ। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি চট্টগ্রামের শাসক নিযুক্ত হন। পরমেশ্বরের মহাভারতের সংক্ষিপ্তি তাঁকে অতৃপ্ত করেছিল। তাই, কেবল অশ্বমেধপর্বের কাহিনীকে বিস্তৃত করে একখানি পূর্ণাঙ্গ কাব্য লিখ্‌তে তিনি আদেশ করেছিলেন শ্রীকর নন্দীকে; শ্রীকর কেবল অশ্বমেধপর্ব নিয়েই কাব্য লিখেছিলেন,—তাঁর রচনার প্রধান আশ্রয় ছিল সংস্কৃত জৈমিনি মহাভারত। পরমেশ্বরের মহাভারত কাব্যের কোনো কোনো পুঁথিতে শ্রীকর নন্দীর অশ্বমেধপর্ব জুড়ে দেওয়া আছে। এই কারণে প্রথমে মনে করা হয়েছিল এঁরা দুজনে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু সে ভ্রান্তির সম্পূর্ণ নিরসন হয়েছে এখন।

শ্রীকর নন্দীর অশ্বমেধপর্ব

কেবল অশ্বমেধপর্ব নিয়ে আরো যাঁরা ষোড়শ শতকে কাব্য লিখেছিলেন, রামচন্দ্র খান এবং কবি রঘুনাথ তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য।

অপরাপর কবি

ঐ একই শতাব্দীতে মহাভারতের বিভিন্ন পর্ব নিয়ে কাব্য রচনা করে সুখ্যাত হয়েছিলেন পিতা-পুত্র ষষ্ঠীবর আর গঙ্গাদাস সেন। এঁদের বাড়ি ছিল ঢাকায় মহেশ্বরদি পরগণা,—জিনাবদি গ্রামে। জাতিতে এঁরা বৈদ্য ছিলেন। ষষ্ঠীবরের ভনিতায় স্বর্গারোহণ-পর্বের পুঁথি পাওয়া গেছে। গঙ্গাদাসের ভনিতায় আবিষ্কৃত হয়েছে আদি ও অশ্বমেধ পর্বের পুঁথি। পিতা এবং পুত্র দুজনের লেখাই একদা পূর্ববঙ্গে জনসমাদর লাভ করেছিল। তাছাড়া, ষষ্ঠীবর সেন উৎকৃষ্ট মনসামঙ্গল কাব্যের লেখক হিসাবেও প্রাথমিক কালের সাহিত্য ইতিহাসে সুখ্যাত হয়েছিলেন। অধুনা এই ভ্রান্তি বিদূরিত হয়েছে। মনসামঙ্গলের কবি ষষ্ঠীবর যথার্থত ছিলেন শ্রীহট্টের দত্তবংশীয়।

ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস সেন

কিন্তু এঁদের কবি-কর্মের উৎকর্ষ সত্ত্বেও আগেই বলেছি মহাভারত কাব্য-রসকে আপামর বাঙালির জীবন-সীমায় পৌঁছে দেবার সার্থক কীর্তি কাশীরাম দাসের। আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে কবি জানিয়েছেন :—

"ইন্দ্রানী নামেতে দেশ বাস সিঙ্গী গ্রাম।
প্রিয়ঙ্করদাস-পুত্র সুধাকর নাম॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত, কৃষ্ণদাস-পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গঙ্গাধর-জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।
পাঁচালি প্রকাশি কহে কাশীরাম দাস।
অলি হব কৃষ্ণ-পদে মনে অভিলাষ॥

কাশীরাম দাস

অর্থাৎ ইন্দ্রানী পরগণার সিঙ্গীগ্রামে কবির বাস ছিল। তিন সহোদরের মধ্যে কাশীরাম ছিলেন মধ্যম। অগ্রজের নাম কৃষ্ণদাস, গঙ্গাধর ছিলেন কনিষ্ঠ। কমলাকান্ত দেব ছিলেন এঁদের পিতা। ইন্দ্রানী পরগণা এখন বর্ধমানের কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত।

কাশীরামেরা তিন ভাই-ই ছিলেন সুকবি। কৃষ্ণদাস লিখেছিলেন কৃষ্ণলীলা-মূলক শ্রীকৃষ্ণবিলাস কাব্য,—ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে কৃষ্ণকিঙ্কর নামে পরিচিত হয়েছিলেন। গদাধরের জগন্নাথমঙ্গল প্রধান ভাবে নীলাচল-মহিমা-কীর্তন। কিন্তু, কাব্য হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল কাশীরামের মহাভারত। এঁরা তিন সহোদরই চৈতন্য-লীলা-রস-সিক্ত ছিলেন। কায়স্থ "দেব" বংশে জন্ম নিয়েও কাশীরাম নিজেকে "দাস",—কৃষ্ণভক্ত-দাসানুদাস রূপে পরিচিত করেছেন। তাঁর হৃদয়ের রাগানুগা রতির শ্রেষ্ঠ পরিচয় এই সবিনয় আত্মনিবেদনে। সমগ্র কাব্যে কবি-প্রাণের এই প্রেমানুরক্তির স্পর্শ বিকীর্ণ হয়েছে,—ফলে মহাভারতের মহাবীর্য-গাথা সকরুণ মূর্ছনায় নবীন মধুর রূপ লাভ করেছে। কাশীরামের রচনা চৈতন্যোত্তর বাংলার প্রেম-ভক্তি-রসে সমাকুল বলেই, বাঙালির আনন্দের হাসি এবং বেদনার অশ্রুকে তা এক সূত্রে গেঁথে তুলেছে।

কবি-স্বভাব

কিন্তু, এই অ-মূল্য কাব্য-রত্নের রচনা কবির হাতে সম্পূর্ণ হয় নি বলেই মনে হয়। এ-সম্বন্ধে প্রবাদ আছে,—

"আদি সভা বন-বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর॥"

তাছাড়া, কবির 'ভ্রাতৃপুত্র' নন্দরাম দাস জানিয়েছেন :—

"কাশীরামদাস মহাশয় রচিলেন পোথা।
ভারত ভাঙিয়া কৈল পাণ্ডবের কথা॥
ভ্রাতৃপুত্র হই আমি তিহঁ খুল্লতাত।
প্রশংসিয়া আমারে করিল আশীর্বাদ॥
কাব্য-পরিচয় আত্মত্যাগে আমি বাপু যাই পরলোক।
রচিতে না পাই পোথা রহি গেল শোক॥
ত্রিপথগা যাই আমি কহিয়া তোমারে।
রচিবে পাণ্ডব কথা পরম সাদরে॥
আশীর্বাদ দিয়া মোরে গেলা সেই জন।
অবিরত ভাবি আমি শ্যামের চরণ॥
কাশীদাস মহাশয় আশীর্বাদ দিল।
তাহার প্রসাদে আমি পুরাণ রচিল॥"

প্রথম প্রবাদ এবং দ্বিতীয় প্রমাণ একত্র করলে বোঝা যায়,—কাশীরামদাস মহাভারতের আদি, সভা ও বনপর্ব লিখে সম্পূর্ণ করেছিলেন; আর বিরাট পর্বের অংশ মাত্র রচনা করে লোকান্তরিত হয়েছিলেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম স্বয়ং কবির আদেশে কাব্যের বাকি অংশ লিখে শেষ করেছিলেন। ঐতিহাসিকেরা সাধারণভাবে এই তথ্যের প্রামাণ্য স্বীকার করে নিয়েছেন। তা সত্ত্বেও বাজার-চলতি মহাভারতের আগাগোড়াই কাশীরামের ভনিতায় প্রচলিত রয়েছে দেখতে পাই। তার কারণ কৃত্তিবাসী রামায়ণের মত মুদ্রিত কাশীদাসী মহাভারতেও কবির রচনার প্রামাণ্য পরিচয় রক্ষিত হয় নি। আর দুঃখের কথা, কাশীরাম সম্বন্ধে উল্লেখ্য গবেষণাও এ-পর্যন্ত বিশেষ করে হয় নি। তবু, অ-নির্ভরযোগ্য রচনা-প্রবাহের মধ্যেও একটি ঐতিহাসিক তথ্য অ-তর্কিত রয়েছে। বাংলা মহাভারত রচনার সকল প্রয়াসের বিচিত্রতা একটি মাত্র ঐক্যের সূত্রে বাঁধা,—আর কাশীরাম দাস ছিলেন সেই এক ও অভিন্ন কাব্যাদর্শের প্রাণ-কেন্দ্র। মধুসূদনের কবিতা এই ঐতিহাসিক সত্যকেই ঘোষণা করেছে :—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
হে কাশী। কবীশ দলে তুমি পুণ্যবান্॥"

অনুমান করা হয়েছে,—১৬০২-০৩ খ্রীস্টাব্দে কাশীদাসী মহাভারতের আদি-পর্ব রচনা শেষ হয়,—একটি পুঁথিতে বিরাটপর্ব রচনার সমাপ্তি-তারিখ পাওয়া গেছে—১৬০৪-০৫ খ্রীস্টাব্দ।

আগে বলেছি কাশীরামের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম খুল্লতাতের অপূর্ণ কাব্য সম্পূর্ণ করার গৌরব দাবি করেছেন। তাছাড়া দ্বৈপায়ন দাস নামে কবির এক পুত্রও ক্ষুদ্র একখানি ভারত-কাব্য লিখেছিলেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত রচনায় উল্লেখ্য কোনো কাব্যগুণ ছিল না। কিন্তু পিতৃ-ঐতিহ্যের গৌরব সম্বন্ধে কবি অতি-সচেতন ছিলেন। তাই, ভনিতায় বারে বারেই পিতার নাম স্মরণ করেছেন, নানা রকমে!—

নন্দরাম দাস ও দ্বৈপায়ন দাস

"কাশীর নন্দন কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন যেন সকল সংসার॥"
"দ্বৈপায়ন দাসে বলে কাশীর নন্দন।
এতদূরে পাণ্ডবের স্বর্গে আরোহণ॥"

এর থেকে প্রমাণিত হয়,—কাশীরাম তাঁর জীবৎকালে এবং তার অব্যহিত পরেই অতুল কবি-কীর্তির অধিকারী হয়েছিলেন।

নন্দরামের পিতার নাম ছিল নারায়ণ। তাঁর ভনিতায় দ্রোণ ও কর্ণপর্বের পুঁথি পাওয়া গেছে।

রামায়ণ কাব্যের মত একাধিক বাংলা মহাভারতের রচনা-কর্মেও পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন কুচবিহারের রাজন্যগণ। এই সব কালের মধ্যে রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণের পৃষ্ঠপোষণে লেখা গোবিন্দ কবিশেখরের কিরাতপর্ব, আর প্রাণনারায়ণের রাজ্যকালে লেখা দ্বিজ শ্রীনাথের মহাভারত উল্লেখ্য। দুখানি কাব্যই সপ্তদশ শতকের রচনা।

অপরাপর কাব্য

অষ্টাদশ শতকের বাংলা মহাভারতের মধ্যে রাজেন্দ্র সেনের রচনারম্ভে কিছু অভিনবতা লক্ষিত হয়। রাজেন্দ্রের মূল কাব্যে শকুন্তলা-উপাখ্যানই বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

৩। ভাগবতের অনুবাদ ও কৃষ্ণলীলা কাব্য

চৈতন্যোত্তর বাংলা সাহিত্যে রামায়ণ ও মহাভারত কাব্যের তুলনায় উল্লেখযোগ্য ভাগবত-অনুবাদের পরিমাণ কম ছিল। মহাপ্রভুর জীবনচরণ এবং বৈষ্ণব ভাব-বিশ্বাসের কল্যাণে ভাগবতের মধুর-রসাবহ বৃন্দাবন

লীলাংশই কেবল বিশেষ ভক্তি ও জন-প্রীতির আকর হয়েছিল। এই সব লীলাকথাই আবার বৈষ্ণব পদাবলীর বিভিন্ন পালাগানে গীতি-সুন্দর রস-রূপ পেয়েছে। বস্তুতঃ সে-যুগের প্রতিভাধর শ্রেষ্ঠ কবিরা প্রায় সকলেই পদ-সংগীত রচনায় প্রবর্তিত হয়েছিলেন। এমন অবস্থায়, একই ভাগবত-কথার বৃন্দাবনলীলা নিয়ে যাঁরা আখ্যায়িকা-কাব্য লিখ্‌লেন, কবি হিসাবে তাঁরা অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিলেন বলেও বটে—আবার গীতের উচ্ছ্বাস বিবরণাত্মক রচনায় স্তিমিত হয়েছিল বলেও বটে,—মূলানুবাদ করে তেমন দক্ষতা দেখাতে পারেন্‌ নি। ফলে, সূক্ষ্ম বুনন কর্মের তুলনায় কাহিনীর বিচিত্রতা রচনার দিকেই তাঁদের ঝোঁক ছিল বেশি। এই চেষ্টায় অর্বাচীন পুরাণাদি থেকে যেমন রাধাকৃষ্ণের লীলা-মধুর গল্প সংগ্রহ করা হয়েছে, তেমনি নিছক লোককাব্যের দানলীলা, নৌকালীলা প্রভৃতি উপাখ্যানেরও রয়েছে দীর্ঘ সরস বর্ণনা। অথচ, মূল ভাগবতে যে ঐ সব প্রেম-কাহিনী ছিল না, কেবল তাই নয়—রাধার নাম পর্যন্ত সেখানে উল্লিখিত হয় নি। অতএব, ভাগবত-অনুবাদের নামে চৈতন্যোত্তর বাংলা সাহিত্যে যে-সব কাব্য রচিত হয়েছে, তার প্রায় সব কয়খানিতেই মূল ভাগবত-কথার চেয়ে অর্বাচীন পুরাণ ও লোক-সংগীতের বিমিশ্রতায় গড়া মধুর রসাস্বাদনের আকাঙ্ক্ষাই প্রধান হয়েছে। এতে ভাগবত-পুরাণ-কথার চেয়ে চৈতন্যলীলা-মাধুর্যের প্রতি যুগ-মানসের অতি-প্রবণতাই প্রমাণিত হয়।

চৈতন্যোত্তর 'ভাগবত' কাব্য

মহাপ্রভুর সমকালে একমাত্র যে কবি ভাগবতের নিষ্ঠাপূর্ণ অনুবাদ করেছিলেন, তিনি রঘুনাথ ভাগবতাচার্য। "ভাগবতাচার্য" উপাধিটি কবি-জীবনে চৈতন্য-কৃপার দান। গৌড় থেকে নীলাচলে ফিরে যাবার পথে মহাপ্রভু কবির কলকাতা বরাহনগরের বাড়িতে অবস্থান করেন। রঘুনাথ তাঁকে তখন মূল সংস্কৃত ভাগবত পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। তাই শুনে—'চৈতন্য ভাগবত' বলেছেন,—

রঘুনাথ ভাগবতাচার্য

"প্রভু বোলে ভাগবত এমত পড়িতে,
কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে ॥
এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচার্য।
ইহা বই আর কোন না করিহ কার্য ॥"

আগাগোড়া কাব্যের ভণিতায় কবি এই উপাধি বহুমান্য শিরোভূষণের মত ব্যবহার করেছেন। তাতে বোঝা যায়, গৌড় থেকে মহাপ্রভুর পুরীতে ফিরে যাবার পরে ভাগবতাচার্যের কাব্য রচনা আরম্ভ হয়।

গ্রন্থ রচনার প্রসঙ্গ বিবৃত করে কবি বলেছিলেন,—"মহাভাগবতে না কহিব অন্য কথা।" এই প্রতিশ্রুতি তিনি আগাগোড়া দৃঢ়তার সঙ্গে রক্ষা করেছেন। রঘুনাথ তাঁর কাব্যের নাম দিয়েছিলেন "কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী।" তাতে মূল ভাগবতের পুরো বারটি স্কন্ধেরই মোটামুটি অনুবাদ রয়েছে। কিন্তু, সংস্কৃত কাব্যের হুবহু আক্ষরিক অনুবাদই কেবল করেন নি কবি; প্রতিটি স্কন্ধের বিষয়-সার একত্র করে তাকে গল্পের পর গল্পে সাজিয়েছেন নিজের ইচ্ছামত। বর্ণনা ও প্রকাশভঙ্গিতেও স্বাধীনতার পরিচয় স্পষ্ট। তাহলেও রঘুনাথ ছিলেন পরম পণ্ডিত; আর এই কারণেই তাঁর নিজস্ব প্রকাশ-শৈলীতেও মূল ভাগবতের ভাব-পরিবেশকে তিনি ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি।

রঘুনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্তি,—ভাগবতের শ্লোক-এর নবীন ব্যাখ্যা করে মহাপ্রভুকে কৃষ্ণাবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রথম প্রয়াস। এ-সম্পর্কে তার বিচার ছিল আগাগোড়া যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত। কলিতে গৌরাবতার-বাদ প্রতিষ্ঠার গৌরব জীবগোস্বামীর ওপরে অর্পিত হয়েছে। কিন্তু রঘুনাথ ছিলেন এই পথের প্রথম পথিকৃৎ।

ইনি প্রখ্যাত বৈষ্ণব-শিরোমণি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন।

রঘুনাথ দাসের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণীর পরেই উল্লেখ্য দ্বিজমাধবের লেখা শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। এই কাব্যেই চৈতন্যোত্তর ভাগবত অনুবাদ-কাব্যের সকল বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়েছে;— মূলানুবাদের প্রতি কবি-চেতনার নিষ্ঠা এইখানেই স্পষ্টতঃ শিথিল হয়ে পড়েছে. সেই সঙ্গে বিচিত্র সূত্র থেকে অভিনব কাহিনী আহরণের আকাঙ্ক্ষাও প্রবল হয়েছে।

দ্বিজমাধব

এই কবির ব্যক্তি-পরিচয় নিয়ে নানা মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন,—ইনি বিষ্ণুপ্রিয়ার সহোদর ছিলেন; আবার কারো মতে ইনি ছিলেন তাঁর খুল্লতাত-পুত্র। মৈমনসিংহের যশোদল-গ্রামে রাঢ় বন্দ্যোপাধ্যায় গোস্বামীরাও কবির উত্তরাধিকার দাবি করেন। মনে হয়, মাধব বিষ্ণুপ্রিয়ার সহোদর অন্ততঃ ছিলেন না।

কবি বলেছেন, "কৃষ্ণচৈতন্য"-এর স্বপ্নাদেশ পেয়েই তিনি কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল "ভাগবত-সংস্কৃত"-কে "লোক-ভাষা-রূপে" বর্ণনা করে তাকে সর্বজনের বোধগম্য করে তোলা। কবি কিন্তু ইচ্ছা করেই এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি। ভাগবত ছাড়াও তাঁর রচনায় মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে অজস্র কাহিনী যথা-ইচ্ছা গৃহীত হয়েছে। অন্য দিকে, দানলীলা, নৌকা-লীলা ইত্যাদি লোক-কথার বর্ণনাতেও কবির উৎসাহ ছিল সমতুল। আগাগোড়া, কাব্য-কাহিনীতে একচ্ছত্র নায়িকার ভূমিকা পেয়েছেন রাধা,—যে রাধার নামও নেই ভাগবতে। এ-দিক থেকে কবি ভাগবত ঐতিহ্যের চেয়ে চৈতন্য-প্রেমের জীবন-বাণীর দ্বারাই একান্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর "রাগানুগ" কবি-প্রাণ বস্তুতঃ রাধাকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ প্রেম-লীলারসে বিহ্বল হয়েছিল। স্থানে স্থানে উচ্ছল ভাবের সে আকূতি সংগীতের আকার পেয়েছে। কবি সে-সব জায়গায় উপযুক্ত সুর-লয়েরও নির্দেশ দিয়েছেন, ফলে, ভাগবতের নিষ্ঠাপূর্ণ অনুবাদের চেয়ে, চৈতন্য-ভক্তি-ঋদ্ধ প্রেম-গীতিকা রূপেই দ্বিজমাধবের কাব্য শ্রেষ্ঠ মর্যাদা পেয়েছে। কাব্য-বর্ণনায় মহাপ্রভুকে ইনি স্পষ্ট ভাষায় কৃষ্ণাবতার বলে ঘোষণা করেছেন।

এঁর কাব্য চৈতন্য-সমকালে,—অথচ,—রঘুনাথদাসের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিনীর পরে রচিত হয়েছিল বলে মনে করবার কারণ আছে।

কবি কৃষ্ণদাসের কৃষ্ণমঙ্গলও দ্বিজমাধবের কাব্যাদর্শ অনুসরণ করেছিল। অর্থাৎ অল্প পরিমাণ ভাগবত-কথার সঙ্গে হরিবংশ প্রভৃতি পুরাণ এবং নৌকাখণ্ডাদি লৌকিক উপাখ্যান মিলিয়ে কৃষ্ণমঙ্গলের বিচিত্রতাপূর্ণ কাহিনী গড়ে উঠেছিল। তাছাড়া, মধুর রসাবেশের নিবিড়তা সৃষ্টির প্রতিই কবির উৎকণ্ঠা ছিল সমধিক। এঁর পিতার নাম ছিল যাদব,—মা ছিলেন পদ্মাবতী। বাড়ি ছিল তাঁদের গঙ্গার পশ্চিম পারে। কাব্য-রচনাকাল ষোড়শ শতকের একেবারে শেষ, অথবা সপ্তদশ শতকের একেবারে শুরুতে।

কৃষ্ণদাসের কৃষ্ণমঙ্গল

ষোড়শ শতকের আর একজন সুখ্যাত কবি ছিলেন কবিশেখর দেবকীনন্দন সিংহ। তাঁর পিতার নাম ছিল চতুর্ভুজ,—মা ছিলেন হীরাবতী বা হারাবতী। কবি নিজে লিখেছেন,—

দেবকীনন্দন সিংহ

"আর একখানি দোষ না লবে আমার।
পুরাণের অতিরিক্ত লিখিব অপার॥"

দৈবকীনন্দনের আগাগোড়া কাব্যটি এই উক্তিরই যেন সার্থক ফলশ্রুতি। আর এই রচনা-কর্মে পাণ্ডিত্যের চেয়ে চৈতন্য-অনুরক্তিময় ভাবাতিশয্যই কবি-মনকে চালিত করেছে বেশি। ফলে দৈবকীনন্দনের রচনায় সহজ কলা-কুশলতা হৃদয়স্পর্শী হয়েছে।

ডঃ সুকুমার সেন মনে করেছেন,—এই কবিশেখর দৈবকীনন্দনই ছিলেন বৈষ্ণব-পদাবলী-খ্যাত 'বাঙালি বিদ্যাপতি'। রায়শেখর, কবিশেখর ইত্যাদি ভণিতায় এই বাঙালি বিদ্যাপতির অসংখ্য পদ রয়েছে। অবশ্য পদকর্তা কবিশেখর এবং কবিশেখর দৈবকীনন্দনের অভিন্নতা সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে মতভেদ রয়েছে। দৈবকীনন্দনের অনুবাদ-কাব্যের নাম "গোপাল পাঁচালী"। এর আগে তিনি সংস্কৃত ভাষায় দুখানি এবং বাংলা ভাষায় আরো একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সংস্কৃত রচনা দুটি হচ্ছে,— গোপীনাথ-বিজয় নাটক এবং গোপাল-চরিত মহাকাব্য। তাঁর প্রথম রচিত বাংলা কাব্যের নাম ছিল গোপালের কীর্তনামৃত।

শ্যামদাস

"দুঃখী" শ্যামদাসের 'গোবিন্দমঙ্গল' কাব্য রচনার কাল সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে মতভেদ রয়েছে। কেউ মনে করেছেন, কবি অষ্টাদশ শতকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, আবার কারো কারো মতে তিনি ছিলেন সপ্তদশ শতকের লোক। ডঃ সুকুমার সেন কবিকে ষোড়শ শতাব্দীতে স্থাপিত করেছেন। তাঁর মতে, কবির পিতা এবং মহাভারত-বিখ্যাত কবি কাশীরাম দাসের খুল্লপিতামহ শ্রীমুখ ছিলেন অভিন্ন ব্যক্তি। কবির মা'র নাম ছিল ভবানী;—মেদিনীপুর জেলায় এঁদের বাসভূমি ছিল বলে মনে করা হয়েছে। শ্যামদাসের কাব্যে লৌকিক উপাখ্যানের প্রভাবই বেশি। মঙ্গলকাব্যের আদর্শে লেখা 'রাধার বারমাস্যা' যেমন অভিনব তেমনি করুণ।

কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণবিলাস

কাশীরাম দাসের অগ্রজ শ্রীকৃষ্ণদাসের কাব্যের নাম ছিল শ্রীকৃষ্ণবিলাস। রচনাকাল সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকের প্রথম বা দ্বিতীয় বছর। কাশীরামের প্রসঙ্গে এঁর ব্যক্তি-পরিচয় উদ্ধৃত হয়েছে। কাব্যের বৈশিষ্ট্য তেমন কিছু নেই। কবি বারে বারে তাঁর

কাব্যকে ভাগবত-সার নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু, গল্পাংশে ভাগবতের বহির্ভূত কাহিনীর বর্ণনাই বরং বেশি।

অভিরামদাস

অভিরাম দাস তাঁর শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল লিখেছিলেন সপ্তদশ শতকে। এতে গল্পের বিচিত্রতা রয়েছে; কিন্তু লৌকিক রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীর ব্যবহার সংক্ষিপ্ত। ইনি শ্রীচৈতন্যকে বন্দনা করে কাব্যারম্ভ করেছেন।

ভবানন্দ

হরিবংশ কাব্যের কবি ভবানন্দ সম্ভবতঃ শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। সংস্কৃত হরিবংশ পুরাণের সঙ্গে এঁর রচনার কোনো যোগ নেই। প্রধানতঃ রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমের গ্রামীণ কাহিনীকেই ইনি রস-রূপ দিয়েছেন। দানলীলা, নৌকা-লীলাদি ভবানন্দের মুখ্য বর্ণিতব্য বিষয়। ইনি সপ্তদশ শতকের কবি ছিলেন।

দ্বিজ পরশুরাম

দ্বিজ পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল ঐতিহাসিক খ্যাতি পেয়েছে আবিষ্কর্তার মহিমায়। এই কাব্যের একখানি আগাগোড়া সম্পূর্ণ পুঁথি আবিষ্কার করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। কাব্যের বিষয় ছিল দানলীলা, নৌকা-লীলাদি। কবি বীরভূমবাসী ছিলেন বলে মনে হয়।

অপরাপর রচনা

ষোড়শ শতকের পরে ভাগবত-অনুবাদ কাব্যে মূল ভাগবতের প্রভাব ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে এসেছে। আরো পরে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে অর্বাচীন পুরাণ-কথা এবং ততোধিক লোক-কাব্যের গল্প-বিচিত্রতা এই সব রচনা-প্রবাহে অভিনবতার কৌতুক সৃষ্টি করেছে। আগে বলেছি,—বাংলা সাহিত্যের দিকে দিকে এই কৌতুক-শিথিল লঘুতার সূচনা দেখা দেয় চৈতন্য-প্রভাব-বিনষ্টির যুগে। অষ্টাদশ শতকের অনুবাদ কাব্যে এই বিনষ্টি-লক্ষণ স্ফুটতর হয়েছে।

বলরাম দাসের শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত কাব্যে ভাগবত-প্রসঙ্গ দুর্লভ। অতি অর্বাচীন ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের গল্পাধারে তিনি লৌকিক দেহাসক্তিপূর্ণ সহজিয়া রসের পরিবেশন করেছেন। কাব্যের রচনাকাল ১৭০২-০৩ খ্রীস্টাব্দ বলে অনুমিত হয়েছে।

বৈষ্ণব প্রসঙ্গের আধারে দেহ-রসাসক্ত নূতন সহজিয়া সাহিত্যপ্রবাহের মধ্যে প্রধানভাবে উল্লেখ্য চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত দেহ-কড়চা এবং

চৈত্যন্যরূপ প্রাপ্তি ইত্যাদি গ্রন্থ। বাংলা-সাহিত্যের ঊষা-যুগে সহজিয়া দেহ-সাধনার শ্রেষ্ঠ কাব্যরূপ চর্যাপদ। চৈতন্য-পূর্ব মধ্যযুগে কৃষ্ণকীর্তন অতুল্য সহজিয়া কাব্যকীর্তি। কিন্তু আগে বলেছি,—চৈতন্য-মহিমার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ প্রেম-সাধনার জগতে দেহ-বিবিক্ততায় আদর্শ সৃষ্টি। ফলে, চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব সাহিত্যই নয় কেবল,—প্রায় সকল সাহিত্যই কাম-গন্ধের প্রাচুর্যহীন, পরিস্রুত প্রেম-রসে ভরপুর। কিন্তু, চৈতন্য-ভাব শিথিলতার সঙ্গে বাংলাদেশে আবার দেহাসক্তি জগে উঠেছে,—প্রেম-ভাণ্ডারকে ছাপিয়ে। ফলে উচ্চ-নীচ উভয় সমাজেই শৃঙ্গারন্ধতা প্রবল হয়েছে,—নীচু শ্রেণীতে বিশেষ করে লোক-সাহিত্যের আকারে সেই অন্ধ দেহাসক্তি প্রকাশ পেয়েছে সহজিয়া কবি-কর্মের মাধ্যমে। বলা বাহুল্য, চৈতন্য ভাবৈতিহ্যের বিনষ্টি-যুগে জাত এই সাহিত্যের রচনা বিখ্যাত বৈষ্ণব-কবি চণ্ডীদাসের দ্বারা হয় নি। ইনি নব-রসের রসিক নবীন চণ্ডীদাস। বৈষ্ণব কাব্যে বৈষ্ণব ভাবানুভূতির ঐতিহাসিক পরিসমাপ্তি ঘটেছে এঁদের নূতন রচনা-প্রবাহে।

ইতিহাসের পরি-সমাপ্তি

চৈতন্য-উত্তর মঙ্গলকাব্য

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত চৈতন্য-উত্তর মঙ্গলকাব্যও মহাপ্রভুর জীবন-ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। আগে দেখেছি, মঙ্গল-কাব্যের উদ্ভব ঘটেছিল সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে। সেখানে বিভিন্ন লোক-দেবতাদির মধ্যে রেষারেষির ভাবটাই ছিল প্রধান। কিন্তু, মহাপ্রভুর অ-হেতুক প্রেম-সাধনার সামাজিক ফলশ্রুতি হিসেবে,—এবার মঙ্গলসাহিত্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে প্রতি সহজ সহনশীলতা একান্ত প্রীতি-ভক্তিতে পরিণত হয়েছিল। প্রথম যুগের মঙ্গলকাব্যে দেবতার অমিতাচারী শক্তির সামনে মানুষকে নিতান্ত অসহায়, কৃপা ভিক্ষুরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু চৈতন্য-উত্তর যুগে মানুষ তার মানসিক শক্তি ও সাহসের বলে অজেয় হয়ে উঠেছে—দেবতার হাতের অকারণ লাঞ্ছনা তার প্রতিরোধের সামনে হয়েছে পরাভূত। ফল কথা, সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে কল্পিত মঙ্গল-সাহিত্য চৈতন্য-চেতনার ভাবস্পর্শে মানব-মহিমার বিজয়গীতিরূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। সেই একই মনসা, চণ্ডী এবং ধর্মমঙ্গল সাহিত্যে অতঃপর এই যুগ স্বভাবের সাধারণ শিল্প-প্রকাশই লক্ষ্য করব।

চৈতন্যোত্তব মঙ্গল-কাব্যের বিশিষ্টতা

১। চৈতন্যোত্তর মনসামঙ্গল

চৈতন্যোত্তর মনসামঙ্গল কাব্যের প্রথম উল্লেখ্য কবি ষষ্ঠীবর দত্ত। এঁর বাড়ি ছিল শ্রীহট্টের গয়গড় গ্রামে; কবি ছিলেন জাতিতে বৈদ্য। তাঁর একটিমাত্র মেয়ে ছিল; ছেলে ছিল না একটিও।

ষষ্ঠীবর দত্ত

ষষ্ঠীবরের পরেই মনসামঙ্গলের উল্লেখ্য কবি ছিলেন বংশীদাস। চৈতন্যোত্তর মনসামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবিও ছিলেন ইনি। আবার, মৈমনসিংহের রামায়ণ-কবি,—"মহিলা কৃত্তিবাস' চন্দ্রাবতী ছিলেন এঁরই কন্যা। পিতৃ-পরিচয় দিয়ে চন্দ্রাবতী বলেছেন,—

বংশীদাস

"ধারা স্রোতে ফুলেশ্বরী নদী বহে যায়।
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায় ॥
ভট্টাচার্য বংশে জন্ম অঞ্জনা ঘরণী।
বাঁশের পালার ঘর ছনের ছাউনি ॥
ঘট বসাইয়া সদা পূজে মনসায়।
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছাড়ি যায়।
দ্বিজ বংশী পুত্র হইলা মনসার বরে।
ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে ॥"

বংশীদাস তাঁর পিতার চেয়েও দরিদ্র ছিলেন,—অধিকতর মনসা-প্রীতির জন্যই কি না, কে জানে? পিতার দারিদ্র্য চিত্রিত করে চন্দ্রাবতী লিখেছিলেন,—

"ঘরে নাই ধান চাল, চালে নাই ছানি।
আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পাণি ॥"

কবি-পরিচয়

কেবল মনসামঙ্গল রচনা নয়,—আসরে তা গান করাই ছিল বংশীদাসের প্রধান জীবিকা। চৈতন্যধর্মের প্রবর্তনায় দেবনাম কীতনের রীতি সারা বাংলা দেশে সুপ্রচলিত হয়েছিল। কেবল 'হরিনাম' নয়,—সেই সঙ্গে রামায়ণ, মহাভারত, এমন কি মঙ্গলকাব্য সমূহও আসরে গীত হ'ত। এইরূপ মনসামঙ্গলের কীর্তনই ছিল দ্বিজবংশীর পেশা।

রস-সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর লেখনী পরিমিতি-বোধের দ্বারা সহজে নিয়মিত হয়েছিল। তাই তাঁর রচনার সুষমাও ছিল স্বতোভাস্বর। লেখনীর মত দ্বিজবংশীর কণ্ঠও ছিল অমৃতস্বাদী। এ-বিষয়ে বিস্ময়কর লোক-প্রবাদ রয়েছে। একবার 'মনসার ভাসান' গাইতে যাওয়ার পথে নিঃসীম জলাকীর্ণ হাওরে ভয়ানক দস্যু কেনারামের হাতে ধরা পড়েছিলেন কবি। মৃত্যুর আগে তিনি শেষবারের মত ভাসান গাইবার অবকাশ প্রার্থনা করেন। সেই অন্তিম পরিবেশে কবিকণ্ঠে উৎসারিত বেহুলার বেদনা-সংগীত দস্যুর চিত্তকে বিগলিত করে তুলেছিল,—হাত থেকে তার তরবারি খসে পড়েছিল,—চোখে ঝরেছিল জল। বাকি জীবন কেনারাম কবির দলের সেবক হয়ে অতিবাহিত করে।

কবি-রচিত বেহুলার হৃদয়প্লাবী বেদন-কথার একটি অংশ ঃ—

"নিরখি নিরখি কান্দে চন্দ্রমুখী,
বসি ত্রিবেণীর ঘাটে।
ত্রিবেণীর চর দেখি লাগে ডর
ঠেকিল ঘোর সংকটে।
চান্দর কোঙর প্রভু লক্ষীধর,
দেহ হে উত্তর মোরে।
আমি অভাগিনী কিছুই না জানি,
ভাসিলু একা সাগরে॥"

কাব্য-স্বভাব

দ্বিজবংশী সপ্তদশ শতকের কবি ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনসামঙ্গলকাব্য রচনার গৌরব ছিল কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের। পূবের তুলনায় পশ্চিম বাংলায় মনসামঙ্গল রচনার তৎপরতা ছিল কম। অবশ্য তা অকারণ ছিল না। পূর্ববঙ্গের মত পশ্চিমবঙ্গ অত জলাকীর্ণ নয়,—তার সর্প ভীতিও পূর্ব-বঙ্গের মত অত আতিমাত্রিক ছিল না। তাহলেও ক্ষেমানন্দের কবি-কর্ম উল্লেখ্য উৎকর্ষের আকর ছিল। গ্রন্থ-রচনার কারণ সম্বন্ধে কবি কৌতুককর কাহিনী বলেছেন ঃ—তাঁর মুল বাডি ছিল বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামে। কিন্তু নানা অশান্তির দরুণ তাঁকে দেশ ছাড়তে হয়,—তাতে বাল্যশিক্ষারও বিভ্রাট ঘটে। অবশেষে রাজা বিষ্ণুদাসের ভাই ভারামল্লের কাছে কবি তিনখানি গ্রাম লাভ করেন দান হিসেবে। সেখানে একদিন সন্ধ্যায় খডবনে মুচিনী-বেশে মনসা তাঁকে দেখা দেন এবং কাব্য-রচনায় প্রবুদ্ধ করেন। মনসাকে কবি বারে বারে কেতকা-নামে অভিহিত করেছেন,—"কেয়াপাতে জন্ম হৈলা কেতুকা সুন্দরী।" তাই নিজেও আত্মপরিচয় দিয়েছেন কেতকাদাস বলে। এর কাব্য-রচনার কাল আনুমানিক সপ্তদশ শতক।

কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর পরিবেশ-সচেতনতা ও ব্যাপক কৌতূহল। বেহুলার স্বর্গ-যাত্রার পথ বর্ণনা করে ২২টি ঘাটের নাম দিয়েছেন তার মধ্যে চৌদ্দটি এখনও রয়েছে,—দামোদর, বাঁকা নদী ও বেহুলা নদীর দুই তীরে। মধ্যযুগের বাঙালির পক্ষে এই ভৌগোলিক জ্ঞান

প্রায় অপ্রত্যাশিত ছিল। দেব-সভায় বেহুলার নৃত্যের প্রসঙ্গে কবি প্রাচীন নটীনৃত্যের একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেছেন। তাঁর কাব্যে ষোড়শ শতকের খ্যাততম চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরামের রচনার প্রভাবও যথেষ্ট।

ক্ষেমানন্দ

ক্ষেমানন্দ নামে আর একজন কবির মনসা-মঙ্গলের পুথি পাওয়া গেছে মানভূম অঞ্চলে। তাতে ঐ অঞ্চলের ভাষার ছাপও রয়েছে। কাব্যটি নিতান্ত ক্ষুদ্র এবং রচনাতে উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য কিছু নেই।

কবি সীতারাম

সীতারাম নামে পশ্চিমবঙ্গের আর একজন কবি মনসামঙ্গল লিখে আসলে রাঢ়ের দেবতা ধর্মঠাকুরের জয়গান করেছেন। সীতারাম ধর্মমঙ্গলের কবি হিসাবেই সুখ্যাত। মনসা-মঙ্গলে তিনি মনসাকে দিযে ধর্মের পূজা করিয়েছেন।

জীবন মৈত্র

বগুড়া জেলার কবি জীবন মৈত্র তাঁর রচনায় প্রচলিত মনসা-কাহিনীর সঙ্গে মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণের সর্প-পূজার উপাখ্যান যুক্ত করে গল্পের বিচিত্রতা সম্পাদন করেছেন। কবির পিতার নাম ছিল অনন্ত মৈত্র,—মা ছিলেন স্বর্ণমালা। নাটোরের রানী ভবানীর ছেলে রামকৃষ্ণের প্রজা ছিলেন তিনি; জনসাধারণের কাছে তাঁর পরিচয় ছিল 'পাগলা জীবন' নামে। চৈতন্য-চেতনার বিনষ্টি-যুগে বাংলা সাহিত্যের দিকে দিকে বিচিত্রতা ও অভিনবতার যে আকর্ষণ দেখা দিয়েছিল,—মনসামঙ্গলের ইতিহাসে জীবনের কাব্য তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

২। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

চৈতন্যোত্তর চণ্ডীমঙ্গল

চৈতন্যের পূর্ব ও পরবর্তী বাংলায় মনসামঙ্গলের রচনা চলেছিল প্রায় অবারিত ধারায়। চণ্ডীমঙ্গলের কাব্য এবং কবি-সংখ্যা সে তুলনায় অনেক কম, যদিও সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল-কবির মর্যাদার অধিকারী হচ্ছেন চণ্ডী-মঙ্গলেরই একজন রচয়িতা,—মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। একদিক থেকে, মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে চণ্ডীমঙ্গলের দান প্রায় অতুল্য। অনুমান করা হয়, প্রাচীন পাঁচালী থেকেই মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি। অর্থাৎ, তুর্কী আক্রমণের পূর্বকালেও লৌকিক মঙ্গল-দেবতাদের পূজা বহুদিন থেকে

প্রচলিত ছিল। সেদিনকার অর্ধ বা অল্পশিক্ষিত ভক্তগণ পাঁচালীর অ-পূর্ণ গঠিত কাব্যাধারে তাঁদের দেবতাদের বন্দনা করেছিলেন। সেই দুর্বল শিল্পকর্মকে সংস্কৃত পুরাণের আদর্শে নবরূপায়িত করে মঙ্গলকাব্যের জন্ম হয়। এই ঐতিহাসিক তথ্য জানা থাকলেও, প্রাচীন পাঁচালীর আকৃতি ও প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দুর্লভ। কারণ তার কোনো পুঁথি পাওয়া যায়নি। চণ্ডীমঙ্গলের সাহিত্যে কিছু সংখ্যক উৎকৃষ্ট পাঁচালীর পরিচয় আছে। যদিও এই সব কাব্য অর্বাচীনকালের রচনা,—তবুও প্রাচীন পাঁচালীর স্বতন্ত্র আঙ্গিকটি তাতে আভাসিত হয়েছে।

এইসব রচনার মধ্যে একখানি উল্লেখ্য সৃষ্টি দ্বিজ জনার্দনের চণ্ডী-পাঁচালী। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন জনার্দনের পাঁচালীকে প্রায় আড়াইশ' বছরের পুরানো বলে অনুমান করেছিলেন। একালের পণ্ডিতেরা কাব্যটির অত প্রচীনতার দাবি অস্বীকার করেছেন; তাহলেও, পাঁচালী-কাব্যের স্বতন্ত্র রূপটি এতে আভাসিত হয়েছে,—সন্দেহ নেই।

চণ্ডীর পাঁচালী

পূর্ণাঙ্গ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সিদ্ধ শিল্পী হিসেবে প্রথমে উল্লেখ্য দ্বিজ মাধব। আকবরের শাসনকালে সপ্তগ্রামের ব্রাহ্মণবংশে এঁর জন্ম হয়েছিল.—পিতার নাম ছিল পরাশর। তাঁর কাব্যের নাম ছিল 'সারদাচরিত', অথবা মঙ্গলচণ্ডীর গীত।

রচনাকাল সম্বন্ধে কবি জানিয়েছেন,—

দ্বিজমাধব

"ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধব গায় শারদা-চরিত ॥"

অর্থাৎ ১৫০১ শক,—তথা ১৫৭৯ খ্রীস্টাব্দে মাধবের সারদা-চরিত রচনা শেষ হয়েছিল। এই কাব্যের অধিকাংশ পুঁথি পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া গেছে। মনে হয়, কবি চট্টগ্রামে বাস পরিবর্তন করেছিলেন। আর সেখানেই হয়ত তাঁর কাব্য রচিত হয়েছিল।

দ্বিজ মাধবের কবি-স্বভাবের পরিচয় দিয়ে ডঃ দীনেশচন্দ্র লিখেছিলেন,—"ক্ষুদ্র ঘটনা, ক্ষুদ্র কথা, তুচ্ছ বিষয় লইয়া অনেক শ্রেষ্ঠ কবিত্ব বিকাশ পায়। কবি ব্যাধের ক্ষুদ্র কুটীর বর্ণনা করিবেন, এস্থলে লেখনীর ছেঁড়া কাঁথা,

মাংসের পসরা ও ভেরাণ্ডার থামই বর্ণনীয় বিষয়।......মাধু যে কার্য হাতে লইয়াছিলেন, তাহার যোগ্য ক্ষমতা তাঁহার বেশ ছিল,—'দুলি পেলি খেলী এয়ো আইল ব্যাধ ঘরে। মৃগচর্ম পরিধান, দুর্গন্ধ শরীরে॥" প্রভৃতি বর্ণনায় দেখা যায়, মাধু ভেরাণ্ডার থাম ধরিয়া ব্যাধের ঘরে উঁকি মারিয়া নিজে এই সকল দেখিয়াছেন ; সেখানে ব্যাধ-রূপসীগণের অর্ধাবৃত অঙ্গের দুর্গন্ধ সহ্য করিয়াও ভদ্র কবি তাহাদের গ্রাম্যরূপের ফটো তুলিয়া লইয়াছেন,—তাহা মার্জিত করিয়া সুন্দর করিতে যান নাই।"

কবি-স্বভাব

মাধবাচার্যের কবি-প্রতিভার এর চেয়ে যথার্থ পরিচয় দান অসম্ভব। চণ্ডী-মঙ্গলেব, তথা মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরামের সঙ্গে এঁর রচনার তুলনা করা হয়। বাস্তব জীবনকে তার ভাল-মন্দ, সম্পদ ও দীনতার সকল খুঁটিনাটি নিয়ে এঁরা দুজনেই প্রত্যক্ষ করেছেন, দুজনেই ছিলেন তাঁরা বাস্তবের কবি। কিন্তু মুকুন্দরামের প্রতিভা ছিল প্রথম শ্রেণীর চিত্রশিল্পীর, বস্তুর স্থূল-রূপকে তিনি কল্পনার রং দিয়ে সূক্ষ্ম লাবণ্যময় করেছেন,—অথচ তার বাস্তব মূল্যকে আচ্ছন্ন হতে দেন নি। অন্যদিকে মাধবাচার্যের শিল্প প্রথম শ্রেণীর প্রতিবিম্ব-রচয়িতার,—Photographer-এর। তাঁর কবি-মন ছিল যেন একটি ফটো-তোলার ক্যামেরা ; বস্তুর হুবহু প্রতি-রূপটি সেখানে ধৃত হয়ে আছে যথোচিত ভাষার ফ্রেম-এ। দীনেশচন্দ্রের ভাষায় সত্যই মাধু-কবি তাঁর কাব্যে "গ্রাম্যরূপেব ফটো তুলিয়া লইয়াছেন"।

কিন্তু, কবির এই অনন্যচিত্ত বাস্তব-অনুরাগের মধ্যেও সম্পৃক্ত হয়েছে চৈতন্য-চেতনা-বিমথিত বৈষ্ণব ভাবুকতা। মূল গল্পের বিভিন্ন পরিচ্ছেদের মুখবন্ধ হিসাবে কবি একটি-দুটি ছত্রের "ধুয়া" রচনা করেছেন। প্রত্যেকটি উপাখ্যানের মূল ভাব ঐ ধুয়ার মধ্যে আভাসে ব্যঞ্জিত। আর, গল্প-ভাবের এই কাব্যিক ব্যঞ্জনা রচনা করতে কবি রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-কথাকে প্রায় একমাত্র অবলম্বন করেছিলেন। মূল প্রসঙ্গ থেকে বিচ্যুত না হয়েও রাধা-কৃষ্ণলীলা-রসে অবগাহনের এই আনন্দে কবির চৈতন্য-নিষ্ঠার পরিচয় সুব্যক্ত :—

কাব্যরূপ

"কাল ভ্রমরা, যথা মধু তথা চলি যাও।
আমার সংবাদ প্রাণনাথেরে জানাও॥

সে কথা কহিবে প্রভুর ঘনাইয়া কাছে।
সুস্থির সম্ভ্রমে কেঁও লোকে শুনে পাছে॥
চরণ-কমলে শত জানাইও প্রণাম।
অবশেষে শুনাইও রাধার নিজ নাম॥"

মুকুন্দরাম

চণ্ডীমঙ্গল,—তথা মঙ্গলকাব্য মাত্রেরই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরামের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবে, ষোড়শ শতকের একেবারে শেষভাগে তাঁর কাব্য রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

কবির নিজের জীবন-কথা তাঁর কাব্যের মানবিক আবেদনকে বহুল অংশে বর্ধিত করেছে। বর্ধমানের দামুন্যা গ্রামে ছিল কবির পৈতৃক বাসভূমি। আকবরের রাজত্বকালে মানসিংহ যখন "গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ" তখন ডিহিদার ছিলেন মামুদ সারপ। তাঁর অত্যাচারে "ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব",—সুজনেরা অতিষ্ঠ হয়েছিলেন,—অনেককে আত্মরক্ষার জন্য দেশত্যাগও করতে হয়েছিল। ভয়-ত্রস্ত মুকুন্দরামও সপরিবারে হাঁটা-পথে পালিয়ে গিয়েছিলেন। অনেক দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ পেরিয়ে, অবশেষে কবি "কুচট্যা নগরে" এসে উপস্থিত হন। সেখানে,—

কবি জীবনী

"তৈল বিনা কৈলুঁ স্নান   করিনু উদক পানে
শিশু কাঁদে ওদনের তরে।
ক্ষুধাভয় পরিশ্রমে   নিদ্রা যাই সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥"

স্বপ্নেই কবিকে দেবী মহামন্ত্র দান করেছিলেন,—আর আদেশ করেছিলেন চণ্ডী-কাব্য রচনা করতে। এর পরে মেদিনীপুরের আড়রা গ্রামে ব্রাহ্মণ জমিদার বংশের আশ্রয়লাভ করেন তিনি। সেইখানেই "রাজা রঘুনাথ"-এর সভাকবিরূপে কাব্য রচনা করেন। ভনিতাংশে কবি বংশ-পরিচয় দিয়েছিলেন :—

"মহামিশ্র জগন্নাথ   হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই,   চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥"

অর্থাৎ জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র হৃদয় মিশ্র ছিলেন কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের পিতা ; আর, কবিচন্দ্র ছিলেন তাঁর 'অগ্রজ ভাই'। তাছাড়া, আর এক ধরনের ভনিতা থেকে জানা যায়,—কবির এক ছেলে এবং এক মেয়ে ছিলেন,—যথাক্রমে শিবরাম ও যশোদা। তাঁর পুত্রবধূর নাম ছিল চিত্রলেখা,—জামাতা ছিলেন মহেশ

মুকুন্দরামের কাব-চেতনা চৈতন্য-ভক্তিরসে নিষ্ণাত ছিল। কাব্যারম্ভে চৈতন্য-বন্দনা করেছিলেন তিনি,—

কবি-স্বভাব

"অবনীতে অবতরি চৈতন্য রূপেতে হরি,
বন্দিব সন্ন্যাসী চূড়ামণি।
সঙ্গে প্রভু নিত্যানন্দ, ভুবনে আনন্দ-কন্দ
মুকতির দেখাল্য সরণি॥"

চৈতন্য-কৃপায় মানবের জীবন্মুক্তির অনুভব কবির হৃদয়-বিদ্ধ হয়েছিল,—ফলে, তাঁর সমগ্র কাব্যে মানুষের জীবনের অপার বিস্তার ও বৈচিত্র্যের মধুস্বাদ নিরবধি হয়ে আছে। মানব-মহিমার অর্থে, জীবনের আলোকময় মুহূর্তগুলিকেই কেবল একত্র করেন নি কবি। সুখে অথবা দুঃখে, সম্পদে এবং দীনতায় যে-কোনো মানুষের প্রতিটি দিন যে অপরূপ জটিলতায় ভরা,—তাকেই কাব্যের অঞ্জলিতে ভরে মুকুন্দরাম নিবেদন করেছেন ইতিহাসের হাতে। কেবল কাব্য-সাহিত্যের নয়,—মধ্যযুগের বাঙালি জাতির ইতিহাসেও মুকুন্দরামের অভয়ামঙ্গল এক অতুল্য গ্রন্থ। কালকেতুর ব্যাধ-জীবন থেকে আরম্ভ করে তার রাজৈশ্বর্যের অপার মহিমাকে তিনি নিখুঁত খুঁটিনাটি সহ উপস্থিত করেছেন। কিন্তু, তাঁর কবি-দৃষ্টি কখনোই একটি জীবনের সীমায় বাঁধা পড়ে ছিল না। কালকেতুর রাজ্যখণ্ডের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি সেকালের বর্ণাশ্রম হিন্দু সমাজের একটি সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কন করেছেন। ইতিহাসের দিক থেকে সেই জীবন-চিত্র যেমন নিখুঁত, সাহিত্যের বিচারে তেমনি তা জীবন্ত। গুজরাট নগরে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থ, বণিক থেকে নব-শাখ,—অস্পৃশ্য হিন্দু,—এমন কি মুসলমানদেরও অবস্থান, স্বভাব-ধর্ম, ও জীবিকাচরণের এক-একটি অখণ্ড শ্রেণীগত রূপ তিনি গড়ে তুলেছেন। অস্পৃশ্য সমাজ-ধর্মের বিবৃতি দিয়ে মুকুন্দরাম লিখেছেন,—

"মৎস্য বেচে চষে চাষ বৈসে দুই জাতি দাস,
কলুরা নগরে পাতে ঘানী।
বাইতি নিবসে পুরে, নানা জাতি বাদ্য করে,
পুরে ভ্রমে মঞ্জরী বিকিনী॥

কাব্য-কীর্তি

বাগদি নিবসে পুরে, নানা অস্ত্র ধরি করে,
দশ বিশ পাইক করি সঙ্গে।
মাছুয়া নিবসে পুরে জাল বুনে মাছ মারে,
কোচগণ বৈসে নানা রঙ্গে॥
নগর করিয়া শোভা, বসিল অনেক ধোবা,
দড়ায় শুকায় নানা বাসে।
দরজী কাপড় সীয়ে, বেডন করিয়া জীয়ে,
গুজরাটে বৈসে একপাশে॥"...

মুসলমান সমাজের প্রতিদিনকার আচার-ব্যবহার প্রসঙ্গে কবি বলেছেন :—

"ফজর সময়ে উঠি বিছায়্যা লোহিত পাটি,
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।
ছিলি মিলি মালা ধরে, জপে পীর পেগাম্বরে,
পীরের মোকামে দিই সাজ॥

* * *

বড়ই দানিস-বন্দ, কাহাকেও না করে ছন্দ,
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
ধরয়ে কম্বোজ বেশ, মাথে নাহি রাখে কেশ,
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি॥"

আসলকথা, মুকুন্দরাম ছিলেন মধ্যযুগের বহুদর্শী কবি। রাজনৈতিক দুর্যোগের আঘাতে তাঁকে বাস্তুত্যাগ করতে হয়েছিল। তারপর অনিবার দুঃখ-দুর্ভাগ্যকে নিয়ে পথ চলেছেন তিনি দীর্ঘদিন। আবার একদিন সুখের মুখ দেখেছিলেন কবি। সুখ এবং দুঃখের সঙ্গে সমান মিতালি ছিল তাঁর,—তাই কোনোটিকেই অতিমূল্যে ফাঁপিয়ে তোলেন নি। সুখে-দুঃখে বন্ধুর জীবন-পথে নিত্যকালের বাঙালির অভিযাত্রার ঐতিহাসিক কাহিনীকে চিরকালের রসরূপ দিয়েছেন কবি

ইতিহাসের ফলশ্রুতি

মুকুন্দরাম। বাংলা সাহিত্যের সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত এই কবি-কর্মের পরিচয় উদ্ধার করে বলেছেন,—"Its most remarkable feature its intense reality. Many of the incidents are super-human and miraculous, but the thoughts and feelings and sayings of his men and women are perfectly natural, recorded with a fidelity which has no parallel in the range of Bengali literature." মুকুন্দরামের কাব্যের এর চেয়ে সত্য পরিচয় উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব। কেবল. কালকেতু-ফুল্লরার গল্পেই নয়,—ধনপতি-খুল্লনার উপাখ্যানেও তাঁর শিল্পি-দুর্লভ দূরদর্শনের সঙ্গে ঐতিহাসিকোচিত বিশ্বস্ততা (fidelity)র পরিণয় বন্ধন ঘটেছে। একটি অখণ্ড জাতির জীবন-ইতিহাসকে নিত্যকালের রস-লোকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন যিনি,—মুকুন্দরাম মধ্যযুগের বাঙালি-জীবনের সেই মহাকবি।

দ্বিজ রামদেবের অভয়ামঙ্গল ?

অভয়ামঙ্গল নামে আর একখনি নূতন কাব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে; নবীন কবির নাম দ্বিজ রামদেব। ডঃ আশুতোষ দাস এই কাব্যের পুঁথি আবিষ্কার ও সম্পাদনা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানিত হয়েছেন। অনুমান করা হয়েছে ১৫৭১ শক,—তথা ১৬৪৯ ৫০ খ্রীস্টাব্দে এই কাব্য রচিত হয়েছিল। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য [বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, তৃতীয় সংস্করণ] এই কাব্যের কাহিনী, বর্ণন-ভঙ্গী এবং ভাষাগত উপাদান বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন,—আলোচ্য কাব্যের বহুলাংশই আসলে দ্বিজমাধবের 'শারদা-চরিত'-এর অনুকরণমাত্র। এঁর রচনাভূমিও চট্টগ্রাম অঞ্চলে। এদিক থেকেও দ্বিজ রামদেবের পৃথক্ কবি-কর্মের মৌলিকতা সম্পর্কে সংশয় পোষণ করা অসম্ভব নয়।

দ্বিজ হরিরাম

মুকুন্দরামের পরে রচিত সকল চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেই তাঁর রচনার প্রভাব রয়েছে। এই সময়কার কবিদের মধ্যে উল্লেখ্য একজন ছিলেন দ্বিজ হরিরাম। অনুমান করা হয়, দক্ষিণ রাঢ়ের সীমান্তে চিতুয়া বরদার সর্দার শোভাসিংহের আশ্রয়ে থেকে এই কাব্য লিখিত হয়েছিল।

চট্টগ্রামের চণ্ডীমঙ্গল-কবি মুক্তারাম সেন জাতিতে ছিলেন বৈদ্য। তাঁর

পিতার নাম ছিল মধুরাম,—কাব্যের নাম সারদা-মঙ্গল ; মোটামুটি রচনাকাল অষ্টাদশ শতক। ইনি সহজ অনাড়ম্বর ভাষায় কেবল কালকেতুর উপাখ্যানই রচনা করেছিলেন। তাঁর কাব্যে ধনপতি-কাহিনী বর্জিত হয়েছে।

মুক্তারাম সেন

রামানন্দ যতির কাব্যের উল্লেখ্য উৎকর্ষ কিছু নেই ; কিন্তু কবির অপরিসীম আত্মাদর কৌতুকপ্রদ। কাব্যের মধ্যে তিনি নিজের রচনার সঙ্গে মুকুন্দরামের রচনার তুলনা করে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন।

রামানন্দ যতি

লালা জয়নারায়ণ দেব তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রচলিত কাহিনী দুটি ছাড়াও তৃতীয় একটি গল্পের অবতারণা করেছেন ; সেটি ক্রিয়া-যোগ সার নামক সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে গৃহীত। কবি বিক্রমপুরের বৈদ্য-বংশজ ছিলেন।

জয়নারায়ণ দেব

৩। দুর্গামঙ্গল কাব্য

দুর্গামঙ্গল কাব্য আসলে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারারই নব পরিণতি। আগে বলেছি, সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে চৈতন্য-চেতনার বিনষ্টি-কালে বাংলা সাহিত্যের সকল শাখাতেই গভীর জীবন-রস-রসিকতার পরিচয় ক্ষীণ হয়েছিল। সেই অভাব পূরণের জন্য তখন একদিকে পরিহাস-লঘুতা বা ডিটেক্‌টিভ-কমিক্ রচনা, অন্যদিকে কৌতুক-জনক গল্প-বিচিত্রতা সৃষ্টির চেষ্টা ব্যাপক হয়েছিল। নতুন গল্পের রসদ যোগাতে অনেক সময় সংস্কৃত পুরাণ-কথার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ইতিহাসে অনুরূপ প্রয়াসের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ দুর্গামঙ্গল কাব্য। আগে দেখেছি, লালা জয়নারায়ণের মত কবি লৌকিক চণ্ডী-কাহিনীর সঙ্গে সংস্কৃত কাব্য-কথার বিচিত্র সংযোগে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সেই চেষ্টার পরিণতিতে লৌকিক চণ্ডীকাব্যের পরিবর্তে সম্পূর্ণ পুরাণ-কাহিনী নিয়ে পৌরাণিক দেবী দুর্গার মঙ্গল কাব্য রচিত হতে লাগল।

কাব্য-পরিচয়

আগে বলেছি, চৈতন্যোত্তর যুগে লৌকিক চণ্ডী পৌরাণিক চণ্ডী,—তথা দুর্গার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে পড়েন। দুর্গার এই চণ্ডীরূপের মহিমা কীর্তিত হয়েছে মার্কাণ্ডেয় পুরাণে একটি কাব্য-উপাখ্যানে। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী নামে

সে রচনা সুপ্রসিদ্ধ ; দুর্গাপূজার সময়ে বঙ্গদেশে এই সংস্কৃত চণ্ডীকাব্য নিত্য পঠিত হয়। বাংলা দুর্গামঙ্গল কাব্যসমূহ প্রধানভাবে এই কাব্যেরই বঙ্গানুবাদ।

সপ্তদশ শতকে রচিত অনুরূপ একটি বাংলা কাব্যের নাম চণ্ডিকা-বিজয় ; কবির নাম দ্বিজ কমললোচন। লৌকিক চণ্ডীমঙ্গল ধারার কোনো যোগ নেই এই রচনার সঙ্গে ; আগাগোড়া মার্কেণ্ডেয় চণ্ডীর আখ্যায়িকা নিয়ে কাব্যটি গঠিত। কবি "দিল্লীশ্বরসুত" অর্থাৎ শাহ সুজার শাসনাধিকারে বাস করতেন বলে জানিয়েছেন। কাব্যটি হয়ত ঐ সময়ে (১৬৩৯—১৬৬০ খ্রীঃ) রচিত হয়েছিল। কবির বাড়ি ছিল রংপুর জেলায় ; পিতার নাম ছিল যদুনাথ। কাব্য মধ্যে পিতা যদুনাথের ভণিতাও আছে স্থানে স্থানে। কাব্যটি যৌথ রচনা কি না বলা কঠিন। রচনায় ভক্তি-মূলক আবেগ আছে ; কিন্তু কাব্যিক উৎকর্ষ নেই।

কমললোচন।

আলোচ্য শতকের আর একটি উল্লেখ্য দুর্গামঙ্গলের রচয়িতা ছিলেন ভবানীপ্রসাদ রায়। কবির পিতার নাম নয়নকৃষ্ণ রায়, কুলগত উপাধি 'কর' ; জাতিতে এঁরা ছিলেন বৈদ্য। মৈমনসিংহের কাঁটালিয়া গ্রামে কবির বাড়ি ছিল। শৈশবেই তিনি মা-বাপকে হারিয়ে ছিলেন ; তার উপরে ছিলেন জন্মান্ধ। এই দুর্ভাগ্যের বেদনা কাব্যের আত্মকথা-অংশ অপার কারুণ্যে বিবৃত হয়েছে। স্থানে স্থানে মূল সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদও প্রশংসনীয়।

ভবানীপ্রসাদ রায়।

রূপনারায়ণ ঘোষ দুর্গামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে। এঁর বাড়িও ছিল ময়মনসিংহ জেলায়,—আদাবাড়ি গ্রামে। কবি সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ফলে, তাঁর কাব্যের ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গিতে সংস্কৃত বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের পরিচয় আছে। তা ছাড়া, কিছু কিছু অংশ তিনি ব্রজবুলিতেও রচনা করেছিলেন।

রূপনারায়ণ ঘোষ।

'অভয়ামঙ্গল'-এর রচয়িতা রামশংকর দেব অষ্টাদশ শতকের কবি ছিলেন, তাঁর বাড়ি ছিল হুগলী জেলায়। চণ্ডী-কাব্য ও রামায়ণের কবি রামানন্দ যতি ছিলেন এঁর গুরু। "গৌতম-পুত্র শতানন্দের আগমশাস্ত্র এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণ অবলম্বন" করে রামশংকর তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন।

রামশংকর দেব।

দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ ছিলেন মূলতঃ ফুলিয়ার মুখুটি বংশজাত। তাঁর পিতা বীরভূমে বাস পরিবর্তন করেছিলেন। গঙ্গানারায়ণের ভবানীমঙ্গল-এর কাহিনীর অভিনবতা আছে। পুরাণ-কথার অনুসরণ করে উমার জন্ম থেকে আগাগোড়া দেবী-লীলা এবং সেই সঙ্গে কৃষ্ণলীলারও বর্ণনা করেছেন কবি। কাব্যিক উৎকর্ষ তাতে বাড়ে নি ; কিন্তু বিচিত্রতা সম্পাদিত হয়েছে।

গঙ্গানারায়ণ।

৪। ধর্মমঙ্গল কাব্য

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত ধর্মমঙ্গল কাব্যেরও প্রথম উদ্ভব তুর্কী আক্রমণোত্তর মধ্যযুগে হয়েছিল বলে মনে করা হয়। আগে দেখেছি, এই কাব্যধারার আদিকবি রূপে ময়ূর ভট্ট বন্দিত হয়ে আসছেন। তা হলেও, ধর্মমঙ্গল কাব্যের যত পুঁথি এ-পর্যন্ত পাওয়া গেছে, তার কোনটিরই মূল রচনাকাল ষোড়শ শতকের আগে বলে অনুমানও করা চলে না। প্রায় সব ক'খানাই সপ্তদশ শতক বা তার পরের রচনা। তা ছাড়া, এই কাব্যধারায় শ্রেষ্ঠ কবিকর্মের রচনাকাল অষ্টাদশ শতকে। মনসা ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সঙ্গে এই সব দিক থেকে ধর্মমঙ্গলের তফাৎ মৌলিক। সবচেয়ে বড় তফাৎ হচ্ছে কাব্য-কাহিনীর রসাবেদনে। আগে দেখেছি, চণ্ডী ও মনসামঙ্গল সাম্প্রদায়িক প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে প্রথমে রচিত হলেও, ক্রমশঃ বাঙালির সমাজ ও পরিবার-বন্ধনের মূল-ভূমি থেকে রসদ আহরণ করে জীবন-রস-ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে। এদিক থেকে, অনুভূতির গভীরতা এবং জীবন-বোধের স্পর্শ-কাতরতা আলোচ্য দুটি কাব্য-ধারাকেই মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাব্যে চণ্ডী ও মনসামঙ্গলের এই সহজ স্পর্শাতুরতা দুর্লভ ডিটেক্‌টিভ গল্পের উত্তেজনা, কৌতুক এবং কৌতূহলই ধর্মমঙ্গলের সাধারণ রস-উৎস। এই স্বাতন্ত্র্যের মূলে ঐতিহাসিক পরিবেশের প্রভাবও অবশ্য খুব কম ছিল না। আগে দেখেছি, চৈতন্য-পূর্ব মধ্যযুগেই চণ্ডী এবং মনসা পৌরাণিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উচ্চকোটির হিন্দু সমাজে নিজেদের স্থান করে নিয়েছিলেন। ফলে শিক্ষিত, সূক্ষ্ম-ভাবাতুর হিন্দু কবি-প্রতিভার প্রাণস্পর্শে ঐসব লৌকিক কাহিনী অনির্বচনীয় রসব্যঞ্জনায় মণ্ডিত হয়েছে।

ধর্মমঙ্গলের স্বভাব-স্বাতন্ত্র্য

কিন্তু, রাঢ়ের যে-সব দূর প্রত্যন্তে ধর্মপূজা প্রচলিত ছিল,—নিতান্ত অন্ত্যজ-অশিক্ষিত সমাজে,—সেখানে উচ্চ-নীচ হিন্দু-সংস্কৃতির এমন বিমিশ্রতা সাধিত হতে পারেনি। তথাকথিত উচ্চ-কোটিতে ধর্মপূজা দীর্ঘদিন নিন্দনীয় ছিল। এমন কি, সপ্তদশ শতকেও কবি রূপরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল রচনার অপরাধে সমাজে পতিত হয়েছিলেন। এমন অবস্থায় সংস্কৃতিমান সূক্ষ্ম চিত্তবৃত্তির সান্নিধ্যলাভ ধর্মমঙ্গলের ভাগ্যে ঘটেনি,—ফলে, গভীর অনুভবময়তার স্পর্শ এতে নেই। অন্য আর এক দিক থেকে এই ক্ষতি পরিপূরিত হয়েছে। রাঢ়ের তথাকথিত অন্ত্যজ সমাজের মধ্যে যে জীবনসংগ্রাম যুযুৎসা এবং সদাদীপ্ত শক্তির দার্ঢ্য রয়েছে,—তাকেই পাথরের মূর্তির মত কঠিন ঋজুতায় বেঁধে তুলেছে ধর্মমঙ্গলের কাব্য কথা। এই সব রচনার ভাষায় আলংকারিক উজ্জ্বলতা প্রায়ই অনুপস্থিত। কিন্তু সেই সঙ্গে অমিশ্র সত্য-কথনের আদিম উদাত্ততার অভাব নেই কোথাও। চণ্ডী এবং মনসামঙ্গলের প্রেম-স্নিগ্ধতার পরিবর্তে ধর্মমঙ্গল কাব্যে পরিপূর্ণ হয়ে আছে বলিষ্ঠ সংগ্রামের সুকঠিন দৃঢ়তা।

খেলারাম

ধর্মমঙ্গলের প্রাচীনতম যে কাব্যের সন্ধান জানা গেছে, তার লেখক ছিলেন কবি খেলারাম। এঁর কাব্য ১৫২৭ খ্রীস্টাব্দে রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু কাব্যের কোন পুঁথি পাওয়া যায়নি।

রূপরাম চক্রবর্তী

প্রাচীনতম যে কবির ধর্মমঙ্গলের পুঁথি পাওয়া গেছে, তিনি রূপরাম চক্রবর্তী। এঁর কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে মতভেদ রয়েছে। ষোড়শ শতকের শেষভাগ থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যকাল পর্যন্ত কোনো সময়ে রূপরাম ধর্মমঙ্গল রচনা করেছিলেন। বর্ধমানের কায়তি শ্রীরামপুর গ্রামে কবির জন্ম হয়; তাঁর পিতা শ্রীরাম চক্রবর্তীর টোলে অনেক ছাত্র পড়ত। কিন্তু, এমন পণ্ডিতের ছেলে হয়েও কবির ভাগ্যে বিদ্যালাভ ঘটেনি। লেখাপড়ায় তিনি খুব অমনোযোগী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে কবির অগ্রজ রত্নেশ্বর টোলের অধ্যাপক হন। অমনোযোগিতার জন্য তিনি কবিকে খুব তিরস্কার করেন; ফলে রূপরাম গৃহত্যাগ করে যান। অন্যান্য আরও অনেক জায়গায় বিদ্যা শিক্ষা করতে গিয়েও তিনি বারে বারেই ফিরে আসেন। একবার গুরুগৃহ

থেকে এইরূপে স্বেচ্ছা-বিদায় নিয়ে বাড়ি আসবার পথে ধর্মঠাকুর কবিকে দেখা দেন। ঠাকুরের এই সময়কার আদেশ শিরোধার্য করেই রূপরাম পরে কাব্য রচনায় বৃত হয়েছিলেন। গোপভূমের রাজা গণেশ তাঁর কবি-কর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। আগে বলেছি, ধর্মমঙ্গল রচনা ও ধর্মপূজা করার অপরাধে রূপরাম নিজের সমাজে পতিত হয়েছিলেন।

রূপরামের ধর্মমঙ্গল মোটামুটি সরল, সাবলীল ভাষায় লেখা। কিছু কিছু জায়গায় কবির সংস্কৃত-প্রীতির পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে, বিশেষ করে তৎসম শব্দের প্রয়োগ ও বাচন-ভঙ্গিতে। রূপরামের কবি-কর্মে প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষ দুর্লভ।

শ্যামপণ্ডিত

শ্যামপণ্ডিতের ধর্মমঙ্গলের একখানি মাত্র পুঁথি পাওয়া গেছে;—লিপিকাল ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দ। কাব্যের বর্ণনাংশে বীরভূম অঞ্চলের পরিবেশ-প্রভাব লক্ষিত হয়;—এই কাব্যের প্রচলনও দেখা যায় বীরভূমেই। কবি এই জেলার লোক ছিলেন মনে হয়। সাধারণতঃ ধর্মঠাকুরের পুরোহিতেরাই পণ্ডিত উপাধি ব্যবহার করতেন,—কবি হয়ত ধর্মপূজক ছিলেন।

রামদাস আদক

রামদাস আদকের ধর্ম-কাব্যের নাম অনাদিমঙ্গল;—রচনাকাল ১৬৬২ খ্রীস্টাব্দ। কবির পিতার নাম ছিল রঘু,—জাতিতে এঁরা কৈবর্ত ছিলেন;—নিবাস ছিল বর্ধমানের হায়াৎপুর গ্রামে।

সীতারাম দাস

সীতারাম দাস ধর্মমঙ্গলের একজন প্রতিষ্ঠাবান কবি ছিলেন। বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস্ গ্রামে মামার বাড়িতে এঁর জন্ম হয়েছিল; নিজের বাড়ি ছিল সুখসায়ের। কবির পিতার নাম দেবীদাস, জাতিতে এঁরা কায়স্থ ছিলেন। গৃহদেবতা গজ-লক্ষ্মীমার স্বপ্নাদেশ পেয়ে সীতারাম কাব্য-রচনায় বৃত হয়েছিলেন। রচনাকাল ১৬৯৮-৯৯ খ্রীস্টাব্দ। প্রাঞ্জল সরলতাই ছিল সীতারামের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইনি একখানি মনসামঙ্গল কাব্যও লিখেছিলেন।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম স্মরণীয় কবি ঘনরাম চক্রবর্তী;—ধর্মমঙ্গলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিও তিনি। বর্ধমান জেলার কৈয়ড় পরগণা,—কৃষ্ণপুর গ্রামে কবির বাড়ি ছিল। পিতার নাম গৌরীকান্ত, মা সীতাদেবী ছিলেন রাজবংশের

কন্যা। কবি একান্ত রামভক্ত ছিলেন। "কৌশল্যানন্দন কৃপাবান্"কে কাব্য-মধ্যে বারে বারে বন্দনা করেছেন তিনি। তাছাড়া চারিটি ছেলেরই নাম রেখেছিলেন প্রথমে রাম নাম যোগ করে।

কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে ঘনরাম লিখেছেন,—

কবি শ্রেষ্ঠ ঘনরাম

"সংগীত আরম্ভকাল নাহিক স্মরণ।
শুন সবে যে কালে হইল সমাপণ॥
শক লিখে রাম গুণ রস সুধাকর।
মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর॥
সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াক্ষ তিথি।
যাম সংখ্য দিনে সাঙ্গ সংগীতের পুঁথি॥"

অর্থাৎ, ১৬৩৩ শকের—[১৭১১ খ্রীস্টাব্দ] ৮ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে ঘনরামের কাব্যরচনা শেষ হয়। কিন্তু, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির গণনা থেকে জানা গেছে, এই শুক্লা তৃতীয়া হয়েছিল ১লা অগ্রহায়ণ। অনেকে মনে করেন, ঘনরামের কাব্য-সমাপ্তির তারিখও ঐ দিন। কবি তাঁর রচনায় বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের শুভ কামনা করেছেন। সম্ভবতঃ ইনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

ঘনরামের কবি-কর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য,—তথাকথিত অন্ত্যজ সমাজের স্থূলতাপূর্ণ কাহিনীকে তিনি অভিজাত কাব্য-রূপ দিয়েছিলেন। আগে বলেছি, মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে ধর্মমঙ্গল-কাহিনীর এ্যাডভেঞ্চার-ধর্মিতা ছিল অতুল্য। আর, সেই দুর্লভ সম্পদের উৎস ছিল সেকালের বলিষ্ঠকায় রাঢ়-জনতার জীবন। কেবল পুরুষ নয়,—ধর্মমঙ্গলের নারীচরিত্রগুলির দুঃসাহসিক সমরাভিযান ও বিস্ময়কর বীরত্বও আসলে সেকালের লোক-জীবনের অপরিহার্য স্থূলতা ও আদিমতার পরিবেশ থেকে দীর্ঘদিন মুক্ত হতে পারেনি। ঘনরাম তাঁর বিদগ্ধ রুচি, পাণ্ডিত্য, ও সূক্ষ্ম শিল্প-বোধের পরিমণ্ডনে "গ্রাম্য" লোক-জীবন-গাথাকে সর্বজনীন কাব্য-রূপ দান করেন। অশিক্ষিত-পটু, সহজ জীবন-কাহিনীতে শিল্প-রসের এই নব-সংযোজন ধর্মমঙ্গল কাব্যকে অভূতপূর্ব রস-সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছে। ধর্মমঙ্গলের ইতিহাসে ঘনরাম এদিক থেকে সঞ্জীবনী-প্রতিভার দাবি করতে পারেন।

কবি-কর্মের বৈশিষ্ট্য

স্মার্ত হিন্দু শাস্ত্র ও সংস্কৃত পুরাণ-সাহিত্যে তাঁর অধিকার ছিল সুগভীর। কবির সমগ্র চেতনার মধ্যে পৌরাণিক হিন্দু ঐতিহ্যের অনুভব সহজে ব্যাপ্ত হয়েছিল। তাছাড়া, আরবী, ফারসী ভাষাতেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল বিস্ময়কর। ফলে, কি বাগ্‌বিন্যাসে, কি গল্প-বর্ণনায়, কি রুচির শালীনতায়, —কি শব্দ-সম্পদের গভীরতায়, ধর্মমঙ্গল কাহিনীর লঘু-রুচিহীন অংশাবলীও নাগরিক বিদগ্ধতায় সজ্জিত হয়ে উঠেছে। ঘনরামের বাচনভঙ্গির এই দুর্লভ কলাকৌশল তাঁর রচনার বহু অংশকে লোক-প্রিয় প্রবচন রূপে আজও অমর করে রেখেছে ঃ—

"নারীহীন পুরুষ পেয়েছে বড় দাগা।
সহজে হইবে বুঝি সোনায় সোহাগা ॥"

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীতে বিচিত্রতার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় সহদেব চক্রবর্তীর অনিলপুরাণ-এ। অনুমান করা হয়েছে ১৭৩৪ থেকে ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে এই কাব্য রচিত হয়েছিল। এতে ধর্মমঙ্গলের মুখ্য কাহিনী লাউসেন-উপাখ্যান নেই। হরিশ্চন্দ্র ও তার ছেলে লুইচন্দ্রের প্রাচীনতর গল্পটি সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। তাছাড়া উপাখ্যানের

অনিলপুরাণ ও সহদেব চক্রবর্তী

একটি প্রধান অংশ জুড়ে রয়েছে শিব-প্রসঙ্গ। শিব বাংলাদেশের প্রাচীনতম লোক-দেবতা।—বৈদিক ও পৌরাণিক সু-প্রাচীন দেব-কল্পনার সঙ্গে এই অনভিজাত দেবতার অভিন্নতা সম্পাদিত হয়েছিল অনায়াসে। সহদেব চক্রবর্তী শিব-সম্বন্ধীয় সেই পৌরাণিক-অপৌরাণিক বিচিত্র কাহিনীকে একত্র জড়ো করে তাঁর কাব্যের অভিনবতা সম্পাদন করেছেন। তাতে নাথ-সিদ্ধা মীননাথ গোরক্ষনাথের গল্পও প্রসঙ্গত এসে পড়েছে। চৈতন্য-প্রভাব বিনষ্টির যুগে বাংলা সাহিত্যের অ-গভীরতার অভাব-পূরণের জন্য গল্প-বিচিত্রা আহরণের যে নূতন প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল, ধর্মমঙ্গলের ইতিহাসে অনিলপুরাণ তার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এ ছাড়া কাব্যটির উল্লেখ্য শিল্প-সম্পদ আর কিছু নেই।

সরল, অনাড়ম্বর ভাষায় হৃদ্য ধর্মমঙ্গলকাব্য-রচনার পরিচয় দিয়েছেন কবি নরসিংহ বসু। তাঁর পিতার নাম ছিল ঘনশ্যাম। কবি বীরভূমের নবাব

আসাদুল্লা মতান্তরে আসফউল্লা খাঁর উকিল ছিলেন। একবার প্রভুর দেয় খাজনা নিয়ে মুর্শিদাবাদ যাবার পথে ধর্মঠাকুরের স্থানে কবি এক সন্ন্যাসীর দেখা পান। ইনি তাঁকে ধর্মকাব্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করেন।

নরসিংহ বসু

সংস্কৃত, ফারসী, হিন্দী, ওড়িয়া প্রভৃতি নানা ভাষায় নরসিংহের ব্যুৎপত্তি ছিল। কিন্তু, গোটা কাব্যের কোথাও তিনি অকারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা করেন নি। তাঁর প্রাঞ্জল ভাষা একদিক থেকে গ্রাম্যতা-দোষমুক্ত, অন্যদিকে স্বভাব-সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী। কাব্যটির রচনাকাল ১৭৩৭ খ্রীস্টাব্দ।

মাণিকরাম গাঙ্গুলীর কাব্য-রচনার কাল নিয়ে প্রবল মতভেদ আছে। ৺যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে কাব্যটি রচিত হয়েছিল ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে। কবির পিতার নাম গদাধর, মা ছিলেন কাত্যায়নী। এদের বাড়ি ছিল হুগলীর বেলুডিহা গ্রামে। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ হিসাবে কবি ধর্মঠাকুরের স্বপ্নাদেশ লাভের এক কৌতুককর বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর কাব্যের মুখ্য উপাখ্যান লাউসেন কাহিনী। স্থানে স্থানে বিচিত্রতর গল্প-পরিবেশনের প্রয়াসও রয়েছে।

মাণিক গাঙ্গুলী

৫। শিবায়ন কাব্য

শিবায়ন কাব্যধারাকে ঠিক মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না,—রূপ-প্রকরণের দিক থেকে তো নয়ই, ভাবাদর্শের দিক থেকেও না। আগে বলেছি, তুর্কী আক্রমণোত্তর বাংলাদেশে ধর্মচেতনার পুনর্গঠন যখন হচ্ছিল, তখনই চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি লোক-দেবতাকে পৌরাণিক হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠা দেবার সাম্প্রদায়িক আকাঙ্ক্ষা থেকে মঙ্গলকাব্যের জন্ম। আর, মূলতঃ সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতার এই মনোভাবই মঙ্গলকাব্যের প্রাথমিক রূপ-কল্পনাকেও প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু, শিব-দেবতাকে নিয়ে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধির জাগরণ বাংলাদেশে কখনোই ঘটে নি। শিব বেদ-পূর্ব বাঙালি সমাজের প্রাচীনতম দেবতা। তা হলেও, তিনি যে কখন কি করে বেদের রুদ্র এবং পুরাণের শিব-এর সঙ্গে একান্ত অভিন্ন হয়ে মিশে গেছেন, তার ঐতিহাসিক চিহ্নও আজ আর স্পষ্ট করে জানবার উপায় নেই। ফলে, অভিজাত ব্রাহ্মণ্য

শিবায়নের কাব্য-স্বভাব।

সমাজে প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্যে চণ্ডী-মনসার মত শিবকে কখনো সচেষ্ট হতে হয় নি। বরং চণ্ডী-মনসাই তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধের বন্ধন রচনা করে উচ্চ-সমাজে পাংক্তেয় হতে চেয়েছেন। এমন কি, ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টি-কাহিনীতে পর্যন্ত পৃথক্ ও প্রধান ভাবে শিব-মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। এই কারণেই, আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতামূলক মঙ্গলকাব্যের জন্ম-কালে পৃথকভাবে শিব-কাব্য রচিতই হয়নি,—সে-বিষয়ে প্রয়োজনবোধও ছিল না কিছু।

কিন্তু শিবকে নিয়ে পৃথক্-স্বতন্ত্র কাব্য-রচনার অতি-আগ্রহ না থাকলেও, —সুপ্রাচীন কাল থেকেই শিব-গীতির বাহুল্য ছিল বাংলা দেশের সর্বত্র। শিব ছিলেন মূলতঃ বাঙালির কৃষি-জীবনের অধিষ্ঠাতা দেবতা। ফলে, সেদিন ধানভানৃতেও শিবের গীত করা হত। তাছাড়া, দলবদ্ধভাবে না হলেও, শিবকে নিয়ে নানারকম গল্প-গাথা-কাহিনী-কাব্য-কবিতা রচিত হয়েছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। মঙ্গল কাব্যের মত শিবের শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের উত্তেজনা এ-সব কাব্য-কথায় কম ছিল। তার বদলে, তাঁর সর্বাতিক্রমী প্রতিষ্ঠার শান্ত মহিমাকেই কীর্তিত করা হয়েছে আগাগোড়া। সপ্তদশ শতক বা পরবর্তী-কালে রচিত এই ধরনের কিছু সংখ্যক কাব্যের পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে। কাহিনীর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এদের প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা চলে :— (১) মৃগলুব্ধ এবং (২) লৌকিক শিবায়ন কাব্য।

শিব-কাব্যের দুটি রূপ।

মৃগলুব্ধ কাব্যের মূল উৎস পুরাণের গল্প। কাব্যের মুখবন্ধে শিব কর্তৃক মুনিপত্নী-লঙ্ঘন, মুনির শাপে লিঙ্গ-চ্যুতি, ভ্রষ্টলিঙ্গের প্রভাব ইত্যাদি লোক-কথাশ্রিত অর্বাচীন পুরাণ-প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে। তার পরে হয়েছে মূল উপাখ্যানের সূচনা। রাজা মুচুকুন্দ শিবরাত্রির উপবাস-ব্রত-পূজা শেষ করে বসলে রাণী রুক্মিণী তাঁকে শিব-রাত্রির কথা শুনিয়েছিলেন নিম্নরূপে :—

১। মৃগলুব্ধ।

বিদ্যাধর চিত্রসেন একবার ইন্দ্রের সভায় নৃত্য করবার সময় হরিণ-শিকার দেখে তাল ভঙ্গ করেন। ইন্দ্র ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে পৃথিবীতে ব্যাধ-জন্ম-যাপনের অভিশাপ দেন। দেবরাজকে তুষ্ট করে চিত্রসেন বর লাভ করেন যে, ভদ্রসেন মৃগের সাক্ষাৎ পেলে তিনি মুক্ত হবেন। অতঃপর যথারীতি চিত্র-সেনের ব্যাধ-জীবন শুরু হয়। এক শিবারাত্রির দিনে আ-সায়াহ্ন চেষ্টা

করেও চিত্রসেন কোনো পশু পেলেন না, অনাহার ও ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে পথও খুঁজে পাচ্ছিলেন না বনের মধ্যে। অবশেষে আত্মরক্ষার জন্য রাত্রিতে তিনি এক বেলগাছে চড়ে বসেন। গাছের তলায় ছিল এক শিব-লিঙ্গ। চিত্রসেনের স্পর্শ লেগে একটি সজল বিল্বপত্র গাছ থেকে সেই শিবের মাথায় পড়ে। উপবাসী ব্যাধের হাতে সজল-বিল্বপত্র পেয়ে আশুতোষ পরিতৃপ্ত হন। এদিকে রাত্রিতে ভদ্রসেন মৃগ চিত্রসেনের বিস্তারিত জালে ধরা পড়ে। মৃগী প্রাণ বিপন্ন করেও স্বামিসঙ্গ ত্যাগ করতে অ-রাজি হয়। প্রাতে ব্যাধ ভদ্রসেন মৃগকে দেখতে পায়। মৃগ-দম্পতির কাছে তত্ত্বকথা শুনে তার লুপ্তজ্ঞান ফিরে আসে। তখন চন্দ্রভাগা-তীরের মন্দিরে শিবপূজা করে সে মুক্তিলাভ করে; ভদ্রসেনও পত্নীসহ শিবলোক প্রাপ্ত হয়।

রুক্মিণীর কাছে এই ব্রতকথা শুনতে শুনতে মুচুকুন্দের শিবরাত্রির প্রভাত হয়। রাজদম্পতিও চন্দ্রভাগাতীরের মন্দিরে পূজা করে শিবলোক লাভ করেন।

লৌকিক শিবায়নের গল্প আসলে কৃষক-জীবনের কল্পনা-জাত। মৃগ-লুব্ধের মুখবন্ধে যেমন লোক-কাহিনী রয়েছে, তেমনি শিবায়নের শুরুতেও আছে নানা পৌরাণিক গল্প:—দক্ষ প্রজাপতির গল্প:—দক্ষ প্রজাপতির শিবহীন যজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, দক্ষের দুর্গতি, হিমালয়-গৃহে সতীর পুনর্জন্ম-গ্রহণ, তাঁর শিবসাধনা এবং শিবকে পতিলাভ ইত্যাদি। মৃগলুব্ধকাহিনীর সংক্ষেপ বিবৃতিও আছে কোনো কোনো কাব্যে। এর পরেই মূল গল্প আরম্ভ হয়েছে কৃষি-দেবতা শিবকে নিয়ে:—

১। শিবায়ন।

সংসার-জীবনে পার্বতীর দুঃখের শেষ নেই;—ভিক্ষার অন্নে আর সংসার চলে না। অবশেষে শিবকে তিনি চাষে মনোযোগী হতে পরামর্শ দিলেন। বিশ্বকর্মা তৈরি করে দিলেন লাঙল জোয়াল আর চাষের মই। জোড়া বলদ আর বীজ-ধান ধার করে আনা হল কুবেরের ভাণ্ডার থেকে। শিবের অনুচর ভীম বৃষ্টি-ভেজা মাটিতে হাল ধরল,—দিনে দিনে পৃথিবীর শস্যভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে উঠলো। নারদের ঢেঁকি দিয়ে ভীম ধান ভানে,—দেখে দেখে শিবের আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু সুদিনের মুখ দেখে শিব পার্বতীকে গেলেন ভুলে। তাঁর একে দারিদ্র্য, তায় বিরহ। শিবকে উত্ত্যক্ত করবার জন্যে তিনি উঁডানি মশা আর ডাঁশ-মাছিকে পাঠালেন শিবের ক্ষেতে।

সারা গায়ে ঘি মেখে শিব তাদের আক্রমণ উপেক্ষা করলেন।' অবশেষে পার্বতী রেগে পাকাধানে ধরিয়ে দিলেন পোকা; সোনার ধান হল শূন্যগর্ভ। শিব তাতে আরো প্রমত্ত হয়ে উঠলেন; মহামায়া তখন বাগ্দিনীর বেশ ধরে এসে ভুলিয়ে নিলেন শিবকে। নিরুদ্দিষ্টা বাগ্দিনীর অনুসরণ করে শিব অবশেষে ফিরে এলেন কৈলাসে। আবার যাতে স্বামী ভুলে না যান, তাই, পার্বতী এবার শাঁখা পরতে চাইলেন;—নারদ বলেছিলেন হাতে শাঁখা পরলেই স্বামী আর বিরূপ হতে পারবেন না। কিন্তু, ত্রিদিবেশ্বর শিব চিরভিখারী,—শাঁখা পাবেন কোথায়? শুরু হ'ল হর-গৌরীর কোন্দল। অভিমানে পার্বতী চলে গেলেন পিতৃগৃহে। নিরুপায় শিব শঙ্খবণিকের বেশে শ্বশুরবাড়ি গেলেন পার্বতীর মান ভাঙাতে। দুজনের কৃত্রিম বাদানুবাদের পর বিশ্বজননী বিশ্বেশ্বরের হাতে নারীর শ্রেষ্ঠ অলংকার পরলেন শাঁখা। তারপরে মহাশক্তি মহাকালীরূপে বিকশিতা হলেন। হর-গৌরীর মিলন হল,—দুজনে আবার ফিরে এলেন কৈলাসে।

গল্প দুটির প্রতি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে,—প্রথমটির মুখ্য কাহিনী অভিজাত পুরাণ থেকে আহৃত,—দ্বিতীয়টির প্রধান গল্পাংশ লোকজীবন-সম্ভব। তাহলেও দুটি কাব্যেই বিপরীত ধর্মী গৌণ উপাখ্যান অনায়াসে বিমিশ্রিত হয়েছে,—মৃগলুব্ধে লোক-কথা,—আর শিবায়নে পুরাণ-প্রসঙ্গ। এখানেই শিবকাব্যের স্বভাবগত সহনশীলতা ও প্রশান্তির ছাপ সুস্পষ্ট। অন্যদিকে শিবায়নের গল্পাংশ স্থূল হলেও আদিম লোক জীবনের অ-ভিন্ন প্রতিচ্ছবি রূপে কেবল অভিনবই নয়,—ইতিহাস-রস-সমৃদ্ধও।

মৃগলুব্ধ কাব্যপ্রবাহের মধ্যে যে পুঁথিখানি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলে মনে করা হয়েছে, তার কবির নাম বা পরিচয় কিছুই জানা যায় নি; অসম্ভব নয়, ইনি হয়ত চট্টগ্রামের কবি ছিলেন।

মৃগলুব্ধের আদি কবি

মৃগলুব্ধ কাব্যের সবচেয়ে বিখ্যাত কবি ছিলেন রতিদেব। কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে জানা যায়,—

"রস অঙ্ক বায়ু শশী শাকের সময়।
তুলামাসে সপ্তবিংশতি গুরুবার হয়॥"

কবি রতিদেব

অর্থাৎ ১৫৯৬ শক,—১৬৭৪ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে কার্তিক বৃহস্পতিবার রতিদেবের কাব্য-রচনা আরম্ভ হয়েছিল। এঁর বাড়ি ছিল চট্টগ্রাম,

চক্রশালা পরগণার সুচক্রদণ্ডী গ্রামে। তাঁর পিতার নাম গোপীনাথ,—মা ছিলেন মধুমতী। জাতিতে এরা ব্রাহ্মণ। কবির গুরুর নাম ছিল মোক্ষদা ঠাকুর।

পাঁচালীর আকারে লেখা রতিদেবের মৃগলুব্ধ একান্ত ক্ষুদ্রকায় কাব্য। তাহলেও, কবির গভীর ভক্তি-বিশ্বাসের স্পর্শ আগাগোড়া কাব্যকে হৃদ্য করেছে। মৃগ-দম্পতির প্রসঙ্গে করুণ রসের অনুভূতিও হয়েছে সুনিবিড়।

রতিদেবের মৃগলুব্ধ কাব্য-পুঁথির পরিশিষ্টে মনসা ধূপাচার নামক রচনাংশ পাওয়া গেছে। এটুকুও স্বয়ং কবির রচনা বলে অনুমিত হয়।

মৃগলুব্ধের একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন রামরাজা। ইনি হয়ত জাতিতে ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মগ,—'রাজা' উপাধি চট্টগ্রামবাসী মগরাই ব্যবহার করে থাকেন। লিঙ্গপূজা প্রচারের কাহিনী ছাড়া অপর অংশে রতিদেব ও রামরাজার রচনায় আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। কে যে কার কাছে ঋণী বলা কঠিন।

রামরাজা

দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে মৃগলুব্ধের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন কবিচন্দ্র। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ বীরসিংহের রাজত্বকালে (১৬৫৮—'৮২ খ্রীঃ) এই কাব্য রচিত হয়েছিল। ইনি এবং শিবায়ন-খ্যাত কবি রামকৃষ্ণ দাস অভিন্ন ব্যক্তি বলে ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেছেন। কারণ, এঁর কাব্যেও কবিচন্দ্র বা কবিচন্দ্র দাস ইত্যাদি ভণিতা পাওয়া গেছে।

কবিচন্দ্র

রামকৃষ্ণের পিতার নাম ছিল কৃষ্ণরায়,—মা ছিলেন রাধা দাসী। জাতিতে এঁরা কায়স্থ ছিলেন। কাব্য-রচনার কাল ১০৯১ বঙ্গাব্দ (?)। রামকৃষ্ণের রচনায় পুরাণ-কথার প্রাধান্য বেশি।

শিবায়ন কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন রামেশ্বর চক্রবর্তী। এঁর মূল বাড়ি মেদিনীপুর জেলায়, যদুপুর গ্রামে। কবি নিজে বাস পরিবর্তন করেছিলেন একই জেলার অযোধ্যা নগরে। জাতিতে এঁরা কেশবকোণীয় ব্রাহ্মণ। কবির পিতার নাম ছিল লক্ষ্মণ চক্রবর্তী, মা ছিলেন রূপবতী। তাঁর দুই স্ত্রী ছিলেন,—সুমিত্রা আর পরমেশ্বরী।

শিবায়নের কবি
রামেশ্বর

যদুপুরে থাকবার সময়ে কবি একখানি সত্যনারায়ণের পাঁচালি লিখেছিলেন। শিবায়ন কাব্য রচিত হয় কর্ণগড়ের রাজা রাজসিংহ ও যশোবন্ত সিংহের আশ্রয়ে থেকে। কাব্যের রচনাকাল,—

"শকে হল্য চন্দ্রকলা রাম করতলে।
বামে হল্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে॥"

অর্থাৎ, ১৬৩২ শক,—বা ১৭১০-১১ খ্রীষ্টাব্দ।

রামেশ্বরের শিবায়নের মূল নাম 'শিব-সংকীর্তন'। কাব্যটি গীত হবার জন্যে লিখিত হয়েছিল। তাই মঙ্গল কাব্যের মতই অষ্টমঙ্গলার আকারে এই গল্পাংশ বিন্যস্ত হয়েছে। কিন্তু ঐ সংগীতিক আকৃতি ছাড়া মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে এর ভাব বা প্রকরণগত আর কোনো মিল নেই।

রামেশ্বর অষ্টাদশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন,—যুগ-স্বভাব তাঁর রচনায় সু-ব্যক্ত হয়েছিল। ফলে আলংকারিক চাকচিক্য ও রচনা-বৈদগ্ধ্যে তিনি ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ না হলেও, তাঁর সার্থক পূর্ব-সূরী। রামেশ্বরের গ্রন্থে তাঁর শাস্ত্র-জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও সুস্পষ্ট।

দ্বিজশংকর

দ্বিজ হরিহরের পুত্র শংকরের লেখা একখানি লৌকিক শিবায়নের কাব্যও পাওয়া গেছে।

৬। কালিকামঙ্গল

কালিকামঙ্গল

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে কালিকামঙ্গল নামে আর একশ্রেণীর রচনা-প্রবাহের উল্লেখ করা হয়। শিবায়নের মতই আকৃতিতে এরা সর্বাংশে মঙ্গলকাব্যের সমধর্মী নয়। আসলে এই কাব্যধারা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের বাংলা সাহিত্যে যুগান্তরের পদ-চিহ্ন-বাহী। ভারতচন্দ্রের রচনাকে আশ্রয় করে এই শ্রেণীর কাব্যদেহেই মধ্যযুগ-বিনষ্টি ও নব-যুগ-সম্ভাবনার সংকেত প্রস্ফুটতম হয়েছে। এই কারণেই চৈতন্যোত্তর মঙ্গলকাব্যের পর্যায়ে নয়,—যুগান্তরের সৃষ্টি হিসাবে এই কাব্যগ্রন্থ পৃথক্ আলোচনার যোগ্য।

দ্বাদশ অধ্যায়

মধ্যযুগের বিপর্যয় ও যুগান্তর

বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যোত্তর মধ্যযুগের অবসান লক্ষণ অঙ্কুরিত হতে আরম্ভ করেছে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে। লক্ষ্য করেছি, ঐ সময় থেকেই বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল শাখাতে বিচিত্রতা সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়েছে। কিন্তু, বিচিত্রতা-মাত্রই সব সময়ে নবীনতার বাহক হয় না। আলোচ্য পর্যায়েও নুতন সৃষ্টিধারার বিকাশের চেয়ে পুরাতনের বিনাশই ঘটেছে বেশি। মধ্যযুগের চৈতন্য-প্রভাবিত জীবন-চেতনা ক্রমশঃ যত শিথিল হয়েছে, ততই সাহিত্যের আকৃতি ধীরে ধীরে হয়েছে পরিবর্তিত। অবশেষে সাহিত্যের প্রকৃতিতেও দেখা দিয়েছে প্রায় আমূল পরিবর্তন। আরাকান-রোসাঙের ইসলামী সাহিত্য, বাউল-সুফী প্রভৃতি লোক-সংগীত, শাক্তগীতি ও বিদ্যাসুন্দর কাব্য-প্রবাহ বাংলা সাহিত্যে মধ্য-যুগান্তরের এই নবীন স্বভাব-প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ বাহক।

চৈতন্যযুগের বিপর্যয়

আগে বলেছি, প্রেম-অনুরক্তি-প্রধান সামাজিক মূল্যবোধ, এবং মানব-মহিমার প্রতি অকুণ্ঠ সশ্রদ্ধতাই চৈতন্য-প্রভাবিত বাঙালি জীবনের প্রাণ-কেন্দ্র ছিল। এই সার্বিক মিলনাকাঙ্ক্ষার ফলে স্মার্ত-ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রাচীন জাতি-বিভেদ অনেকটা শিথিল হয়েছিল। অন্যদিকে হিন্দু-মুসলমান,—উচ্চনীচ নির্বিশেষে সংস্কৃতি ও রুচিগত অভিন্নতারও একটি আদর্শ উঠেছিল গড়ে। এই কারণে, বিনষ্টি-যুগের আঘাতও এই মিলন এবং একতামূলক জীবনাদর্শের ওপরেই এসে পড়েছিল প্রথমে। একেবারে শুরুতেই জাতি ও অর্থনীতিগত বিভিন্নতা দিনে দিনে মাথা তুলতে লাগলো; তারপরে বিচ্ছেদের সেই ফাঁক দিয়ে নৈতিক অবনতি ও আত্মপরতা ক্রমশঃ সমাজ-জীবনের সকল স্তরে দেখা দিল। আর, বৃহত্তর বাঙালি জীবন,—তথা বাংলা সাহিত্যেরও এই প্রকৃতি-পরিবর্তনের মূলে ছিল পরিবর্তিত রাজনৈতিক পটভূমির প্রভাব।

বিনষ্টির স্বভাব

১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশ সর্বপ্রথম দিল্লীর মোগল রাজ-বংশের

অধিকারভুক্ত হয়। সম্রাট আকবর তখন ছিলেন দিল্লীশ্বর। এর আগে পর্যন্ত বাংলাদেশ পাঠানজাতীয় নানা রাজবংশের শাসনাধীন ছিল। প্রথম যখন তুর্কী-পাঠানেরা এদেশে আসেন,—সারা বাংলাদেশে তখন বিপর্যয় ও বিনাশ প্রায় নিরবধি হয়েছিল। আগে দেখেছি, এই সময়ে প্রায় দু'শ বছরকাল বাঙালি জীবনের মত বাংলা সাহিত্যের সৃজন-লোকও নিষ্ক্রিয় স্তব্ধতায় ঊষর হয়েছিল। ইলিয়াসশাহী শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পরে সেই ভীরু নিষ্ক্রিয়তা প্রথম মুক্তির পথ খুঁজে পায়,—চৈতন্য-জীবনাদর্শের প্রভাবে তা সহস্র-পথ-প্রসারী হয়েছিল। ইংলণ্ডের মত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যও একান্তরূপে রাষ্ট্রশক্তির লালিত ছিল,—এমন কথা বলা চলে না। তাহলেও, সাহিত্য ও অন্যান্য সৃজনমূলক কর্মপদ্ধতির উপযোগী জীবন-পরিবেশ রচনায় এদেশের পাঠান শাসকেরা যে বিশেষ সহায়ক হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। অর্থাৎ সুস্থ, ভারসম একটি রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক পটভূমির অভাবে চৈতন্য-চেতনার সামাজিক ফলশ্রুতি অঙ্কুরিত হতে পারা কঠিন ছিল,—একথা অনস্বীকার্য। তাছাড়া, বিখ্যাত পাঠান গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ ও তাঁর অনুবর্তী প্রশাসকেরা নানাভাবে বাংলা কাব্য-রচনার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। আসল কথা, পাঠানযুগের রাষ্ট্রাধিকারিগণ প্রথমে বিদেশ থেকে এলেও, ক্রমশঃ বাংলাদেশে বসবাস করে বাঙালি হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে, তুর্কী আক্রমণের অব্যবহিত বিপত্তির কাল কেটে গেলে, বাংলার সমাজ ও সাহিত্য পুনর্গঠিত ভার-সমতা ফিরে পেয়েছিল।

উৎস

মোগল শাসনের সম্বন্ধে কিন্তু একথা বলা চলে না। বস্তুতঃ মোগল আমলেই বাংলাদেশে বিদেশী রাজশক্তির অধীন থাকার অনুভব সর্বপ্রথম তীব্র ও স্পষ্ট হতে পেরেছিল। বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক টয়েন্‌বি তাঁর 'The World and the West' গ্রন্থিকায় উল্লেখ করেছেন,—ভারতবর্ষ প্রথমে মুসলমানদের পদানত না হলে, তাকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের অধীন হতে হত না কখনো। এই প্রসঙ্গে মুসলমান অধিকার অর্থে, আগাগোড়া-বিজাতীয় মোগল অধিকারের কথাই ব্যক্ত হয়েছে বলে মনে করি। পরে দেখব,—ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র প্রথম থেকেই আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য মোগল সাম্রাজ্যবাদের প্রবর্তিত রীতিপদ্ধতিই একান্তভাবে অনুসরণ করেছিলেন।

বস্তুতঃ, ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশ আকবরের শাসন-সীমাভুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এখানকার সমাজদেহে সাম্রাজ্যবাদী বিক্রিয়া ক্রমশঃ প্রবল হতে থাকে।

সকলেই আসতেন দিল্লী থেকে। এঁরা অনেকেই রক্তসূত্রে বা অন্য কোনোভাবে বাদশাহী বংশের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। তাছাড়া, অর্থের লোলুপতা, নীতিহীন বিলাস-ব্যসন, ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মপর মূল্যবোধ,—সব-কিছু নিয়ে দিল্লীর জীবন-চেতনা বাংলাদেশের সামাজিক আদর্শের একেবারে পরিপন্থী ছিল। শুধু তাই নয়,—শাসন করতে যাঁরা এলেন, শোষণ করাই ছিল তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সকলেই প্রায় জানতেন,—কিছুতেই এদেশে বাস করবেন না তাঁরা,—চাকরি করতে আসা—চাকরি শেষ করে আবার ফিরে যাবেন দিল্লীর স্বদেশে। অতএব, যতটুকু পারা যায়, সাম্রাজ্য এবং নিজের লাভের অঙ্ক বাড়িয়ে নেবার দিকে সকলেরই আগ্রহ ছিল অধীর। তাছাড়া ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গভূমি তখন স্বর্ণপ্রসূ বলে ছিল প্রখ্যাত। অতএব, যত পারা যায়,—সোনার সঞ্চয় শোষণ করার দিকেই ছিল তাঁদের একমাত্র লোভাতুরতা। স্বয়ং দিল্লীশ্বর, এবং তাঁদের প্রতিনিধি ও কর্মিবৃন্দের বহুমুখী লালসার অগ্নিতে বাঙালির অর্থনৈতিক সংগতি ও সামাজিক শান্তি একসঙ্গে দগ্ধ হয়ে চলেছিল ;—জীবনের ভার-সমতা হচ্ছিল বিলুপ্ত।

বিপর্যয়-লক্ষণ

অন্যদিকে সমাজ-দেহেও বিভেদের শূন্যতা ক্রমেই দুরাতিশায়ী হয়ে চলেছিল। মোগল শাসক যাঁরা এসেছিলেন, দিল্লীর নাগরিক পরিবেশের জন্য আক্ষেপ ছিল তাঁদের আপ্রাণ। সেই অভাব পূরণের জন্যে দেশের লোকের অর্থেই বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠতে লাগল বিচিত্র শাসন-নগরী ও উপনগরী। এই সব নবগঠিত শহর কেবল শাসনেরই নয়,—বাণিজ্যেরও কেন্দ্র হয়ে উঠ্‌ল। ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে বাংলা দেশ মোগল অধিকারে আসে। পর বছরেই, পর্তুগীজ বণিকেরা হুগলীতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের ফরমান পায় দিল্লীশ্বরের কাছ থেকে। ধীরে ধীরে ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসী বাণিজ্যকুঠিও গড়ে উঠ্‌তে থাকে পূর্ব-পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন নদীর তীরে তীরে। ফলে প্রচুর কাঁচা পয়সার আড়ত হয়ে ওঠে নবগঠিত এই সব শহর-নগর-বন্দর। নবাব সরকার, বা বিদেশী

বণিকদের কুঠিতে চাকরি পাওয়ার অর্থই ছিল প্রচুর টাকা উপার্জন। এই টাকার লোভে সমাজের শিক্ষিত, বুদ্ধিমান লোকেরা নিজেদের গ্রামের ভিটা ছেড়ে উঠে এলেন নূতন নগরীতে। ফলে, একদিকে অর্থবান নাগরিক এবং অন্যদিকে অর্থহীন ভূমিজীবী গ্রাম্য জনতার মোটা দুই ভাগে প্রথমেই বিভক্ত হয়ে গেল গোটা বাঙালি জাতি। এই পার্থক্য বা দূরত্ব ক্রমে কেবল বাড়তেই লাগল। ফলে, গ্রামের জীবনে অশিক্ষা, দারিদ্র্য, রোগ-জীর্ণতা ও নীতিহীনতা হতে লাগল দুর্বার। অন্য দিকে, শহরের জীবনেও নিরবচ্ছিন্ন অভ্যুদয় ঘটল না। অর্থের লোভ উচ্চস্তরের লোকদের অন্ধ করেছিল। ফলে বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণের আদর্শ থেকে তাঁরা বিচ্যুত হয়েছিলেন। তাছাড়া, মোগল রাজধানীর আদর্শে গড়া এই সব নূতন শহর-নগরে নৈতিক জীবনের চারিত্র-গুণ ও মানসিক স্বাস্থ্যও প্রবল দুর্নীতিতে ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছিল। মানব চরিত্রের দীনতার সংগে সংগে মানবিক আদর্শেরও বিনাশ ঘটেছিল। অথচ দেখেছি, মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রাণ ছিল, এই সুমহৎ মানবিক মূল্যবোধ। অতএব, এখানেই মধ্যযুগীয় সাহিত্যধর্মেরও বিনষ্টি সূচিত হয়েছিল।

এ-বিষয়ে নূতন বিপত্তির সৃষ্টি করেছিল ভাষাগত অনৈক্য। পাঠান যুগে বাঙালি জাতির মত বাংলার শাসক-গোষ্ঠির ভাষাও ছিল বাংলা। কিন্তু, মোগলেরা স্থানীয় ভাষার দাবিকে অস্বীকার করলেন,—আরবী এবং ফারসী রাজ-ভাষার মর্যাদা পেল। অতএব, ঐ সব ভাষা-শিক্ষা রাজকৃপা লাভের একমাত্র উপায় হল। অর্থের লোভে বাঙালি-শ্রেষ্ঠরা সেদিন আরবী ফারসী ভাষার চর্চায় একান্ত বৃত হয়েছিলেন। বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ সেদিক থেকেও হয়েছিল বাধাহত। নূতন ভাষা জাতির জীবনে নূতন প্রাণের বার্তা বহন করে আনে। কিন্তু, আলোচ্য যুগের বাঙালি শিক্ষিতজন লাভের লোভে ভাষা-চর্চা করছিলেন,—প্রাণের আনন্দে নয়। এই কারণে দীর্ঘ দু'শ বছরের আরবী-ফারসী চর্চা বাংলা ভাষায় কয়েকটি নূতন শব্দমাত্র ছাড়া স্থায়িভাবে আর প্রায় কিছুই দিতে পারেনি। বিনষ্টি যুগের এই সাহিত্য, প্রাণের অভাব পূরণ করতে চেয়েছিল কথার আড়ম্বর ও পাণ্ডিত্যের কৃত্রিম ঘনঘটা রচনা করে।

আগে বলেছি ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশ আকবরের শাসন-ভুক্ত হয়।

মুকুন্দরামের অভয়ামঙ্গল, কাশীরামের মহাভারত, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃতের মত শ্রেষ্ঠ কাব্য ও দার্শনিক গ্রন্থ এর পরে রচিত হয়েছিল। কিন্তু, আসলে মোগল-প্রভাবিত যুগের বাইরেই এঁদের সৃজনপীঠ রচিত হয়েছিল। মুকুন্দরাম মোগল আওতার বাইরে পালিয়ে গিয়ে তবেই কাব্য রচনা করতে পেরেছিলেন। কাশীরাম ও কৃষ্ণদাসের কবি-মানসও গঠিত হয়েছিল মোগল অধিকার-পূর্ব যুগে। তাছাড়া, তাঁদের কাব্য-রচনার কালে মোগল-প্রভাবের ফলশ্রুতি সমাজে প্রকট হতে পারেনি। আকবরের আমলে মোগল শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের আগে বাংলাদেশে মোগল শাসন-ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি। রাজকার্য সুশৃঙ্খল হতে শাহজাহানের আমল চলে এসেছিল। জাহাঙ্গীরের দেহান্ত ঘটে ১৬২৭ খ্রীস্টাব্দে। অতএব, মোগল শাসনের সামাজিক প্রতিফল সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝিতেই প্রথম প্রকাশ পায়। আগেও বলেছি, বাংলা সাহিত্যে যুগান্তরস্বভাব সূচিত হয়েছে ঐ সময় থেকেই।

সাহিত্যে যুগান্তর লক্ষণ

এই সময়কার শিল্প-কর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য সাহিত্য-বিষয়ের দ্বিধা-বিভক্তি। একদিকে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থসম্পদে দীন গ্রামীণ লোক-সাধারণের জীবনবাণী উদ্গীত হয়েছে লোক-সাহিত্যের আকারে। বাউল, মুর্শিদীগান, পূর্ব-বঙ্গের গীতিকা-সাহিত্য ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আবার, নাগরিক সমাজের সাহিত্য আকার পেয়েছিল বিভিন্ন বিদ্যাসুন্দর কাব্যে,—আলংকারিক বিদগ্ধতা ও পাণ্ডিত্যের চমক দিয়ে আদিম দেহ-লোলুপতাকে আবৃত করার দিকেই এই শ্রেণীর সাহিত্যের ঝোঁক ছিল প্রবল। এ ছাড়া রামপ্রসাদ-প্রবর্তিত শাক্ত সংগীতে গ্রাম-নগরে ব্যাপ্ত নিখিল বাংলার ক্ষুধার্ত শূন্যতাবোধের বিরুদ্ধে ব্যথিত প্রতিবাদ-গীতি ধ্বনিত হয়েছে। অন্যদিকে, আরাকান-প্রত্যন্তের মুসলমানী সাহিত্যে লোক-সংগীতের আধারে নবীন মানব-প্রেমের বাণী হয়েছে উদ্গীত।

লোক-সাহিত্য

সাধারণতঃ লোক-সাহিত্য কথাটির ব্যবহার হয় ইংরেজি Folk Lore শব্দের পরিবর্তে। Folk অর্থে উন্নততর সমাজের প্রান্তবর্তী অপেক্ষাকৃত অনুন্নত পৃথক্ জনসমষ্টিকে বোঝায়। অতএব Folk Lore, তথা লোক-সাহিত্য বলতে বুঝি এই অনুন্নত সমাজের সৃষ্টিকে,—পার্শ্ববর্তী উচ্চ-স্তরের শিল্পকর্মের তুলনায়, রুচি, চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গিতে যা অপেক্ষাকৃত স্থূল এবং দীনতাপূর্ণ। এদিক্ থেকে, লোক-সাহিত্যের ধারণার সঙ্গে একটি আপেক্ষিক নিকৃষ্টতা-বোধ জড়িয়ে আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো সমাজের জীবন ও সংস্কৃতি উচ্চ-নীচ দুটি পৃথক্ পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে না পড়ে, ততক্ষণ সে সমাজে লোক-সাহিত্যের উদ্ভব কল্পনা করা চলেনা। বাংলা সাহিত্যের আদি পর্যায়ে চর্যাপদ ছিল শ্রেষ্ঠ লোকসাহিত্যের নিদর্শন,—তার পাশে বাঙালির রচিত অভিজাত সাহিত্যের উৎকৃষ্ট পরিচয় পাই জয়দেবের গীতগোবিন্দে। আদি-মধ্য পর্যায়ে বিদ্যাপতির বিদগ্ধ কলা-কুশলতার পাশে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন স্থূলাবয়ব লোক-সাহিত্যের নিদর্শন। চৈতন্য-সমকালীন বাংলায় লোকসাহিত্য নেই। কারণ, নিখিল বাঙালির একীভবনের মধ্যে লোক-সমাজের পৃথক্ অস্তিত্ব সেদিন একেবারে বিলীন হয়ে গিয়েছিল।

লোক জীবন ও লোক-সাহিত্য

লোকসাহিত্য বলতে সব সময়ই মূর্খতা বা নির্বুদ্ধিতা-পূর্ণ রচনার কথা ভাব্‌বার কারণ নেই। শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে লোক-জীবনের জ্ঞান ও আদর্শ মাত্রই প্রধান ভাবে প্রকৃতিজ, অপেক্ষাকৃত অমার্জিত। চৈতন্য-চেতনা বিনষ্টির যুগে লোক-সমাজের পুনরুদ্ভব ঘটে,—লোকসাহিত্যেরও ঘটে নব-প্রাদুর্ভাব। এই সব সাহিত্যে চৈতন্য-যুগের ক্ষীণ পূর্ব-চেতনার সঙ্গে লোক-জীবনের স্থূল প্রেম ও দেহাকৃতিকে এক সঙ্গে যুক্ত করে,—মানব মনের মন্ময় অনুভূতিকে সহজ রস-রূপ দিয়েছেন এ-যুগের মরমী কবিরা। তাঁদের মধ্যে আছেন বাউল, মুর্শিদী, মারিফতী প্রভৃতি গুহ্য সাধক-কবির দল।

বাউল, মুর্শিদী, মারিফতী গান

তা ছাড়া, হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির বি-মিশ্রতায় গঠিত অখণ্ড বাঙালি-চেতনার মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যের নব-রূপ দিয়েছেন চট্টগ্রাম রোসাঙের মুসলমান কবিকুল। এ-কেবল নূতন আকৃতি নয়,—নব-জীবনের সঞ্চার। চৈতন্য-যুগের বাংলা দেশ মানুষের মধ্যে দেব-মহিমা আবিষ্কার করে ভাব-অভিভূত হয়েছিল। তাই, সে যুগের সাহিত্যের সকল শাখায় দেবান্বিত মানুষের মহিমা-গীতিই নব-নব রূপে উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু, আরবী, ফারসী ভাষায় লেখা মুসলমানী সাহিত্য মানুষের প্রেম,—তথা মানুষের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার সঙ্গে তার অসংগতি-অপূর্ণতাও সমান মানবিক মূল্যের স্বীকৃতি পেয়েছে। ভক্তির বদলে সহানুভূতির স্পর্শ পেয়ে মানুষের দুর্বলতাও প্রীতি-মাধুর্যে হৃদ্য হয়েছে। চট্টগ্রাম-রোসাঙের মুসলমান কবিকুল সেই বিশুদ্ধ মানবতাকে আরবী-ফারসী সাহিত্যের মণিকোঠা থেকে আহরণ করে এনেছেন বাংলা ভাষায়, বঙ্গ-সরস্বতীর সাধন-পীঠে। কিন্তু, বাংলা সাহিত্যের পূর্বৈতিহ্যকে তারা বিস্মৃত হন নি। চৈতন্য-যুগের ক্ষীয়মাণ ধর্ম-প্রেবণার বৃন্তে অ-মিশ্র শুদ্ধ মানব-প্রেমের কাব্য-কুসুম রচনা করেছেন এঁরা।

চট্টগ্রাম-রোসাঙের ইসলামী সাহিত্য

তা হলেও, রোসাঙের মুসলমান কবি-কুলের অধিকাংশ রচনাই লোক-সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত। কারণ, আলোচ্য কবি-সমাজ একেবারে নিজ্ঞান না হলেও, পাণ্ডিত্যের চেয়ে চিত্ত-জ সহজ অনুভবের 'পরেই নির্ভর করেছেন একান্তভাবে। তাঁদের গল্প,—তাঁদের অনুভব ও রচনাভঙ্গী সব কিছুই ছিল লোক-চেতনাশ্রিত লোকসাহিত্য।

লোক-সাহিত্যের আর একটি অর্বাচীন এবং অপেক্ষাকৃত অ-প্রামাণ্য রূপ পাওয়া গেছে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদিত পূর্ব-বঙ্গ ও মৈমনসিংহ গীতিকার উপাখ্যানকাব্য-প্রবাহে। বিপর্যয় যুগের সামাজিক জীবনের স্পর্শ এই সব রচনায় স্পষ্ট ও অকৃত্রিম।

পূর্ববঙ্গ ও মৈমনসিংহ গীতিকা

১। বাউল, মুর্শিদী ও মারিফতী গান

'বাউল' শব্দের উৎপত্তি অনুমান করা হয়েছে 'বাতুল' শব্দ থেকে। এই নামের তাৎপর্য বিষয়ে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন,—"বহু

শতাব্দী ধরিয়া জাতি-পংক্তির বহির্ভূত নিরক্ষর একদল সাধক শাস্ত্র-ভারমুক্ত মানব-ধর্মই সাধন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা মুক্তপুরুষ, তাই সমাজের কোনো বাঁধন মানেন নাই। তবে সমাজ তাঁহাদের ছাড়িবে কেন? তখন তাঁহারা বলিয়াছেন, 'আমরা পাগল, আমাদের কথা ছাড়িয়া দাও। পাগলের তো কোনো দায়িত্ব নাই।' বাউল অর্থ বায়ুগ্রস্ত, অর্থাৎ পাগল।"

বাউল-এর তাৎপর্য

বাউলেরা "শাস্ত্রভারমুক্ত" যে মানবধর্মের সাধনা করেছেন,—তাকে খুঁজে ফিরেছেন মানব-দেহ-ভাণ্ডেরই মধ্যে। দেহের আদিম ও চিরন্তন আকাঙ্ক্ষাকে মনের সহজ অনুরাগে রাঙিয়ে তাঁরা ডালি দিয়েছেন অনুভব-ময় 'মনের মানুষ'-এর দেউলে,—দিয়েছেন একান্ত মনে মনে। বাউলের গান সেই বাউল সাধনারই অঙ্গ। তাই, এই গানের বিষয়বস্তুর দুটি উপাদান।—(১) দেহের স্থূল আকাঙ্ক্ষা ও আকুতিকে নিয়মিত করবার সাধন-প্রয়াস অধিকাংশ বাউল গানে প্রাধান্য পেয়েছে। (২) দ্বিতীয় শ্রেণীর সংগীতের উৎস দেহাতীত অনুভব-প্রগাঢ়তার কেন্দ্র-মূলে। রক্ত-মাংসের দেহ নিয়ে দেহী যেখানে রূপের অতীত অনুভব-বেদ্যতার মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়েছেন,—সেখানকার আনন্দ-সৌরভই এই সব দুর্লভ দু-একটি বাউল গীতে ব্যঞ্জনা পেয়েছে :—

সাহিত্যে বাউল ধর্ম

"ধন্য আমি বাঁশিতে তোর
আপন মুখের ফুঁক্।
এক বাজানে ফুরাই যদি
নাইরে কোন দুঃখ॥
ত্রিলোক ধাম তোমার বাঁশি
আমি তোমার ফুঁক্।
ভালমন্দ রন্ধ্রে বাজি,
বাজি নিশুইত রাত।
ফাগুন বাজি, শাওন বাজি
তোমার মনের সাথ॥
একেবারেই ফুরাই যদি
কোনো দুঃখ নাই।

এমন সুরে গেলেম বাজি,
আর কি আমি চাই ॥"

আধুনিক বাঙালির বিদগ্ধ রস-লোকে বাউল গানকে আবিষ্কার করার প্রধান গৌরব রবীন্দ্রনাথের। শিলাইদহের জীবনে তিনি বিখ্যাত বাউল-কবি গগন হরকরার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। ডাক হরকরা গগন কবিগুরুর জমিদারিতেই বাস করতেন। এঁর মুখ থেকে এবং অন্যান্য সূত্র থেকে বাউল গান সংগ্রহ করে কবি তাঁর বিখ্যাত হিবার্ট বক্তৃতা 'Religion of Man'-এ ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের আরো একজন প্রিয় বাউল কবি ছিলেন শ্রীহট্টের হাসন-রজা চৌধুরী। ভারতীয় দর্শনসভার সভাপতির ভাষণে কবি এঁর বাউল-গীতির উদ্ধার ও ব্যাখ্যা করেছেন। Religion of Man-এও এঁর কবিতার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা রয়েছে।

বাউল-ইতিহাস

অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন স্বতন্ত্রভাবে বাউল সাধক, ও তাঁদের সংগীতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। পরে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ ও উপদেশের প্রভাবে তিনি বাউল-গীতির আবিষ্কাব, ব্যাখ্যা ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন।

বাউলদের সাধনা গুরু-পরম্পরা-সিদ্ধ। ফলে, গুরুর প্রবর্তনা অনুসারে, এঁরা বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত। পূর্বোক্ত গগন হরকরা ছিলেন কুষ্টিয়ার লালন ফকিরের শিষ্যধারার অন্তর্গত। স্পষ্টই দেখছি, বাউলদের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না ;—'মনের মানুষের সাধনায় সকল মানুষের প্রীতি উপদেশ এঁরা হৃদি-বদ্ধ করেছেন।

বাউল সম্প্রদায়ের প্রথম অঙ্কুরোদ্গম মোটামুটি ষোড়শ শতকের শেষে অথবা সপ্তদশ শতকের শুরুতে হয়েছিল। তার বিকাশ ও পরিণতি ঘটেছে অষ্টাদশ শতক এবং তারও পরে। বাউলেরা অনেকে মহাপ্রভুকে তাঁদের আদি গুরুরূপে বন্দনা করে থাকেন। এর থেকেই বুঝি,—একান্ত শিথিলভাবে হলেও, চৈতন্যের প্রেমানুরক্তির ঐতিহ্য বাউলের 'মনের মানুষের' সন্ধিৎসাকে আমূল আলোড়িত করেছিল।

বিভিন্ন বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে জগমোহন ছিলেন একটি প্রাচীন ধারার প্রবর্তক,—তাঁর পরাগতরা জগমোহনী সম্প্রদায় নামে খ্যাত। একতারা

বাজিয়ে বাউল গান করার প্রচলন করেন গুরু আউলচাঁদ্। অষ্টাদশ শতকের একেবারে শুরু কিংবা পূর্ব-শতকের সমাপ্তি-সীমায় ইনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। আউলচাঁদের সময় থেকে গুরু-পরম্পরা-বদ্ধ বাউল সাধনার ইতিহাস ক্রমশঃ স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল হয়ে এসেছে।

মুসলমান লোক-সমাজে বাউল-এর অনুরূপ সহজ সাধনার পন্থাকেই মুর্শিদী বা মারিফতী ধারা নামে অভিহিত করা হয়। বাউল-সাধনা আনুষ্ঠানিক শাস্ত্র-ধর্ম-নিরপেক্ষ। মুর্শিদী-মারিফতী সাধনাতেও শাস্ত্রাচার বর্জিত হয়েছে। অনুভব-প্রধান স্বাধীন সহজ ইস্‌লামী স্ফী-ভজন-পদ্ধতির দ্বারা মুর্শিদী মারিফত প্রভাবিত। বাউলদের মত এঁদেরও সকল সাধনার কাণ্ডারী হচ্ছেন গুরু বা মুর্শিদ। মারিফত্ শব্দের অর্থ 'পন্থা'। গুরুগম্য সাধন পন্থাকেই ব্যঞ্জিত করা হয়েছে মুর্শিদী-মারিফতী গানে।

মুর্শিদী মারিফতী

২। রোসাঙের ইস্‌লামী সাহিত্য

ব্রিটিশ ভারতে চট্টগ্রাম বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানকালেও তা পূর্বপাকিস্তান,—অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত। কিন্তু, দৈনন্দিন আচার-ব্যবহার, ভাষা ও উচ্চারণ পদ্ধতির বিচারে দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের এই প্রত্যন্ত অঞ্চল বাংলা দেশে অনন্য। প্রতিবেশী ব্রহ্মরাজ্যের আরাকানীদের দ্বারা চট্টগ্রামের জীবনযাত্রা ও ভাষা-সংস্কৃতি বহুল প্রভাবিত হয়েছে। এই প্রভাব কেবল ভৌগোলিক নৈকট্যের ফল নয়। পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল অন্ততঃ দেড়শ বছর। সপ্তদশ শতকের শুরুতে জাহাঙ্গীর-এর রাজত্বে চট্টগ্রামের বৃহত্তম অংশ মোগল বাংলায় আবার ফিরে এসেছিল। বাকি অংশ নানা প্রভাবের তাড়নায় অশান্তি-পীড়িত হয়েছিল। এদিক থেকে চট্টগ্রাম যেমন আরাকানী আচার-আচরণের দ্বারা প্রভাবিত, আরাকানও তেম্‌নি বঙ্গীয় সংস্কৃতির প্রভাব এড়াতে পারে নি। বস্তুতঃ সপ্তদশ শতকের ইস্‌লামী বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশ রচিত হয়েছিল আরাকান-ভূমিতে,—সেখানকার রাজা বা রাজ-পরিষদ্‌দের পৃষ্ঠপোষকতায়।

ইস্‌লামী সাহিত্যের সৃজন-পীঠ

আরাকান তখন ছিল সংস্কৃতি সমন্বয়ের কেন্দ্র। রাজা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, অথচ অধিকাংশ প্রজা ছিলেন মুসলমান; এঁদের মধ্যে অনেকে শ্রেষ্ঠ রাজকার্যেও নিযুক্ত ছিলেন। প্রজারঞ্জনের জন্য দীর্ঘদিন ধরে বৌদ্ধ রাজারা সিংহাসনে আরোহণ করবার সময়ে একটি ইস্‌লামী নাম-ও গ্রহণ করতেন। অতএব, বৌদ্ধ এবং ইস্‌লামী সংস্কৃতির একটি সুষ্ঠু সাযুজ্য রচিত হতে পেরেছিল সেদিনকার আরাকানে। হিন্দুরাও যে ছিলেন, এবং তাঁদের ধর্ম ও পুরাণকথার ঐতিহ্য মুসলমান কবিদের পক্ষে দুরধিগম্য ছিল না, আলাওলের পদ্মাবতী,—এমন কি দৌলৎ কাজির সতী ময়নামতীতেও তার ছাপ স্পষ্ট। তাছাড়া, ভাষাগত বিচিত্রতাও ছিল সেকালের পক্ষে কল্পনাতীত। রোসাঙের প্রথম বাঙালি মুসলমান কবি দৌলৎ কাজি আশরফ্ খান্-এর রাজ-সভা বর্ণনা করে বলেছেন,—সেখানে নানাজাতির লোক-সমাগম হয়েছিল :—

আরাকান রাজসভা

"সৈয়দ শেখ আদি মোগল পাঠান।
স্বদেশী বিদেশী বহুতর হিন্দুস্থান॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বহুতর।
সারি সারি বসিলেন যেন মহেশ্বর॥"

সেই রাজসভায় প্রচলিত ভাষা-বিচিত্রতা সম্বন্ধে কবি জানিয়েছেন,

"আরবী ফারসী নানা তত্ত্ব উপদেশ।
বিবিধ প্রসঙ্গ কথা আছিল বিশেষ॥
গুজ্রাতি গোহারি ঠেট্ট ভাষা বহুতর।
সহজে মহন্ত সভা আনন্দ সাগর॥"

তাহলেও সেখানকার বহুসংখ্যক সাধারণ লোকের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। দৌলৎ কাজি তাদেরই চিত্ত-বিনোদনের জন্য কাব্য রচনা করেছিলেন। কবির পৃষ্ঠপোষক আশরফ খাঁ তাঁকে কাব্য রচনার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন,—

দৌলৎ কাজির সতী ময়নামতী

"ঠেটা চৌপাইয়া দোহা কহিলা সাধনে।
না বুঝে গোহারি ভাষা কোন কোন জনে॥
দেশী ভাষে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দে।
সকলে শুনিয়া যেন বুঝয় সানন্দে॥"

হিন্দী ভাষার কবি সাধন "মৈনা সত" নামে কাব্য রচনা করেছিলেন। দৌলৎ কাজি এই হিন্দী কাব্য-কথাকেই বাংলা ভাষায় নবরূপ দিয়েছিলেন আশরফ খাঁর আদেশে।[১]

কবি জানিয়েছেন, আশরফ ছিলেন আরাকান-রাজ শ্রীসুধর্মের অমাত্য। শ্রীসুধর্ম তাঁর রাজত্বকালের ষোল বছরের মধ্যে বার বছরই আনুষ্ঠানিকভাবে রাজকার্য করেন নি। কারণ, দৈবজ্ঞেরা বলেছিলেন,—রাজ-অভিষেক গ্রহণের এক বছরের মধ্যে তাঁর প্রাণান্ত হবে। এই কারণে, তাঁর শাসন কালের প্রথম বার বছর রাজ-অধিকারে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন আশরফ খাঁ। দৌলত এই সময়ে তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। ইতিহাস অনুসারে এই সময় ছিল ১৬২২—১৬৩৫ খ্রীস্টাব্দ।

দৌলৎ কাজির কাব্য 'মৈনা সত'-এর হুবহু অনুবাদ নয়,—পুরাতন গল্পের ওপরে কবি নিজের আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনার রং বুলিয়েছেন। সতী ময়নামতী, বা লোরচন্দ্রানী নামে পরিচিত কাব্যের কাহিনী নিম্নরূপ:—রাজপুত্র লোরক সতী ময়নামতীকে বিয়ে করেছিলেন। রাজপুত্র যেমন বীরত্বে ছিলেন "দুর্জয়", ময়নামতীও তেমনি ছিলেন রূপেগুণে "সর্বকলাযুতা।" নবদম্পতীর জীবন সুখে কাটছিল। এমন সময়ে একদিন লোরকের কানন-বিহারের ইচ্ছা হল। রানী ময়না আর বৃদ্ধ অমাত্যদের ওপরে রাজ্যভার দিয়ে তিনি সকল যুবাপাত্রের সঙ্গে বন-যাত্রা করেন এবং সেখানে এক যোগীর কাছে গোহারী দেশের রাজকন্যা চন্দ্রানীর প্রতিকৃতি দেখে মুগ্ধ হন। দোর্দণ্ডপ্রতাপ বামন ছিল চন্দ্রানীর বর। তার অমিত শক্তি গোহারী রাজাকে শত্রুভয় থেকে চিরমুক্ত করেছিল। কিন্তু পিতা নিরাতঙ্ক হলেও বামনের হাতে কন্যা চন্দ্রানীর যৌবন-কামনা একান্ত অতৃপ্ত হয়েছিল। যোগীর কাছে এই কাহিনী, এবং চন্দ্রানীর রূপ লাবণ্যের কথা শুনে লোর ছদ্মবেশে গোহারী দেশে উপস্থিত হন।

কাহিনী

প্রথম দর্শনেই দুজনের প্রতি দুজনের আসক্তি জন্মে। গভীর রাত্রে দুঃসাহসিক কৌশলে লোর চন্দ্রানীর শয্যাগৃহে গিয়ে পৌঁছেন। এমন সময়ে বামনের আগমন-বার্তা শুনে দুজনেই বনপথে পালিয়ে যান। গভীর বনে বামন এঁদের পথ-রোধ করে দাঁড়ায়; কিন্তু লোরের সহিত দুঃসাহসী যুদ্ধ করে অবশেষে তার মৃত্যু হয়। যুদ্ধ চলবার সময়ে অতর্কিত

সর্পাঘাতে চন্দ্রানীরও প্রাণান্ত হয়েছিল। লোর যখন শোকে অভিভূত, তখন এক ঋষি এসে তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। পরে গোহারি-রাজের আহ্বানে তাঁরা রাজধানীতে ফিরে যান। আরো পরে, বিবাহিত জীবনে এঁরা গোহারির রাজা-রানীর আসন অধিকার করেন।

এদিকে স্বামি-বিরহে ময়না-সতী দিন-রাত অঝোরে ঝুরতে থাকে। অথচ, এমন দুর্দিনে "ছাতন কুমার" এসে দাঁড়ালো তার অদম্য লালসা নিয়ে;—প্রবল বিতৃষ্ণা-ভরে সতী ময়না তাকে করলো প্রত্যাখ্যান। রতনা মালিনীকে টাকা দিয়ে চর নিযুক্ত করলো ছাতন,—ময়নার মন জয় করে দেবার জন্যে। শুভার্থিনী দাসীর ভূমিকায় আবির্ভূত হল বিশ্বাস-ঘাতিকা কুট্টনী। আষাঢ়ের ঘন-বর্ষা থেকে জ্যৈষ্ঠের প্রখর উত্তাপের মধ্যে বারটি মাস ঘুরে আসে ময়নার বিরহার্ত চিত্তের বিচিত্র বেদনার "বারমাস্যা"। আর, প্রতিটি দুর্বল আকুলতার ক্ষণে রত্না মালিনী ছাতন-সঙ্গ লাভের লোলুপ প্রস্তাব তুলে ধরে চোখের 'পরে। প্রতিবারেই ময়না তার অজেয় সতীত্বের শক্তিতে সকল প্রলোভন জয় করে। অবশেষে মালিনীর দুরভিসন্ধির কথা বুঝতে পেরে তাকে চরম শাস্তি দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। তারপরে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে লোরকের সন্ধানে পাঠায় বিমলা-সারিকে সঙ্গে দিয়ে। অবশেষে, চন্দ্রানীর ছেলের হাতে গোহারি রাজ্যের ভার দিয়ে লোর সপত্নীক ফিরে এলেন ময়নার কাছে। এবার তিনজনেরই দিন কাটতে লাগ্‌ল সুখে শান্তিতে। পরিণত বয়সে লোরের মৃত্যু হলে দুই নারীই অনুমৃতা হয়েছিলেন।

গল্পটির মধ্যে আদর্শ-বিমিশ্রতার পরিচয় স্পষ্ট লক্ষণীয় হয়ে আছে। ময়নামতীর চরিত্রে মধ্যযুগের স্মার্ত হিন্দু সমাজের সতীত্ব-আদর্শ উদ্দীপ্ত। স্বামী যথেচ্ছাচার করলেও স্ত্রী নীরবে সমস্ত কিছু সহ্য করবে;—উপেক্ষিত অপমানিত হয়েও একান্তমনে করবে স্বামি-ধ্যান,—ময়নামতী এই মূল্য-বোধেরই প্রতীক। অন্য দিকে, আদিম লোক-সমাজের নারী-স্বাতন্ত্র্য, বিবাহিতা পত্নীরও বীর-উপভোগের স্বাধীন আকাঙ্ক্ষা স্বীকৃতি পেয়েছে লোর-চন্দ্রানীর গল্পে। আর, নিজে পণ্ডিত হলেও, দৌলৎ কাজি এই দুটি আদর্শকেই লোক-জীবনের ভাবে-ভাষায় ম'ণ্ডত করে প্রকাশ করেছেন। বিদ্যাপতির বৈষ্ণব কবিতা, এমন কি জয়দেব-কালিদাসের সংস্কৃত রচনার

প্রতিচ্ছায়াও দুর্লভ নয় 'সতী ময়নামতী' কাব্যে। কিন্তু, বর্ণনা-ভঙ্গী এবং চরিত্রায়ণের গুণে সব কিছুই আকারিত হয়েছে আদিম, প্রকৃতি-জ স্বভাবে। রচনা-শৈলী, ও জীবনবোধের এই বৈশিষ্ট্যেই দৌলৎ কাজির রস-ঋদ্ধ কবি-কর্মও লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।

দৌলৎ তাঁর গোটা কাব্য রচনা শেষ করে যেতে পারেন নি। ময়নার "বারমাস্যা" অংশে সর্বশেষ জ্যৈষ্ঠমাসের বর্ণনা আরম্ভ করার পরেই তাঁর দেহান্ত হয়। কিন্তু ঐ অ-পূর্ণ রচনারই গুণ-বৈশিষ্ট্যে তিনি রোসাঙের শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা পেয়েছেন। এর মূলে ছিল কবি-প্রাণের সহজ বিশ্বাস ও প্রেমানুরক্তির নিবিড়তা। রোমান্টিক প্রণয়-কাব্যের ওপরে দৌলৎ-এর আদর্শবাদী ভাব-কল্পনা প্রেম-তপস্যার মহিমা রচনা করেছে। কবি নিজে ছিলেন সুফী সাধক। সেই সাধনার আনুষ্ঠানিক অংশ থেকে অ-মিশ্র অনুরক্তির রক্তিমাটুকু ছেকে নিয়ে তার কাব্যকে করে তুলেছেন লাবণ্যময়। বেদ-উপনিষদের প্রসঙ্গ থেকে বিদ্যাপতির রূপ-প্রকাশ পর্যন্ত সর্বত্র সেই সহজ অনুভবের লাবণ্য বিভান্বিত হয়ে আছে। "বারমাস্যার" শুরুতে কবি লিখেছেন,—

"দেখ ময়নাবতী প্রবেশ আষাঢ়
চৌদিকে সাজয় গম্ভীর।
বধূজন প্রেম ভাবিয়া পন্থিক
আইসয় নিজ মন্দির॥
যার ঘরে কান্ত সব সোহাগিনী
পূরে মনোরথ কাম।
দুর্লভ বরিষা তামসী রজনী
নির্জন সংকেত ঠাম।

দৌলতের কবি-কীর্তি

দারুনী ডাউক দাদুরী ময়ূর
চাতক নিনাদে ঘন।
তা ধ্বনি শুনিতে শ্রবণ বিদরে
না সহয় মনে মদন॥
যাবৎ বয়স কেলি কলারস
পূরয় মনোরথ জানি।

ছঠ পরিপাটি মান উপরোধ
চাতুরি তেজ কামিনা ॥
শুনহ উকতি করহ ভকতি
মানহ সুরতি রাই ॥
নাগর সুজন মিলাইয়া দেম
যেন কালার কোলে রাই ॥'

বৈষ্ণব কবিতার সুর লোক-জীবন-রসে তন্ময় দৌলৎ-এর কবি-প্রাণের স্পর্শে লোকসাহিত্য-লক্ষণে এমনি করেই অনুরঞ্জিত হয়ে উঠেছে।

কবি আলাওল

দৌলৎ-এর অপূর্ণ কাব্যের রচনা সম্পূর্ণ করেছিলেন রোসাঙের প্রখ্যাত কবি আলাওল। এঁর অনেক কবি-কর্মের মধ্যে পদ্মাবতী কাব্য সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু, কাব্যের চেয়েও কবির জীবন ছিল বিচিত্রতর অভিজ্ঞতা ও রসের আকর।

"মুল্লুক ফতেহাবাদ"-এর জামালপুরে কবির আদি নিবাস ছিল। তাঁর পিতা ছিলেন নবাব কুতুবের অমাত্য।

পিতা-পুত্র একবার জলপথে যাবার সময়ে পর্তুগীজ দস্যুদের হাতে পড়েন। তাতে কবি-পিতা প্রবল যুদ্ধ করে 'সহিদ্' হন। আলাওল নিজে রক্ষা পেলেও, বহু দুর্ভোগ সহ্য করে তবে এসে পৌঁছান আরাকান রোসাঙে। এখানে প্রথমে তিনি সৈন্য-বাহিনীতে অশ্বারোহীর পদে যোগ দেন। কিন্তু অল্প দিনেই তাঁর কবি-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তখন রোসাঙের "মুখ্য পাটেশ্বরীর অমাত্য মহাজন" মাগন ঠাকুর তাঁর পৃষ্ঠপোষক হয়ে পড়েন; এঁর আশ্রয়েই কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য পদ্মাবতী রচিত হয়। সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জমাল নামে দ্বিতীয় কাব্যটির রচনাও আরম্ভ হয় মাগনঠাকুরেরই পৃষ্ঠপোষণে। কিন্তু, গ্রন্থ-সমাপ্তির আগে মাগনের মৃত্যু হয়, কবি তখন রাজা চন্দ্রসুধর্মের অমাত্য সোলেমানের আশ্রয়ে চলে আসেন। এঁর নির্দেশেই তিনি দৌলৎ কাজির কাব্যের অসম্পূর্ণ অংশ রচনা করে শেষ করেন। এর পরে প্রধান সেনাপতি সৈয়দ মহম্মদের অনুরোধে রচনা করেন হপ্তপয়কর নামে নূতন কাব্য।

এই সময়ে আলাওলের জীবনে আবার দুর্যোগ দেখা দেয়। শাহসুজা তখন ঔরঙ্গজেবের ভয়ে পালিয়ে রোসাঙ্ রাজসভায় আশ্রয় নিয়েছিলেন।

ঐ সময়ে কবির সঙ্গে সুজার হৃদ্যতা ঘটে। কিছু দিন পরে রোসাঙ্ সরকারের বিরাগভাজন হয়ে শাহ-সুজার প্রাণান্ত হয়। সেই সময়ে মৃজা নামে এক দুষ্ট শত্রু সুজা ও আলাওলের নাম একত্র জড়িয়ে রাজদরবারে ষড়যন্ত্রের মিথ্যা অভিযোগ আনে। বিনা অপরাধে কবি সুদীর্ঘ পঞ্চাশ দিন কারাবাস যন্ত্রণা ভোগ করেন। পঞ্চাশ দিন পরে মৃজাব মিথ্যাচার ধরা পড়িলে তার মৃত্যুদণ্ড হয়, আর কবি মুক্তি লাভ করেন। তার পরেও আবো কিছুদিন নানা দুর্ভাগ্য কবিকে তাডা করে ফিরে। সবশেষে, কাজি সৈয়দ মামুদশাহেব কৃপা লাভ করে আবার তাঁর সৌভাগ্য উদয় হয়। এঁর আশ্রয়ে কবি সয়ফুলমুলক্ বদিউজ্জমাল রচনা করে সম্পূর্ণ কবেন। পরে রাজা চন্দ্রসুধর্মার আদেশে নূতন কাব্য রচনা করেন, কবি নিজামীর 'দারা সেকেন্দর-নামা' অবলম্বন করে।

কবি-জীবনী

দৌলৎ কাজির অনুভব--তন্ময়তার পরিবর্তে আলাওলের কাব্যে জ্ঞান-গম্ভীরতা প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য পদ্মাবতী হিন্দী-কবি মহম্মদ জায়সীর পদুমাবৎ-এর অনুসরণে লেখা। ইতিহাসের সঙ্গে কিছু পরিমাণ কবি-কল্পনা মিশিয়ে পদ্মাবতী কাব্যের কাহিনী গঠিত :— চিতোরের রাণা রত্নসেনের প্রথমা পত্নী ছিলেন নাগদেবী। সিংহলের রাজকন্যা পদ্মাবতীর রূপগুণের কথা শুনে রত্নসেন মুগ্ধ হন এবং একটি পোষা শুকপাখি নিয়ে যোগীর বেশে উপনীত হন সিংহলে। সেখানে প্রধানতঃ সেই শুক পাখিরই সাহায্যে রত্নসেন-পদ্মাবতীর মিলন হয়। দেশে ফিরে দুই স্ত্রী নিয়ে সুখে দিন কাটছিল রাণার। কিন্তু পদ্মাবতীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করেন, এবং পরাজিত রাজাকে বন্দী করে নিয়ে যান। গৌরীসেন ও বাদিনা নামে দুই রাজ-সুহৃদ্ তাঁকে কৌশলে উদ্ধার করে আনেন। এদিকে রাণা রত্নসেনের অনুপস্থিতির সময়ে দেওপাল নামে রাজা পদ্মিনীকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করে। দেশে ফিরে রত্নসেন তার প্রতিবিধানের জন্য প্রস্তুত হন; যুদ্ধে দেওপালের মৃত্যু হয়; কিন্তু স্বয়ং রাজাও মারাত্মক আঘাত পান। স্বামীর মৃত্যু হলে নাগদেবী ও পদ্মাদেবী দুজনেই অনুমৃতা হন। এই সময়ে সম্রাট আলাউদ্দিন আবার

পদ্মাবতী কাব্য

ছুটে আসেন চিতোরে ; পদ্মাবতীর দগ্ধ চিতার পাশে প্রণাম করে তিনি স্বদেশে ফিরে যান।

জায়সী সূফী কবি ছিলেন,—ঐতিহাসিক গল্পাশ্রিত কাব্যে তাই নিজ ধর্ম-কল্পনার রং ফলিয়েছেন। চিতোর অর্থে তিনি মানবদেহ বুঝেছিলেন, রত্নসেন হচ্ছেন জীবাত্মা ; পদ্মিনী বিবেক, আর শুকপাখি ছিল ধর্মগুরুর প্রতীক। আলাওল নিজেও সূফীভাবের সাধক ছিলেন ; জায়সীর কাব্যাদর্শের তিনি পোষকতা করেছিলেন। কিন্তু জায়সীর মত তাঁর অনুভূতির অতলস্পর্শতা এমন সহজ ছিল না। সে অভাব তিনি পূরণ করেছেন পাণ্ডিত্যের বিদগ্ধতা দিয়ে। আরবী-ফার্সী সাহিত্যের মত হিন্দুধর্ম এবং সংস্কৃত কাব্যালংকার শাস্ত্রে আলাওলের সাধারণ জ্ঞান ছিল। তাকেই লোকসাহিত্যোচিত আধারে উপস্থিত করে কাব্য-চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছেন তিনি। অনুভব-গভীরতার চেয়ে বিদগ্ধ উজ্জ্বলতার প্রতিই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি।

অপরাপর রচনা

সৈফুল মুলুক বদিউজ্জমাল নামে আলাওলের দ্বিতীয় রচনা একই নামের ফারসী কাব্যের আদর্শে লেখা। হপ্তপয়কর এবং দারা সেকেন্দর নামা নিজামীর লেখা ফারসী কাব্যের বঙ্গানুবাদ। শেষোক্ত কাব্যে গ্রীক্ বীর আলেকজাণ্ডারের বিজয়-কাহিনীর কিছু কিছু অংশ বর্ণিত আছে।

আলাওল, এবং তাঁর আগে দৌলৎ কাজি কিছু কিছু রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদও লিখেছিলেন। দৌলতের পদ রচনাও তাঁর একমাত্র কাব্য সতী ময়নামতীর অন্তর্গত। কিন্তু, এই সব কাব্য বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যের বহির্ভূত ;—একান্তরূপে লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত।

কবি সৈয়দ সুলতান ঐ ধরনের রাধাকৃষ্ণ-প্রেমমূলক লোকসংগীতের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন। এঁর বাড়ি ছিল চট্টগ্রামের পরাগলপুরে—কবি

কবি সৈয়দ সুলতান

সূফীপন্থী সাধক ছিলেন। তাঁর রাধাকৃষ্ণ-কবিতায় ঐ সাধনারই গোপন সংকেত-কথা আভাসিত হয়েছে। তাছাড়া, জ্ঞান-প্রকাশ নামক গ্রন্থে তান্ত্রিক যোগাদি সাধনার উল্লেখ আছে। "নবীবংশ"-তে আছে নবীদের আবির্ভাব ও জীবনকাহিনী। এই শেষোক্ত গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত হয় ১৬৫৪—৫৫ খ্রীস্টাব্দে।

কবি মহম্মদ খান 'মুক্তালহোসেন' কাব্যে কারবালা যুদ্ধের আরবী কাহিনীর বঙ্গানুবাদ করেছেন। নবীবংশের প্রাসঙ্গিক আলোচনাও রয়েছে এতে। কবির পিতার নাম ছিল মুবারিজ খান। শাহ সুলতান ছিলেন এঁর গুরু।)

মহম্মদ খান

৩। পূর্ববঙ্গের গীতিকা সাহিত্য

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের উৎসাহ ও প্রবর্তনায় প্রধানতঃ ৺চন্দ্রনাথ দে পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বহুসংখ্যক গাথাকাব্য আহরণ করেছিলেন ;—লোক-জীবনাশ্রিত নর-নারী-নির্ভর বিশুদ্ধ মানব-প্রেমের চরম বসরূপ তাতে উদ্ভাসিত হয়েছে। এই কাব্য-প্রবাহের ঐতিহাসিক প্রামাণ্য সম্বন্ধে অনেকে সংশয় পোষণ করে থাকেন। অধিকাংশ কাব্যেরই পুঁথি পাওয়া যায় নি। ৺চন্দ্রনাথ দে লোক-মুখ থেকে সেই সু-প্রাচীন প্রেম-গাথা সংগ্রহ করে ডঃ দীনেশচন্দ্রকে লিখে পাঠিয়েছিলেন। তার থেকে মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার একাধিক খণ্ড সম্পাদিত হয়। সন্দেহ নেই, এমন অবস্থায় মূল রচনার আগাগোড়া বিশুদ্ধি রক্ষিত হওয়া অসম্ভব ছিল। তাহলেও, এই গাথাবলী যে মোটামুটি গ্রামীণ লোক-জীবনের স্বভাব-আকৃতিকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে—এ-সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই। ডঃ দীনেশচন্দ্রের ভাষাতেই এই রচনাপ্রবাহের শিল্প-পরিচয় প্রকাশিত হতে পারে :—"পল্লী-গীতিকায় বৈষ্ণব প্রভাব আদৌ নাই। তাহাতে চূড়ান্ত প্রেমের কথা আছে—কিন্তু প্রেমের আধ্যাত্মিকতা নাই ; দুশ্চর তপস্যা আছে—কিন্তু তুলসী বা বিল্বপত্রের অর্ঘ্য নাই···পল্লীগীতিকার প্রেম বিরাট্ আকাশের নীচে, নীল বনান্ত প্রদেশে, রক্তপুষ্প রঞ্জিত বন্যবীথিতে কংস, ধনু প্রভৃতি প্রবল নদ-সৈকতে স্বাধীনভাবে বিকশিত হইয়াছে—কিন্তু তাহা মন্দির জুড়িয়া বসে নাই। এই প্রেম নর-নারীর প্রেম,—ইহা উপাস্য-উপাসকের সাধনা নহে।"

কাব্য-স্বভাব

স্পষ্টই দেখছি,—এই গীতিকা-সাহিত্য চৈতন্য-প্রভাব থেকে বিমুক্ত। ডঃ দীনেশচন্দ্র অনুমান করেছেন,—চৈতন্য-পূর্ব মধ্যযুগেই এই সব গাথার অন্ততঃ কয়েকটি রচিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, পরবর্তী পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন নি। মোটামুটি সপ্তদশ শতক বা তার পরে এই সব কাব্য রচিত হয়ে থাকবে।—এই রচনাপ্রবাহে চৈতন্য-প্রভাবিত দেবাশ্রিত মনুষ্যত্ব-

বোধের ছাপ যেমন নেই,—তেমনি আবার একটু লক্ষ্য করলেই তার পরিবর্তে পাওয়া যাবে, ইসলামি সাহিত্যের সমতুল মানব-দেহ-মনের প্রতি বিশুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার রস-রূপ। এই সব রচনায় মুসলমানী সাহিত্যের পৃথক প্রভাব কিছু আছে কিনা, সে-কথা নির্ণয় করা কঠিন। তাহলেও, পূর্বকথিত যুগান্তর কালের সামাজিক বিনষ্টির জীবন-বেদনাকে এই সব কাব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে রক্ত-কমল রূপে ফুটিয়ে তুলেছে।

মহুয়া, মলুয়া, জয়চন্দ্র-চন্দ্রাবতী, লীলা-কঙ্ক প্রভৃতির উপাখ্যান এই সব গাথাকাব্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আর, প্রতিটি কাব্যেই প্রেমের জন্য সতী নারীর লাঞ্ছনা বরণ, এমন কি অকথ্য সামাজিক নির্যাতনের যূপকাষ্ঠে আত্মবলি-দানের কাহিনী অশ্রু-তপ্ত গীতিরূপ ধারণ করেছে। কিন্তু, প্রতি ক্ষেত্রেই, সতীত্ব অর্থে নারীর মূক সহনশীলতা ও নির্বিচার আত্ম-নির্যাতনের মহিমাকেই স্বর্গীয় মূল্যে উদ্ভাসিত করে দেখানো হয়েছে। এই সব কাহিনীতে সামাজিক ভার-সমতার অভাব সূচিত হয়ে থাকে। পুরুষ নিঃসীম উৎপীড়ন করেছে,--আর অন্ধ আবেগে নারী তা কেবল সয়েই গেছে,—কোনো সমাজেব পক্ষেই এমন অবস্থা আদর্শ বলে মনে করা চলে না। তা হলেও যে-কোনো পরিবেশের মধ্যেই হোক্,—প্রেমের জন্যে একান্ত আত্ম-উৎসর্জনের বেদনা ও গরিমা এই সব কাব্য-কথাকে সহজেই কালজয়ী হৃদ্যতা দান করেছে।

কাব্য-পরিচয়

শক্তি বিষয়ক সঙ্গীত

শক্তি বিষয়ক সংগীত বাংলা সাহিত্যে অষ্টাদশ শতকের নব-যোজনা। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায়,—রামপ্রসাদ সেন ছিলেন এই নবীন গীতিপ্রবাহের "আদি গঙ্গা হরিদ্বার।" বাংলা দেশে শক্তি পূজার ইতিহাস সু-প্রাচীন,—আর্য-পূর্ব কাল থেকেই এই সাধনার ধারা একান্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। আর্য-প্রভাবিত যুগে বাংলাদেশের লৌকিক স্ত্রী-দেবতারা অনেকাংশে হিন্দু-পুরাণের স্বীকৃতি পেয়ে পৌরাণিক শক্তির রূপ ধারণ করেন। চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি দেবতা এই পর্যায়ে পড়েন। কিন্তু, শক্তিসাধনার আরো একটি ধারা রয়েছে, পৌরাণিক ধর্মের সঙ্গে যার কোনো যোগ নেই। বিভিন্ন তন্ত্র শাস্ত্রের গুহ্য সাংকেতিক নির্দেশের দ্বারা পরিচালিত বলে,—একে তান্ত্রিক ধর্ম নামে পরিচায়িত করা হয়। শক্তি-তন্ত্রের নির্দেশিত সাধনা দেহাশ্রয়ী, গুরুগম্য এবং সাংকেতিক। কালী-তারাদি দশমহাবিদ্যা এই সাধন-ধারার শ্রেষ্ঠ দশজন মহাশক্তি। তান্ত্রিক শক্তি-সাধনা প্রধানতঃ গোপনীয় আচার-আচরণ-প্রধান ছিল। অনেকটা এই কারণেও, এই শাখার দেব-মহিমা নিয়ে সর্বজনীন আবেগাশ্রয়ী সার্থক সাহিত্য রচিত হতে পারে নি। রামপ্রসাদই তান্ত্রিক শক্তির মহিমা গান করে প্রথম বাংলা কবিতা রচনা করলেন।

শক্তি গীতির ঐতিহাসিক তাৎপর্য

তাঁর শক্তি-গীতিকে বিষয় অনুসারে দুই ভাগে ভাগ করা চলে। এক শ্রেণীর কবিতায় তান্ত্রিক সাধন-প্রক্রিয়ার নানা পদ্ধতি ও পর্যায় সাংকেতিক ভাষায় বিবৃত হয়েছে। ঐসব গান কেবল দুর্বোধ্যই নয়,—যাঁদের পক্ষে বোধগম্য তাঁদের কাছেও সাহিত্য-স্বাদুতার দাবি করতে পারে না। আর এক ধরনের কবিতায় দেবতার নামটুকুকে মাত্র উপলক্ষ্য করে অ-মিশ্র মানব হৃদয়ার্তির একটি সর্বকাল-হৃদ্য রসরূপ রচিত হয়েছে। তন্ত্র-সাধনায় আরাধ্য দেবীকে জননীরূপে বন্দনা করা হয়। এই সূত্রকে উপলক্ষ্য করে কবি রামপ্রসাদ তাঁর কাব্যে মানবিক বাৎসল্যের একটি ব্যথা-করুণ মূর্তি রচনা করেছেন। বিশেষ করে ঐ সব

শক্তি-গীতির দুটি রূপ

ক্ষেত্রে দেবতার তান্ত্রিক বা পৌরাণিক মূল স্বরূপটি স্তিমিত হয়ে গিয়ে বিশুদ্ধ মানব-হৃদয়ার্তিই প্রায় সর্বত্র হয়ে উঠেছে করুণা-সুন্দর। আগমনী এবং বিজয়া সংগীত এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। পুরাণে হিমালয়ের গৃহে সতীর পুনর্জন্ম গ্রহণের উপাখ্যান রয়েছে। হিমালয়-বধূ মেনকা হয়েছিলেন এবারে পার্বতীজননী। রামপ্রসাদ মাতা-কন্যার এই পৌরাণিক সম্পর্ককে আশ্রয় করে তাঁর সমকালীন বাংলাদেশের ব্যথাহত বাৎসল্যের একটি ঐতিহাসিক রূপ রচনা করেছেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র আগমনী ও বিজয়া সংগীতের সেই বিশেষ দেশকালগত মানবিক ব্যাখ্যা করে বলেছেন,—বাংলার কুটীরের বালিকা-দুহিতাদের স্বামিগৃহে যাওয়ার পর মাতৃ-হৃদয়ের বিরহের হাহাকারকে করুণ রসের অফুরন্ত উৎস করিয়া যে সকল আগমনী গান পল্লীতে পল্লীতে বহিয়া গিয়াছে, সেই আগমনী গানের আদিগঙ্গা হরিদ্বার এই প্রসাদ-সংগীত। আশ্বিন মাসের ঝরা শিউলি-ফুলের মত এই যে মাতৃমিলনের প্রত্যাশায় বালিকা বধূদের চক্ষুজল রাত্রিদিন ঝরিত, এই সকল আগমনী গান সেই সকল অশ্রুরচিত হার,—উহা তৎকালিক বঙ্গজীবনের জীবন্ত বিচ্ছেদ-রসে পুষ্ট।" মনে রাখ্‌তে হবে,—অষ্টাদশ শতকের বাংলাদেশে বালিকাদের শিশু-বিবাহ প্রায় অ-পরিহার্য ছিল,—আর স্বামিগৃহ তখন ছিল বালিকা-বধূদের দুঃসহ কারাগার। বৎসরে দুয়েকটি দিনের মুক্তির জন্য যেমন কন্যার, তেমনি মায়েরও চোখের জল নীরবে ঝরৃত,—নিরবধি। রামপ্রসাদের আগমনী-বিজয়া গীতি-তে উমা-মেনকা উপলক্ষ্য,—পরম লক্ষ্য সেদিনকার বঙ্গীয় জীবনের মানবিক বেদনার্তি।—

> "আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার।
> এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে।
> মুখ-শশী দেখ আসি, দূরে যাবে দুঃখ রাশি,
> ও চাঁদ-মুখের হাসি সুধারাশি ক্ষরে।
> শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলোচুলে ধায় রানী, বসন না সম্বরে।
> অমনি কাঁদে গলা ধরে॥
> পুনঃ কোলে বসাইয়া, চাঁদমুখ নিরখিয়া, চুম্বে অরুণ অধরে।"

কেবল আগমনী-বিজয়ার গানেই নয়, শক্তি-বিষয়ক অন্যান্য কবিতাতেও সমকালীন জীবন-চেতনার প্রতি রামপ্রসাদের এই অবহিত-চিত্ততার

পরিচয় স্পষ্ট। শুহ্ তান্ত্রিক সাধনায় তিনি সিদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু, তাঁর কবিসিদ্ধির মূলে রয়েছে দুর্লভ মানবিক মূল্যবোধ ও একান্ত সমাজ-সচেতনতা। রামপ্রসাদের সমকালীন সমাজ কেবল বাল্য-বিবাহেই নয়, আরো নানারূপ অনাচার অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়েছিল। আত্মসচেতন সুস্থ সামাজিকের দৃষ্টি নিয়ে তিনি তা অনুভব করেছেন ব্যথিত চিত্তের কানায় কানায়। প্রতিকারের উপায় তাঁর হাতে ছিল না, তাই নিরুপায় মনের অভিযোগ উজাড় করে দিয়েছেন মহাশক্তি জগজ্জননীর পায়ে। নালিশটাই সেখানে লক্ষ্য, - একান্ত তীব্র; জননী কেবল নালিশ জানাবার উপলক্ষ্য মাত্র। একটি গীতে কবি লিখেছেন :—

শক্তি-গীতি ও রামপ্রসাদ-প্রতিভার ঐতিহাসিক স্বরূপ

"বল্ মা আমি দাঁড়াই কোথা
আমার কেউ নাই শংকরী হেথা।
মার সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথাতথা।
যে-বাপ বিমাতাকে ধরে শিরে।
এমন বাপের ভরসা বৃথা॥"

জানা যায়, কবি নিজে বিমাতার ঘরের সন্তান ছিলেন। স্বামি-প্রেম-রিক্তা জননার, পিতৃ-স্নেহ-বঞ্চিত পুত্রের এই ক্ষোভ কবির ব্যক্তি-জীব নয় মূলোৎসারিত যদি না-ও হয়ে থাকে,—তবু এ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অনুভব। দেবকথার উপলক্ষ্যে অ মিশ্র মানব-জীবনানুভূতির বেদনা-বিধুর এই চিত্রায়ণ, এবং সামাজিক সহৃদয়তাকে আশ্রয় করে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য আধুনিকতার পথে প্রথম পদক্ষেপ করেছে। এখানেই শাক্ত সংগীত,—তথা রামপ্রসাদের কবি-কীর্তির ঐতিহাসিক মহিমা।

হালিসহর কুমারহট্টের বৈদ্যবংশে কবির জন্ম হয়েছিল; তাঁর পিতা ছিলেন রামরাম সেন। কবি-পিতা দুটি বিবাহ করেছিলেন,—রামপ্রসাদ ছিলেন দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান। তাঁর সহোদর আর একজন ভাই ও দুটি বোন ছিলেন। নিধিরাম ছিলেন বৈমাত্রেয় ভাই। রামদুলাল ও রামমোহন নামে দুটি ছেলে ছাড়া, কবির কন্যাও ছিলেন দুজন,—পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী। কথিত আছে, এই জগদীশ্বরীর ছদ্মবেশ ধরে দেবী কালিকা কবির ঘরের বেড়া বেঁধে গিয়েছিলেন।

রামপ্রসাদের কবিত্ব প্রকাশের বিষয়েও বিচিত্র লোক-প্রবাদ রয়েছে। দারিদ্র্যের জন্য কবি কোনো জমিদারী সেরেস্তায় চাকুরি নিয়েছিলেন ; কিন্তু হিসাবের খাতায় তিনি লিখ্‌তেন গান। ঐ খাতাতেই নাকি অন্যান্যের মধ্যে নীচের বিখ্যাত সংগীতটিও প্রথম লিখিত হয়েছিল :—

রামপ্রসাদ-জীবনী

"আমায় দে মা তবিলদারি,—
আমি নিমক হারাম নই শংকরী ॥" ইত্যাদি।

কবি-প্রতিভার পরিচয় অনুভব করে জমিদার নাকি মাসিক ৩০৲ টাকা মাসোহারার ব্যবস্থা করে তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই সহৃদয় ভূম্যধিকারীর নাম জানা যায় না। তা ছাড়া নিজ কবিকর্মের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে জমিদার রাজকিশোর মুখোপাধ্যায় ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কথা কবি স্বয়ং উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণচন্দ্রই তাঁকে কবিরঞ্জন উপধিও দিয়েছিলেন।

রামপ্রসাদ একখানি কালিকামঙ্গল বিদ্যাসুন্দর কাব্যও রচনা করেছিলেন। এর সঙ্গে তাঁর শক্তি-সাধনার কোনো যোগ নেই। তৎকালীন সমাজের রুচিহীন দেহ-রস-বিলাসের একটি স্থূলরূপ এতে আভাসিত হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে তাব আলোচনা করা হবে।

কবির আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে পণ্ডিত-সমাজে মতভেদ রয়েছে। ডঃ দীনেশচন্দ্রের অনুমান ১৭১৮—২৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে রামপ্রসাদের জন্ম হয়েছিল।

শ্যামাসংগীতের আদি এবং মহত্তম কবি রামপ্রসাদ সেন ছাড়া 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' নামক আর একজন কবিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি পূর্ববঙ্গের কবি,—ঢাকা জেলার চিনিশপুরের অধিবাসী। কবি সেখানকার কালীবাড়িতে সাধনা করেছিলেন। পূর্ববঙ্গে তাঁর বহু সংগীত আজও জনপ্রিয়।

দ্বিজ রামপ্রসাদ

ভক্তি এবং সামাজিক জীবনবেদনাশ্রিত মানবিক অনুভবে স্নিগ্ধ এই শক্তিগীতি সাধক-অসাধক নির্বিশেষে বহু কবিকে আকৃষ্ট করেছে,—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। এঁদের মধ্যে সাধক-কবিরূপে কমলাকান্ত ভট্টাচার্য প্রথমে উল্লেখ্য। কাল্‌নার অম্বিকানগরে কবির নিবাস ছিল। পরে ১৮০০

খ্রীস্টাব্দে তিনি কোটালহাটে বাস পরিবর্তন করেন। ইনি বর্ধমানরাজ তেজশ্চন্দ্রের গুরু ও সভা-পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর কবিতায় শ্যামার-চরণ লাভের আকাঙ্ক্ষা ও মানবিক সহৃদয়তা একসূত্রে গাঁথা পড়েছে :—

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

"জান না রে মন, পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয়।
হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি, দনুজ-তনয়ে করে সভয়।
কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশি ব্রজাঙ্গনার
মন হরিয়ে লয়।"

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র শ্যামাসংগীতের ভক্ত ছিলেন, নিজেও পদ লিখে গেছেন কিছু কিছু। তাঁর পুত্র ও বংশধরদের মধ্যেও কেউ কেউ শক্তি-গীতি রচনায় হাত দিয়েছিলেন। বর্ধমানরাজ মহাতাবচাঁদ-ও গান রচনা করেছিলেন। তা ছাড়া, কমলাকান্তের মধুস্বাদী গীতি-সংকলনের মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে তিনি ইতিহাস-খ্যাত হয়েছেন। বৃটিশ-ভারতের বিখ্যাত শহীদ রাজা নন্দকুমারও কিছু কিছু কালিকা-গীতি রচনা করেছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র ও বংশধরগণ

শক্তি-গীতি,—বিশেষ করে আগমনী-বিজয়া সংগীতের মানবিক আবেদন আরো যাঁদের কবি-কর্মকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তাঁদের মধ্যে আছেন রামবসু এবং দাশরথি রায়। এঁদের প্রথমজন ছিলেন বিখ্যাত কবিয়াল,—দ্বিতীয়জন অতুল্য পাঁচালিকার। কবি-সংগীতের আলোচনা-প্রসঙ্গে এঁদের পরিচয় উদ্ধার করব। এখানে কেবল লক্ষ্য করি,—ধর্মকে উপলক্ষ্য করে আলোচ্য গীতি-সাহিত্যে রামপ্রসাদ আসলে বিশুদ্ধ মানব-রসের স্বাদ রচনা করেছিলেন; তারই ঐতিহাসিক পরিণতিতে ধর্ম-প্রভাব-মুক্ত কবি-মন নিছক শিল্প-রসের সন্ধানেই এর পরিপূর্তি সাধন করেছে। এই কাব্য সাহিত্যের কবি হিসাবে কেবল মুজা হুসেন ও এণ্টুনী ফিরিঙ্গি-ই নয়—মধুসূদন এবং নজরুল ইসলামও অবশ্য উল্লেখ্য।

রামবসু ও দাশুরায়

কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্য

কালিকামঙ্গল নামে এক নূতন কাহিনীযুক্ত কাব্য-প্রবাহ বাংলা ভাষায় রচিত হতে থাকে মোটামুটি সপ্তদশ শতাব্দী থেকে। তান্ত্রিক দেবী কালিকার ভাবাদর্শ অথবা বাংলা মঙ্গলকাব্যের রূপ ও রস-প্রকৃতি, কোনো কিছুর সঙ্গেই এই রচনা-প্রবাহের কোনো যোগ নেই। সপ্তদশ শতক থেকে বাংলা কাব্য-কবিতার আখ্যান-ভাগে বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা ক্রমশঃ ঘনীভূত হচ্ছিল। আর এই প্রয়োজনে সংস্কৃত, আরবী-ফারসী ও লোককাব্য থেকে অসংখ্য গল্প সংগৃহীত হয়েছিল। এই সংগ্রহের পথ বেয়েই বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রবেশলাভ করে।

কালিকামঙ্গল বনাম বিদ্যাসুন্দর

প্রচলিত বাংলা কাব্যে বিদ্যাসুন্দরের গল্প মোটামুটি নিম্নরূপে পাওয়া যায় :—

এক গভীর রাত্রে কালী-পূজো করে, তুষ্টা দেবীর কাছে রাজকুমার সুন্দর বর পেয়েছিলেন যে, রাজকন্যা বিদ্যার পাণিগ্রহণের অধিকারী হবেন তিনি। বিদ্যা যেমন সুন্দরী ছিলেন, তেমনি ছিলেন সর্বগুণ-যুতা বিদুষী। দেবীর দেওয়া শুকপাখী সঙ্গে নিয়ে সুন্দর এসে উপনীত হন বিদ্যার পিতৃ-রাজ্যে। সেখানকার মালিনী-বুড়ী স্নেহাসক্ত হয়ে তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। সুন্দর তাকে মাসি বলে ডাকতে আরম্ভ করেন। এই মালিনীই রাজবাড়িতে ফুল যোগাত। পরদিন সকালে ফুলের পসরা নিয়ে যাবার সময় সুন্দর একটি অপরূপ মালা তার হাতে দিলেন,—রাজকন্যাকে দেবার জন্যে। মালিনী জানত না,—সেই মালায় রতি-কামদেবের পুষ্পচিত্র কৌশলে আঁকা ছিল; আর ছিল একটি সাংকেতিক প্রণয়-লিপি। সেই মালা পেয়ে রাজপুত্রের রসবোধ, পাণ্ডিত্য ও কলাকৌশলে বিদ্যা মুগ্ধ হন। পরদিন স্নানের ঘাটে সাক্ষাতের জন্যে সাংকেতিক প্রতিবচন পাঠান তিনি সুন্দরকে। যথাকালে এদের সাক্ষাৎ ও সাংকেতিক ভাষায় প্রেম বিনিময় হল। গভীর রাত্রে বিদ্যার শয্যাগৃহে উপস্থিত হবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সুন্দর ঘরে ফিরে এলেন। কিন্তু

বিদ্যাসুন্দরের গল্প

সারাদিনের পরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেও প্রতিশ্রুতি রক্ষার কোনো উপায় তিনি খুঁজে পেলেন না। অবশেষে আবার ভিক্ষা করলেন দেবীর চরণাশ্রয়। স্তবে তুষ্টা কালিকা সুন্দরের ঘর থেকে বিদ্যার শয্যাগৃহ পর্যন্ত একটি গোপন সুড়ঙ্গ-পথ সৃষ্টি করে দিলেন। শুধু ঐ একবারই নয়,—সে পথে প্রতি রাত্রে বিদ্যা-সুন্দরের মিলন হতে লাগলো। ক্রমে মিলন থেকে পরিণয়, এবং পরিণয় ফলে বিদ্যার সন্তান-সম্ভাবনা দেখা দিল। এই সংবাদ প্রকাশিত হয়ে পড়লে রাজপুরীতে আক্রোশ ও ক্রোধ সীমাতিক্রমী হয়ে উঠলো। কিন্তু কিছুতেই অপরাধীকে ধরা গেল না। অবশেষে, রাজকন্যার শয্যাগৃহে সিঁদুর বিছিয়ে রেখে কৌশলে নগরপাল সুন্দরের সন্ধান আবিষ্কার করল। প্রতি রাত্রির মত সেদিনও সুন্দর বিদ্যার কাছে গিয়েছিলেন, আর তার কাপড়ে লেগেছিল ছড়ানো সিঁদুর। সেই কাপড় ধোপার ঘরে কাচতে দিলে সেখান থেকে খোঁজ করে সুন্দরের পরিচয় আবিষ্কৃত হয়। তার ঘরে খুঁজে পাওয়া যায় বিরাট সুড়ঙ্গ। ক্রুদ্ধ রাজা তার মৃত্যুদণ্ড বিধান করেন। মশানে গিয়ে সুন্দর চাতুর্যময় বাগ্‌বিন্যাস করে দেবী কালিকার বন্দনা করেন আবার। তিনি স্বয়ং আবির্ভূতা হয়ে ভক্তকে রক্ষা করেন। ফলে বিদ্যা-সুন্দরের প্রকাশ্য মিলন সংঘটিত হয়।

আসলে এই গল্প উত্তর-পশ্চিম ভারতের সাহিত্য থেকে বাংলা ভাষার অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করেছে। অবশ্য সুন্দরের রক্ষাকর্ত্রী হিসেবে দেবী কালিকার পরিকল্পনা বাংলাদেশের নিজস্ব। অনুমান করা হয়, খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এই কাহিনীর প্রাথমিক রূপ পৃথক্ দুটি গল্পের আকারে প্রচলিত ছিল। একটির বিষয়-বস্তুতে রয়েছে শিক্ষাগুরু দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের প্রতি ছাত্রী রাজকন্যার প্রণয়ের উপাখ্যান,—অপরটিতে আছে 'চৌর' [চতুর] কবি-প্রণয়ীর সঙ্গে প্রণয়িণী রাজকন্যার গোপন মিলন-কথা। তার সঙ্গে বররুচির লেখা সংস্কৃত "বিদ্যাসুন্দরম্" এবং কাশ্মীরী কবি বিল্‌হনের চৌর-পঞ্চাশৎ কাব্যের প্রভাব যুক্ত হয়েছে।

গল্পের উৎস

'বিদ্যাসুন্দরম্'-এর আদি-কবি বররুচির সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় নি। তবে, কৃষ্ণরাম, বলরাম কবিশেখর, রামপ্রসাদ এবং ভারতচন্দ্রের বাংলা কাব্যে বররুচির রচনার প্রভাব রয়েছে নিঃসন্দেহে। বররুচির কাব্যে

কালিকার কোন উল্লেখ নেই; আগেই বলেছি,—এটি বাংলাদেশের পরিকল্পনা। অষ্টাদশ, এমন কি, উনিশ শতকেও বাংলা দেশে সামন্ত-শক্তির সাধারণ পূজ্য দেবতা ছিলেন এই দেবী কালিকা। সেকালের জমিদারেরা লেঠেল দল পোষণ করতেন, কেবল নিজেদের সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্যেই নয়। অধিকাংশ লেঠেলেরাই সেকালে অবসর সময়ের বৃত্তি হিসেবে ডাকাতি করত; আর ভূম্যধিকারী ছিলেন প্রায় সর্বত্র এদের পৃষ্ঠপোষক। বিভিন্ন ডাকাতি অথবা সামন্ত-তান্ত্রিক রাহাজানির সময়ে প্রতিবারেই কালী পূজা করা ছিল প্রথা-সিদ্ধ;—সাধারণ বিশ্বাস ছিল, ঐ সকল বিপজ্জনক কর্মের প্রতিফল থেকে দেবী তাঁর ভক্তদের রক্ষা করতে পারেন। মনে হয়, আলোচ্যকালের এই সামাজিক প্রথাই বিদ্যাসুন্দর কাব্যে সুন্দরের পৃষ্ঠপোষিকা রূপে দেবী কালিকার অবতারণা সম্ভব করেছে।

বররুচি

এই অনুমানের সমর্থন বাংলা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের ইতিহাস থেকেও পাওয়া যেতে পারে। এই ধারার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কবি কঙ্ক চৈতন্য-সমসাময়িক বলে কথিত। ষোড়শ শতকের আর একজন কবি দ্বিজ শ্রীধর এবং সপ্তদশ শতকের মুসলমান কবি সাবিরিদ খাঁও বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেছিলেন। এঁদের কারো বর্ণিত কাহিনীতেই দেবী কালিকার উল্লেখ নেই।

কবি কঙ্ক মৈমনসিংহের বিখ্যাত লোক-গাথা লীলা-কঙ্ক-কাহিনীর নায়ক ছিলেন বলে মনে হয়। ইনি নিজেই জানিয়েছেন, রাজেশ্বর নদীর তীরে বিপ্রগ্রামে তাঁর জন্ম হয়েছিল। পিতার নাম গুণরাজ—মা ছিলেন গুণবতী; জাতিতে এঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। কিন্তু, শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে চণ্ডাল-দম্পতি মুরারি ও কৌশল্যার কাছে কবি প্রতিপালিত হন। পরে তিনি ব্রাহ্মণ গর্গের গৃহে গো-পালকের কাজ গ্রহণ করেন। গর্গ ও তাঁর স্ত্রী প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে কবিকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। কিন্তু, সমাজপতিরা তাতে প্রবল বাধা দিয়েছিলেন। কবি কঙ্ক তাঁর আত্মকথা এখানেই শেষ করেছেন। কিন্তু, প্রচলিত লোক-গাথা থেকে জানা যায়,—সমাজের এই অ-স্বীকৃতিই গর্গকন্যা লীলা ও কঙ্কের জীবনে চরম ট্রাজেডি রচনা করেছিল।

কবি কঙ্ক

কঙ্ক তাঁর কাব্যের নাম দিয়েছিলেন "পীরের পাঁচালী"। সত্যনারায়ণের (পীরের) পাঁচালীর আবরণে তিনি আসলে বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়-কথা বিবৃত করেছেন। আগে বলেছি, কঙ্ককে চৈতন্য-সাময়িক, অর্থাৎ ষোড়শ শতকের কবি বলে মনে করা হয়। ডঃ সুকুমার সেন এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর মতে কঙ্ককে বাংলা বিদ্যাসুন্দরের প্রথম কবি মনে করাও "চরম বিচার-মূঢ়তা"।

দ্বিজ শ্রীধর

দ্বিজ শ্রীধরের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের দু'খানি মাত্র খণ্ডিত পুথি পাওয়া গেছে চট্টগ্রামে। হোসেন শাহের পৌত্র ফিরোজ শাহের আদেশে কাব্যটি রচিত হয়েছিল বলে জানা যায়।

সাবিরিদ্ খাঁ

সাবিরিদ্ খাঁর বিদ্যাসুন্দরে সংস্কৃত শ্লোকের অশুদ্ধ উদ্ধৃতি, এবং ভুল অনুবাদের চেষ্টা দেখা যায়। এর থেকে অনুমিত হয়, কোনো সংস্কৃত কাব্য এঁর রচনার আদর্শ ছিল।

কৃষ্ণরাম দাস

বাংলা বিদ্যাসুন্দর কাব্যে কালিকা-উপাখ্যান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সপ্তদশ শতকের শেষভাগে। কবি কৃষ্ণরাম দাস কলকাতার কাছে নিম্‌তে গ্রামে বাস করতেন; তাঁর পিতা ছিলেন ভগবতীদাস। কালিকামঙ্গল ছাড়াও ইনি আরো তিনখানি কাব্য লিখেছিলেন:—(১) ধর্ম-বিষয়ক রায়মঙ্গল। (২) ষষ্ঠীর পাঁচালী, ও (৩) শীতলার পাঁচালী। কালিকামঙ্গলই তাঁর সর্বপ্রথম রচনা,—কবি-কর্মের দিক থেকেও এটি সর্বোৎকৃষ্ট। রচনাকাল অনুমিত হয়েছে ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে। কালিকা-কথা এই কাব্যে উপলক্ষ্য,—মূল লক্ষ্য বিদ্যাসুন্দরের প্রেমোপাখ্যান।

বলরাম কবিশেখর

এই ধারার পরবর্তী উল্লেখ্য কবি বলরাম কবিশেখর। এঁর কাব্যের শেষাংশ খণ্ডিত; অন্য কোথাও রচনাকালের নির্দেশ নেই। এ-বিষয়ে পণ্ডিতমহলে মতভেদ রয়েছে। তবে মোটামুটিভাবে মনে করা হয়,—ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের আগে আলোচ্য কাব্যখানি রচিত হয়েছিল। কবির জন্মভূমি সম্বন্ধেও পণ্ডিতেরা একমত নন। কেউ কেউ এঁকে পশ্চিমবঙ্গের, কেউ-বা আবার পূর্ববঙ্গের অধিবাসী বলে ঘোষণা করেছেন। কবির পিতার নাম ছিল দেবীদাস আচার্য; মা ছিলেন কাঞ্চন দেবী। এঁদের বংশীয় উপাধি ছিল চক্রবর্তী।

'কবিশেখর' ছিল বলরামের উপাধি। ইনি বিষ্ণুদাস-বংশধর লক্ষ্মীনারায়ণের সভাসদ ছিলেন।

বলরামের কাব্যে বিদ্যা-সুন্দরের প্রণয়-কথার চেয়ে কালিকার প্রতি ভক্তিভাব নিবিড়তর। ফলে, মূল উপাখ্যানের বর্ণনাতেও আদি রসাত্মক বিবৃতি অতি-অসংযত হয় নি। বস্তুতঃ, একমাত্র এই কাব্যকেই যথার্থভাবে 'কালিকামঙ্গল' নামে অভিহিত করা চলে।

আগে বলেছি, শক্তি-সংগীতের আদি গুরু রামপ্রসাদ সেনও 'কালিকা-মঙ্গল' নাম দিয়ে একখানি বিদ্যাসুন্দর কাব্য লিখেছিলেন। বর্ণনার দিক থেকে এই রচনা যেমন রুচিহীন,—বাগ্‌বিন্যাসের দিক থেকেও তেমনি স্থূলতাধর্মী এবং অ-শালীন। মহাকালীর এমন পরম সিদ্ধ সাধকও যে কি করে দেবী কালিকার নাম দিয়ে এমন একখানি গর্হিত কাব্য লিখেছিলেন, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন সে-কথা ভেবে বিস্মিত এবং বিরক্ত হয়েছেন। আসলে রামপ্রসাদ ছিলেন যুগ-সন্ধির কবি। সে-কালের সমাজ-জীবনের সর্বব্যাপী অনিয়ম এবং অনাচার-উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁর ব্যক্তি-চেতনার মূলে প্রবল আক্ষেপের সৃষ্টি করেছিল,—রামপ্রসাদের গীতি-সাহিত্য সেই অনুভূতির সংবেদনশীল শিল্পরূপ। কিন্তু, যে সমাজে নিজে বাস করেছিলেন,—তার পরিবেশ, রুচি ও গল্প-বুভুক্ষার বিশিষ্ট স্বভাবকে কবি অস্বীকার করতে পারেন নি। ফলে, তাঁর কাহিনীকাব্য 'কালিকামঙ্গল'-এ তৎকালীন জীবনের একটি স্থূল হলেও বাস্তব প্রতিচ্ছবি পাই,—তেমনি সেই জীবনের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবের রুদ্ধশ্বাস অভিযোগ লক্ষ্য করি তাঁর শক্তি-সংগীতে। এই দ্বিবিধ কবি-কর্ম রামপ্রসাদের সমাজ-নিষ্ঠ কবি-চেতনার পূর্ণ পরিচয় উদ্‌ঘাটন করেছে।

রামপ্রসাদের কালিকামঙ্গল

অন্য দিক থেকে, ভারতচন্দ্রের কাব্যের সঙ্গে তুলনায় রামপ্রসাদের এই কালিকামঙ্গল সমকালীন জীবন-রূপের আর একটি সত্য দিক প্রকাশিত করে থাকে। ভারতচন্দ্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভাকবি ছিলেন,—তাঁর কাব্যে সেকালের নাগরিক বিদগ্ধ-চিত্ততার অভিব্যক্তি। আর, রামপ্রসাদ ছিলেন স্বভাবতঃ গ্রামীণ কবি। কৃষ্ণচন্দ্রের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ এড়িয়েও গ্রামের ভিটাতেই তিনি থেকে গিয়েছিলেন। একই বিষয়ে লিখিত সমসাময়িক

এই দুই কবিশ্রেষ্ঠের রচনা থেকে সেকালের জীবন-স্বভাবের একটি মূল্যায়ন করা যেতে পারে। কাব্য-বিষয়ের দিক থেকে দুটি রচনাই সমান শৃঙ্গার-প্রমত্ত এবং রুচি-নিকৃষ্ট। কিন্তু ভারতচন্দ্রের নাগরিক মন ভাষা ও বাক্-চাতুর্যের সরসতায় যেখানে অশালীনতার ওপরে শিল্প-মণ্ডন রচনা করেছে,—রামপ্রসাদের কাব্য সেখানে নিরাবরণ, নিরাভরণ,—নগ্নদেহ।

ভারতচন্দ্র কিন্তু আসলে বিদ্যাসুন্দরের কবি নন;—তাঁর কাব্যের নাম অন্নদামঙ্গল। বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী সেই কাব্যের একটি অংশমাত্র। অন্নদা-মঙ্গলে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগীয়তার উত্তরণ এবং আধুনিকতার পথে পদক্ষেপের আকাঙ্ক্ষা আভাসিত হয়েছিল বলে বলা হয়। এই বৈশিষ্ট্যের প্রধান উৎস ছিল কবির একান্ত আত্ম-কেন্দ্রিক ব্যক্তি-চেতনা। এই কারণেই কাব্যবিচারের আগে কবি-কথার আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গে প্রায় অ-পরিহার্য।

অন্নদামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্র

ভারতচন্দ্রের আদি নিবাস ছিল বর্ধমান ভুরসুট-পরগণার পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে। এখন এই গ্রামটি হাওড়া জেলার অধীন। ঐখানেই কবির জন্ম হয় ১৭১২ খ্রীস্টাব্দে। জাতিতে এঁরা ছিলেন ফুলিয়ামেল-মুখুটি ব্রাহ্মণ। কবি পিতা "রাজা" নরেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন প্রতিপত্তিশালী জমিদার। বর্ধমান রাজের সঙ্গে বিবাদের ফলে ইনি সর্বস্বান্ত হন। ভারতচন্দ্র তখন বালক; মাতুলালয়ে থেকে তিনি সংস্কৃত পাঠে বৃত হন। কিছুদিন পরে মাত্র ১৪ বছর বয়সে সারদাগ্রামের কেসরকুনী আচার্যদের একটি বালিকাকে বিয়ে করে তিনি বাড়ি ফেরেন। ভারতচন্দ্রের অগ্রজেরা তখন পরিবারের কর্তা ছিলেন; এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অনুজকে তাঁরা প্রচুর ভর্ৎসনা করেন। ফলে, নব-বিবাহিতা পত্নীকে ফেলে, কবি বাড়ি থেকে পালিয়ে যান হুগলী দেবানন্দপুরের রামচন্দ্র মুন্সীর আশ্রয়ে। সেখানে ফারসী ভাষায় তিনি প্রশংসনীয় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ঐখানে থাকতেই যথাক্রমে ত্রিপদী ও চৌপদী ভাষায় দুখানি সত্যনারায়ণের পাঁচালী তিনি লিখেছিলেন। সেই প্রাথমিক রচনাতেই ভারতচন্দ্রের রস-বিদগ্ধতা ও বাক্‌চাতুর্যের দীপ্তি সু-চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল:

কবি-জীবনী

"সেলাম হামারা পাঁড়ে ধুপমে তোম্ কাহে খাঁড়ে,
পেরেসান দেখে বড়ে মেরে বাৎ ধর তো ॥"

["চৌপদী"—সত্যনারায়ণ পাঁচালী।]

এবারে দেশে ফিরে গেলে, ভারতচন্দ্র তাঁর ফার্সী-বিদ্যার জন্য অগ্রজদের কাছে পরম আপ্যায়িত হন। আগে বলেছি, ফার্সী ছিল সে সময়কার রাজ-ভাষা। কিছু দিন পরে বৈষয়িক বিবাদ নিষ্পত্তির জন্যে কবিকে বর্ধমানে যেতে হয়; কিন্তু সেখানে তিনি কারারুদ্ধ হন। কৌশলে মুক্তি লাভ করে এবারে পালিয়ে যান কটকে। সেখান থেকে কর মুক্ত তীর্থবাসী হিসেবে পুরুষোত্তম হয়ে যান শ্রীক্ষেত্রে। শ্রীক্ষেত্র থেকে সন্ন্যাসিবেশে বৃন্দাবন যাবার সময়ে হুগলী খানাকুল পরগণার কৃষ্ণনগর গ্রামে তাঁর ভায়রা-ভাই-এর কাছে ধরা পড়েন। পরে কবি-পত্নী এসে মিলিত হন সেখানে।

আদি-রচনা

কিছুদিন খানাকুলে বাস করে কবি এবার ফরাসী চন্দননগরের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কাছে উপনীত হন জীবিকার অন্বেষণে। প্রধানতঃ তাঁরই সহায়তায় ভারতচন্দ্র ৪০৲ মাসোহারায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা কবি নিযুক্ত হন। এখানেই তাঁর বিখ্যাত অন্নদামঙ্গল রচিত হয়:—

"বেদ লয়ে ঋষি রস ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥"

অর্থাৎ, ১৬৭৪ শক, তথা ১৭৫২-৫৩ খ্রীস্টাব্দে অন্নদামঙ্গলের রচনা শেষ হয়।

অন্নদামঙ্গল পরিচয়

কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়েই ভারতচন্দ্র মৈথিল কবি ভানু দত্তের 'রসমঞ্জরী'র অনুবাদ করেছিলেন। এটি নায়ক-নায়িকার লক্ষণ বিশেষক কাব্য। দুঃখের কথা, মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে ১৭৬০-৬১ খ্রীস্টাব্দে এই কবি-শ্রেষ্ঠের দেহান্ত ঘটে।

ভারতচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার প্রায় একমাত্র উৎস তাঁর অন্নদামঙ্গল। এই কাব্যেই মধ্য ও আধুনিক যুগের সন্ধিলক্ষণ যুগপৎ আভাসিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। আগে দেখেছি, মধ্যযুগের বাঙালি-জীবন ও বাংলা সাহিত্যের প্রাণ-কেন্দ্র ছিল শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রধান সামাজিক জীবনাদর্শ। আধুনিকতার উৎস, বলা হয়,—উগ্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই মধ্যযুগের সমাজ-সংগঠন ও প্রেম-ভক্তিমূলক

জীবনাদর্শ ক্রমশঃ শিথিল বিধ্বস্ত হতে আরম্ভ করেছিল। তা হলেও, সেই মৃত সমাজের খোলসের ভেতরে বদ্ধ থেকে সেকালের বাঙালির জীর্ণ মন কেবলই ক্ষুব্ধ,—আক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিল। রামপ্রসাদের কালিকামঙ্গল ও শক্তি-গীতিতে যথাক্রমে সেই জীর্ণ বিক্ষোভ ও মুক্তির আক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছে। এদিক থেকে ভারতচন্দ্রের ব্যক্তিমন অনেকটা পরিমাণে ছিল সহজ-মুক্ত। উদ্ধৃত জীবনী থেকে দেখেছি, একেবারে বাল্যকাল থেকেই কোনো সমাজ বা পরিবারগোষ্ঠির প্রতি কোনো ঐকান্তিক আকর্ষণ তাঁর ছিল না। খুব স্পষ্ট করে বললে,—ভারতচন্দ্রের কবি-ব্যক্তিত্ব ছিল সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক। তাঁর সকল অবধানতা এবং আনুগত্য ছিল কেবল নিজের সম্বন্ধে,—নিজের বাল্যবিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যের কথাও তিনি ভাবেন নি।

একদিকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও তির্যক্ রস-বোধ, এবং অন্যদিকে সর্ব-নিরপেক্ষ এই আত্ম-রতি ভারতচন্দ্রের কবি-কর্মকে অ-পূর্ব মানবিক রস-স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত করেছিল। এই নূতন মানব-রস-সম্ভোগের কাহিনীকে তিনি প্রাচীন মঙ্গল-কাব্যের আধারে বিন্যস্ত করেছেন;—তাহলেও যথার্থ মঙ্গলকাব্য নয় অন্নদামঙ্গল।

এই কাব্যের কাহিনী ত্রি-ধা বিভক্ত। প্রথম অংশে আছে পৌরাণিক অন্নপূর্ণামঙ্গল;—অর্থাৎ দক্ষ-যজ্ঞ ও সতীর দেহত্যাগ প্রসঙ্গ থেকে তাঁর পুনর্জন্ম, বিবাহ ও গার্হস্থ্যের কাহিনী গতানুগতিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। তার পরে দেবীর অন্নপূর্ণামূর্তি গ্রহণ, বিশ্বকর্মার অন্নপূর্ণা-পুরী নির্মাণ, কাশীর মাহাত্ম্য, ব্যাসকাশী প্রতিষ্ঠা ও তার বিড়ম্বনা, ইত্যাদি পৌরাণিক উপাখ্যান এই অংশে বর্ণিত হয়েছে। অন্নদামঙ্গলের এই প্রথম খণ্ডটি বহুলাংশে এক আঙ্গিকসিদ্ধ সম্পূর্ণ মঙ্গলকাব্য। অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ড বিদ্যাসুন্দরের গল্প বা তথাকথিত কালিকামঙ্গল। তৃতীয় খণ্ড ভবানন্দ-মঙ্গল,—দেবীর কৃপায় কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দের সার্থকতা ও দিল্লীর নবাব দরবারে রাজা উপাধি লাভের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে এতে। আসলে এই তিনটি পৃথক কাব্যকে ভারতচন্দ্র ভবানন্দ-প্রসঙ্গের ক্ষীণ সূত্রে বেঁধে একত্র করেছেন। এতে অখণ্ড সংহতির চেয়ে বিচিত্রতার স্বাদই বেশি। ভারতচন্দ্র তাঁর রস-সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ পরিচয় দিয়েছেন কাব্যের দ্বিতীয় অংশে বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান রচনায়।

গ্রন্থরচনার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,—নবাব আলিবর্দীর কারাগারে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বন্দী হয়েছিলেন বকেয়া টাকার দায়ে। তখন দেবী তাঁকে স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন,—

"সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়।
মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায়॥
তুমি তারে রায় গুণাকর নাম দিও।
রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও॥"

কবির কথা সত্য হলে, রাজা এবং দেবী,—দুজনেরই উদ্দেশ্য ছিল পূজা প্রচার; অথচ তাঁর নিজের একমাত্র কাম্য ছিল আত্ম-প্রতিষ্ঠা। "মহাভক্তের" ভাবানুভূতি নিয়ে তিনি কাব্য রচনা করেন নি মোটেই। বরং একদিকে রাজা ও রাজবংশের প্রতি একান্ত আনুগত্যের ছাপ আছে; কারণ তাতে কবির আধি-ভৌতিক উন্নতির সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। অন্যদিকে বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনায় তিনি তাঁর যুগ ও রাজসভা-পরিবেশের রতি-রভস আকাঙ্ক্ষাকে চরম অভিব্যক্তি দিয়েছেন;—সেই সঙ্গে সার্থক মুক্তি পেয়েছিল তাঁর রস-কুতূহলী বিদগ্ধ কবি-চেতনাও।

ভারতচন্দ্রের কবি-প্রতিভা ও ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি

ভারতচন্দ্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য, মধ্যযুগ-বিনষ্টির গ্রাম্য রুচি ও স্থূল প্রকাশ-দুষ্ট কাব্য-কথাকে তিনি নাগরিক আভিজাত্যের জীবন-সীমায় টেনে তুলেছেন। এখানে তাঁর প্রতিভা আদি-যুগের কবি জয়দেবের শিল্প-কীর্তির প্রায় সমতুল। জয়দেব রাধা-কৃষ্ণের দেহ-লোভাতুর স্থূল প্রেম-কথাকে রস-সমুজ্জ্বল সর্বজনীন দীপ্তি দিয়েছিলেন। ভারতচন্দ্র তাঁর যুগে অশ্লীল, এমন কি ইতর-হয়ে-পড়া বিদ্যাসুন্দরের শৃঙ্গার-প্রমত্ততাকে বরণীয় শিল্প-মূর্তি দান করেছেন। তাঁর প্রকাশের শালীনতা ও সৌষ্ঠব, রুচির নাগরিকতা ও বিদগ্ধতা বাংলা সাহিত্যের ভাষাপ্রবাহকে নূতন মুক্তির পথ দেখিয়েছে। মুন্সিয়ানা ও দূরদর্শিতায় পূর্ণ তাঁর রচনার বহু অংশ আজও জন-প্রবাদরূপে সু-প্রচলিত :—

"যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন।"
"নীচ যদি উচ্চভাষে
সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।" ইত্যাদি।

এই বিদগ্ধ কলাকর্মের সৃষ্টিতে ভারতচন্দ্র যথার্থ অধিকারীর মতই তাঁর

পূর্বৈতিহ্যের সদ্ব্যবহার করেছেন। কেবল তৎসম শব্দ ও বাগ্‌বিন্যাসই নয়, বহু জায়গায় তূণক, ভুজঙ্গ-প্রয়াত ইত্যাদি সংস্কৃত ছন্দের সার্থক প্রয়োগ করে, মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের গতানুগতিকতায় নূতন রূপ-সুষমার সংযোগ করেছেন। অন্যদিকে, ধামালি ও লোক-গীতির ছন্দ ও 'যাবনী-মিশাল' বাক্‌শৈলীর ব্যবহারে রচনার বিচিত্রতা ও বিদগ্ধ উজ্জ্বলতা গেছে বেড়ে। কাব্য-বিষয়ের বহু অংশে ভারতচন্দ্র শ্রেষ্ঠ মঙ্গল-কবি মুকুন্দরামের রচনার অনুসরণ করেছেন। কিন্তু, সর্বত্রই তাঁর নবীন ভাষা ও নব-ব্যক্তিত্ব-দীপ্ত প্রকাশ-ভঙ্গী পুরাতনকে নূতন রূপে রচনা করেছে। রবীন্দ্রনাথ কবি-ভারতচন্দ্রের শিল্প কীর্তির ফলশ্রুতি ঘোষণা করে বলেছেন,—"রাজসভা-কবি রায় গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মত। যেমন তাহার উজ্জ্বলতা, তেম্‌নি তাহার কারুকার্য।"

বিপর্যয় যুগের সাহিত্য

আগে বলেছি, ভারতচন্দ্রকে মধ্য ও আধুনিক যুগের সন্ধি-লগ্নের কবি বলে অভিহিত করা হয়। আর, ভারতচন্দ্রের পরবর্তী কাল থেকে গণনা করা হয় বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের উদ্ভব। অপর পক্ষে, এই আধুনিকতার উৎস হিসেবে বাঙালির ইংরেজ-সংসর্গের কথাও বলা হয়ে থাকে। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের পরেই এ দেশে ইংরেজ অভ্যুদয়ের পথ ক্রমশঃ প্রশস্ত হয়ে উঠেছিল। আর, আগে দেখেছি, ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কাব্য অন্নদামঙ্গলের রচনা সমাপ্ত হয়েছিল ১৭৫২-৫৩ খ্রীস্টাব্দে। যদিও এর পরেও ১৭৬০-৬১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কবি জীবিত ছিলেন, তবু, সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রভাব অন্নদামঙ্গল রচনার সঙ্গে সঙ্গেই সুচিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। অতএব, ১৭৫২-৫৩তে অন্নদামঙ্গল রচনার পরে এবং ১৭৫৭-য় ইংরেজ অভ্যুদয়ের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগীয়তার সমাপ্তি এবং আধুনিকতার অঙ্কুর-উদ্গম হয়েছে,—এটুকু সাধারণ হিসাব।

বিনষ্টি বনাম নবজাগরণ

কিন্তু, ইতিহাসের হাতে জীবনের বিকাশ কখনোই এমন অকস্মাৎ ঘটে না। অনেক দিনের অনেক চেষ্টা,—অনেক ত্যাগ ও দুঃখ বরণের পরিণামে, তবেই নূতন যুগের উষার আভাস অঙ্কুরিত হতে পারে। অতএব পলাশির যুদ্ধ, অথবা তার পরবর্তী কোনো এক বিশেষ দিনে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা সাহিত্যের ভাব-রূপের আগাগোড়া কাঠামো পালটে গিয়েছিল, এমন কথা মনে করবার কারণ নেই। তা ছাড়াঃ-বাঙালির বৃটিশ সংসর্গের প্রাথমিক ইতিহাস মোগলযুগের চেয়েও ব্যাপক বিনষ্টিতে পূর্ণ। বস্তুতঃ, সেই বিনাশের গভীরেই অঙ্কুরিত হচ্ছিল নব-যুগের সম্ভাবনা; যেমন শুকনো,—ঝরা ফুলের বৃন্তে দেখা দেয় নবীন ফলের অঙ্কুর। পলাশির পর থেকে, রামমোহন রায়ের কলকাতায় স্থায়ী বাসস্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত (১৮১৩ খ্রীঃ) এই জাতীয় বিধ্বংসের পথ রোধ করার সার্থক চেষ্টা হয় নি

বড একটা। এই সময়-সীমার মধ্যেই আধুনিকতার অঙ্কুর উদ্গমের ইতিহাস সন্ধান করবো এবারে।

প্রথমেই বলতে হয়, উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও বাংলা সাহিত্যের অ-পূর্ব সুন্দর বিকাশের একমাত্র বা প্রধান কারণ ছিল ইংরেজদের সান্নিধ্য লাভ,—এই ধারণা ইতিহাসের দিক থেকে পুরোপুরি সত্য নয়। বাঙালির আগে, এবং প্রায় সমসময়ে ভারতবর্ষের আরো একাধিক প্রদেশবাসী এই সুযোগ লাভ করেছিলেন। কিন্তু, তাঁদের জীবন, বা সাহিত্যে বিপ্লবের এমন আমূল আলোড়ন দীপ্ত হয়ে ওঠে নি। অতএব, উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের সকল গৌরব ইংরেজি সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানের নয়,—সেকালের ভারতীয় ইংরেজদের তো একেবারেই নয়। দীর্ঘদিন-ব্যাপী ধ্বংসের গ্লানি জীবনের মূলে পুঞ্জিত করে তুলছিল দুর্জয় ক্ষোভ, আর মুক্তির দুরপনেয় ক্ষুধা। বাঙালি মানসের সেই ক্ষোভ ও ক্ষুধা শান্তি ও মুক্তির আশ্রয় পেয়েছিল ফরাসি-বিপ্লবের অগ্নি-তপ্ত সেদিনকার ইংরেজি সাহিত্য-দর্শনের মধ্যে।

নবজাগরণের স্বভাব

সেই বৈপ্লবিক অগ্নিযজ্ঞে ইংরেজের জ্ঞান-ভাণ্ডার ঘৃত-ভাণ্ড হয়েছিল,—আর সমিধ হয়ে জ্বলেছিল দীর্ঘ দিনের বিনষ্টশুষ্ক বাঙালির প্রাণ। ইংরেজি সাহিত্য-দর্শনের ঘৃত-সংযুক্তি ঘটেছিল আরো পরে। কিন্তু, বাঙালির শুষ্ক প্রাণ-প্রবাহকে সম্পূর্ণ নীরস রুক্ষ সমিধে পরিণত করবার ভূমিকা আলোচ্য সময়-সীমার মধ্যেই প্রধানভাবে গ্রহণ করেছিলেন সেদিনকার ভাবতীয় ইংরেজরা।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রসঙ্গে বলেছি, মোগল অধিকারের শোষণের ঐতিহ্যকে বহন করেই এ-দেশে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা ঘটে। মোগল বাংলার সামাজিক-অর্থনৈতিক ফলশ্রুতিকে সংক্ষেপে নিম্নরূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

(১) ভূমি-নির্ভর গ্রামীণ সমাজ-ব্যবস্থার বদলে এই সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত মুদ্রা-নির্ভর নূতন অর্থনৈতিক জীবন গড়ে ওঠে। ফলে, একদিকে শহর ও গ্রামে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায় অখণ্ড বাঙালি জীবন; আর এই ফাটল কেবলই বাড়তে থাকে অর্থ-লোলুপ মানুষের অন্ধ আত্মপরতার প্রভাবে।

(২) গ্রাম-নগরের এই বিভেদের ফলে, গ্রামীণ জীবনই কেবল নিঃস্ব

হয়ে পড়ে নি ; নাগরিক সমাজ-ও রুচি, শিক্ষা এবং সুস্থ চিন্তার অভাবে হয়ে পড়েছিল দেউলে। একদিকে অর্থ সঞ্চয়ের অন্ধ বুভুক্ষা, আর একদিকে মোগল-নগরীর নারী-মাংস-লোলুপতা এদের দেহ ও মনকে এক সঙ্গে জীর্ণ করে তুল্‌ছিল।

বিনষ্টির লক্ষণ

(৩) অতি লাভের লোভ কেবল নাগরিক ব্যক্তি-জীবনেই প্রধান হয়ে উঠেনি,—রাষ্ট্র-শাসকেরা স্বনামে এবং বেনামে ব্যবসায় একাধিপত্য বিস্তারে উন্মত্ত হয়ে পড়েছিলেন। ফলে, শাসনের পথ রুদ্ধ হয়েছিল ; অথচ শোষণের আকাঙ্ক্ষা গিয়েছিল বেড়ে।

মোগল যুগের সবচেয়ে চরম দুর্ভাগ্য, প্রাচীন সামাজিক জীবনের ভার-সাম্য বিচূর্ণ হল, অথচ নূতন রাষ্ট্রায়ত্ত জীবন-বিধিও গড়ে উঠ্‌ল না। মাঝে থেকে নৈতিক ব্যভিচার, অমানুষিক স্বার্থপরতা এবং আত্ম-সর্বস্ব পরপীড়নের অপরাধ-অতলে ডুবে যেতে লাগল আপামর জাতীয় জীবন।

ইংরেজ অধিকারের প্রথম ধাপে এই সর্বাভিমুখী বিনষ্টির ধারা আরো ব্যাপক আর দ্রুত হয়ে উঠ্‌লো। সাধারণ ধারণা, ইংরেজেরা যতই বিবেক-হীন হোক্, দেশপ্রেম এবং জাতীয়তা-বুদ্ধি তাদের মজ্জাগত। কিন্তু, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা-যুগের ইংরেজ কর্ণধারদের সম্বন্ধে এ-কথা একেবারেই প্রযোজ্য নয়। স্বয়ং ক্লাইভ্ পলাশির বিজয়ের পর কোম্পানীর উন্নতির চেয়েও নিজের স্বার্থের কথা বেশি ভেবেছিলেন। মীরজাফরকে মস্‌নদ দানের মূল্য স্বরূপ ক্লাইভ তাঁর ব্যক্তিগত খাতেই উপার্জন করেছিলেন ২০,৮০,০০০৲ টাকা। বলা বাহুল্য, এই অর্থার্জন কোনো অংশেই আইন-সংগত ছিল না ;—নীতিগত ঔচিত্যের তো প্রশ্নই ওঠে না।

কোম্পানীর স্বার্থ এবং জাতীয় মর্যাদাকে পদদলিত করে সেকালের ভারতীয় ইংরেজদের আত্মগত দলাদলির চরম রূপ প্রকাশ পেয়েছিল ও-আরেন্ হেস্‌টিংস্ ও তাঁর সহকর্মী ফিলিপ ফ্রান্সিসের কদর্য বিবাদের মধ্যে। মহারাজ নন্দকুমার এই গ্লানিকর বিসংবাদের বেদীতে ভয়াবহতম বলি।

বলা বাহুল্য, ইংরেজ চরিত্রের এই দীনতা, অর্থ-লিপ্সা ও শোষণ-বৃত্তি দেশীয় পদাধিকারী ধনবানদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছিল। প্রথমেই মনে রাখতে হবে, মধ্যযুগের সমাজ-পালক, বদান্য, বিদ্যোৎসাহী বাঙালি জমিদার-সমাজের উত্তরাধিকার এঁদের মধ্যে ছিল না। অষ্টাদশ শতকের

শুরুতেই মোগল বাংলায় দেওয়ান হয়ে আসেন মুর্শিদকুলি খাঁ। রাজস্ব আদায়ের জন্য ইনি আর প্রাচীন জমিদারদের ওপর নির্ভর করলেন না,—ইজারাদার নামে এক মধ্য-মুনাফাভোগী কণ্ট্রাকটর দল সৃষ্টি করলেন। নির্মম শোষণ, লোলুপ অর্থ-পিপাসা, এবং অদম্য স্বার্থচিন্তা এদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। রাজ-দরবারের প্রাপ্য মিটিয়ে দিলে এদের পৈশাচিকতাকে নির্বাধ হতে দিতে মুর্শিদকুলির কোনো আপত্তি ছিল না। ক্রমে এরাই হয়ে উঠলো জমির মালিক। বাংলাদেশে এখান থেকেই সামন্ততান্ত্রিক শোষণের সূচনা। ইংরেজেরা দেশের মালিক হয়ে রাজস্ব-ইত্যাদির জন্যে এদের ওপরে আরো বেশি পরিমাণে নির্ভর করতে থাকেন। অন্যদিকে দেশি-বিদেশী বাণিজ্যের সহায়তা করেও এদের ভাণ্ডারে অজস্র অর্থ সঞ্চিত হতে থাকে। সেকালের ইংরেজদের দেখে নাগরিক বাঙালির এই ধারণা মজ্জাগত হয়েছিল যে, অর্থার্জন ও ইন্দ্রিয়-ভোগের জন্যে কোনো আচরণই পাপ নয়;—এ-সব কিছুর পরিবর্তে কিছু সামাজিক দান-খয়রাত,—কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান করলেই সকল পাপের ভার লঘু হয়ে যায়। ফলে, কি বিদেশী শাসক, কি দেশী সহযোগী, সকলের মধ্যেই মানবিক মূল্য-বোধ লুপ্তপ্রায় হয়েছিল। বিশেষ করে, দ্বৈত শাসনকালে ইংরেজদের হাতে অর্থার্জনের অবাধ অধিকার ছিল, কিন্তু সুশাসনের বিন্দুমাত্র দায়িত্ব ছিল না। এর ফলে যে অবাধ নির্যাতন ও অকথ্য মানব-পীড়ন অবারিত হতে পেরেছিল, তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বাংলাদেশের প্রথম মানব-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ '৭৬-এর মন্বন্তরের ঐতিহাসিক বিভীষিকা।

এমন অবস্থায়,—সুস্থ মানবিক মূল্যবোধ যখন একেবারে লুপ্ত হয়েছে, প্রাচীন সমাজ-জীবন যখন আমূল বিধ্বস্ত; অথচ, নবীন জাগৃতির বিন্দুমাত্র পরিচয় কোথাও অঙ্কুরিত হয় নি,—তখন,—সুস্থ, পূর্ণাঙ্গ শিল্প-রচনা অসম্ভব।

বিনষ্টি-যুগের নবীন সাহিত্য

এই সময়ের মধ্যে দু' রকমের সাহিত্যকর্মের পরিচয়ই কেবল পাওয়া যায়;—এক কবিগান; আর এক গদ্য-রচনার অ-পূর্ণ খণ্ডিত প্রয়াস। কবিগান কবিতা হিসাবে খুব উৎকৃষ্ট নয়,—সেকালের গদ্য-রচনায় সাহিত্যিক মূল্যের তো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু, ঐ সব বিশীর্ণ-ক্ষীণ প্রয়াসের অন্তরালেই অঙ্কুরিত হচ্ছিল আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গোপন স্বভাব।

লক্ষ্য করলে দেখব,—স্বাধীনতা-পূর্ব আধুনিক বাংলা সাহিত্য ছিল

একান্তভাবে নগর-সীমা-সংকীর্ণ। বৃহত্তর জন-জীবন থেকে সহজ বিমুখতা এই আত্মকেন্দ্রিক সাহিত্যকে প্রথম অবস্থায় তীব্র স্বাতন্ত্র্য-প্রিয় করেছিল। মধ্যযুগের আস্তিক্যবাদী সমাজ-প্রেমিক গ্রামীণ সাহিত্য-ধারার ওপরে, রূপ এবং ভাবগত প্রথম ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়েছে কবিগানে। বিশ্বাস-ভ্রষ্ট মানুষের ক্ষণিক লোভের উল্লাস-উত্তেজনাকে বক্ষে ধরে সমাজ-বিমুখ ব্যক্তি-সুখ-পিয়াসী এই অ-পূর্ণ গঠিত কবি-কর্মের জন্ম।

অন্য দিকে, মধ্যযুগের সাহিত্য ছিল প্রায় আগাগোড়া পদ্য-প্রধান। গদ্যের সৃজন-প্রয়াসে বাস্তব-প্রয়োজনের প্রতি উৎকণ্ঠা ও বিচার-যুক্তি-সিদ্ধ রচনার প্রতি নবীন জীবনের আগ্রহের অঙ্কুর,—অ-দৃষ্ট রূপে হলেও, উদ্গত হতে পেরেছিল।

সপ্তদশ অধ্যায়

কবিগান

কবি গানের সুনিশ্চিত সংজ্ঞা রচনা সহজ নয়। বাংলা সাহিত্যের বিনষ্টি যুগে এই শ্রেণীর রচনা-প্রবাহ একাধিক শতাব্দীতে ব্যাপ্ত হয়েছিল; আর তাদের রূপও ছিল বিভিন্ন রকমের। কত বিচিত্র ধরনের রচনাকে কবিগানের আওতায় ফেলা যেতে পারে, তার মোটামুটি হিসেব দিয়েছিলেন সজনীকান্ত দাস:—"বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত তর্জা, পাঁচালী, খেউড়, আখ্‌ড়াই, হাফ্ আখ্‌ড়াই, দাঁড়া কবিগান, বসা কবিগান, ঢপ, কীর্তন, টপ্পা, কৃষ্ণযাত্রা, তুক্কগীতি প্রভৃতি নানা বিচিত্র-নামা বস্তুর সংমিশ্রণে কবিগান জন্ম লাভ করে।" 'কবি' বল্‌তে অশিক্ষিত-পটু স্বভাব-কবিদের বোঝাত। সেদিনকার বিস্রস্ত-ভঙ্গুর সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার অবকাশ প্রায় কারোই ছিল না। তা ছাড়া, আগে দেখেছি,—মধ্যযুগের সমাজ বন্ধন ও সাধারণ ধর্ম-বিশ্বাসের একতার প্রভাবে সাহিত্য রচনায় একটি আলংকারিক অথবা সংস্কারগত মান গড়ে উঠেছিল। কিন্তু, নতুন বিনষ্টির যুগে পুরাতন জীবন-বাণীর মতই প্রাচীন রূপাঙ্গিকও শিথিল-বন্ধ, বিস্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এই শ্রেণীর রচনার কাব্যিক উৎকর্ষ অলঙ্কার-রস-সিদ্ধ নয়। তাই, এর রচয়িতারাও 'কবি' নন,—'কবিওয়ালা' নামে পরিচিত; আর তাঁদের রচনা 'কবিতা' নয়,—'কবিগান'।

কবিগান-পরিচয়

কবিগানের গঠন ও বিকাশ একাধিক শতকে ব্যাপ্ত হয়ে থাক্‌লেও, এই শ্রেণীর রচনার ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের পর থেকে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব সময়-সীমার মধ্যে। আর, সেকালের কলকাতাই ছিল এই গীতি-ধারার কীর্তি-পীঠ, যদিও আগে-পরে দুর্বলতর আকারে কবিগানের প্রসার গ্রাম-বাংলাতেও হয়েছিল যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথ কবিগানের উদ্ভব ইতিহাসকে প্রাঞ্জল ভাষায় পরিচায়িত করেছেন:—"ইংরেজের নূতন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন

ইতিহাস

ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ রাজার সভার উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্য-রস আলোচনার অবসর, যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয়জনের ছিল। তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিক সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া আমোদের উত্তেজনা চাহিত—তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না।"

এই "আমোদের উত্তেজনা" রচনার উদ্দেশ্যেই হয়ত, কবিগানের মৌলরূপ গ্রথিত হয়েছিল পদ্য বিতণ্ডার আকারে। কবির গান পাঠের উদ্দেশ্যে রচিত হত না। দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী গায়ক বা "কবিওয়ালা" আসরে অবতীর্ণ হয়ে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে পদ্য বিতর্কে প্রবৃত্ত হতেন। একজন প্রথমে 'চাপান' গাইতেন,—অর্থাৎ, বিতর্কিতব্য বিষয়ের অবতারণা করতেন। অপরজন সেই 'চাপান'-এর উতোর বা উত্তর রচনা করতেন। তার প্রত্যুত্তর দিতেন প্রথম পক্ষ, দ্বিতীয় পক্ষ রচনা করতেন আবার তার উত্তর। এই সব উত্তর-প্রত্যুত্তর সবই পদ্যে রচিত হত; এবং ঢাক-করতাল সংযোগে গীত হত। প্রথম প্রথম 'কবির গান' করবার আগে দুই প্রতিপক্ষ মিলিত হয়ে বিতর্কের বিষয় এবং 'চাপান' ও 'উতোর' পর পর রচনা করে নিতেন, এবং আসরে সেই পূর্ব-প্রস্তুত গানই গেয়ে যেতেন একের পর এক। কোনো কোনে সময়ে অভিজ্ঞ গীতি-রচয়িতাদের দ্বারাও কিছু কিছু গান লিখিয়ে নেওয়া হত। পরে এই পদ্ধতি উঠে যায় এবং আসরেই 'চাপান' ও 'উতোর' তৎক্ষণাৎ রচনা করে গাইবার রীতি প্রবর্তিত হয়। এতে রচনা-সৌন্দর্য কমে গিয়ে প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের চাকচিক্য প্রধান হয়ে ওঠে।

কাব্য-স্বভাব

আগে বলেছি, কবিগান রচনার ভাব ও রূপ-প্রকৃতি, দুই-ই ছিল মধ্যযুগীয় সাহিত্য-ধারার থেকে পৃথক্ ও অভিনব। কিন্তু, পরে এই অশিক্ষিত-পটু স্বভাব-সৃষ্টির ক্ষেত্রেও ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল নূতন এক আঙ্গিক-গত সংস্কার। ফলে, কবিগান-ও ক্রমশঃ গুরুগম্য বিদ্যায় পরিণত হয়ে পড়ে। কবিয়াল-এর জীবিকা-গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিরা তখন শ্রেষ্ঠ পূর্ব-সূরীদের কাছে কবিগান রচনার পাঠ গ্রহণ করতে থাকেন। এইরূপে গুরুপরম্পরায় কবিওয়ালাদের পূর্বসূত্র সন্ধান করে প্রায় আড়াইশ' বছর আগে গিয়ে পৌঁছানো সম্ভব। সংবাদ

কবিওয়ালা পরিচিতি

প্রভাকরের সুখ্যাত সম্পাদক, গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্রই কবিওয়ালাদের সম্বন্ধে প্রথম ঐতিহাসিক সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আজও এ-বিষয়ের গবেষণা তাঁর পরিবেশিত তথ্যের চেয়ে আর খুব বেশি কিছু আবিষ্কার করতে পারেনি। ১২৬১ বাংলা সালে গুপ্তকবি লিখে'ছলেন,—"১৪০ বা ১৫০ বর্ষ গত হইল, গোঁজলা গুঁই নামক এক ব্যক্তি পেশাদারি দল করিয়া ধনীদের গৃহে গাহনা করিতেন।" গোঁজলা গুঁই থেকে শিষ্য-পরম্পরায় কবিওয়ালাদের ইতিহাস নিম্নরূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে :—
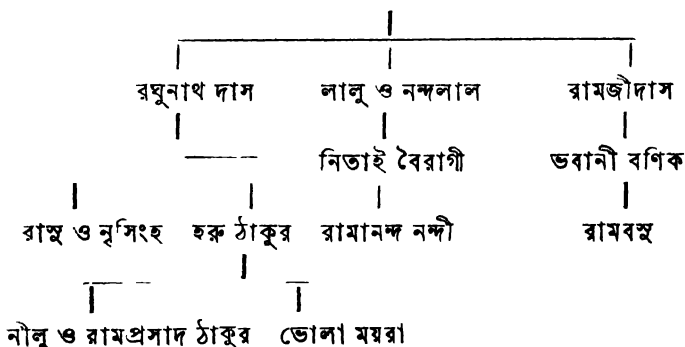
গুপ্ত কবি গোঁজলা গুঁই-এর একটি মাত্র পদ আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। পদটির আরম্ভ নিম্নরূপ :—

> "এসো এসো চাঁদ বদনি।
> এ রসে নীরস করো না ধনি॥
> তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ,
> তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ।
> অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ।
> তুমি আমার তায় রতন মণি।"
>
> গোঁজলা গুঁই

গোঁজলা গুঁই-য়ের শিষ্য চারজন সম্বন্ধে প্রায় কোনো খবরই জানা যায় না। কারণ, এঁদের প্রত্যেকেরই শিষ্যরা শ্রেষ্ঠতর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ফলে, ক্ষমতাবান শিষ্যদের রচনার প্রাধান্যে গুরুদের কবি-কর্ম প্রায়ই হারিয়ে গেছে। কিন্তু, তাঁদের সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি রয়েছে শিষ্যদের উদ্ধৃতিতে। রঘুনাথ, লালু-নন্দলাল এবং রামজীদাস-এর মধ্যে, কেবল দ্বিতীয়োক্তদেরই

রচিত একটি মাত্র পদ পাওয়া গেছে। কবিগানের ইতিহাসে পদটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য :—

লালু ও নন্দলাল

"হলো এই সুখ লাভো পীরিতে।
চিরদিন গেল কাঁদিতে ॥
হয়েছে না হবে কলঙ্ক আমায় গিয়েছে না যাবে কুল
ডুবেছি না ডুব দেখি পাতাল কতদূর।"

ডঃ সুকুমার সেন মনে করেছেন,—লালুর পুরো নাম ছিল লালচন্দ্র। ইনি আর নন্দলাল দুই সহোদর ছিলেন।

রাসু ও নৃসিংহ

গোঁজলা গুঁই-এর শিষ্যদের মধ্যে আবার রঘুনাথ দাসের শিষ্য-ভাগ্যই ছিল সর্বোৎকৃষ্ট। এঁদের মধ্যে রাসু ও নৃসিংহ ছিলেন দুই সহোদর; দু-ভাই মিলিত ভাবে একটি কবির দল চালাতেন। রাসুর জন্ম হয় ১৭৩৪ খ্রীস্টাব্দে;—নৃসিংহ জন্মেছিলেন ১৭৩৮-এ। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগের পরে দুজনেই রঘুনাথ দাসের কাছে কবির গান বাঁধতে শেখেন। পরে ফরাসী চন্দননগরের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় এঁদের কবির দল প্রবল খ্যাতি অর্জন করে। সখী-সংবাদ ও বিরহের গান রচনাতে এঁদের দক্ষতা ছিল সমধিক। কবির গানের ভাব ও বর্ণনায় লঘুতা ও বিশ্বাসের অভাব থাকলেও, মধ্যযুগীয় কাব্যের বিষয়বস্তু নিয়েই এঁরা প্রধান ভাবে গীতি রচনা করতেন। বলা হয়েছে,—"কবির আসরে প্রথমতঃ ভবানী বিষয়, পরে সখীসংবাদ, তারপর বিরহ এবং সর্বশেষে লইর বা খেউড় গাইবার নিয়ম।" রুচির অপকর্ষ এবং সংখ্যার আধিক্যে খেউড় কবিগানের ইতিহাসকে সর্বাপেক্ষা আবিল করেছে। সখীসংবাদ এবং বিরহের কবিগানই বিষয় ও রচনার উৎকর্ষে সবচেয়ে হৃদ্য। রাসু ও নৃসিংহের বাঁধা গান বিষয়-সৌন্দর্য ও অনুভূতির আন্তরিকতায় সত্যই মধুর। ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দে রাসুর দেহান্ত হয়; নৃসিংহ তার পরেও হয়ত আরো কিছুদিন বেঁচে ছিলেন।

রাসু-নৃসিংহের চেয়েও কবিওয়ালা হিসেবে বহুল খ্যাত হয়েছিলেন হরু ঠাকুর বা হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ি। কলকাতার সিমলায় কবির জন্ম হয় ১৭৪৯ খ্রীস্টাব্দে। পুঁথিগত বিদ্যার প্রতি তাঁর বিরাগ ছিল আবাল্য। এগার বছর

বয়সে পিতৃহীন হয়ে হরেকৃষ্ণ প্রথমে সখের একটি কবিদল গড়ে তোলেন। পরে, ক্লাইভ্-এর দেওয়ান রাজা নবকৃষ্ণের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় এটি এক পেশাদারি দলে পরিণত হয়। প্রথম প্রথম গান বাঁধতে শিখবার সময়ে রঘুনাথ দাসকে দিয়ে কবি সংশোধন করিয়ে নিতেন। এই কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি হিসেবে হরেকৃষ্ণ নিজের রচিত কোনো কোনো গানে গুরুর ভনিতা যোগ করেছেন। ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

হরু ঠাকুর।

হরু ঠাকুরের কিছু কিছু গান রচনাগত উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠ। অবশ্য, 'কবির লড়াই' অর্থাৎ, বিতণ্ডার ব্যাপারেই তাঁর দক্ষতা ছিল সমধিক। বলাবাহুল্য, ঐ সকল ক্ষেত্রে, অনেক সময়েই রুচির কোনো বাধা কবি স্বীকার করেন নি। হরু ঠাকুরের রচনার চরমোৎকর্ষের একটি নিদর্শন :—

"পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।
শুনলো সজনি বলি তোমাকে॥
শুনেছো কখনো জ্বলন্ত আগুনো
বসনে বন্ধন রাখে॥
প্রতিপদের চাঁদো হরিষে বিষাদো
নয়নে না দেখে উদয় লেখে।
দ্বিতীয়ার চাঁদো কিঞ্চিতো প্রকাশো
তৃতীয়ার চাঁদো জগতে দেখে।"

নিত্যানন্দ দাস বা নিতাই বৈরাগী ছিলেন লালু ও নন্দলালের শিষ্য। এঁর পিতা ছিলেন কুঞ্জদাস বৈরাগী। চন্দননগরে কবির জন্ম হয়েছিল ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দে। গুরুদের মত নিতাই বৈরাগীরও শ্রেষ্ঠ খ্যাতি ছিল সখী-সংবাদ ও বিরহের পদের জন্য। ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে এঁর দেহান্ত হয়।

নিতাই বৈরাগী

ভবানী বেনেকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করেছিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য রামবসু। কবিওয়ালাদের ইতিহাসে রামবসুর প্রতিভাই বোধ হয় দীপ্ততম। কলকাতার কাছে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে শালকিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বংশে কবির জন্ম হয়েছিল ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে। এঁর পুরো নাম ছিল রামমোহন বসু—পিতা ছিলেন রামলোচন। কিছু ইংরেজি লেখাপড়া শিখে কবি প্রথমে কেরানীর

বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কবিগানের নেশা তাঁকে চাকুরি-ছাড়া করে। প্রথমে অন্যান্য কবিওয়ালাদের ফরমায়েস মত তিনি গান বেঁধে দিতেন। পরে নিজেই বিখ্যাত দল গড়ে তোলেন।

রাম বসু

মাত্র ৪২ বছর বয়সে ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে রামবসুর মৃত্যু হয়। এই স্বল্পায়ত জীবনের সীমাতেই তিনি শ্রেষ্ঠ কবিওয়ালার মর্যাদা অর্জন করে গিয়েছিলেন। ঈশ্বরগুপ্ত লিখে গেছেন,—"যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস, বাংলা কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, সেইরূপ কবিওয়ালাদিগের কবিতায় রামবসু।"

রামবসুর এই শ্রেষ্ঠতা ছিল বহুমুখী। রচনার হৃদ্যতা, বিষয়ের বিচিত্রতা ও প্রাচুর্য, এবং বুদ্ধি-দীপ্ত বিতর্কের উজ্জ্বলতা,—সব দিক থেকেই রামবসু ছিলেন কবিওয়ালা হিসেবে অনন্যতুল্য। তাঁর রচনায় বিদগ্ধ আন্তরিকতার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যেতে পারে নীচের অতি-ক্ষুদ্র কবিগানটিতে :—

'জলে কি জ্বলে, কি দোলে, দেখ গো সখি,
কি হেলে হিল্লোলেতে।
পারি নে স্থির নির্ণয় করিতে।
শ্যামল কমল ফুটেছে বুঝি,
নির্মল যমুনা জলেতে॥"

এঁর রচনার বিষয়-বিচিত্রতার বিবরণ দিয়েছেন ঈশ্বরগুপ্ত,—"রামবসু ভবানীবিষয়, সখী-সংবাদ, বিরহ, খেউড়, লহর, সপ্তমী ['আগমনী'], শ্যামা বিষয়ের রণবর্ণনা ও টপ্পা প্রভৃতি সমুদয় গান উত্তম করিতেন।" রামবসুর লেখা আগমনী গানের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন :—

"গত নিশিযোগে আমি হে দেখেছি যে সুস্বপন—
এল হে সেই আমার তারাধন।
দাঁড়ায়ে দুয়ারে বলে, 'মা কৈ, মা কৈ, মা কৈ আমার,
দেও দেখা দুখিনীরে।'
অমনি দুবাহু পসারি, উমা কোলে করি,
আনন্দেতে আমি, আমি নই।"

এই শিল্প-দক্ষতা ছাড়াও রামবসুর শ্রেষ্ঠ কীর্তি,—কবিগানের আসরে তিনিই সর্বপ্রথম পূর্ব-প্রস্তুতিহীন উপস্থিত-রচনার রীতি প্রবর্তন করেন।

এর আগে প্রতিদ্বন্দ্বী কবিওয়ালারা আসরে আসবার আগেই পরামর্শ করে গান বেঁধে আনতেন। কিন্তু আসরে দাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ 'চাপান' ও 'উতোর' রচনা করে গাইবার পদ্ধতি রামবসুর প্রবর্তিত। এর ফলে, অন্ততঃ কবির নিজের রচনায় হৃদ্যতার সঙ্গে উপস্থিত-বুদ্ধির যোগও ঘটেছিল।

রামবসুর পরে কবিগানের ইতিহাসে উৎকর্ষের অভাব ঘটতে থাকে, ক্রমে ক্রমে এই ধারার বিলোপ ও বিনাশ ঘটে। কিন্তু, গুরুপরম্পরায় পরিচায়িত ওপরের কবিওয়ালাদের সীমার বাইরেও রামবসুর পূর্বকালের আরো একাধিক কবির উল্লেখ প্রয়োজন। এঁদের মধ্যে কেষ্টা মুচি বা কৃষ্ণচন্দ্র চর্মকার বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। হরু ঠাকুরের চেয়ে বয়ঃজ্যেষ্ঠ হলেও এই বৃদ্ধের কাছে তরুণ কবিওয়ালা হরেকৃষ্ণকে একাধিকবার পরাজয় মানতে হয়েছে। এঁর রচিত একটিমাত্র পদাংশ এযাবৎ পাওয়া গেছে; পদটি সত্যিই মনোরম।

কেষ্টা মুচি

এণ্টুনি ফিরিঙ্গি অ-বাঙালি হয়েও বাংলা কবিগান রচনায় দক্ষতা প্রকাশ করেছিলেন। ঠাকুরসিংহের সঙ্গে আক্রমণ-দীপ্ত লড়াই-এ প্রসঙ্গত তাঁর স্বচ্ছ কবি-প্রাণের প্রকাশ মনোহর হয়ে দেখা দিয়েছিল :—

এণ্টুনি ফিরিঙ্গি

ঠাকুরসিংহ। "বলহে আণ্টুনি আমি একটি কথা জানতে চাই,
এসে এদেশে এবেশে তোমার গায়ে কেন কুর্তি নাই॥"

এণ্টনি। "এই বাঙালায় বাঙালির বেশে আনন্দে আছি।
হয়ে ঠাকুরে সিংহের বাপের জামাই কুর্তি টুপি ছেড়েছি॥"

কবিগানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আখ্‌ড়াই গানে উত্তর-প্রত্যুত্তর নেই। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের মধ্যে যাদের গান, বাজনা ও সুর ভাল হত, তারাই জয়ী বলে ঘোষিত হতেন। মহারাজ নবকৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষকতায় কুলুইচন্দ্র সেন এই ধারার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে "বাংলা এগার শতাব্দীতে আখড়াই সুরের উদ্ভাবন করেছিলেন শান্তিপুরের কতিপয় ভদ্রলোক।"

আখড়াই

আখড়াই ভেঙে হয় হাফ্‌ আখড়াই। কবির লড়াই-এর মতই এতে উত্তর-প্রত্যুত্তর-এর রীতি আছে। কবিগানের সঙ্গে হাফ্‌ আখড়াই-এর পার্থক্য কেবল আঙ্গিকগত খুঁটিনাটির।

হাফ্‌ আখড়াই

'টপ্পার সঙ্গে কবিগানের প্রত্যক্ষ যোগ নেই। তবে, একই সময়ের নাগরিক রস-লিপ্সাকে চরিতার্থ করবার আকাঙ্ক্ষা থেকেই মূলতঃ টপ্পার জন্ম। তাছাড়া, শব্দযোজনা ও বাচনভঙ্গির দিক থেকেও কবিগানের সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে। আখড়াই প্রবর্তয়িতা কুলুইচন্দ্র সেনের আত্মীয় রামনিধি গুপ্তই টপ্পার বিশিষ্ট উৎবর্ষ ও পরিণাম বিধান করেন। ইনি নিধুবাবু বা নিধুগুপ্ত নামে পরিচিত। ১১৪৮ বাংলা সালে রামনিধির জন্ম হয়, তাঁর পিতা ছিলেন হরিনারায়ণ গুপ্ত। কর্ম উপলক্ষ্যে রামনিধি কিছুকাল ছাপরা অঞ্চলে বাস করেছিলেন। তখন তিনি হিন্দী গানে পারদর্শিতা লাভ করেন। এখানেই তাঁর টপ্পা রচনার আরম্ভ।

নিধুবাবুর টপ্পা

"টপ্পা হিন্দী শব্দ, আদি অর্থ লম্ফ, তাহা হইতেই রূঢ়ার্থ সংক্ষেপ ; অর্থাৎ ধ্রুপদ ও খেয়াল অপেক্ষা যে গান সংক্ষেপতর, তাহার নাম টপ্পা"। টপ্পার হাল্‌কা সুরে একদা দেহলিপ্সু হাল্‌কা ভাবের অতিশয় চটক লেগেছিল। ফলে, টপ্পা বলতে আজ আদিরসে অতি-সিক্ত একপ্রকার আবিল রচনার কথাই মনে করা হয়। কিন্তু, টপ্পা আসলে এক পৃথক্ রীতির গান। স্বয়ং নিধু-বাবুও টপ্পা সুরের গায়ে আবিল রুচির রং চড়িয়েছিলেন প্রচুর! কিন্তু, নিধুর শ্রেষ্ঠকীর্তি হচ্ছে,—আলোচ্যযুগের স্বভাব-দীন ভাবের আড়ষ্টতার মধ্যেও টপ্পার মাধ্যমে নূতন সূক্ষ্ম অনুভবের স্পর্শ সঞ্চারিত করেছিলেন তিনি :—

"নানান দেশের নানান ভাষা।
বিনা স্বদেশী ভাষা,
পুরে কী আশা ?"

মাতৃভাষার প্রতি চিরন্তন আবেদনে পূর্ণ এই আবেগ-আকুতিও নিধুবাবুরই রচনা। ৯৭ বছর বয়সে কবির দেহান্ত ঘটে ১২৪৫ বাংলা সালে।

নিধুর প্রভাবে টপ্পা-সাহিত্যের সুর ও শৈলী বৈচিত্র্য এবং বিস্তার লাভ করেছিল। বিখ্যাত শ্রীধর কথকও টপ্পার সুরে কথকতাকে ঢেলে সেজেছিলেন। শ্রীধর (১৮১৬) হুগলি-বাঁশবেড়ের প্রখ্যাত কথক লালচাঁদ বিদ্যাভূষণের পৌত্র ছিলেন। আর নিজে তিনি ছিলেন নিধুর শিষ্য। তাতেই তাঁর প্রতিষ্ঠা নবীন মহিমা লাভ করেছিল। শ্রীধরের পিতার নাম ছিল রতনকৃষ্ণ শিরোমণি।

শ্রীধর কথক

কালী মর্জা কিংবা কালী মীর্জা নামে বিখ্যাত কবিটিও আসলে ছিলেন টপ্পা সুরেরই গায়ক। শ্যামা-বিষয়ক গানে ছিল এঁর শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা।

কালী মীর্জা

পলাশির যুদ্ধের বছর-কয় আগে হুগ্‌লির গুপ্তিপাড়ায় এঁর জন্ম হয়েছিল,—পিতার নাম বিজয়রাম চট্টোপাধ্যায় এবং কবির পুরোনাম ছিল কালিদাস চট্টোপাধ্যায়। স্বয়ং রামমোহন রায় এঁর কাছে গান শিখেছিলেন বলে জানা যায়।

পক্ষির দলও নিধুবাবুকে 'কর্তা' বলে মান্য করত। পক্ষির দলের পক্ষিরা সকলেই ভদ্রসন্তান ও 'বাবু' ছিলেন। গঞ্জিকা সেবন এদের নেশা এবং সখ

রূপচাঁদ পক্ষী

দুইই ছিল। অনায়াসে যে যত বেশি গাঁজা হজম করতে পারতেন, তিনিই তত বড় পক্ষি ছিলেন। পক্ষির দলে রূপচাঁদ পক্ষি সংগীত চটকে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তাঁর ইংরেজি-বাংলা মেশানো গান বিদ্রূপে, কৌতুকে, সরসতায় বহুল উপভোগ্য হয়েছিল। রূপচাঁদের পিতার নাম ছিল গৌরহরি দাস,—মূল বাড়ি ছিল উড়িষ্যায়।

পাঁচালীকার হিসাবে দাশরথি রায় বিখ্যাত। কবিগানের মত

দাশুরায়ের পাঁচালী

পাঁচালীও আসরে গান করা হত, কিন্তু এতে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। একজন গায়ক পায়ে নুপুর ও হাতে চামর মন্দিরা নিয়ে আসরে দাঁড়িয়ে গান করতেন ; তাঁর সঙ্গীরা বসে বসে বাদ্যাদিসহ সুর-যোজনা করতেন।

বর্ধমান জেলার বাঁধমুড়ি গ্রামে দাশরথির জন্ম হয়েছিল ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে ; জাতিতে ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন,—পিতার নাম ছিল দেবীপ্রসাদ রায দাশরথির গানে অনুপ্রাসের ঝঙ্কার ও সুরের লালিত্য শ্রোতার হৃদয় জয় করে নিত। ইনি আগমনী-বিজয়ার বিষয়েও গান লিখেছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর দেহান্ত ঘটে।

চপ্‌ কীর্তনের প্রবর্তয়িতা হিসেবে মধুকান বিখ্যাত। নূপুর ও চামর-মন্দিরাসহ পাঁচালী গানের যে পুরানো ধারা ছিল, তারই বিবর্তনে কীর্তনের

মধুকান-এর চপ

ঢং-এ নূতন গানের রীতি প্রচলিত হয়। তার থেকে জন্ম হয় চপ কীর্তনের। মধুকান-এর পুরো নাম ছিল মধুসূদন কিন্নর,—বাড়ি ছিল যশোহর জেলায়। ১২২০ থেকে ১২৭৫ বাংলা

সালের মধ্যে ইনি জীবিত ছিলেন। অনুপ্রাসের উচ্ছ্বাস ও ধ্বনির চমৎকারিত্ব মধু-র রচনার শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য ছিল।

যাত্রাগানও আসলে পাঁচালীরই পরিণতি কি না, সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। পাঁচালী একক গায়েনের গান, বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর সংলাপ গায়েন একাই গান করতেন। যাত্রায় ভূমিকালিপি বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর মধ্যে বণ্টিত হল। অভিনয়ের ব্যবস্থাও সুষ্ঠু করা হল,—কিন্তু সংলাপের মাধ্যম থাকল গান।

সখের যাত্রা ও গোপাল উড়ে

যাত্রা শব্দের অর্থ রূপান্তরিত হতে হতে 'দেবলীলাত্মক অথবা অন্য কাহিনীর 'নাটগীতি' রূপে বিবেচিত হতে থাকে। এই অর্থেই যাত্রা বাংলার প্রাচীনতম নাট্যরূপ। এই নাট্যকলার মূলে বৈদিক কালের নাট্যাঙ্গিকের অবশেষও পণ্ডিতেরা লক্ষ্য করেছেন এবং অনুমান করেছেন সম্ভবতঃ প্রথম পর্যায়ে সূর্য ছিলেন যাত্রা কাহিনীর অধিদেবতা। পরে কৃষ্ণযাত্রা এবং আরো পরে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা বাংলাদেশে জনপ্রিয় হয়। এই বিদ্যাসুন্দর নিয়েই কলকাতায় প্রথম সখের যাত্রাদল বাঁধা হয়। পরিচালক ছিলেন বহুবাজারের রাধামোহন সরকার, এবং প্রথম অভিনয় হয়েছিল রাজা নবকৃষ্ণের বাড়িতে। গোপাল উড়ে এই যাত্রাদলে গান করে সুবিখ্যাত হন। রাধামোহনের মৃত্যুর পর ইনি পেশাদারি দল গড়ে তোলেন।

কবিগানের আর একটি রূপান্তর তর্জা। তর্জা গানেও কবির মত 'উতোর কাটাকাটি' রয়েছে। আসলে তর্জা ঝুমুর গানের মত, গানের সঙ্গে নাচও আছে। রুচির দিক থেকে তর্জাগান খেউড়ের মতোই অপাংক্তেয়।

বাংলা গদ্যের অঙ্কুর-উদ্গম

(পৃথিবীর সকল ভাষাতেই আগে সাহিত্য রচিত হয়েছে পদ্যে, গদ্য এসেছে তার অনেক পরে। সাধারণতঃ মনে করা হয়, গদ্য হচ্ছে আবেগ ও ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশের বাহন। গদ্যের মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে প্রকাশ পায় মানুষের যুক্তি-চিন্তা-অন্বিত বিচারবোধ। একথাও মনে করা হয়ে থাকে যে, মানব-শিশুর মত মানব সভ্যতাও প্রাথমিক অবস্থায় ছিল আবেগ-উদ্বেল। হয়ত এই কারণেই মানুষের প্রথম ভাবানুভূতির আবেগ-কম্পিত প্রকাশও সকল কালে সর্বত্র পদ্যের মাধ্যমে। বহুদিনের জীবন-সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতার শেষে কোনো জাতির মনে যখন যুক্তি-চিন্তার পারম্পর্য ঘনীভূত হয়ে ওঠে, তখনই তার ভাষা-সাহিত্যে জন্ম নেয় সুগঠিত গদ্য। বাংলা ভাষাতেও পদ্যের প্রথম জন্ম লক্ষ্য করেছি, খ্রীস্টীয় দশম শতকের মাঝামাঝিতে। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে সুগঠিত গদ্য রচিত হয়েছিল,—আরো প্রায় ন'শ বছর পরে,—মাত্র উনিশ শতকের মধ্যসময়ে এসে। অনেকটা এই কারণে মনে করা হয়,—ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এসেই বাঙালি মনে যুক্তি-চিন্তার বিস্তার ঘটেছিল। ফলে, বাংলা-সাহিত্যে গদ্য রচনাও আসলে ইংরেজ-সংসর্গের দ্বারা প্রভাবিত। সন্দেহ নেই, বাংলা গদ্যের গঠনে কেবল ইংরেজি শিক্ষাই নয়,—একাধিক ভারতীয় ইংরেজের দানও তুলনা-রহিত। কিন্তু, একথাও সত্য যে, ইংরেজ আমলের আগেই বাঙালির মনে গদ্য রচনার আকাঙ্ক্ষা একটু একটু করে অঙ্কুরিত হচ্ছিল। সে গদ্যের দৈহিক গঠন ছিল এলো-মেলো,—ভাবের মধ্যেও ছিল আচ্ছন্ন চিত্তের অস্পষ্টতা। তবু দেহে-মনে অপূর্ণ ঐ গদ্য-শিশুর মধ্যেই বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসেরও প্রথম জন্ম।)

গদ্যরূপের অঙ্কুর

বাংলা গদ্যের এই অঙ্কুর গঠনের ইতিহাসকে অনুসরণ করে পেছন দিকে পঞ্চদশ-চতুর্দশ শতকে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি রসময় চম্পূ রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। চম্পূ অর্থে বুঝি গদ্য-পদ্যময় রচনা। অতএব, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির রচনাংশে গদ্য-ও ছিল, একথা মনে করা যেতে পারে। বিদ্যাপতি

চৈতন্যরূপ প্রাপ্তি

বহু ভাষা-বিদ্ ছিলেন, কিন্তু চণ্ডীদাসের সব লেখাই ছিল বাংলা ভাষায়। চৈত্যরূপ প্রাপ্তি নামে একখানি 'সহজিয়া' গদ্য গ্রন্থ তাঁর নামে প্রচলিত আছে। তবে, এর লেখক বিখ্যাত পদকর্তা চণ্ডীদাস নন,—অপর কোনো সহজিয়া চণ্ডীদাস। আলোচ্য গ্রন্থের কোনো পুঁথিই সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের আগে লেখা নয়। চৈত্যরূপের ভাষা নিম্নরূপ :—

চৈত্যরূপের রা চ অধরূপ লাডি। রা অক্ষরে রাগ লাডি। চ অক্ষরে চেতন লাড়ি। র এতে চ মিশিল রা এতে বসিল।"

'দেহকড়চা' নামে আর একখানি সহজিয়া গদ্য গ্রন্থ রয়েছে নরোত্তমের নামে। ইনিই সপ্তদশ শতকের প্রখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য কিনা, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। গ্রন্থটির ভাষা নিম্নরূপ :—

দেহকড়চা।

"তুমি কে। আমি কে। আমি জীব। তুমি কোন্ জীব আমি তটস্থ জীব। থাকেন কোথা। ভাণ্ডে। ভাণ্ড কিরূপে হইল। তত্ত্ববস্তু হইতে।"

এই সব রচনার গ্রন্থকর্তার পরিচয় ও লিখনকাল বিষয়ে সংশয় আছে। এ ছাড়া, সপ্তদশ শতকে শ্রীরূপ গোস্বামীর লেখা বাংলা গদ্য 'কারিকা'র সন্ধান পাওয়া গেছে। ভাষার পরিচয় :—"প্রথম শ্রীকৃষ্ণ গুণ নির্ণয়। শব্দগুণ, গন্ধগুণ, রূপগুণ, রসগুণ ও স্পর্শগুণ এই পাঁচগুণ। এই পঞ্চগুণ শ্রীমতী রাধিকাতেও বসে।"

শ্রীরূপের কারিকা।

অষ্টাদশ শতকে লেখা আরো একাধিক বৈষ্ণব সহজিয়া গদ্য গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া গেছে। স্মৃতি, ন্যায়, চিকিৎসা শাস্ত্র, ইত্যাদি বিষয়েও আলোচ্য সময়ে বাংলা গদ্যে গ্রন্থ রচিত হয়েছিল।

অন্যান্য গদ্যগ্রন্থ।

(কিন্তু, বাংলা গদ্য রচনার নিশ্চিত সন-তারিখ যুক্ত যে প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা একখানি চিঠি। ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দে কুচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ এই চিঠি লিখেছিলেন আহোম-রাজা চুকাম্‌ফা স্বর্গদেবকে।) ভাষার পরিচয় নিম্নরূপ :

বাংলা গদ্যের প্রাচীন নির্শন

"লেখনং কার্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে

বাঞ্ছা করি। তখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে।"

এই ভাষার বোধগম্যতা অনস্বীকার্য। তাছাড়া, অন্তত: চিঠি-পত্রের ব্যবহারেও বাংলা গদ্যের গঠন ষোড়শ শতকেই প্রশংসনীয় আকার পেয়েছিল বলে মনে হয়।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে লেখা বাংলা গদ্যের প্রামাণ্য নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন ডঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। দুটি নিদর্শনই ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। সপ্তদশ শতকের লেখাটি একটি চুক্তিপত্রের দলিল :—রচিত হয়েছিল ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দে। গদ্য রচনাভঙ্গী নিতান্ত বিস্রস্ত ; তাছাড়া সেকালে প্রচলিত দুর্বোধ্য বৈষয়িক ইস্‌লামি শব্দের ব্যবহার অতিরিক্ত।

অষ্টাদশ শতকের লেখাটির নাম "মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র।" যেমন বিষয়-বস্তু, তেমনি তার ভাষা,—দুই-ই কৌতূহলজনক :—

বিক্রমাদিত্য চরিত্র

"মোং ভোজপুর শ্রীযুক্ত ভোজ রাজা তাহার কন্যা নাম শ্রীমতি মৌনাবতী ষোড়ষ বরিস্যা বড় সুন্দরি মুখ চন্দ্র তুল্য, কেশ মেঘের রঙ্গ চক্ষু আকর্ণ পর্য্যন্ত যুঙ্গ্য ভ্রূ ধনুকের নেয়ায় ওষ্ঠ রক্তিমে বর্ন,............।"

গদ্যরচনায় দেশীয় চেষ্টার ফলশ্রুতি।

সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকের লেখা আরো বহু চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ পাওয়া গেছে। তাতে সেকালের বাংলা গদ্যের দুটি সমান্তরাল রূপ দেখতে পাওয়া যায়। নিজেদের মধ্যে পারিবারিক বা বৈষয়িক কারণে যখন ব্যক্তিগত পত্রাদি লিখিত হত, তাতে তৎসম ও তদ্ভব শব্দাদির ব্যবহারই থাকত বেশি। সে ভাষা যেমন বোধগম্য, তেমনি তার দেহ-ও ছিল অপেক্ষাকৃত সুগঠিত। কিন্তু, যেসব চিঠি বা দলিল-দস্তাবেজ রাজদরবারে পেশ করবার জন্যে রচিত হত, তাতে মাত্রাতিরিক্ত,—এমন কি অসংগত পরিমাণ আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হত। ফলে, ভাষার দুর্বোধ্যতা যেমন বাড়ত, গদ্য-দেহের গঠনেও তেম্‌নি বিশৃঙ্খলা দেখা যেত বেশি। যে-কোনো ভাষাতেই নূতন শব্দ এবং প্রকাশভঙ্গিকে আয়ত্ত করতে পারলে ভাষার বলিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু, আরবী-ফার্সি ভাষার ব্যবহারকারী বাঙালিরা যে-কোনো রকমে বিদেশী রাজশক্তির মনস্তুষ্টি করতে চেয়েছিলেন,—ভাষাকে

সুগঠিত করবার দিকে ঝোঁক ছিল না তাঁদের।) রবীন্দ্রনাথের কথায়, সেদিন মুসলমানী রাজশক্তির "বাহুবলের ধাক্কা দেশের উপরে খুব জোরে লেগেছে, কিন্তু কোনো নতুন চিন্তা-রাজ্যে কোনো নতুন সৃষ্টির উদ্যমে তার মনকে চেতিয়ে তোলে নি।"

অতএব দেখ্‌ছি, ইংরেজ সমাগমের আগে বা ইংরেজ সংসর্গের বাইরে দেশীয় উদ্যোগে বাংলা গদ্য রচনার প্রয়াস শুরু হয়েছিল অন্ততঃ ষোড়শ শতাব্দী থেকে। কিন্তু, অব্যবহিত প্রয়োজন নির্বাহ করাই ঐ সব লেখার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ভাষা সুগঠিত করবার শৈল্পিক আয়োজনের কথা সেকালের গদ্য-লেখকেরা ভাবতেও পারেন নি।

বিদেশীদের মধ্যে প্রথমে গদ্য রচনার চেষ্টা করেছিলেন পর্তুগীজ ধর্ম-যাজকেরা। য়ুরোপীয় বণিকদের মধ্যে পর্তুগীজেরাই প্রথমে এসেছিল ভারতবর্ষে,—১৪৯৭ খ্রীস্টাব্দে। ষোড়শ শতকের প্রথমভাগেই পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় এদের অনেক বাণিজ্য-কুঠি গড়ে উঠেছিল। পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের অধিকাংশ ছিল জলদস্যু; যারা তা ছিল না, তাদের মধ্যেও সাহিত্য-সংস্কৃতি-প্রীতির ছিল একান্ত অভাব। এর মধ্যে বাংলা ভাষার কিছু কিছু চর্চা করেছিলেন পর্তুগীজ ধর্মপ্রচারকেরা। ভাষার উন্নতি বা সুগঠন বিষয়ে তাঁদের কোনো চেষ্টাই ছিল না। যে-কোনো রকমের বাঙালির কাছে খ্রীস্টীয় ধর্ম-কথা বোধগম্য করে তোলাই ছিল এঁদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। বাংলা গদ্যের বিশেষ গঠনরীতি বা প্রকাশভঙ্গিকে জানবার কোনো চেষ্টা তাঁরা করেন নি। ফলে, পর্তুগীজ ভাষারীতির কাঠামোর সংগত বা অর্ধ-সংগত বাংলা শব্দ যোজনা করে এঁরা অদ্ভুত রকমের বাংলা গদ্য লিখে গিয়েছিলেন। তাহলেও স্বীকার করতে হয়, বিদেশীদের মধ্যে বাংলা ব্যাকরণ লিখ্‌বার প্রথম চেষ্টাও করেছিলেন পর্তুগীজেরা। তাতে বাংলা ব্যাকরণের রীতি-পদ্ধতিকে সুগঠিত করবার কোনো আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় না। পর্তুগীজ ব্যাকরণের কাঠামোয় বাংলা শব্দ-রূপ ও ধাতুরূপের একটি সাধারণ ধারণা পর্তুগীজ পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই ছিল ঐ প্রচেষ্টার একমাত্র প্রয়াস।

পর্তুগীজ-প্রয়াসে রচিত গদ্য

ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে পর্তুগীজ যাজকদের বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনার সন্ধান পাওয়া যায় ষোড়শ শতকেই। ঐ সময়ে ঢাকা সোনারগাঁ-র

জে-সুইট্ ধর্মযাজক ফ্রান্সিস্কো ফেরনান্দেস্-এর খ্রীস্টধর্ম-বিষয়ক দুখানি পুস্তিকার বাংলা অনুবাদ করেছিলেন দোমিনিক্ দে সুজা। সপ্তদশ শতকে ঐ অঞ্চলের ধর্মযাজকদের চেষ্টায় বাংলা ব্যাকরণ, শব্দকোষ, প্রার্থনা ও অপরাপর ধর্মপুস্তিকা রচিত হয়েছিল বলেও জানা যায়। কিন্তু এই সব, এবং আরো অনেক পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হওয়ার খবর পাওয়া গেলেও, তাদের প্রত্যক্ষ কোনো নিদর্শন নেই। এপর্যন্ত পর্তুগীজ-চেষ্টায় লিখিত তিনখানি বই-এর মুদ্রিত সংস্করণ পাওয়া গেছে। তার দুখানি পাদ্রি মানো-এল্ দ্য-আসুম্প্-সাম্ এর লেখা; আর তৃতীয়খানির লেখক খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত বাঙালি জমিদার-পুত্র দোম্-এন্তোনিও।

মানো-এল্-দ্য আসুম্প সাম্।

মানো-এল্ এর প্রথম রচনা পর্তুগীজ ভাষায় লেখা বাংলা গদ্যের একখানি ব্যাকরণ ও শব্দকোষ :—,Vocabularoi em Idioma Bengalla e Portuguez'। এই গ্রন্থ দুইভাগে বিভক্ত ;—প্রথম ভাগ ব্যাকরণ; দ্বিতীয় ভাগে আছে পর্তুগীজ-বাংলা ও বাংলা পর্তুগীজ শব্দকোষ। ব্যাকরণখানি পর্তুগীজ ভাষায় লেখা। এর আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যের কথা ওপরে উল্লেখ করেছি। গ্রন্থখানি ১৭৩৪ খ্রীস্টাব্দে রচিত হয়েছিল।

কৃপারশাস্ত্রে অর্থভেদ।

মানো-এল্-এর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ঢাকা জেলায় ভাওয়াল পরগণায় লেখা হয়েছিল ১৭৩৫ খ্রীস্টাব্দে। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে কথোপকথন উপলক্ষ্যে খ্রীস্টধর্মের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে এতে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই বইএর ভাষা আলোচনা করে জানিয়েছেন,—এতে প্রায় আড়াইশ বছর আগেকার পূর্ববঙ্গীয় আঞ্চলিক ভাষাকে সাধুভাষার কাঠামোয় উপস্থিত করবার চেষ্টা রয়েছে।

দোম্ এন্তোনিওর রচনা।

পর্তুগীজ আওতায় লেখা তৃতীয় গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত নাম 'ব্রাহ্মণ-রোমান্-ক্যাথলিক-সংবাদ'। এর লেখক ঢাকা অঞ্চলের বিখ্যাত জমিদার-পুত্র ছিলেন। পর্তুগীজ দস্যুরা একান্ত বালককালে তাঁকে অপহরণ করে নেয়। ফাদার মানোএল্দের্ রোজারিও নামে একজন পর্তুগীজ পাদ্রি তাঁকে উদ্ধার করে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করেন। তখন তাঁর নাম হয় দোম্-এন্তোনিও। পরে ইনি তাঁর

অসংখ্য দেশবাসীকে রোমান ক্যাথলিক্ ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থে দোম্-এনতোনিও "জেন্টু"দিগের প্রতিনিধি একজন ব্রাহ্মণ, আর রোমান্ ক্যাথলিক একজন ধর্মযাজকের মধ্যে কথোপকথনের পরিণামে খ্রীস্টধর্মের সবশ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত করেছেন। ভাষা মানোএল্-এর রচনারই প্রায় সমধর্মী।

আলোচ্য তিনখানি গ্রন্থই ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে পর্তুগালে লিস্বন নগরীতে মুদ্রিত হয়। তখনো বাংলা হরফ্-এর আবিষ্কার হয়নি; তাই রোমান্ অক্ষরে এই বাংলা বই তিনখানির মুদ্রণ হয়েছিল। দোম এন্তোনিওর 'ব্রাহ্মণ রোমান্ ক্যাথলিক সংবাদ' বাংলা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত বই,—যদিও মুদ্রণ হয়েছিল রোমান্ হরফে। তিনখানি বই-এরই এক পৃষ্ঠায় পর্তুগীজ অনুবাদ মুদ্রিত হয়েছিল।

পর্তুগীজ রচয়িতাদের এইসব প্রচেষ্টা বাংলা গদ্যের গঠনে, বা ঐতিহাসিক বিকাশে উল্লেখ্য কোনো সহায়তা করতে পারে নি। তবু, একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে গদ্য রচনার সুপরিকল্পিত চেষ্টার সূত্রপাত এখানেই। পর্তুগীজদের প্রবর্তিত এই চেষ্টার উল্লেখযোগ্য উন্নতি বিধান করেন ইংরেজ প্রয়াসীরা।

বাংলা গদ্য রচনায় ইংরেজ প্রয়াস

পর্তুগীজদের বেলা যেমন কেবল ধর্মযাজকদের মধ্যেই গদ্য রচনার প্রয়াস সীমাবদ্ধ ছিল, ইংরেজদের ক্ষেত্রে তেমনটা ছিল না। একেবারে প্রথম দিকে ব্রিটিশ ভারতে খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকদের উপস্থিতি আইন করে বারিত হয়েছিল। উইলিয়ম কেরির মত মহাপণ্ডিত ব্যক্তিকেও প্রথমে ওলন্দাজ অধিকৃত শ্রীরামপুরকে কেন্দ্র করে ধর্মপ্রচার করতে হয়েছিল। ফলে, যদিও ইংরেজ ধর্মযাজক ও শিক্ষাব্রতীদের চেষ্টাই পরিণামে বাংলা গদ্যকে গতিশীল করেছিল, তবু প্রথমে গদ্য রচনার কৃতিত্ব ইংরেজ সরকারের কর্মচারিগণেরই।

হাল্হেডের ব্যাকরণ

পলাশির যুদ্ধের পর থেকেই দেখি এদেশের ভাষা শিখবার জন্যে ইংরেজ রাজপ্রতিনিধিদের প্রয়োজনবোধ প্রবল হয়েছে। ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দে কটকের তৎকালান প্রেসিডেন্ট দেশী ভাষা না জানার জন্যে পদচ্যুত পর্যন্ত হয়েছিলেন। ওআরেন হেস্টিংস্ ভারত শাসক হয়ে এসে বিদেশী শাসন-প্রতিনিধিদের জন্যে দেশী ভাষা শেখার বিশেষ

ব্যবস্থা করলেন। তারই ফলে, এন্. বি. হালহেড্-এর লেখা "A Grammar of the Bengal Language" বই-এর প্রকাশ ঘটে। বাংলা গদ্য, এবং তার চেয়েও বেশি, বাংলা মুদ্রণ-পদ্ধতির ইতিহাসে এই বইখানি বিশেষ মূল্যবান;—এতেই সর্বপ্রথম বাংলা শব্দ বাংলা হরফে মুদ্রিত হয়েছিল। বাংলা ছাপাখানার জন্ম হয় এই সূত্রেই।

বাংলা মুদ্রণ-যন্ত্র

হাল্‌হেডের মূল গ্রন্থ ইংরেজি ভাষায় লেখা। কিন্তু, উদাহরণ হিসেবে কিছু বাংলা শব্দও ব্যবহৃত হয়েছিল। ঐ শব্দগুলি মুদ্রিত করবার জন্যে চার্লস উইল্‌কিন্‌সন্ ছেনি কেটে মুদ্রণযোগ্য বাংলা হরফের পত্তন করেন। হাল্‌হেড্ আর উইল্‌কিন্‌সন্, দুজনেই কোম্পানীর কর্মচারী ছিলেন। দেশে ফিরে যাবার আগে দ্বিতীয়োক্ত জন পঞ্চানন নামে এক কর্মকারকে এই অক্ষর তৈরি করার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। পরে, স-পুত্র পঞ্চানন বাংলা মুদ্রণ-যন্ত্রের প্রসারে বিশেষ সহায়তা করেন।

হাল্‌হেড্-এর ব্যাকরণ ইংরেজ শিক্ষার্থীদের সহায়তার জন্যে রচিত হয়। এ ছাড়া দেশীয় ভাষায় আইন বিষয়ক নানা গ্রন্থও অনুবাদিত হয়েছিল। বাংলা শেখবার শব্দকোষ এবং সহজ-প্রবেশ (tutor) জাতীয় গ্রন্থিকাও প্রচুর লিখিত হয়েছিল। কিন্তু বাংলা গদ্যের সুগঠনে এদের প্রত্যক্ষ দান কিছু নেই।

কেরির বাইবেল

এ-বিষয়ে ইংরেজ মিশনারিদের উদ্যোগই প্রথমে বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল। এঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখ্য নাম উইলিয়ম কেরি ও জশুয়া মার্শম্যান-এর। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁরা ওলন্দাজ-অধিকৃত শ্রীরামপুরে ধর্ম প্রচারের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন; সেই সঙ্গে রামরাম বসু নামক একজন দেশীয় মুন্সীর কাছে বাংলা শিখতে আরম্ভ করেন। কেরি এবং মার্শম্যান দুজনেই পূর্বাবধি সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ফলে, বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জন করা তাঁদের পক্ষে সহজ-সাধ্য হয়েছিল। ক্রমে, ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে কেরি ও তাঁর সহযোগীদের চেষ্টায় শ্রীরামপুর থেকে নিউ-টেস্টামেণ্ট-এর আগাগোড়া বাংলা অনুবাদ বাংলা হরফেই মুদ্রিত হয়। এই উপলক্ষ্যেই বিখ্যাত শ্রীরামপুর প্রেসের প্রথম প্রতিষ্ঠা।

এই গ্রন্থের ভাষা হাস্যকর রকমে ত্রুটিবহুল,—একই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে ভাষা আরো অনেক সুগঠিত হতে পেরেছিল। বাংলা ভাষার বক্তব্যকে সর্বজনবোধ্য করতে হবে,—প্রথম থেকেই এই আকাঙ্ক্ষা শ্রীরামপুরের লেখকদের প্রভাবিত করেছিল। ফলে, ভাষার বাক্যরীতি ইংরেজি-ঘেঁষা হলেও, তাতে প্রাঞ্জলতা ও স্পষ্টতার অভাব কম। এখানেই পর্তুগীজ ধর্মযাজকদের তুলনায় ইংরেজ যাজকদের স্বকীয়তা এবং উৎকর্ষ।

ঊনবিংশ অধ্যায়

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও বাংলা গদ্য

শ্রীরামপুরে কেরির নিজের লেখা বাইবেল বাংলা গদ্যরচনার ইতিহাসকে প্রভাবিত করতে পারে নি; কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে এই কেরির-ই পরিচালনা ও পরিকল্পনায় রচিত বহু গ্রন্থ বাংলা গদ্যে নবযুগের নবীন প্রবর্তনার সৃষ্টি করেছিল।

১৮০০ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা মে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম সরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজের বিঘোষিত নীতি ছিল বিদেশী সিবিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলা। কলেজটির জীবৎকালে এই উদ্দেশ্য বিশেষ সফলতা লাভ করতে পারে নি। ফলে, অনেক উৎসাহের মধ্যে জাত প্রতিষ্ঠানটির অকাল-মৃত্যু হয় একান্ত দুরবস্থার মধ্যে। কিন্তু, এই সময়ের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি উন্নতি হয়েছিল বাংলা গদ্য রচনার। আর, তার কৃতিত্ব ছিল উইলিয়ম কেরির। ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রথমে সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষক হিসেবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগ দেন। ১৮০৭ সালে ঐ দুই বিষয়ের অধ্যাপক ও সর্বাধ্যক্ষ পদে উন্নতি লাভ করেন। প্রথম থেকেই সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগ দুটির দায়িত্ব অবশ্য কেরির ওপরেই ন্যস্ত ছিল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্দেশ্য

পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন করতে গিয়ে তিনি প্রথমে বাংলা গদ্য পুস্তকের একান্ত অভাব অনুভব করেন। তখন কেরির প্রথম কাজ হল বাংলা ভাষায় পাঠযোগ্য গদ্য-পুস্তক রচনা করিয়ে নেওয়া। প্রথমতঃ, একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য-তালিকায় ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, দর্শন, অলংকার-শাস্ত্র, ইত্যাদি নানা বিষয়ের স্থান হওয়া উচিত। এদিক থেকে রচিতব্য গ্রন্থের বিষয়াবলীর পরিকল্পনাও তাঁকেই করতে হয়েছিল সুচিন্তিতভাবে। আর এই জন্য, প্রথম থেকেই নির্ভরযোগ্য একদল শিক্ষক-রচয়িতাকে খুঁজে বার করতে হয়েছিল তাঁর। তাছাড়া, নূতন রচনার ভাষা যাতে কেবল বোধগম্যই নয়, বাংলা ভাষার গঠন-রীতি-সম্মতও হয় সে-বিষয়ে কেরির

অবধানতা ছিল প্রখর। তিনি বুঝেছিলেন,—কোনো ভাষা শিখতে হলে, ভাষা-ভাষীদের বাচনভঙ্গির অনুসরণ অবশ্যই করতে হবে। তাই, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কেরির ব্যক্তিগত প্রয়াস 'কথোপকথন' গ্রন্থের সম্পাদনাতেই নিবদ্ধ হয়েছিল। এককালে মনে করা হত,—এই গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ স্বয়ং কেরিরই রচনা। এখন সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে,—কোনো অংশই হয়ত তাঁর নিজের লেখা নয়। তা হলেও, গোটা গ্রন্থটিরই পরিকল্পনা যে তাঁর, তাতে কিছু সংশয় নেই। এই বৃহৎ গ্রন্থে, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চ-নীচ সমাজে ব্যবহৃত কথ্য ভাষার পরিচয় উদ্ধার করা হয়েছে। সর্বত্রই যে মূল ভাষার যথার্থ প্রতিরূপ উদ্ধৃত আছে, এমন কথা মনে করবার কারণ নেই। কিন্তু, বাংলা ভাষার মূল বাঁধুনিটি এই বিচিত্র রূপাবলীর প্রায় সর্বত্রই আভাসিত হয়েছে :—

কথোপকথন ও কেরি

"'তোমরা কয় যা।'
'আমি সকলের বড আমার আর তিন যা।'
'কেমন যা-য় যা-য় ভাব আছে, কি কালের মত।'
'আহা ঠাকুরাণী, আমার যে জ্বালা আমি সকলের বড,
আমাকে তাহারা অমুক-বুদ্ধিও করে না।'"

কিন্তু, কথোপকথনই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে প্রকাশিত প্রথম গদ্য গ্রন্থ নয়। ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে কথোপকথন প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ বছরেই এর পূর্বে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় রামরাম বসুর লেখা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র। তা হলেও, মুন্সী রামরাম যে কেরির আদর্শ-বোধের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। বাংলা গদ্যের গঠনের পথে সংস্কৃত ভাষার প্রতি কেরির আস্থা ছিল সমধিক। রামরাম বসু নিজে সংস্কৃত না জানলেও সংস্কৃতানুসারিতার হাস্যকর চেষ্টাও করেছেন অনেক। প্রতাপাদিত্য চরিত্রের ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন,—"আমি তাহাদিগের স্বশ্রেণী একই জাতি"—অর্থাৎ প্রতাপাদিত্যের স্বজাতি ছিলেন তিনি। যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্য ছিলেন বারভুঁইয়ার শ্রেষ্ঠ নেতা ;—আকবরের বঙ্গ-বিজয়ের বিরোধিতা করে কালে কালে তিনি শ্রেষ্ঠ দেশ-প্রেমিকের মর্যাদা

রামরামবসুর প্রতাপাদিত্য চরিত্র

পেয়েছিলেন। স্বাজাত্য-বোধের ফলে প্রতাপাদিত্যের ঐতিহাসিক কীর্তি-কলাপের প্রতি রামরামের নিগূঢ় মমতা ছিল। তিনি নিজেই জানিয়েছেন,—ফারসী ভাষার নানা আখ্যায়িকার সঙ্গে বংশগত কিংবদন্তী যোগ করে এই জীবনী-ইতিহাস রচিত হয়েছিল। ঐতিহাসিকের তথ্য-দৃষ্টি ও জীবন-বোধের যথার্থতায় রামরাম যে সিদ্ধকাম ছিলেন, তার বহু প্রমাণ রয়েছে মূল গ্রন্থে। কিন্তু, ঠিক সেই পরিমাণেই ভাষা-রচয়িতার দায়িত্ব পালনে তিনি একান্ত অযোগ্যতারই পরিচয় দিয়েছেন।

রামরাম প্রতিভাধর ব্যক্তি ছিলেন। প্রতাপাদিত্য চরিত্রের ভাষা রচনায় ত্রুটি তাঁর অক্ষমতাপ্রসূত নয়,—অনবধান জনিত। প্রায় এক বছরের ব্যবধানে প্রকাশিত তাঁর লিপিমালার সঙ্গে তুলনা করলেই এই বক্তব্য স্পষ্ট হবে। প্রতাপাদিত্য চরিত্রের একটি বাক্য—"কাননগো দপ্তরে আপন বাপের প্রকোষ্ঠে কাজকর্ম করিতেছিল। ইতিমধ্যে সে দপ্তরে শিরিস্তাদার কান্তার নামে একজন কটকী ছিল। তাহার সহিত শিবানন্দের অপ্রণয় হইয়া সে উৎখাত হইয়া গৌড়ে রাজধানী স্থানে গতি করিলেন।"

রচনা-পরিচয়

মূলের একটি মাত্র বাক্যকে আমরা ছেদ-চিহ্নিত করেছি। তাতে মূল রচনার দুর্বোধ্যতা যদি কমেও থাকে, তবু বাক্যের অন্বয়হীনতা কেবল দোষবহুল নয়,—বিসদৃশ। অথচ, ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে লিখিত লিপিমালার ভাষায় আছে,—"মহাদেব বিবাহ করেন দক্ষের দুহিতা। মহাশক্তি অবতীর্ণা দক্ষের গৃহে। তাহার নাম সতী।"

লিপিমালা

এখানেও ছেদ-চিহ্ন-গুলি আমাদের দেওয়া। কিন্তু, তাতে বাচ্যার্থই কেবল স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি; বাক্যের গঠন-রীতিও অনেকটা সহনীয় এবং সাবলীল হয়েছে। এখানে বলা উচিত, লিপিমালা রচনার আগে,—ঐ একই সালে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রথম গ্রন্থ 'বত্রিশ সিংহাসন' প্রকাশিত হয়েছিল। অনেকের ধারণা, রামরাম মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষাভঙ্গিকে অনুসরণ করেই লিপিমালার রচনাগত উৎকর্ষের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। এখানেই রামরাম-প্রতিভার নিজস্ব স্বরূপ। যথেষ্ট শক্তির অধিকারী হয়েও মহৎ বস্তু নির্মাণের ধৈর্য তাঁর

রামরাম-প্রতিভা

ছিল না। অথচ, একবার মাত্র আদর্শ রচনার সন্ধান পেয়েই অনায়াসে তার অনুসরণ করতে পেরেছেন তিনি। লিপিমালাতে বাংলা পত্র রচনার আদর্শ শিক্ষা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রন্থটি নানা বিষয়ে লিখিত পত্রের সমষ্টি।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য লেখা এই দুটি গদ্য-পুস্তক ছাড়া রামরাম পৃথক্‌ভাবে একাধিক পদ্য ও কবিতা-পুস্তিকাও লিখেছিলেন। অনুমান ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়েছিল। ফার্সি ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ। টমাস, কেরি, মার্শম্যান প্রভৃতি খ্রীস্টীয় ধর্মযাজকদের বাংলা শেখাবার দায়িত্ব নিয়েই তিনি প্রথম ইংরেজ সান্নিধ্যে আসেন। ক্রমে ইংরেজি ভাষার কথনেও সুদক্ষ হয়ে ওঠেন, যদিও তা লিখ্‌তে পারতেন না কখনো। একাধিক ইংরেজ তাঁর ইংরেজি ভাষাজ্ঞানের প্রশংসা করেছেন। খ্রীস্টীয় ধর্মযাজকদের সঙ্গে বাস করে রামরাম বসু কিছুদিন ঐ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। প্রথমে ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি একটি খ্রীস্ট-স্তোত্র রচনা করেন। পরে ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে দুটি ইংরেজি খ্রীস্ট-সংগীতেরও বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। আরো পরে 'খ্রীস্ট বিবরণামৃতম্' নামে পদ্যে যীশুখ্রীস্টের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত লিখেছিলেন।

রচনাকালের বিচারে রামরাম বসুর পরেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক-লেখক হিসেবে প্রথমে উল্লেখ্য পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। ইনি ছিলেন নিঃসন্দেহে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-গোষ্ঠীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা-শিল্পী ও প্রধান গ্রন্থকার। আনুমানিক ১৭৬২ খ্রীস্টাব্দে ভদ্রক-এ মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয়েছিল। ভদ্রক এখন উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্গত ;—তখন ছিল মেদিনীপুর জেলায়।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

নাটোরের রাজপণ্ডিতের কাছে তিনি শিক্ষিত হয়েছিলেন। ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয় মাসিক ২০০৲ বেতনে ফোর্ট উইলিয়মের প্রধান বাংলা-পণ্ডিত হিসেবে নিযুক্ত হন। এই প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে —শিক্ষক হিসেবে একই বিদ্যায়তনে রামরাম বসুর মাইনে ছিল মাসে ৪০৲ টাকা। মৃত্যুঞ্জয়ের শ্রেষ্ঠ পদাধিকার এবং অধিকতর পারিশ্রমিক তাঁর যোগ্যতর পাণ্ডিত্যের দ্বারাই কেবল সমর্থিত হয় না ; শিক্ষক ও ভাষা-রচয়িতা হিসেবেও তাঁর দায়িত্ববোধ ছিল অতুল্য। মৃত্যুঞ্জয় কখনো ভোলেন নি যে, বিদেশী শিক্ষার্থীদের কাছে নিজের মাতৃভাষার গদ্যরূপ, সাহিত্য, ও জ্ঞানভাণ্ডারকে

বরণীয় করে তোলার ব্রতেই তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাই, একদিকে যেমন বিচিত্র পাণ্ডিত্য ও রসপূর্ণ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করে গেছেন একের পর এক, তেমনি প্রতিটি রচনার ভাষাকে কেবল রীতি-বিশুদ্ধই নয়, সুগঠিত করে তোলাতেও তিনি সচেতনভাবে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

ফোর্ট ইউলিয়ম কলেজের জন্যে সবসুদ্ধ চারখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন মৃত্যুঞ্জয়। আগে বলেছি তাঁর প্রথম লেখা বত্রিশ সিংহাসন প্রকাশিত হয়েছিল ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে। গল্পের বিবৃতিমূলক ভাষার দেহে স্বচ্ছতা সৃষ্টির সার্থক নৈপুণ্যই প্রকাশ পেয়েছে এই গ্রন্থে:—"দক্ষিণ দেশে ধারা নামে এক পুরী ছিল সেই নগরের নিকটে সম্বদকর নামে এক শস্যক্ষেত্র থাকে তাহার কৃষকের নাম যজ্ঞদত্ত।"

বত্রিশ সিংহাসন

এমন প্রাঞ্জল ভাষা রচনা করা সত্ত্বেও মৃত্যুঞ্জয়ের নাম একালের পাঠকের কাছে দুর্বোধ্যতম বাংলা গদ্যের লেখক হিসেবে কুখ্যাত হয়ে আছে। এর প্রধান কারণ, তাঁর শেষতম গ্রন্থ প্রবোধ-চন্দ্রিকার অংশবিশেষের ভাষা। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ভাষাকে বিষয়ের অনুগত করে রচনা করার আকাঙ্ক্ষা ছিল মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যে প্রবল। আর সেই চেষ্টাতেই মাঝে মাঝে দুর্বোধ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। যথার্থ শিল্পী জানেন, ভাষা হচ্ছে ভাবের বাহন। অতএব যে ভাষা বর্ণিতব্য বিষয়কে যথোচিত পরিবেশের মধ্যে উপস্থিত করতে পারে না, নিতান্ত সুবোধ্য হলেও রচনাকর্মের ইতিহাসে তা নিকৃষ্ট। প্রাঞ্জলতার জন্য মৃত্যুঞ্জয় বিষয়-পরিবেশের মৌলিকতাকে বিসর্জন দেন নি। ভাষা-শিল্পী হিসেবে এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠতা। আর এই শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হতে পারবে তাঁর দ্বিতীয় রচনা হিতোপদেশ (১৮০৮ খ্রী:) গ্রন্থে।

হিতোপদেশ

বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থ আসলে একই নামের সংস্কৃত মূলের অনুবাদ। হিতোপদেশ কেবল গল্পের ভাণ্ডার নয়; সরস-বিচিত্র কাহিনীর আধারে জীবনের গভীর আদর্শকে মর্মবিদ্ধ করে তোলার দিকে সংস্কৃত হিতোপদেশ-রচয়িতার আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। মূল রচনার সেই পরিবেশ-গম্ভীরতাকে মৃত্যুঞ্জয় হুবহু অনুবাদ করতে চেয়েছেন তাঁর বাংলাভাষার মধ্যে:—

"প্রাজ্ঞলোক অজর ও অমরের ন্যায় হইয়া বিদ্যা এবং অর্থচিন্তা করিবেক। আর যম কর্তৃক কেশে গৃহীতের মত হইয়া ধর্মাচরণ করিবে।"

এই শ্লোকের সংস্কৃত মূল,—

"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ॥

স্পষ্টই দেখছি, ভাষাকে মূল সংস্কৃতের অনুগামী করার চেষ্টায় বাংলা গদ্যের অন্বয়-রীতিকে এখানে ভেঙে গড়া হয়েছে। তাহলেও এ-বাংলা দুর্বোধ্য নয়।

রাজাবলি (১৮০৮) নামে মৃত্যুঞ্জয়ের তৃতীয় বইখানি ভারতীয় রাজ-বংশের ইতিহাস;—লেখকের স্বীকৃতি অনুসারে—"কলির প্রারম্ভ হইতে ইংরেজের অধিকার পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাটদের সংক্ষেপ ইতিহাস।"—কলির প্রারম্ভ বলতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাহিনী দিয়ে শুরু হয়েছে বই-এর বর্ণনা। বিষয়বস্তুর আহরণে মূলতঃ কিংবদন্তী ও লোকপ্রসিদ্ধির ওপরেই নির্ভর করা হয়েছে। রাজাবলির বিবরণাত্মক ভাষার রচনা উপলক্ষ্যে মৃত্যুঞ্জয় বাংলা গদ্যের আরো গাঢ়তা সম্পাদন করেছিলেন:—"পূর্বে সূর্যবংশীয় রামচন্দ্র নামে রাজা হইয়াছিলেন তিনি নৈমিষারণ্যে যখন যজ্ঞ আরম্ভ করেন তাহার পূর্ব কিছুদিন কোনই কারণেতে আপন পত্নী সীতাকে বনবাসে দিয়াছিলেন।"

রাজাবলি

মৃত্যুঞ্জয়ের চতুর্থ গ্রন্থ প্রবোধ-চন্দ্রিকা রচিত হয়েছিল ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর বহু পরে ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। আগে বলেছি, প্রবোধ-চন্দ্রিকার ভাষার জন্যেই মৃত্যুঞ্জয়ের যত খ্যাতি এবং অখ্যাতি। এক অর্থে এই গ্রন্থটি কেবল সাধারণ জ্ঞানের বই নয়,—বিচিত্র বিদ্যার বিশ্বকোষও। চারটি 'স্তবক' ও বহু 'কুসুম'-এ বিভক্ত এই গ্রন্থে অলংকার, ব্যাকরণ, ধ্বনি ও লিপিতত্ত্ব, আইন, তর্কশাস্ত্র, জ্যোতির্জ্ঞান, রাজনীতি ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। আর ভেবে বিস্মিত হতে হয়, রচনার প্রায় সকল বিভাগেই মৃত্যুঞ্জয় গদ্যভাষাকে বিষয়ানুগ করে তুলতে চেয়েছেন। ভাষা-প্রশংসা নামক প্রথম কুসুম-এ ভাষার পরিচয় দিয়ে তিনি লিখেছেন,—"অভিব্যক্তবর্ণা ধ্বনিমাত্ররূপা পরানাম্নী ভাষা প্রথমা, যেমন অভিনব কুমারেরদের ভাষা।" মূল সংস্কৃতের অনুগ, এবং সেই কারণে অতিরিক্ত তৎসম-শব্দে কণ্টকিত এই দুর্বোধ্য ভাষার জন্যেই মৃত্যুঞ্জয়

প্রবোধ-চন্দ্রিকা

নিন্দাভাজন হয়েছেন। কিন্তু, এই ধরনের গদ্য প্রবোধ-চন্দ্রিকাতেও প্রচুর নেই। অথচ, আমরা স্মরণ করি না, ঐ একই গ্রন্থের বিষয়ান্তরে লেখক লিখেছেন,—"দণ্ডকারণ্যে প্রাচীন নদীতীরে বহু কালাবধি এক তপস্বী তপস্যা করেন, বিবিধ কৃচ্ছ্রসাধ্য তপঃ করিয়াও তপঃ সিদ্ধিভাগী হন না।"

ফল কথা, মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে বাংলা গদ্য বিশুদ্ধ অন্বয়-রীতি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারেনি। কিন্তু, গদ্যভাষাকে বর্ণিতব্য বিষয়ের বাহন হতে হবে,—এই মৌলিক সত্যানুভূতি তাঁর রচনাতেই প্রথম স্বীকৃতি পেয়েছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা ছাড়া, আর একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের প্রকাশ ঘটেছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে। গ্রন্থটি কেরির নামে প্রচলিত ইতিহাসমালা। এতে সাধুভাষায় রচিত ১৫টি দেশি-বিদেশী গল্প বিবৃত হয়েছে। ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। ডঃ সুশীলকুমার দে বলেছেন,—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা গদ্য নিয়ে সুদীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষার অব্যর্থ ফল ইতিহাসমালায় দেখা দিয়েছে। এই গ্রন্থের বিশুদ্ধ অন্বয়-রীতি বিদ্যাসাগরীয় গদ্যের পূর্বসূরী :—"একজন ঘটক ব্রাহ্মণ,অর্থাৎ বিবাহের যোজক এক বনের মধ্য দিয়া আসিতেছিল। সেখানে এক ব্যাঘ্র ঘটক ব্রাহ্মণকে মারিতে উদ্যত হইলে ব্রাহ্মণ ভীত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।"

কেরির ইতিহাসমালা

মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার তুলনায় এই গদ্যের রূপ-বিশুদ্ধি স্বতোভাস্বর।

রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় ছাড়া কেরির অধীনে আরো যে-কয়জন মুন্সী-পণ্ডিত গদ্য রচনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে গোলোকনাথ শর্মার হিতোপদেশ ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখকের পুরো নাম ছিল গোলোকনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ইনি মিশনারীদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গোলোকনাথের রচনায় বাংলা গদ্যরীতি-জ্ঞানের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না।

গোলোকনাথ শর্মা

তারিণীচরণ মিত্রের ঈশপের গল্প রোমান হরফে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে তারিণীচরণের জন্ম হয়েছিল কলকাতায়। ইনি বাংলা, হিন্দী এবং উর্দু ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ইনি হিন্দী

তারিণীচরণ মিত্র

বিভাগেরই মুন্সী ছিলেন। প্রতীচ্য গল্পের এই সংকলন জন গিলক্রাইস্টের তত্ত্বাবধানে ছটি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে রোমান হরফে প্রকাশ করা হয়েছিল। বাংলা, ফার্সী ও হিন্দী, এই তিন ভাষার অনুবাদ করেছিলেন তারিণীচরণ। এঁর বাংলা রচনায় ইংরেজি গদ্যের বাক্য-রীতি (syntax) হুবহু অনুসৃত হয়েছে।

চণ্ডীচরণ মুন্সী

চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস' ফার্সি 'তুতিনামার' বাংলা অনুবাদ। ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়ে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। লণ্ডন থেকেও এই গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু লেখকের বাংলা পদ্যরীতির জ্ঞান যে বিশুদ্ধ ছিল না, আগাগোড়া বই-এ তার প্রমাণ আছে।

চণ্ডীচরণ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা বিভাগে পণ্ডিত ছিলেন। ইনি ভগবদগীতারও একটি পদ্যানুবাদ করেন।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়স্য চরিত্রংও প্রকাশিত হয়েছিল ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দেই। এই লেখকও ছিলেন ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিত। ইনি কৃষ্ণনগর রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত ছিলেন বলে জানা যায়। তাছাড়া, স্বয়ং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অব্যবহিত পূর্ববর্তী যুগের এক শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। এদিক থেকে রাজীবলোচনের হাতে সমকালীন বাংলার একখানি উৎকৃষ্ট ইতিহাস রচনার সুযোগ ছিল প্রচুর। কিন্তু, যথার্থ নিষ্ঠার অভাব ও অতিরিক্ত কল্পনা-বিলাসের দরুণ সেই সম্ভাবনা নষ্ট হয়েছে। ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল বলে গদ্য গঠন-রীতিও অনেকটা বিশুদ্ধ। এই গ্রন্থও লণ্ডনে পুনর্মুদ্রিত হয়।

হরপ্রসাদ রায়

সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যাপতির লেখা 'পুরুষ পরীক্ষা' গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন হরপ্রসাদ রায়। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রকাশের পরে এই গ্রন্থও লণ্ডনে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

ইতিহাসের ফলশ্রুতি

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আওতায় রচিত আরো বহু গ্রন্থ-গ্রন্থিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রায়ই তাদের কোনো প্রত্যক্ষ নিদর্শন মেলে নি। তাছাড়া, আরো যে কিছু সংখ্যক বইয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে,—বাংলা গদ্যের গঠনে তাদের কোনো

উল্লেখযোগ্যতাও নেই। অতএব, এখানেই বর্তমান আলোচনা সমাপ্ত হতে পারে। কিন্তু তার আগে বাংলা গদ্যের জন্ম-ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়মের অতুল্য ভূমিকা অবশ্য স্মরণীয়। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই কলেজ ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে যখন বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন 'It had no revenues and system of instruction, no teacher, and as a college, in reality no pupils।" তবু, এই একান্ত বিনষ্টিযুক্ত পরিণাম সত্ত্বেও, এই কলেজের অতন্দ্র সাধনা বাংলা গদ্যের গঠনে ইতিহাসের যাত্রাপথ রচনা করেছে। রীতি-শুদ্ধ সাবলীল গদ্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে লিখিত হয়নি। কিন্তু, বিচিত্র বিষয়-চারী সুগঠিত গদ্য রচনার সাধনা শুরু হয়েছিল এই শিক্ষাবেদীতেই।

নগর বাংলায় নবজীবন

আগে বলেছি, মোগল-যুগের সমাপ্তি ও ব্রিটিশ শাসনের শুরুতে অপার বিনষ্টির বেদনা-তলে বাংলা সাহিত্যে নবযুগের লক্ষণ অঙ্কুরিত হয়ে উঠছিল। সে ছিল অনেকটা প্রকৃতির হাতের দান,—জৈব ব্যাপার। স্থাবর অথবা জঙ্গম, যা-ই হোক,—জীবনেব স্বভাবই হচ্ছে মৃত্যু রোধের চেষ্টা। অতএব ব্যক্তি, জাতি বা সমাজের সকল স্তরেই প্রাণের লক্ষণ যে পর্যন্ত রয়েছে, বিনাশকে নিরুদ্ধ করবার প্রয়াস যে পর্যন্ত চলতেই থাকে চেতনার অতলে, —জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে। কিন্তু, নবীন শক্তি, তথা নবচেতনার প্রেরণা সংযোজিত না হলে, প্রাণের সেই ক্ষয়ে-আসা স্পন্দন মৃত্যু রোধ করবার প্রাণান্ত চেষ্টায় মরণের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়। পূর্ববর্তী স্তরের সাহিত্যসাধনায় মুমূর্ষুর মৃত্যু রোধের সেই প্রাণান্ত চেষ্টা লক্ষ্য করেছি গদ্য-পদ্যের ক্ষয়িষ্ণু ধারায়। এবার এল নবজীবন। আত্মরক্ষার পুরাতন প্রয়াসে কেবল বলাধানই হল না, জীবনে এবং সাহিত্যে নতুন প্রাণের বন্যায় নবীন বাণী,—নূতনতর প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা তরঙ্গায়িত হল। বাঙালি চেতনার এই নবজীবনায়নের কেন্দ্র-শক্তি ছিলেন রামমোহন রায়।

নবজীবন-শিল্পী রামমোহন

মনে রাখতে হবে, নূতন প্রাণের এই ঢেউ নিখিল বাংলার জীবনে ছড়িয়ে পড়তে পারে নি। আগে বলেছি, ইংরেজের সান্নিধ্যে না হলেও, উনিশ শতকের বাঙালি-মনের গুহায়িত বিক্ষোভ বিদ্রোহের অগ্নিতাপ আহরণ করেছিল ইংরেজিব সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানের শিক্ষা থেকে। বাঙালি জীবন তখন ইতিহাসের হাতে দ্বিধা বিভক্ত,—গ্রাম থেকে শহর-বাংলা পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ইংরেজি শিক্ষার প্রাণদীপ্তি দূরে থাক,—আক্ষরিক জ্ঞানও তখন গ্রামদেশে ছড়িয়ে পড়বার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। ফলে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির নবজীবন-চেতনা সহরের সীমাকে ছাড়িয়ে কখনো বৃহত্তর বাংলার জীবন-ভূমিতে ছড়িয়ে পডতে পারে নি। এই কারণে উনিশ শতকের বাঙালি

উনিশশতকীয় জাগরণের সীমায়তি

জীবনের রেনেসাঁস যত গগন-চুম্বী,—তত দূরব্যাপ্ত নয়। বহু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের উত্তুঙ্গ সীমাকে পেরিয়ে, সাধারণ বাঙালির জীবন-ভূমিতে তা' বিস্তারিত হতে পারে নি। হয়ত অনেকটা এই কারণেই, উনিশ শতকের বিপ্লবী মনের আগুন শিল্প-সাহিত্যের সৃজন-ভূমি ছেড়ে সার্বভৌম জীবনের কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে নি। স্বয়ং রামমোহন রায় দেওয়ানী উপলক্ষ্যে গ্রাম ও মফঃস্বল বাংলায় জীবনের দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন। তবু, কেবল পূর্বোক্ত কারণেই বাঙালি-জীবন,—তথা নগর-বাংলায় বৈপ্লবিক চেষ্টার আরম্ভ হয় তাঁর কলকাতাবাসী হবার সময় থেকে।

বাঙালির জীবন ও সাহিত্যের নবজাগরণ-সাধনায় রামমোহনের শ্রেষ্ঠ দান ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা। নিজে তিনি ছিলেন সংস্কার-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান।—কিন্তু, সেকালের ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুর আচার-অন্ধতার প্রতি তাঁর বিরোধিতা ছিল মর্মগত। নিতান্ত বাল্যকালে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা, ও একেশ্বরবাদের শ্রেয়তা ঘোষণা করে তিনি সমাজে ও পরিবারে নিগৃহীত হয়েছিলেন। একথা রামমোহন নিজে জানিয়ে গেছেন। সন্দেহ নেই, রামমোহনের ব্যক্তিত্বের মূলে নিহিত ছিল স্বভাব-স্বাতন্ত্র্যের তীব্রতা। তা হলেও, তাঁর আদর্শ ও বিশ্বাস, তাঁর দুর্লভ জ্ঞান-সাধনার দ্বারাই ক্রমশঃ প্রবুদ্ধ ও সংহত হয়েছিল। এ-কথাও সত্য যে, প্রথমে আরবী-ফার্সী ভাষার বই পড়ে তাঁর মনে একেশ্বরবাদের আদর্শ দানা বেঁধে ওঠে। তবু, ইংরেজি দর্শন-সাহিত্যের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে এসেই রামমোহন-চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য,—তাঁর উগ্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও সুতীব্র স্বাধীনতা-প্রীতির জন্ম হয়েছিল। রামমোহনের মুক্ত-চেতনায় এ-সত্য স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছিল যে,—বাঙালি মনের অশিক্ষা, অন্ধ-সংস্কার ও দুর্নৈতিকতার অনপনেয় বন্ধন থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় ছিল স্বাধীন চিন্তা, স্বতন্ত্র আত্ম-বিশ্বাস এবং অকুণ্ঠ বিচার-বুদ্ধি। তাঁর সদ্য ইংরেজি-শিক্ষিত মন একথাও বুঝেছিল যে,—আত্মপ্রত্যয় ও স্বাধীন ব্যক্তিত্বের বীজ প্রাণতপ্ত হয়েছিল সেদিনকার ফরাসি-বিপ্লব-বুদ্ধ ইংরেজি দর্শন-সাহিত্য-ইতিহাসে। তাই, বাঙালি প্রাণের বন্ধন-মোচনের আকাঙ্ক্ষায় ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য তিনি অধীর হয়ে ওঠেন।

রামমোহন-প্রতিভার দান

রামমোহনের স্বপ্ন ও আদর্শবাদ কল্পনা-বিলাস মাত্র ছিল না। একথা প্রমাণিত হল ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজের ফলশ্রুতি থেকে। উনিশ শতকের সাহিত্য ও সমাজের শ্রেষ্ঠ কর্ণধারগণ,—রাজনারায়ণ-ভূদেব-মধুসূদন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত সকলেই এই মহা-প্রতিষ্ঠানের মানস-সন্ততি। হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের পড়ুয়াদলের বিশ্বাস, উদ্দীপনা ও দৃঢ়তা ছিল অতুল্য-প্রবল। ক্রমে সারা দেশের নাগরিক সমাজে অতীত-বিরোধী এক নূতন ব্যক্তি-স্বতন্ত্র জীবনাদর্শকে তাঁরা ছড়িয়ে দিলেন। ফলে, যাঁরা সেই শিক্ষার আওতার বাইরে রইলেন, তাঁদেরও মধ্যে অনেকে নূতন চিন্তা ও নব-জীবন রচনার আকাঙ্ক্ষায় হলেন উদ্বুদ্ধ। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণে হিন্দু কলেজ কেবল একটি শিক্ষায়তন ছিল না। এর শিক্ষার্থীরা হয়েছিলেন নবীন আদর্শের অধিনায়ক। রামমোহনের আন্দোলন ও চেষ্টায় সতীদাহ নিবারিত হয়েছিল,—স্বয়ং বিদ্যাসাগর নারী-শিক্ষা ও বিধবা বিবাহের প্রবর্তন করেছিলেন অন্ধ-বিশ্বাসের অচলায়তনকে বিদীর্ণ করে। কিন্তু, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, কল্পনাতীত মহাবিপ্লবের পেছনে হিন্দু স্কুলের ছাত্ররাই শ্রেষ্ঠ সামাজিক সমর্থন রচনা করেছিলেন। শিক্ষিত তারুণ্যের এই অকুণ্ঠ সমর্থন না পেলে, রামমোহন-বিদ্যাসাগরের জীবন-ব্রত সফল হত-ই, এমন কথা আজ জোর করে বলবার উপায় নেই।

হিন্দুকলেজ ও বাংলার নবজীবন

হিন্দু-কলেজের শিক্ষা সেকালের ছাত্রদের কেবল আত্ম-সচেতন নয়,—সমাজ সচেতনও করেছিল। সেই সঙ্গে জন্ম নিয়েছিল স্বদেশ-প্রীতি ও স্বাধীনতা-বোধ। এর সবটুকুই ইংরেজি শিক্ষার ফল নয়,—বরং, অনেকাংশেই তা এক বাঙালি শিক্ষকের দান। ইনি ছিলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য রাজনারায়ণ বসু লিখেছিলেন,—"তাঁহার পিতা একজন ইটালিয়ান ও মাতা একজন এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক ছিলেন।…তাঁহার এই দেশে জন্ম। কিন্তু, অন্যান্য ফিরিঙ্গি যেমন বলে 'মোদের বিলাত', তিনি সেইরূপ বলিতেন না। এই দেশকে তিনি স্বদেশ জ্ঞান করিয়া ইহার প্রতি যথেষ্ট মমতা করিতেন। তিনি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ পূর্বক বাঙালিদিগের

নবীন-জীবনধর্মের মহাগুরু ডিরোজিও

সংসর্গে এরূপ বাঙালি হইয়া যান যে, তিনি সাহেবের পুত্র তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন।”

বাঙালি একটি ভাষাভাষী গোষ্ঠিমাত্র নয়,—একটি পূর্ণাঙ্গ জাতি,—এই তথ্যের জীবন্ত প্রমাণ ছিলেন ডিরোজিও। তাঁর ভারতপ্রেমের অমর কাব্য-রূপ ইংরেজি ভাষায় লেখা ‘Faquir of Jangira’। সতের বছর বয়সে ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি হিন্দু স্কুলের চতুর্থ শিক্ষকের কর্মভার গ্রহণ করেন। রক্ষণশীল অভিভাবকদের প্রতিবাদে ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। ডিরোজিওর প্রধান অপরাধ ছিল তাঁর তীব্রতম স্বাতন্ত্র্য-প্রীতি ও অবিচল আত্মপ্রত্যয়। তিনি তাঁর ছাত্রদের উপদেশ দিয়েছিলেন,—নিজের মনে বিচার ও যাচাই না করে কেউ যেন ঈশ্বরকেও বিশ্বাস না করেন। মানুষের বিচার-বুদ্ধির প্রতি শ্রদ্ধা অত বেশি ছিল বলেই, বিচার-হীন অন্ধ বিশ্বাস তাঁর চোখে ছিল দুঃসহ মূঢ়তা। ফলে স্বাধীন চিন্তা ও বিচার-বুদ্ধির নামে সেদিনকার রক্ষণশীল হিন্দুত্বের প্রতি ডিরোজিও-শিষ্যরা উৎপীড়নও করেছিলেন যথেষ্ট। কিন্তু একথাও মানতে হবে যে সে-অবিচার প্রথম উৎসাহের উচ্ছ্বাস-সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। বিদ্যায়তনের ভিতরে এবং বাইরে নিজের বাড়িতেও তাঁরা ছিলেন তাঁর পরমতম আত্মীয়। এই স্কুলের কর্মভার ত্যাগ করলেও, বাড়িতে নব্যবঙ্গদলের সঙ্গে তাঁর প্রাণের যোগ অবারিত হয়ে রইল। এমন কি, এই তরুণ শিক্ষকের অকাল-মৃত্যুর পরেও তাঁর স্বাধীন-স্বতন্ত্র প্রাণধারাই নবীন বাঙালির নব-জাগরণের রসদ যুগিয়েছে।

প্রাণধর্মের মহাসাধক বিদ্যাসাগর

এর পরে এলেন, বাংলার প্রাণধর্মের-মহাধারক, মহত্তম শিক্ষাগুরু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রামমোহন, ডিরোজিও ও বিদ্যাসাগর,—এই ত্রয়ীর জীবন-সাধনায় বাঙালির জীবন্মুক্তির ত্রিবেণীতীর্থ রচিত হল। বাংলা সাহিত্যেও, বিচিত্র ধারায় ঘটল সেই নবজাগরণের রূপ-প্রকাশ :—

১। প্রথমতঃ আত্ম-বিচার ও সমাজ-চেতনার ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা দিল নানা সাময়িক পত্র-পত্রিকা। তাতে একদিকে নানা মতবাদ ও

বিতর্কের অবতারণা এবং সমসামন্নিক সাংবাদিক আলোড়নের ফলে আগ্রহ ও কৌতূহল ক্রমশঃ দীপ্ত হতে লাগল। সেই সঙ্গে বহুমুখী ভাবনার বাহন রূপে গদ্য ভাষারও ঘটতে লাগল বিষয় ও প্রকরণগত বিচিত্র প্রসার।

সাহিত্য-ইতিহাসের রূপ-পরিণাম

২। এই জীবন-কৌতূহল ও আত্ম-চেতনার প্রকাশ প্রসঙ্গেই বাংলা গদ্যের রূপ পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠলো, সেই সঙ্গে দেখা দিল উত্তুঙ্গ ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত সাহিত্যস্বাদী গদ্য।

৩। জাতীয় জীবন গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা ঘনীভূত হবার ফলে দেখা দিল নূতন এক সাহিত্য-রূপ,—নাটক। সেই সঙ্গে কবিতারও নবজন্মের হল বিবোধন।

বাংলা গদ্যে সাময়িকপত্রের প্রভাব

আধুনিক সভ্যতার ওপরে সাময়িক পত্রের প্রভাব দূর-যানী ও বিচিত্র একালের মানুষের মন বিশ্ব-মুখী। সংবাদ-পত্র বিশ্বমানবের দিন যাপনের সংবাদকে ঘরের কোনায় টেনে আনে। তেমনি অন্যান্য সাময়িক পত্রে পাই সমকালীন পৃথিবীর জ্ঞান-সাধনা ও জীবন-বাসনার মর্ম-স্পর্শ। অতএব জাতির জীবন-ইতিহাসে সাময়িক পত্রের প্রভাব অ-বিস্মরণীয়। তাহলেও সাহিত্যের ইতিহাসের পক্ষে সাময়িক পত্রের আলোচনা সর্বথা অ-পরিহার্য নয়। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-যুগের পরে, বাংলা গদ্য-গঠনের অগ্রগতির ক্রম অনুসরণ করবার জন্যে সাময়িক পত্রের আংশিক ইতিহাস অবশ্য-সন্ধেয়।

বাংলা গদ্যে সাময়িক পত্র

কারণ এই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাতেই বিচিত্র আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে বাংলাগদ্যের বহন ও প্রকাশ-ক্ষমতা বহু-বিস্তারিত হতে পেরেছিল। তাছাড়া চলমান জীবনের প্রতি বাঙালির কৌতূহল ও উৎকণ্ঠাকেও সংহত করেছিল সংবাদপত্রের আলোচনা। আর জীবন-চেতনাই তো সকল রকমের সৃজন-কর্মের উৎস। এদিক থেকে আলোচ্যকালের সাময়িক পত্র নবযুগের সাহিত্য-চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল পরোক্ষভাবে।

বাংলাগদ্যের সুগঠনে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের সার্থক চেষ্টার পরিচয় আগে লক্ষ্য করেছি। প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র সম্পাদনের গৌরবও

দিগ্‌দর্শন মাসিক পুস্তিকা

এঁদেরই। দিগ্‌দর্শন নামে এই পত্রিকা ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে জে. সি. মার্শম্যান্-এর সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। সংবাদ সরবরাহ করার চেয়ে স্কুলপাঠ্য-বিষয়ের অবতারণাই এই পত্রিকায়-বেশি করে করা হত। তাই, সম্পাদকেরাও একে পত্রিকা না বলে বলেছেন 'মাসিক পুস্তিকা।' স্কুল পাঠ্য-উপাদানের প্রচুরতার জন্য স্কুল বুক্ সোসাইটি এই পুস্তিকার প্রতি সংখ্যার বহু খণ্ড ক্রয় করে নিতেন।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা উচিত, স্কুল বুক্ সোসাইটি এদেশে দেশীয় শিক্ষার

প্রবর্তন ও বাংলা গদ্যের প্রাথমিক গঠনে বিশেষ সহায়তা করেছিল।

স্কুলবুক্ সোসাইটি

১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে এই সোসাইটির পত্তন হয়,—ষোল জন অ-ভারতীয় আর আটজন ভারতীয় সদস্য নিয়ে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মতই এঁরা বিশেষজ্ঞদের টাকা দিয়ে নানা বিষয়ে পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়ে নিতেন। এঁদের প্রখ্যাত লেখকগোষ্ঠির মধ্যে রামমোহনও ছিলেন একজন।

যাই হোক, একাধারে বাংলা, ইংরেজি এবং বাংলা ইংরেজি-মিশ্র ভাষাতে একই সঙ্গে দিগ্‌দর্শনের তিন প্রকারের সংস্করণ প্রকাশিত হত। বাংলা সংস্করণ ২৬ সংখ্যা, এবং ইংরেজি ও ইংরেজি-বাংলা সংস্করণ ১৬ সংখ্যা করে ছাপা হয়েছিল বলে জানা যায়।

বাংলা ভাষায় এযাবৎ প্রাপ্য প্রথম সংবাদপত্র 'সমাচারদর্পণ'-ও প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীরামপুর মিশন থেকে,—সম্পাদক ছিলেন একই

সমাচার দর্পণ

মার্শম্যান সাহেব। তবে, মার্শম্যান যে উভয় পত্রিকারই কেবল সাধারণ পরিচালকই ছিলেন,—আর যথার্থ লেখক ও সংবাদ-সম্পাদক ছিলেন দেশীয় পণ্ডিত-মুন্সীরা, তার প্রমাণ আছে। পণ্ডিতেরা সকলে ছুটি নিয়েছিলেন বলে, একবার সমাচার দর্পণের প্রকাশ বন্ধ রাখতে হয়েছিল।

দিগ্‌দর্শন প্রকাশের প্রায় একমাস কালের মধ্যেই 'সমাচারদর্পণ' সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হিসেবে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদনা কর্মে প্রথমে প্রধান সহযোগী ছিলেন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ও তারিণীচরণ শিরোমণি। ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই পত্রিকাটি জনপ্রিয়তার সঙ্গে চালু ছিল। এর মধ্যে ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে একে [ইংরেজি ও বাংলা] দ্বিভাষিক করা হয়। কারণ ততদিনে হিন্দু কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইংরেজি পত্রিকার আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠেছিল।

উনিশ শতকের বাংলার জাতীয় ইতিহাসে সমাচার দর্পণের স্থানে অ-তুল্য। ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম ইত্যাদি সমকালীন বাঙালি জীবনের সকল দিকের পূর্ণাঙ্গ তথ্য-চিত্র এই প্রাচীন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ধৃত রয়েছে। এই পত্রিকার তথ্যাবলীকে বিষয়ানুসারে সজ্জিত ও

সু-সম্পাদিত করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক কীর্তি—'সংবাদপত্র সেকালের কথা' প্রকাশিত হয়েছিল।

কিন্তু সমাচার দর্পণেরও আগে, যদিও প্রায় সমসময়েই, আর একটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়। পত্রিকাটির ফাইল পাওয়া যায়নি, হয়ত তা খুব দীর্ঘজীবীও হতে পারে নি। এইটিই বাংলা ভাষার এতাবৎ- জ্ঞাত প্রথম সংবাদপত্র। পরিচালক-গোষ্ঠী ছিলেন বিশুদ্ধ বাঙালি,—হরচন্দ্র রায় এবং গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। পত্রিকাটির নাম বাঙাল-গেজেটি; প্রথম প্রকাশ ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই মে। সমাচার দর্পণের প্রথম প্রকাশকাল ঐ একই খ্রীস্টসালের ২৩শে মে।

বাংলা ভাষার সাংবাদিকতার ইতিহাসে বাঙালির এই প্রথমতম স্বাধীন প্রচেষ্টার ইতিহাসে অবশ্যই শ্লাঘনীয়। এই ধারারই সফল পুষ্টি ও পরিণতি লক্ষ্য করি রামমোহনের বিচিত্রচারী প্রচেষ্টায়। প্রথম জীবনে তিনি একখানি ফার্সি পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। বাংলা পত্রিকার সম্পাদক-রূপে তাঁর প্রথম প্রকাশ ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে.—ব্রাহ্মণ-সেবধি পত্রিকা নিয়ে। এখানে রামমোহন ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন শিবপ্রসাদ রায়। পত্রিকাটি অল্পদিনের মধ্যেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

সাংবাদিক রামমোহন

কিন্তু তারপরে ঐ ১৮২১ খ্রীস্টাব্দেই সম্বাদ কৌমুদী নিয়ে এবারে দৃপ্ত আত্মপ্রকাশ করলেন রামমোহন। সমাচার দর্পণের দক্ষ সম্পাদনা-কর্ম সত্ত্বেও এঁদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-বিরোধী অপপ্রচার। প্রধানতঃ এরই প্রতিবাদ করবার জন্যেই 'সম্বাদ কৌমুদী'র প্রকাশ। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। নববাবু বিলাস, নববিবি-বিলাস, কলিকাতা কমলালয় প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা ও সমাচার চন্দ্রিকার সম্পাদনা করে ইনি পরে বিখ্যাত হন। প্রথম থেকেই রামমোহন এই পত্রিকায় নানা বিষয়ে লিখতেন। কিন্তু, সতীদাহ-নিবারণ বিষয়ক প্রবন্ধ নিয়ে তাঁর সঙ্গে ভবানীচরণের মত-পার্থক্য হয়। ভবানীচরণ ছিলেন রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ, আর রামমোহন, দীপ্ত সমাজ-বিপ্লবী। এই মতভেদ উপলক্ষ্যে ভবানীচরণ সম্বাদ কৌমুদীর সংসর্গ ত্যাগ করেন, এবং রামমোহনের প্রতিবাদে রক্ষণশীল হিন্দুমণ্ড-

সম্বাদ কৌমুদী

প্রচারের জন্য রাধাকান্তদেব প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষণে নূতন সংবাদপত্র সমাচার চন্দ্রিকার প্রবর্তন করেন। যাই হোক, নানা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে সম্বাদ কৌমুদী ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত টিঁকে ছিল। একেবারে শেষ পর্যায়ে রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ কিছু দিন এই পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। রামমোহনের পরিচালনাকালে পত্রিকাটি বহু বৈপ্লবিক প্রেরণার উদ্বোধনে সচেষ্ট হয়েছিল।

১৮২২ খ্রীস্টাব্দে সমাচার চন্দ্রিকার প্রতিষ্ঠা হয়, প্রধানত: সম্বাদ-কৌমুদীর সতীদাহ নিবারণ চেষ্টার বিরোধিতা করবার জন্যে। এই দুই পত্রিকার দ্বন্দ্ব চলেছিল দীর্ঘ দিন। সমাচর-চন্দ্রিকা সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল,—আর আগেই বলেছি ভবানীচরণ ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। ইনি রক্ষণশীল হিন্দুদলের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-সভারও সম্পাদক ছিলেন। এদিক থেকে রামমোহন-বিরোধী আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন তিনি। তা হলেও, ভবনীচরণের প্রতিভা অনস্বীকার্য ছিল:— আর সকল বিষয়েই তাঁর রক্ষণশীলতা কিছু অন্ধ ছিল না। সেকালের ভার-সমতা-হীন নাগরিক জীবনকে ব্যঙ্গ করে তাঁর রচিত নববাবু বিলাস, নববিবি বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থের রসিকতা যেমন ছিল তীক্ষ্ণ-দীপ্ত, তেমনি সমাজ গঠনের চেষ্টাতেও তাঁর প্রভাব ছিল সেকালে প্রায় অতুল্য। ভবানীচরণের সমাজ-সন্দর্শনের এই ক্ষমতা রক্ষণশীল মনোভাব সত্ত্বেও সমাচার চন্দ্রিকাকে বহু জন-শ্রদ্ধেয় করে তুলেছিল। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে ভবানীচরণের মৃত্যুর পরেই এর দীপ্তি অনেকটা হ্রাস পেয়ে গিয়েছিল।

সমাচার চন্দ্রিকা

বাংলা ভাষায় আর একখানি উল্লেখযোগ্য সংবাদ-সাপ্তাহিক ছিল বঙ্গদূত। সার্জন আর মণ্ট্‌গোমারি মার্টিন 'বেঙ্গল হেরাল্‌ড্‌' নামে পত্রিকা প্রকাশ করতেন। এক সঙ্গে ইংরেজি, বাংলা, ফারসি ও নাগরী [হিন্দী] ভাষায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। বাংলা সংস্করণের নাম ছিল 'বঙ্গদূত'। ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গদূত বাংলাভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন নীলরত্ন হালদার। তার পরে আরো একাধিক সুযোগ্য সম্পাদক এই পত্রিকার পরিচালনা করেছিলেন। রামমোহন রায়, দ্বারকনাথ ঠাকুর,—এঁরা ছিলেন বঙ্গদূত-এর প্রধান পরিচালক। সেকালের রাজনীতি ও অর্থনীতিগত ভাবনার ছাপ এই পত্রিকায় সুস্পষ্ট হয়ে আছে।

বঙ্গদূত

বঙ্গদূত-এর পরেই শ্রেষ্ঠ উল্লেখ্য পত্রিকা গুপ্তকবির সংবাদ প্রভাকর। ঈশ্বরগুপ্ত সেকালের সবচেয়ে শক্তিশালী সাংবাদিক ছিলেন। সংবাদ প্রভাকর ছিল তাঁর আত্মপ্রকাশের প্রায় একমাত্র আশ্রয়-ভূমি। সমকালীন রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে জাতীয় মতবাদ গঠনে সংবাদ প্রভাকরের ভূমিকা কেবল একচ্ছত্র ছিল না, সেকালের প্রবীন কাব্য-সাহিত্যেরও ধাত্রীরূপা ছিল এই পত্রিকা।

গুপ্তকবির সংবাদ প্রভাকর

১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী সংবাদ প্রভাকর প্রকাশিত হয়। পাথুরেঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর ছিলেন এর পৃষ্ঠপোষক,—ঈশ্বরগুপ্ত ছিলেন সম্পাদক। প্রথম বারে ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে মে পর্যন্ত পত্রিকাটি 'অতি সম্ভ্রমের সহিত মুদ্রিত' হয়েছিল। এই সময়ে যোগেন্দ্রমোহনের মৃত্যুর প্রায় দেড় বছব পরে সংবাদ প্রভাকরের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। চার বছর পরে ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের ১০ই আগস্ট পত্রিকাটি পুনঃ প্রকাশিত হয়;—এবারে বারত্রয়িক রূপে। অর্থাৎ, প্রতি সপ্তাহে পত্রিকার তিনটি করে সংখ্যা প্রকাশিত হত। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই জুন প্রভাকর সর্বপ্রথম দৈনিক আকারে প্রকাশিত হয়। এ-বিষয়ে গুপ্তকবির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সৃজনশীল সাহিত্য রচনার প্রসার। দৈনিক পত্রিকায় সংবাদ সরবরাহ করে সাহিত্য-রচনার সুযোগ কম থাকে; তাই পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত হল মাসিকপত্র।

সংবাদ প্রভাকরের মাধ্যমে গুপ্তকবি নাগরিক বাঙালির জীবনে উগ্র স্বাদেশিকতা ও স্বাতন্ত্র্য-বোধকে করে একান্ত ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। কবিতা লিখে তিনি নিজস্ব স্বদেশ-প্রেমের আদর্শকে প্রকাশ করেছিলেন—

"কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।"

এই অতি উগ্র আদর্শবাদকেই তিনি সংবাদ প্রভাকরের মাধ্যমে শিক্ষিত বাঙালির মর্মে বিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। যেমন গদ্যরচনাতে, তেমনি নবীন সমাজ-চেতনার সৃজনে সংবাদ প্রভাকর সেদিন বাংলাদেশে নবজীবনের সঞ্চার করেছিল।

জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে। উদারপন্থী

তরুণদের পরিচালনাধীনে এই পত্রিকা বাংলাদেশে প্রগতিশীল সমাজ ও সংস্কার আন্দোলনের অগ্রণী হয়েছিল। রামমোহন-সহচর প্রখ্যাত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ কিছুকাল এই পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। তা ছাড়া নানা সময়ে এই পত্রিকার পরিচালনা ও পৃষ্ঠপোষণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন নব্যবঙ্গ সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত তরুণগণ :—দাক্ষিণানন্দন মুখোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ মল্লিক, মাধবচন্দ্র মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে জ্ঞানান্বেষণের ইংরেজি সংস্করণও প্রকাশিত হয়ে চলে। সেকালের বাংলার উদারনৈতিক মতবাদের প্রচলনে এই পত্রিকার ভূমিকা ছিল দূরযানী।

জ্ঞানান্বেষণ

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় নামে আর একখানি মাসিকপত্র প্রচুর জনপ্রীতি অর্জন করেছিল। ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়,—হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এর সম্পাদক। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে উদয়চন্দ্র আঢ্য সম্পাদক হন। পরে, আঢ্য পরিবারই বংশ পরম্পরায় এর সম্পাদনা করেছেন ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। প্রথমে 'মাসিক' হিসেবে প্রকাশিত হলেও এক বছরের মধ্যেই সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সাপ্তাহিক আকার পায়। পরে ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে দৈনিক আকারে প্রকাশিত হতে থাকে। দেশীয় পাঠকদের "বিদ্যা-বুদ্ধি বৃদ্ধি বিষয়ক হিতোপদেশ" দান ও "রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল শ্রীল শ্রীযুক্ত দেশাধিপতির কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট" করাই ছিল এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য।

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়

গদ্যের সুসংগঠন ও পূর্ণ রূপায়ণ, এবং সেই সঙ্গে শিক্ষিত-মানসের রুচিপ্রসার,—এই দুই প্রসঙ্গের উৎস হিসেবেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সাময়িক পত্র-পত্রিকার সফল অনুপ্রবেশ। আর, এই দুটি আদর্শই পূর্ণ চরিতার্থ হয়েছিল ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশে। মধ্যবর্তীকালে প্রকাশিত আরো বহু পত্র-পত্রিকার উল্লেখ-ও করা হয়নি এ আলোচনায়। তাতে, সাময়িক পত্রিকার ইতিহাস অ-পূর্ণ থাকলেও বাংলা সাহিত্যের পক্ষে তাদের কোনো উল্লেখযোগ্যতা নেই। কারণ, কী গদ্যরূপের সংগঠনে,—কী সৃজনশীল রুচির পরিবর্ধনে, এইসব পত্রিকার কোনো উল্লেখ্য দান অনুপস্থিত। তত্ত্ববোধিনী এই সকল প্রয়াসের অ-পূর্ণতাকে সুসম্পূর্ণ করেছে।

তত্ত্ববোধিনী

১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষণে ও পরিকল্পনায় তত্ত্ব-বোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল,—মূলতঃ ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে। এই উদ্দেশ্য সাধনেরই অন্যতম মাধ্যম হিসেবে কল্পিত হয়েছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশ। বিশেষ করে, মফঃস্বল বাংলার 'ব্রহ্ম-নিষ্ঠ'দের সঙ্গে মানস সংযোগ রচনার জন্য এইরূপ একটি পত্রিকার প্রয়োজন প্রথমে অনুভূত হয়েছিল। কিন্তু মহর্ষির ব্রহ্মোপলব্ধির মধ্যে একটি সহজ শক্তি ছিল,—ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা-চর্চার চেষ্টাকে যা নির্মূল করতে পেরেছিল। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই দেখি,—উনিশ শতকের দীপ্ততম ব্রাহ্মণ্য-মূর্তি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও প্রথমে তত্ত্ববোধিনী সভার পৃষ্ঠপোষক, এবং পরে সম্পাদক পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রই অক্ষয়কুমার দত্তের মত মহত্তম সম্পাদককে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সঙ্গে প্রথমাবধিযুক্ত করে দিয়েছিলেন। এই পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই মুক্তপ্রাণ বাংলা গদ্য-রূপের গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম রচিত হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলা-সুন্দর বিশুদ্ধ বাংলা গদ্যের জনক। তাঁর রচনার মধ্যেই বাংলা গদ্য শিল্প-বিভান্বিত হয়ে উঠেছিল। সেই সঙ্গে গদ্য-দেহে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও দার্শনিক-ঐতিহাসিক বিচারের ওজোগুণ সঞ্চারিত করেছিলেন স্বয়ং সম্পাদক অক্ষয়কুমার। এই দুই মহা-ঋত্বিকের সাধনায় তত্ত্ববোধিনীর পাতায় গতিশীল গদ্যের কেবল নবজন্মই সাধিত হয় নি ;—গদ্য-চিন্তা ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে নবজাগরণশীল জাতীয় চিন্তারও একান্ত বাহন। সেই সঙ্গে স্বয়ং মহর্ষির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রয়াস যুক্ত হয়ে তত্ত্ববোধিনীতে নবীন বাঙালি সংস্কৃতির জন্মসংবাদকে শঙ্খ-বিঘোষিত করে তুলছিল।

পূর্ণাবয়ব গদ্য-রূপ

মুখের কথাকে প্রকাশ করবার জন্যেই গদ্যের প্রথম উদ্ভব। লেখার মাধ্যমে যখন গদ্য-রূপের ব্যবহার হতে থাকে, তখনো তার প্রধান উদ্দেশ্য হয় প্রয়োজন নির্বাহ। কিন্তু, সাহিত্য-রসের পরিবাহক হতে হলে আটপৌরে গদ্যকে প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করতে হয়। স্রষ্টার ব্যক্তিমনের নিভৃত উত্তাপেই যথার্থ-শিল্পের অঙ্কুর উদ্গত হতে পারে। তাই, সাহিত্যিক গদ্যকেও প্রথমে লেখকের ব্যক্তিত্বের স্পর্শে নিষিক্ত হতে হয়। কিন্তু, তারও আগে প্রয়োজন গদ্যের সাবলীল বহমানতা। যে-কোনো সময়ে, যে-কোনো ভাবকে যদি ভাষার মাধ্যমে অনায়াসে প্রকাশ করা সম্ভব না হয়, তা হলে, সে ভাষার নিরুদ্ধ প্রবাহে মুক্তি খুঁজতে গিয়ে শিল্পি-মনের আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।

সাহিত্যিক গদ্য

বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে এই প্রাথমিক বহমানতার সৃষ্টি হয়েছিল বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সাময়িক পত্রের বিচিত্রচারী আলোচনা ও বিতর্কের মধ্যে। তারপরে, বিভিন্ন প্রাণতপ্ত ব্যক্তিত্বের লেখনী-স্পর্শে লিখ্য গদ্যের বুকে নবীন শিল্প-সম্ভাবনার অঙ্কুর দেখা দিতে লাগল ;—ক্রম-বিকশিত হতে লাগল বাংলা গদ্যের সাহিত্যিক রূপ-সম্ভার।

বাংলা গদ্য লিখে সে গদ্যে নিজের ব্যক্তিত্বের দীপ্তি সঞ্চারিত করে দেবার প্রথম কীর্তি রাজা রামমোহন রায়ের। প্রথমেই বলে রাখা উচিত, রীতি-বিশুদ্ধ বাংলা গদ্য রচনায় তাঁর অসাফল্য সংশয়রহিত। কিন্তু, গদ্য ভাষাকে তিনিই প্রথম গৃহ-কর্ম-নির্বাহের সীমা থেকে বৃহত্তর জ্ঞান-চিন্তার জগতে টেনে আনেন। তাঁর প্রথম রচনা বেদান্ত গ্রন্থ-এর (১৮১৫ খ্রীঃ) অনুবাদে মূল সংস্কৃতের দার্শনিক বিচার ও আলোচনাকে তিনি হৃদয়ের সকল উত্তাপ দিয়ে উদ্ধার করেছেন। অতএব, এই ভাষার কেবল রচনাতেই নয়, পঠনেও যে মনের সংযোগ প্রয়োজন, গ্রন্থের 'অনুষ্ঠান' অংশে লেখক সে-কথা স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন,—"প্রথমতঃ

গদ্য-লেখক রামমোহন

বাংলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহ ব্যাপার নির্বাহের যোগ্য কেবল কতকগুলি শব্দ আছে। এ-ভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয়, তাহা অন্য ভাষায় ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়তঃ এ-ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিংবা কাব্য বর্ণনে আইসে না। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারেন না ইহা প্রত্যেক কানুনের তরজমায় অর্থবোধের সময় অনুভব হয়। অতএব বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ কেহ ইহাতে মনোযোগ্যে ন্যূন্যতা করিতে পারেন। এ নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি।"

উদ্ধৃত অংশটুকু রামমোহনের গদ্যরচনা-বৈশিষ্ট্যের প্রাঞ্জল পরিচায়ক। প্রথমতঃ, তাঁর গদ্য-রীতি বাংলা বাগ্‌ভঙ্গির অনুবর্তন করতে পারে নি ;—অনেকাংশে বরং ইংরেজি বাক্য-রীতির অনুসারে গঠিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর পূর্ববর্তী বাংলা গদ্যে ব্যক্তি-মনের চিন্তা বা উপলব্ধির স্পর্শ যে ঘটে নি, একথাও তিনি নিজেই ব্যক্ত করেছেন। সর্বোপরি, পাণ্ডিত্য অথবা সৃজন-বাসনাপূর্ণ গদ্য রচনার ধারা যেমন তিনি প্রবর্তিত করেছিলেন, তেমনি প্রথম গ্রন্থের 'অনুষ্ঠান'-এই পাঠকদের রুচি ও চিন্তাকেও তাঁর অনুগামী করে নিতে চেয়েছেন। এখানেই বাংলা গদ্যে সাহিত্য-সম্ভাবনার বীজ নিহিত হয়েছে। কোনো শিল্পী-ই স্বয়ম্ভূ নন। পাঠক-সমাজ,—তথা পারিপার্শ্বিক জীবনধারার সঙ্গে শিল্পি-মনের আদান-প্রদানের সূত্রেই সার্থক শিল্পের উৎস। রামমোহন তাঁর পাঠকদের গদ্য-রসবোদ্ধা করে তুলে সেই উৎসের মূলই রচনা করতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া, কেবল পাঠকের অনুভবকে নয়, লেখকের আকাঙ্ক্ষাকেও উদ্দীপ্ত-সুগঠিত করে তোলায় রামমোহনের দান ছিল অপরিসীম। তাঁর বেদান্ত সম্বন্ধীয় আলোচনা, এবং বিশেষ করে, সতীদাহ নিবারণ মূলক প্রবন্ধাবলী রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজকে বিরোধিতায় উৎক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। রামমোহনের প্রবন্ধাদির উত্তর দিতে গিয়ে তাঁরা প্রতি-প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হন। রামমোহন তার উত্তর দিলে, তাঁরা দিলেন আবার প্রত্যুত্তর। এইভাবে উত্তর প্রত্যুত্তরের ধারা চলতেই লাগলো। এর ফলে উভয় পক্ষেই গদ্যলেখক ও লেখার পরিধি বিস্তারিত হতে লাগল।

শুধু তাই নয়, নিজ নিজ পক্ষের বক্তব্যকে যুক্তি-সিদ্ধ, অথচ সর্বজন-গ্রাহ্য প্রাঞ্জল করে তোলার আকাঙ্ক্ষায় প্রতিটি লেখকই লেখার মধ্যে নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের প্রকাশকে অবারিত করে তুলতে লাগলেন।

এখানেই গদ্য-লেখক রামমোহনের অতুল্য কীর্তি। বাংলা ভাষাকে রীতিশুদ্ধ রূপ তিনি দিতে পারেন নি,—শিল্প-সুন্দর করতে পারা তো দূরের কথা। বস্তুতঃ সেদিন তাঁর কোনো খেয়ালও ছিল না,—সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য তাঁর কখনোই ছিল না। তবু, সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকায় দাঁড়িয়েই ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত বাংলা গদ্য-রচনার ধারাকে তিনি অবারিত করেছিলেন প্রথম।

সাহিত্যের ইতিহাসে রামমোহনের সকল রচনা সমুল্লেখ্য নয়,—কেবল কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য মোটামুটি জানা যেতে পারে যে, তাঁর বেদান্তগ্রন্থ ও

রামমোহন রচনাপঞ্জী

বেদান্তসার প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে; সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় সংবাদ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮১৮ ও ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে। ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে লেখেছিলেন "সহমরণ বিষয়", গৌড়ীয় ব্যাকরণ লিখিত হয় ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে। শেষোক্ত গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় লিখিত প্রথম ভাষা-সচেতন, বিজ্ঞান-নীতি-নিষ্ঠ বাংলা ব্যাকরণ। এ-ছাড়াও বহু সংখ্যক উপনিষদ-এর অনুবাদ-ব্যাখ্যা ও ধর্ম-বিষয়ে নানা বিতর্কমূলক প্রবন্ধেরও তিনি রচয়িতা ছিলেন। আধুনিক বাংলা,—এমন কি ইংরেজি শিক্ষিত ভারতে ঔপনিষদিক বিদ্যার প্রসার রামমোহনের আর এক অতুল্য কীর্তি। এ ছাড়া কয়েকটি ব্রহ্মসংগীত-ও তিনি লিখেছিলেন।

১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দ বা নিকটবর্তী কোনো সময়ে হুগলী জেলার রাধানগরে রামমোহনের জন্ম হয়েছিল। পিতা ছিলেন রামকান্ত রায়,—মা তারিণী দেবী। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে তাঁর দেহান্ত হয়।

বাংলা গদ্যের লেখক হিসেবে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-৮৫ খ্রীঃ) সমুচিত মর্যাদা পান নি। হয়ত খ্রীস্টান হয়েছিলেন

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন

বলেই সেকালে তাঁর দান উদারতার সঙ্গে স্বীকৃত হয়নি। শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন,—ডিরোজিওর শিষ্যদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন ছিলেন "সর্বাগ্রগণ্য"। প্রথমে তিনি হেয়ার

স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, পরে শিবপুর বিশপ কলেজের অধ্যাপক, এবং আরো পরে কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হয়েছিলেন। বাংলা গদ্যে প্রকাশিত তাঁর প্রথম পুস্তক উপদেশ কথা (১৮৴০ খ্রীঃ) খ্রীস্টধর্মের পুরোহিত হিসাবে প্রদত্ত ভাষণের সমষ্টি। কিন্তু বাংলা গদ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা পাঠ্যপুস্তক-রচয়িতা হিসেবে। বিদ্যাকল্পদ্রুম নামে তের খণ্ডে বিভক্ত একখানি বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থের বাংলা, এবং ইংরেজি-বাংলা-মিশ্র দুরকম সংস্করণই প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে এই গ্রন্থ-ভাষার অতি-কাঠিন্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু, কৃষ্ণমোহনের ভাষা সর্বত্রই দুষ্পাঠ্য ছিল না,— "একপ্রকার হংসরাজের বিষয়ে কথিত আছে যে, সে ম্রিয়মান্ অবস্থায় ব্যতীত জীবদ্দশায় কদাপি গান করে না। কিন্তু আসন্নকাল উপস্থিত হইলে মধুর স্বরে গান করে।"

ষড্‌দর্শন সংবাদ (১৮৭৬ খ্রীঃ) নামে কৃষ্ণমোহন আর একখানি পাঠ্য পুস্তক লিখেছিলেন। তাতে কথোপকথনের মাধ্যমে দর্শনের তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। Inquirer-নামে ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদনা করে তিনি সুখ্যাত হয়েছিলেন। তা ছাড়া 'সংবাদ সুধাংশু' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিকেরও সম্পাদনা করেছিলেন অল্পকাল।

বাংলার লিখিত গদ্য ভাষায় লেখকের ব্যক্তিক প্রদীপ্তি সাবলীল ভঙ্গিমায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পৃষ্ঠায় (প্রথম প্রকাশ ১৮৪৩), সে কথা পূর্বেও বলেছি। বাংলা গদ্যের এতাবৎ আলোচিত বিকাশ ধারায় তিনটি প্রধান গ্রন্থি লক্ষিত হয়েছে। প্রথমে ছিল মুখের ভাষাকে সু-অন্বিত পরিমার্জিত লিখ্যরূপদানের সমস্যা। উইলিয়ম কেরির সম্পাদনা এবং মৃত্যুঞ্জয়ের রচনাবলীর মাধ্যমে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কালেই বাংলা গদ্যের সেই গ্রন্থি মোচন ঘটেছিল। দ্বিতীয় সমস্যা ছিল যথোচিত শব্দ সমাহরণ—ক্ষমতার। ভাষার প্রকাশ-শক্তির বিস্তার এবং প্রাঞ্জলতা বিধানেই তার বলিষ্ঠতার ভিত্তি। সংবাদ ও সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় সেই সর্বমুখী প্রয়োগ-প্রবণতার সফল বিকাশ। রসরচনা, দর্শন, রাষ্ট্র, ধর্ম, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ক গুরুগম্ভীর আলোচনা ও তথ্য-প্রকাশ থেকে শুরু করে নানা রকমের ইস্তাহার-বিজ্ঞাপন

বাংলা গদ্য style-এর সুপরিনীতির পূর্বসূত্র

রচনার লঘু ভাষা-প্রয়োগেও সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় সাবলীল প্রাঞ্জলতা প্রায় সর্বজন-আয়ত্ত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল।

এবারে এলো সাহিত্যিক রস-ব্যঞ্জনাময় ভাষাসৃষ্টির প্রেরণা। মানুষের ভাবনায় এমন কথাও আছে, কেবল অন্বয়-পরিবদ্ধ বাক্য কিংবা, আভিধানিক স্পষ্টার্থযুক্ত শব্দের প্রযোজনেই যার তাৎপর্য পূর্ণ অধিগম্য হয় না। বক্তব্যের গূঢ়ার্থ যেখানে বক্তার অভিপ্রায়ের মধ্যে নিহিত থাকে, সেখানে সার্থক প্রকাশ কেবল তখনই সম্ভব, যখন বক্তার অভীষ্ট ঝোঁকটি বাগ্‌ভঙ্গির মধ্যে সমুচিত বিন্যস্ত হতে পারে। এখানেই বস্তুতঃ ভাষার দেহে বক্তার ব্যক্তিত্বের অন্বয় স্বাতন্ত্র্য-দীপ্ত style-এর জন্মদান করে।

রামমোহন বাংলা গদ্যের প্রথম ব্যক্তিত্ব-ভাস্বর লেখক। কিন্তু তাঁর কালে গদ্যের শারীরিক গঠনই সুবিন্যস্ত হতে পারে নি। ভাষার আভ্যন্তরীণ সামর্থ্যও তাই শিল্প-সুষমাযুক্ত লাবণ্য আয়ত্ত করে উঠ্‌তে পারে নি। 'তত্ত্ব-বোধিনী' পত্রিকা প্রকাশেরও পূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় বাংলা গদ্যের গঠন-প্রকৃতি যে কত স্বাভাবিক ও সর্বজন-সাধ্য হয়ে পড়েছিল তার এক নতুন গ্রন্থ-গত নিদর্শন পাওয়া গেছে। গ্রন্থটির আবিষ্কর্তা গৌহাটী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ;—লেখক শ্রীহট্ট জেলার কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণি। গ্রন্থের নাম 'পুরাণবোধোদ্দীপনী—চতুর্থ খণ্ড',—রচনা সমাপ্তির কাল

পুরাণবোধোদ্দীপনী ও লিখ্য বাংলা গদ্যের সাধারণ রূপ

১৮২৭ খ্রীস্টাব্দের শেষ ভাগ। এখানে স্মরণ করতে হয়, কৃষ্ণচন্দ্রের গ্রন্থরচনা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যুগান্তকারী সৃষ্টি 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশের (১৮৪৭) প্রায় কুড়ি বছর আগেকার। লেখক কিছু প্রতিভাধর ছিলেন না। তবুও অনায়াসে তিনি লিখ্‌তে পেরেছিলেন,—"শচীকে বৃহস্পতি অভয় প্রদান করিয়া আপনার অন্তঃপুরে রাখিলেন। পরে ক্ষণমাত্র ব্যাজে নহুষ রাজার দূত বৃহস্পতির গৃহে আগমন করিয়া বলিলেন যে, শচীকে নহুষ রাজা আহ্বান করিয়াছেন।"—এই ভাষা 'তত্ত্বোবোধিনী'-পূর্ব লিখ্য বাংলা গদ্যের সাধারণ নিদর্শন হিসেবে পরিগৃহীত হতে পারে।

এই সাবলীল ভাষা-রূপের গভীরে শিল্পের লাবণ্য বিচ্ছুরিত করেছিল দেবেন্দ্রনাথ-অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বদীপ্ত style ;—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই তার প্রথম স্মরণীয় প্রকাশ।

বাংলা গদ্য style গঠনে ত্রয়ী

তত্ত্ববোধিনীর প্রতিষ্ঠাতা পরিকল্পক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সে কথা আগেই বলেছি। এই পত্রিকা-গোষ্ঠীর বরণীয় লেখক হিসেবেও তিনিই প্রথম স্মরণীয়। প্রিন্স দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন তিনি,—জন্ম হয় ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের ৭ই মে। কেবল রবীন্দ্রনাথ নন, মহর্ষির অন্যান্য পুত্রেরাও অনেকেই যুগ-দুর্লভ শিল্প ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন; আর সেই লোকোত্তর শক্তির উৎস ছিল তাঁদের পিতৃ-প্রতিভার মধ্যে। দার্শনিকের অতলস্পর্শ অনুভবের সূত্রে কবির আবেগকেও গ্রথিত করেছিল মহর্ষির গদ্য। ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান-এ তাঁর ব্রহ্মোপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে ভক্তিসুন্দর সাবলীল ভাষায়:—"ভূলোকে, দ্যুলোকে, আকাশে, অন্তরীক্ষে, উষাকালে, শ্রদ্ধাবান্ একনিষ্ঠ বীরেরা সেই স্বপ্রকাশ, আনন্দ-স্বরূপ, অমৃত-স্বরূপ পরমেশ্বরকে সর্বত্র দৃষ্টি করেন।...উষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তরাকাশে তাঁহার আলোক প্রকাশ পায়।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

প্রধানভাবে ব্রাহ্মসমাজ, অথবা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্যেই তাঁর প্রায় সকল রচনাই লিখিত হয়েছিল। তবু, ঐসব রচনার সাহিত্য-মূল্যও কম নয়। রাজনারায়ণ বসু বলেছিলেন, বাংলা গদ্যে বক্তৃতার ভাষা এক সফল সাহিত্যিক পরিণতি লাভ করেছিল দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা-মালায়। বস্তুতঃ এই কথ্য বাক্‌রীতি বাংলা সাধু গদ্যের দেহেও এক অপূর্ব সাবলীলতা দান করেছিল। মহর্ষির রচনা-পঞ্জীর মধ্যে রয়েছে ব্রাহ্মধর্ম (১৮৫১-৫২), ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা (১৮৬২), ব্রাহ্ম-ধর্মের ব্যাখ্যান (১৮৬৯-৭২) ইত্যাদি। রচনাগুলি উল্লিখিত সময়ে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়,—পরে এগুলি গ্রন্থাকারেও পুনঃ প্রকাশিত হয়।

সাহিত্যিক সৃষ্টি হিসাবে মহর্ষির শ্রেষ্ঠ রচনা তাঁর "স্বরচিত জীবনচরিত" (১৮৯৮)। "১৮ বৎসর হইতে ৪১ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত" নিজ জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে তিনি পাণ্ডুলিপি দিয়ে গিয়েছিলেন। নির্দেশ ছিল, লেখকের জীবৎকালে গ্রন্থটি যেন প্রকাশিত না হয়। এই গ্রন্থের ভাষা ও বর্ণনায় আত্ম-দর্শনের গভীরতা, নিসর্গ-প্রীতির ঐকান্তিকতা এবং ঈশ্বর-ভক্তির অবিচলতা সমগ্র রচনাকে আশ্চর্য শিল্প-সুষমায় মণ্ডিত করেছে। মহর্ষির পত্রাবলীতেও ক্ষণে ক্ষণে কবি-পিতার প্রতিভাকে অনায়াসে প্রত্যক্ষ করা চলে।

বাংলা গদ্যে উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রাণোজ্জ্বল একটি রূপ প্রতিফলিত হয়েছে বিদ্যাসাগরের রচনায়। প্রায় একই সময়ে তার আরো একটি রূপ প্রত্যক্ষ করি অক্ষয়কুমারের গদ্য-প্রবাহে। অ-পরিণত-যৌবন রবীন্দ্রনাথ একদা লিখেছিলেন,—"যেদেশে সেক্‌স্‌পীয়র জন্মিয়াছে, সেই দেশেই নিউটন জন্মিয়াছে; যেদেশে অত্যন্ত বিজ্ঞান-দর্শনেব চর্চা, সেই দেশেই অত্যন্ত কাব্যের প্রাদুর্ভাব; ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে, কল্পনার কাজ কেবলমাত্র সৃজন করা নয়। যেদেশে কাল্পনিক লোক বিস্তর আছে, সেদেশের লোকেরা কবি হয়, দার্শনিক হয়, বৈজ্ঞানিক হয়। সকলি হয়।" কবি নিজে বিজ্ঞানের-আলোচনা করে, এবং বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের আযৌবন হৃদ্-সঙ্গচারণ করে এই সত্য প্রমাণ করে গেছেন। বাংলা-সাহিত্যের রবীন্দ্রযুগ আত্যন্তিক বিজ্ঞান-দর্শন-সাধনারও যুগ,—আচার্য জগদীশচন্দ্র-প্রফুল্লচন্দ্র এবং ব্রজেন্দ্রনাথ শীল-কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের যুগ। বস্তুতঃ সাহিত্যের সম্পূর্ণতা কেবল সৃজনমূলক রচনার প্রাচুর্যে নয়। দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাসাদির জ্ঞান-মার্গী সাধনা সাহিত্য ও ভাষাকে বলিষ্ঠতা দান করে থাকে; জাতির হৃদ্‌বৃত্তি ও চিদ্‌বৃত্তিকে বিকশিত করে সমগ্র জাতীয় জীবনকে করে তোলে সম্পূর্ণ,—ভার-সম। এই পূর্ণতার মধ্যেই সাহিত্য-কর্মেরও যথার্থ সফলতা। ঈশ্বরচন্দ্র-অক্ষয়কুমারের যুগ কেবল বাংলা গদ্য ভাষার নয়,—রেনেসাঁস যুগের বাঙালি জাতীয়তারও নব-প্রবোধনের যুগ। শিল্পের পথে,—জীবন-সাধনার ভাব-ঋদ্ধ ধ্যানের পথে জাতির মনকে সেদিন চালনা করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক অক্ষয়কুমার এলেন ভাবুক জাতির জীবনে সর্বপ্রথম বস্তু-গত ও নির্বস্তুক জ্ঞানের দীপ্ত আলো নিয়ে। বিদ্যাসাগরের ভাব ও ভাষায় ঋজুতার সঙ্গে রয়েছে হৃদয়াবেগের জঙ্গমতা। অক্ষয়কুমারের বিচার-পরীক্ষণপূর্ণ রচনার ভাষা যেমন ধীর, তেমনি বস্তু-সীমা সংযত। একজন দিয়েছেন ভাবের আবেগ,—প্রাণের উৎসাহ; আর একজন বর্ধিত করেছেন প্রাণের শক্তি।

বাংলা গদ্যে অক্ষয়কুমার

১৮২০ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই জুলাই অক্ষয়কুমারের জন্ম হয়েছিল জননী দয়াময়ীর স্নেহ-ক্রোড়ে। তাঁর পিতা ছিলেন পীতাম্বর দত্ত। অঙ্ক-শাস্ত্র, পদার্থ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখাতেই

তাঁর জ্ঞান ও উৎসাহ ছিল আবাল্য-প্রখর। উনিশ বছর বয়সে পিতৃ-বিয়োগের ফলে তাঁকে শিক্ষায়তন ত্যাগ করে কর্ম-সন্ধান করতে হয়। একান্ত শুভানুধ্যায়ী কোনো এক আত্মীয় তখন তাঁকে আইন পড়তে উপদেশ দিয়েছিলেন। অক্ষয়কুমার জবাব দিয়েছিলেন,—"যে বিষয় পরিবর্তনীয়, তাহা শিক্ষা করিলে লাভ কি?"—এর থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি—বিশ্বনিয়ামক চিরন্তন জ্ঞানের প্রতি অক্ষয়-প্রতিভার সহজাত পিপাসার পরিচয় স্বয়ং-স্ফুট হয়ে থাকে। এই সহজ প্রতিভাই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে একদা সর্বজ্ঞানের আকর করে তুলেছিল। বস্তুতঃ তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক হিসেবেই গদ্য-লেখক ও জ্ঞানি-মনীষী অক্ষয়কুমারের যুগপৎ আত্মপ্রকাশ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একথা স্বীকার করে বলেছিলেন,—"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক সময়ে ৭০০ জন গ্রাহক ছিল; তাহা কেবল এক অক্ষয়বাবুর দ্বারা। অক্ষয়কুমার দত্ত যদি সে সময়ে পত্রিকা সম্পাদন না করিতেন, তাহা হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এরূপ উন্নতি কখনোই হইতে পারিত না।"

অক্ষয়কুমারের জীবনকথা

তা হলেও, সাহিত্যক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারের প্রথম আবির্ভাব হয় একখানি কাব্যগ্রন্থ নিয়ে;—অনঙ্গমোহন কাব্যের প্রকাশকাল ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দ। ঈশ্বর-গুপ্তের নির্দেশে সংবাদপ্রভাকরের জন্য তিনি প্রথম গদ্য রচনা করেছিলেন। তারপরে তত্ত্ববোধিনীর পৃষ্ঠায় এই গদ্যের পূর্ণ বিকাশ। পুস্তিকার আকারে অক্ষয়কুমারের প্রথম যে দুখানি গদ্য রচনা প্রকাশিত হয়, তার একখানি ভূগোল (১৮৪১), আর একখানি "শ্রীযুক্ত ডেভিড্ হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা।" তাঁর ইতিহাস-বিখ্যাত প্রথম গদ্যগ্রন্থ 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' দুইখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে ১৮৫১ ও ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে। য়ুরোপীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের সূত্র এই গ্রন্থে সহজ গদ্যে গ্রথিত হয়েছিল। অক্ষয়কুমারের আর একখানি উল্লেখ্য গ্রন্থ "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" ইংরেজ গবেষক H. H. Wilson-এর The Religious Sects of the Hindus-এর অবলম্বনে কল্পিত। ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা ও ধর্মচেতনার একটি ঐতিহাসিক ও ধর্মতত্ত্বগত প্রামাণ্য পরিচয় রয়েছে এই গ্রন্থে। অক্ষয়কুমারের স্বতন্ত্র গদ্য-রূপের স্বভাবও এতে সুপ্রকট,—"ল্যাটিন ও গ্রীক্-

রচনাপঞ্জী

কেল্‌টিক ও টিউটোনিক্‌, লেটিক ও স্লাবোনিক্‌, হিন্দু ও পারসিক ইত্যাদি বিভিন্ন বংশীয় বিভিন্ন জাতি একটি মূল জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই পরম মনোহর মহত্তম তত্ত্বটি য়ুরোপীয়দিগের শব্দবিদ্যানুশীলনের, বিশেষতঃ সংস্কৃত চর্চার সুধাময় ফল।"

অক্ষয়কুমারের অধিকাংশ রচনাই একদা পাঠ্যপুস্তকের মর্যাদা পেয়েছিল। এইসব পুস্তকেব মধ্যে রয়েছে চারুপাঠ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ, ধর্মোন্নতি সংসাধক প্রস্তাব, ধর্মনীতি, ও পদার্থবিদ্যা।

বাংলা গদ্যরীতির (style) গঠনে যে শিল্পি-ব্যক্তিত্বের দোলা ঐতিহাসিক পথিকৃৎ-এর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁকে বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী বলে অভিহিত করেছেন।

যথার্থ শিল্পী বিদ্যাসাগব

১৮২০ খ্রীস্টাব্দে ২৬শে সেপ্টেম্বর যুগপুরুষ বিদ্যাসাগরের জন্ম হয়েছিল মেদিনীপুর বীরসিংহের এক অত্যন্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ বংশে। তাঁর পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা ভগবতীর নাম পুত্রের মতই নিখিল বাঙালির কাছে চিরস্মরণীয়। কঠোর দারিদ্র্য ও দুরবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত-কলেজে সর্ববিদ্যা মন্থন করেছিলেন,—তাই তাঁর উপাধি হয়েছিল 'বিদ্যাসাগর'। কিন্তু, নিত্যকালের বাঙালি মানসের কাছে তিনি চিরবন্দিত হয়ে আছেন 'দয়ার সাগর' রূপে। কেবল বাংলা গদ্যেরই নয়, শিক্ষা ও নবীন সমাজ-সংস্কারেরও তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ হোতা।

বেতাল পঞ্চবিংশতি

বিদ্যাসাগরের প্রথম গ্রন্থ বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে। হিন্দী 'বেতাল-পচ্চিশী'র অনুসারে এই সরস গল্প গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল, বিশেষ ভাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য পুস্তক হিসেবে। কলেজ-কর্তৃপক্ষই গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন। এর আগে বাসুদেবচরিত নামে আর একখানি গ্রন্থ বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন;—শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে। সম্ভবতঃ হিন্দু-পুরাণের কাহিনী বলে ফোর্ট উইলিয়ম-কর্তৃপক্ষ এতে পৌত্তলিকতার সন্ধান পেয়েছিলেন। তাই গ্রন্থটি তাঁরা ছাপেন নি।

যাই হোক্, বেতাল পঞ্চবিংশতিতেই ভাষা-শিল্পী বিদ্যাসাগরের "অ-পূর্ব বস্তু নির্মাণক্ষমতা" শক্তির প্রাঞ্জল প্রকাশ ঘটেছিল। এই গ্রন্থেই বাংলা গদ্য প্রথম রীতিশুদ্ধ রূপ পেল,—প্রতিটি কাব্য হল আদি-অন্তে অন্বিত, সুগঠিত,—পূর্ণাঙ্গ। বিদ্যাসাগরই সর্ব প্রথম বাংলা গদ্যের প্রতিটি বাক্যকে ছেদ চিহ্ন দ্বারা পরস্পর থেকে পৃথক্ করে দেখালেন। কেবল তাই নয়, শব্দের পারস্পরিক অন্বয়ের ফলে গদ্যেও ছন্দের ঝঙ্কার জেগে ওঠে,—সে কথাও প্রথম প্রতিপন্ন করলেন তিনিই। তা ছাড়া, তাঁর রচিত গদ্য কেবল বাচ্যার্থকেই প্রকাশ করল না,—শিল্পীর ঋজু-স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের স্পর্শে শব্দাবলী হয়ে উঠলো ব্যঞ্জনাধর্মী। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐতিহাসিকের সত্যদৃষ্টি নিয়ে বলেছেন, বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগরের এই অ-ভূতপূর্ব সৃজন-দক্ষতার "ফলেই শতাব্দীপাদের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র এবং অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সম্ভব" হয়েছিল। বেতাল পঞ্চবিংশতির একটি ছত্র উদ্ধার করলেই এই সকল মন্তব্যের সত্যতা প্রতিপাদিত হতে পারবে:—

গদ্যে শিল্পরূপের বিকাশ

"একদা, রাজা বিক্রমাদিত্য মনে মনে এই আলোচনা করিতে লাগিলেন, জগদীশ্বর আমায়, নানা জনপদের অধীশ্বর করিয়া, অসংখ্য প্রজাগণের হিতাহিত চিন্তার ভার দিয়াছেন।"

সুদীর্ঘ এই বাক্যের অন্বয় কোথাও বিন্দুমাত্র আড়ষ্ট নয়;—যথাযোগ্য বিরতির সঙ্গে পড়লে ছন্দের স্পন্দনও অবারিত হতে পারে।

বেতাল পঞ্চবিংশতির বাক্য-সজ্জায় বিদ্যাসাগর প্রথম ছেদ চিহ্নের নিয়মিত প্রয়োগ করেছিলেন। 'কমা' চিহ্নের প্রথম পদ্ধতি-বদ্ধ ব্যবহার হল দ্বিতীয় গ্রন্থ শকুন্তলাতে (১৮৫৪ খ্রীঃ)। বেতাল পঞ্চবিংশতির পরবর্তী সংস্করণগুলি একই রীতিতে 'কমা'-চিহ্নিত হয়। রামমোহনের প্রথম রচনার 'অনুষ্ঠান' অংশে দেখেছি, বাংলা বাক্য যেমন সেকালে সুগঠিত, সুচিহ্নিত ছিল না, তেম্‌নি গদ্যপাঠের রীতিতেও সেকালের পাঠকেরা ছিলেন অনভ্যস্ত। প্রতিটি বাক্যকে ছেদ-চিহ্নের দ্বারা পৃথক্ করে নিলে তার অর্থগ্রহণে সুবিধা হয়,—বেতাল পঞ্চবিংশতির রচনাকালেই বিদ্যাসাগর একথা অনুভব করেছিলেন। এ ছাড়া, উচ্চারণ করবার সময় একটি বাক্যের সমাপ্তি-স্থলের আগেও আমাদের থামতে হয়।

শকুন্তলা

এই বিবৃতি সু-কল্পিত হলে অর্থগ্রহণ সহজ হয়, তেম্‌নি শব্দের ঝঙ্কারও হয় সুলয়-বলয়িত। শকুন্তলা গদ্য-কাব্যে অনভিজ্ঞ পাঠকের সাম্‌নে এই সুখপাঠ্য, সুতান গদ্যরূপকে তুলে ধরেছিলেন বিদ্যাসাগর :—

"কিয়ৎক্ষণ পরে, শান্তিপূর্ণ জলকমণ্ডলু হস্তে লইয়া, গৌতমী লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন, এবং শকুন্তলার শরীরে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন, বাছা! শুনিলাম আজ তোমার বড অসুখ হয়েছিল ; এখন কেমন আছ, কিছু উপশম হয়েছে ?"

সরল, অথচ গম্ভীর ঝঙ্কারময় এ ভাষা কেবল রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্যের গদ্যের সঙ্গেই তুলনীয়।

শকুন্তলা কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নামক বিখ্যাত সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ। কিন্তু, বিষয় ও ভাবের ব্যত্যয় না ঘটিয়েও বিদ্যাসাগর তাঁর বাংলা রচনায় বাঙালি জীবনের পরিবেশটি সুন্দর ফুটিযে তুলেছিলেন। শেক্‌সপীয়রের Comedy of Errors-এর অনুবাদ করেছিলেন বিদ্যাসাগর 'ভ্রান্তিবিলাস' (১৮৬৯ খ্রীঃ) নামে। তাতে যেমন বই-এর নাম, তেম্‌নি পাত্রপাত্রীদের নামও পাল্‌টে দিয়েছিলেন তিনি,—বিদেশী নামের জায়গা জুড়েছিলেন দেশী নাম। বই-এর 'বিজ্ঞাপন'-এ এ-বিষয়ে তিনি জানিয়েছেন যে,—বিদেশী নাম দেশী পরিবেশে বেমানান হয়ে পড়ে। কেবল নামের বেলাতেই নয়, আগাগোড়া রস-রচনার ক্ষেত্রেও এই দেশীয় আবহাওয়া তিনি সর্বত্র রক্ষা করে গেছেন। ফলে, অনুবাদ-কাহিনী মৌলিক রচনার রসে ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে। প্রধানতঃ অনুবাদক হলেও, এখানেই বিদ্যাসাগরের শিল্প-স্বভাবের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য। তাঁর তৃতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ 'সীতার বনবাস'-এ (১৮৬০ খ্রীঃ) এই সত্য আরো স্পষ্ট-প্রাঞ্জল হতে পেরেছে। এই গ্রন্থের প্রথম তিন অধ্যায় ভবভূতির উত্তররামচরিত থেকে নেওয়া। গ্রন্থের বাকি অংশ বিদ্যাসাগর চয়ন করেছেন তাঁর শিল্পিমনের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা অনুসারে,—বিভিন্ন সংস্কৃত রচনার বিচিত্র অংশ থেকে।

অপরাপর রচনা

বিদ্যাসাগরের একমাত্র মৌলিক শিল্প-রচনা হচ্ছে গদ্য-কাব্য প্রভাবতী সম্ভাষণ ; বাংলা ভাষার প্রথম শোক-কাব্য-ও (Elegy) বোধ হয় এটি। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিন বছরের এক পৌত্রীর মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে এই অপূর্ব রচনার জন্ম

প্রভাবতী সম্ভাষণ

হয়েছিল। মেয়েটির নাম ছিল প্রভাবতী;—বিদ্যাসাগর তাকে প্রাণাধিক ভালবাসতেন।

তাছাড়া, বিধবা-বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব-এও (১৮৫৫) বিদ্যাসাগরের আবেগকম্পিত বেদনা শিল্প-সুন্দর রূপ পেয়েছে:—"হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশে পুরুষ জাতির দয়া নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক ধর্ম রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সেদেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্ম গ্রহণ না করে।"

বিদ্যাসাগর রচনাপঞ্জী

বিদ্যাসাগরের অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে:—মার্শম্যান এর বাংলার ইতিহাসের শেষ নয় অধ্যায়ের অনুবাদ (১৮৪৮), চেম্বার্স বায়োগ্রাফির অনুবাদ "জীবন চরিত" (১৮৪৯), চরিতাবলী (১৮৫৬), মহাভারত-এর (উপক্রমণিকা ভাগ) অনুবাদ (১৮৬০), আখ্যান মঞ্জরী (১৮৬৩ খ্রীঃ) ইত্যাদি।

তাছাডা, 'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল', ইত্যাদি সরস ব্যঙ্গরচনাও তিনি করেছিলেন বেনামীতে; উপলক্ষ্য ছিল বিধবা-বিবাহ বিষয়ক বিতর্ক।

বিদ্যাসাগরের আর একখানি উল্লেখ্য গ্রন্থ তাঁর "স্বরচিত জীবন চরিত"। নিজের জীবৎকালে এই মূল্যবান রচনাটি তিনি প্রকাশ করেন নি। পিতার তিরোভাবের পর বিদ্যাসাগর-পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

তত্ত্ববোধিনী যুগের সমকালেই পত্রিকা সম্পাদনা করে বিখ্যাত হয়েছিলেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তাঁর অধিকাংশ গদ্য রচনাই বিবিধার্থ সংগ্রহ ও রহস্য সন্দর্ভ পত্রিকার পাতায় বদ্ধ রয়েছে। দুটি পত্রিকাই ছিল স-চিত্র। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৈশোর-জীবনে বিবিধার্থ সংগ্রহ-এর প্রভাবের কথা উচ্ছ্বসিত ভাষায় স্বীকার করেছেন জীবনস্মৃতি-তে। রাজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন,—"রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন। তিনি একাই একটি সভা। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনেক বড় বড় সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের স্মৃতি আমার মনে যেমন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে, এমন আর কাহারও নহে।"

অথচ, যথার্থ সৃজনী-সাহিত্য যাকে বলে, রাজেন্দ্রলাল তা মোটেও রচনা

করেন নি। পত্রিকা দুটিতে তিনি বিশ্ব-বিদ্যার সমাহার করেছিলেন। তার বহুলাংশই সম্পাদকের রচিত হলেও, লেখকের নাম অনেক জায়গাতেই অনুপস্থিত। রাজেন্দ্রলালের নিজ নামে প্রকাশিত কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে আছে প্রাকৃত ভূগোল (১৮৫৪), শিল্পিক দর্শন (১৮৬০), শিবাজীর চরিত্র (১৮৬০), মেবারের রাজেতিবৃত্ত (১৮৬১), ও পত্রকৌমুদী (১৮৬৩)।

১৮২২ খ্রীস্টাব্দে রাজেন্দ্রলালের জন্ম হয়েছিল, তাঁর পিতার নাম ছিল জন্মেজয় মিত্র।

বাংলা গদ্যে অক্ষয়কুমারের রচনাধারার অনুসৃতি সেকালে খুব একটা লক্ষিত হয় না। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-স্বাদী গদ্য রচনার রীতি বহুল অনুশীলিত হয়েছিল। শেষোক্ত অনুশীলন-কারীদের মধ্যে তারাশঙ্কর তর্করত্ন ছিলেন একজন প্রধান। সংস্কৃত গদ্যকাব্য কাদম্বরীর অনুবাদ তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। স্থানে স্থানে বিদ্যাসাগরের শকুন্তলার ভাষার সঙ্গে এই রচনার অপরূপ সাদৃশ্য ছিল। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা রচনার মাত্র এক বছর পরে এই গ্রন্থ রচিত হয়। লেখক বলেছেন, তাঁর রচনা "মূল সংস্কৃতের অবিকল অনুবাদ নহে। গল্পটি মাত্র অবিকল পরিগৃহীত হইয়াছে।"

তারাশঙ্কর তর্করত্ন

কাদম্বরীর আগে তারাশঙ্কর লিখেছিলেন 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা' (১৮৫০), আর তার পরে লেখেন জন্‌সনের রাসেলাস্ গ্রন্থের অনুবাদ (১৮৫৭)।

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-সাধনা ও সমাজ-বিপ্লবের একান্ত অনুবর্তী ছিলেন। তাঁরই শিশু পৌত্রীর মৃত্যু উপলক্ষে 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' লিখিত হয়। রাজকৃষ্ণের রচনায় আগাগোড়া বিদ্যাসাগরের গদ্যভঙ্গির প্রভাব রয়েছে। ফরাসী কবি ফেনেলেনের ইংরেজি-কাব্যানুবাদ অবলম্বন করে ইনি টেলিমেকস্ লিখেছিলেন ১৮৫৮ থেকে ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন,—বিদ্যাসাগর মশায় এই গ্রন্থের আগাগোড়া ভাষা সংশোধন করে দিয়েছিলেন। রাজবালা নামে একখানি রোমান্টিক্ আখ্যায়িকাও লিখেছিলেন রাজকৃষ্ণ (১৮৭০ খ্রীঃ)।

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

যেমন তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদনায় অক্ষয়কুমার,—বিবিধার্থ সংগ্রহ ও রহস্য

সন্দর্ভে রাজেন্দ্রলাল, তেম্‌নি এযুগের গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে সোমপ্রকাশের সম্পাদক হিসেবে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ অবিস্মরণীয়। কোনো সমালোচক বলেছেন,—"তাঁহার সোমপ্রকাশ বাংলাভাষাকে ও বাংলা সাহিত্যকে গৌরবশ্রী দান করিয়াছিল। সুন্দর সরল বাংলা ভাষায় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, পলিটিক্‌স্‌ আলোচিত হইতে লাগিল। বাংলা ভাষার সর্বপ্রকার ভাব প্রকাশ করিবার এরূপ ক্ষমতা আছে, ইহা পূর্বে লোকে ভাল করিয়া ধারণা করিতে পারে নাই।" এর থেকেই বাংলা গদ্যের সংগঠনে দ্বারকানাথের যথার্থ ভূমিকার পরিচয় স্পষ্ট হবে। এ ছাড়া, তাঁর নিজের নামে প্রচলিত স্বতন্ত্র রচনার মধ্যে প্রধান হচ্ছে,—রোমরাজ্যের ইতিহাস ও গ্রীসরাজ্যের ইতিহাস (১৮৫৭)।

দ্বারকানাথ
বিদ্যাভূষণ

দ্বারকানাথ শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতুল ছিলেন। ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়েছিল,—পিতা ছিলেন হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

গুপ্তকবি ঈশ্বর গুপ্ত

নবীন বাংলা সাহিত্যের গঠমানতার যুগে গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন সব্যসাচী। সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক হিসেবে তাঁর গদ্যরচনা ও জাতি-চেতনার দুর্লভ পরিচয় ঐতিহাসিক মর্যাদা পেয়েছে। বাংলা সৃজনী-সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন সেকালে একাধারে অতীত-সন্ধিৎসু, ও অনাগত-বিধাতা।• আগে বলেছি, কবিওয়ালাদের বিস্মৃতপ্রায় পরিচয়ের প্রায় সবটুকুই ঈশ্বর গুপ্ত আহরণ করে গেছেন সংবাদ প্রভাকরে। এই সংবাদ প্রভাকরের পৃষ্ঠাতেই শিক্ষার্থী তরুণ হিসেবে অন্যান্যের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এবং দীনবন্ধুরও সাহিত্য রচনার হাতে-খড়ি হয়েছিল। কিন্তু,• কেবল কবিগানের ঐতিহাসিক ও ভাবী কবিদের স্রষ্টারূপেই নয়, কবি হিসেবে ঈশ্বর গুপ্ত নিজেও সেকালে ছিলেন যুগপ্রধান,—প্রায় একচ্ছত্র শিল্পী।•

ঈশ্বরগুপ্তের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব

একথা অবশ্য স্বীকার্য যে,—প্রতিযোগিতার প্রাচুর্য সত্ত্বেও সেকালের বাংলা গদ্যসাধনা, তথা,—সাংবাদিকতার ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ছিল অনন্য। কিন্তু,• কবি-হিসেবে তাঁর বিকাশ ছিল প্রায় একক। তাহলেও, বলতেই হয়,—কবি ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিভা সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্তের সাধনার কাছে ম্লান হয়ে গেছে। "বস্তুতঃ, তাঁর কবি-কর্ম একদিকে কবিওয়ালাদের রচনা-ধারারই উত্তর-সাধনা করেছে;—অন্যদিকে তা ছিল তাঁর সাংবাদিকব্যক্তিত্বেরই যেন পদ্যায়িত প্রকাশ। ঈশ্বরগুপ্তের প্রতিভার পক্ষে এতে বিস্ময়ের কারণ কিছু নেই। সিদ্ধকাম সাংবাদিক উচ্চশ্রেণীর কবিত্ব-শক্তির অধিকারী হতে পারেন নি,—তার জন্য অনুযোগের কারণ অন্ততঃ থাকা উচিত নয়। আসলে কৌতূহলের বিষয়,—আলোচ্য যুগ-সীমায় কাব্য-প্রচেষ্টার এই একান্ত স্বল্পতা।•

গুপ্তের কবিত্ব

১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে রামমোহন স্থায়িভাবে কলকাতাবাসী হন। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা, আর ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়,

মধুসূদনের তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য। এই সময়ের মধ্যে বাংলা গদ্যের উন্নতি, বিকাশ ও সম্পূর্ণতার ইতিহাস একটি অখণ্ড যুগ-প্রগতির পথকে সুচিহ্নিত করেছে। কিন্তু, সে তুলনায় কাব্য-সাহিত্যের পরিণতি একান্ত নিরুদ্ধ হয়েছিল। সুশিক্ষিত নগর-বাংলাতেও অশিক্ষিত-পটু কবিগানের পুনরাবর্তন চল্‌ছিল বিচিত্ররূপে। গদ্যের তুলনায় পদ্য সাহিত্যের এই স্থাণুতা বিস্ময়কর হলেও অসম্ভব নয়। আগে বলেছি, গদ্য হচ্ছে প্রয়োজন ও মননের বাহন। কিন্তু পদ্য বহন করে ভাবের ধ্যান-তন্ময়তাকে। যে যুগের কথা বল্‌ছি,—তখন নগর বাংলার দিকে দিকে নবজাগরণের সাড়া পড়ে গিয়েছিল। নবীনজীবনাদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন, উত্তেজনা, বিতর্কের যেন ঝড় উঠেছিল। এমন পরিবেশে গভীর সত্যানুভবের ধ্যান,—তথা যুগোত্তীর্ণ কাব্যরচনার সাধনা অসম্ভব। কবি-মনের অবিচল দৃঢ় প্রত্যয়ের মূল-ভূমিতেই সার্থক কাব্য-প্রেরণার জন্ম। আরো পরবর্তীকালে, রঙ্গলালের রচনায় সেই প্রত্যয়ের উষালোক ক্ষীণ আভায় ধরা পড়েছে। মধুসূদনের কবি-কর্মে ঘটেছে এই অকম্পিত যুগ-বিশ্বাসের দীপ্ততম প্রকাশ।

বিবর্তন যুগের কবিতা

ঈশ্বর গুপ্তের যুগে জাতীয় জীবনে কাব্য-রচনাব সেই রাজপথ রচিত হয়নি। ফলে, একদিকে নিতান্ত লঘু, হাস্য-সরস চালে কবিওয়ালাদের বাঙ্‌মুখরিত অগভীর রচনা-শৈলীর অনুসরণ করেছেন তিনি। অপর দিকে, সমকালীন জীবনের বিতর্কিত সমস্যা নিয়ে হয় ব্যঙ্গ, নয়, সাংবাদিকের মত পদ্যে তর্কজাল রচনা করেছেন। 'আনারস' কবিতায় তিনি লিখেছেন :—

"বন হতে এলো এক টিয়ে মনোহর।
সোনার টোপর শোভে মাথার উপর ॥
এমন মোহন মূর্তি দেখিতে না পাই।
অপরূপ চারুরূপ অনুরূপ নাই ॥
ঈষৎ শ্যামল রূপ, চক্ষু সব গায়।
নীলকান্ত মণিহার, চাঁদের গলায় ॥
সকল নয়ন-মাঝে, রক্ত-আভা আছে।
বোধ হয় রূপসীর চক্ষু উঠিয়াছে ॥"

ঈশ্বর গুপ্তের কবি-স্বভাব

এই রচনাংশে ঈশ্বর গুপ্তের রসিক প্রাণের পরিচয় স্পষ্ট, সেই সঙ্গে

প্রকাশভঙ্গির বাঙ্‌নিপুণ অগভীরতাও দুর্লক্ষ্য নয়। কবিওয়ালা-সুলভ শব্দালঙ্কারপ্রীতির চরম নিদর্শনও রয়েছে এই কবিতাতেই :—

"লোকে বলে, আনারস, আনারস নয়।
আনারস হলে কেন জানারস হয়॥
তারে তার জানা যায়, রস ষোল আনা।
অরসিক লোক তবু, বলে তারে আনা॥
ফেলিয়া পনর আনা এক আনা রাখে।
এই হেতু 'আনারস' বলে লোক তাকে॥
অরসিক নাহি করে, রসেতে প্রবেশ।
আনাতেই ষোল আনা, না জানে বিশেষ॥"

একটি মাত্র 'আনা' কথা দিয়ে কেবল অনুপ্রাস নয়, অর্থের ফাঁকি রচনার কবিগান-সুলভ প্রয়াস এখানে লক্ষ্য করবার মত।

ঈশ্বর গুপ্তের কবি-প্রতিভার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য,—যে-কোনো অকিঞ্চিৎকর বিষয় নিয়ে তিনি সরস,—এমন কি, স্থূল, ব্যঙ্গ চটুল কবিতা রচনা করতে পারতেন তাঁর লেখা পৌষ পার্বণ, পাঁটা ইত্যাদি কবিতা এককালে রসিক জনের মন পুলকিত করেছিল,—জিহ্বাকেও করেছিল সরস। কিন্তু ভাবের দিক থেকে উল্লেখ্য গভীরতা কোথাও ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র এ'কে ঈশ্বরগুপ্তের কবিস্বভাবের 'ইয়ারকি' বলেছেন। ঈশ্বরকে নিয়েও কবি এই ধরনের ইয়ারকি করেছেন :—

"কহিতে না পার কথা—কি রাখিব নাম?
তুমি হে আমার বাবা—হাবা আত্মারাম।"

'পৌষ পার্বণ' কবিতায় তাঁর রচনাংশ আজও লোকের মুখে মুখে ফিরে থাকে :—

"সুখের শিশির কাল, সুখে পূর্ণ ধরা।
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গ ভরা।"

কবির সহজ বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের সার্থক পরিচয় এখানেই। শুধু তাই নয় :—

"রেতে মশা, দিনে মাছি,
এই নিয়ে কলকাতায় আছি।"

নিয়ত-সত্যের আকর, এই অভিজ্ঞতা-তিক্ত, সরস অথচ তির্যক্ ব্যঙ্গকবিতাও ঈশ্বর গুপ্তেরই রচনা।

কিন্তু, এটি ঈশ্বর গুপ্তের রচনার একদিক। সেকালের জাগ্রৎমান জীবন-বাণীর প্রতি তাঁর সচেতনতার প্রকাশ আছে কৌলীন্য-প্রথা, স্বদেশ, মাতৃভাষা, ইত্যাদি কবিতায়। ভাবে অগভীর, এবং প্রকাশে গতানুগতিক হলেও, অনুভূতির তির্যক সত্যতা তীব্ররূপে প্রতিফলিত হ'য়েছে এই সব কবিতাতেও। তাঁর স্বদেশ-ভক্তির নিরাবরণ, নিরাভরণ অভিব্যক্তি আগেও উদ্ধার করেছি :—

"কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।"

আগে বলেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বয়সের রচনা 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা-সংকলন সম্পাদনা ও তাঁর জীবনী আলোচনা করে সেই ঋণ স্বীকার করেছেন :— ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে ঈশ্বর গুপ্তের জন্ম হয়েছিল কাঁচড়াপাড়ায়। তাঁর পিতার নাম ছিল হরিনারায়ণ গুপ্ত,—মা ছিলেন শ্রীমতী দেবী। অল্প বয়সে কবির মাতৃবিয়োগ হয়, এবং তাঁর পিতা দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন। এর প্রতিবাদে কবি জোড়াসাঁকোয় চলে আসেন মাতুল বাড়িতে। এখানেই সামান্য লেখাপড়ার পর তাঁর কর্মজীবনের সূচনা হয়। মাঝে মাঝে রক্ষণশীল হলেও, সমকালীন সমাজ-জীবনের বহু প্রগতি-আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। বিধবা-বিবাহের তীব্র বিরোধিতা তিনি যেমন করেছিলেন, তেমনি কৌলীন্য-প্রথারও নিন্দা ও বিদ্রূপ করেছেন। এর থেকেই বুঝি, তাঁর প্রত্যয় সব সময় পূর্বাপর সংযুক্ত ছিল না,—কিন্তু একবার যা বিশ্বাস করতেন, তার জন্য সর্বস্বপণ করতেও বাধত না তাঁর। কবিতাতেও কবি-চরিত্রের এই ঋজুতা ও কাঠিন্য, নিরাভরণ-প্রায় গদ্যায়ত ভাষায় তীব্র সত্যরূপ পেয়েছে।

কবি-জীবনী

চতুর্বিংশ অধ্যায়

বাংলা নাটকের জন্ম-কথা

নাটককে বলা হয় যৌথ শিল্প। অর্থাৎ, নাট্যশিল্পের স্বাদ নাট্যকার ও দর্শকের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে একান্ত বদ্ধ নয়। কবি আপন মনে কবিতা রচনা করেন, পাঠক নিভৃতে তা পাঠ করে গ্রহণ করেন রসের স্বাদ। নাটকের বেলা তা হবার উপায় নেই। বই পড়ে নয়,—মঞ্চে অভিনয় দেখে তবেই নাট্য-রসের যথার্থ আস্বাদন সম্ভব। এই কারণে, নাটককে বলা হয়েছে 'দৃশ্যকাব্য'। এদিক্ থেকে, নাটকের রস-উপাদানকে আস্বাদ্য করে তোলার দায়িত্ব যে-পরিমাণে লেখকের, ঠিক ততখানি, বা তারও চেয়ে বেশি দায়িত্ব মঞ্চাভিনেতাদের। আবার মঞ্চের গঠন. সজ্জা, পরিবেশ-রচনা ইত্যাদির ওপরেই অভিনয়ের সাফল্য অনেক অংশে নির্ভর করে থাকে। অতএব, নাট্যকার যা রচনা করেন, তার রসাস্বাদকে স্বরূপতঃ দর্শকের মনে পৌঁছে দিতে হলে, নাট্যকারের কল্পনার সঙ্গে অভিনেতা ও মঞ্চ-নির্দেশককে একাত্ম হতে হবে। আবার, অভিনয়-কলার সঙ্গে একান্ত-লীন হতে না পারলে দর্শকের পক্ষেও নাট্য-রসের আস্বাদন অসম্ভব হয়। অতএব, অন্যান্য শিল্প-রচনার ক্ষেত্রে শিল্পী যেমন রস-সৃষ্টি করেন, আর পাঠক করে আস্বাদন, নাটকের ক্ষেত্রে তা হয় না। এখানে নাট্যকার, অভিনেতা, মঞ্চ-চালক ও দর্শক নাটকের রচনা-শৈলীর যেন চারটি স্তম্ভ,—চারজনেই একাধারে পূর্ণাঙ্গ নাট্য-রসের স্রষ্টা ও ভোক্তা। অতএব, কোনো এক সমষ্টিগত আদর্শের আবেগ যখন একটি গোটা জাতির মনকে একাত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধে তোলে, তখনই সেই জাতির ইতিহাসে সফল নাট্য-রচনার জীবন-পরিবেশ গড়ে উঠ্তে পারে। এইরূপ এক উপযোগী পরিবেশই শেক্স্‌পীয়রের বিশ্ব-জয়ী নাট্য-কলার জীবন-ধাত্রী।

নাট্য-কলার অতুলা স্বাতন্ত্র্য

নাট্যকলার গঠন-ভঙ্গি এই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বহুল প্রভাবিত হয়ে থাকে। অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে রচনার প্রকরণ শিল্পীর ব্যক্তিগত প্রবণতার দ্বারা

নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু, নাটকের রচনা-শৈলীকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে একটি গোটা জাতি বা সমাজের সমষ্টিগত প্রভাব। এই কারণে, জাতিতে জাতিতে নাট্য-রচনার প্রকৃতিই কেবল পরিবর্তিত হয় না,—আকৃতিরও বিভেদ ঘটে থাকে। তাই দেখি, ইংরেজি ও সংস্কৃত নাট্যকলার প্রকাশভঙ্গিতে রয়েছে আমূল তফাৎ, ;—তাই সংস্কৃত ও ইংরেজি উভয় নাট্যশৈলীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েও বাংলা নাটক কোনো রীতিরই একান্ত অনুগত হয়নি।

বাঙালির নাট্যস্বভাব

অতি প্রাচীনকাল থেকেই গৌড়-বঙ্গবাসীদের স্বভাব ও শিল্প-সাহিত্যে আবেগাতিশায়িতার কথা বিশেষ উল্লিখিত হয়েছে। এই কারণেই, বাংলা গদ্যের বহমানতা পদ্য-সমুচিত আবেগধারায়,—এই কারণেই বাংলা কবিতা গানের সুরে বিগলিত বিলম্বিত। বাংলা নাটকেও জাতির এই মৌল স্বভাব বিশেষ প্রকট হয়েছে। ফলে, আমাদের নাট্য-সাহিত্যে ঘটনা ও সংঘাতের চেয়ে আবেগ ও উচ্ছ্বাসই প্রবল হতে দেখি সুপ্রাচীনকাল থেকে।

বাংলা ভাষায় নাট্যাকারে লেখা প্রাচীনতম যে রচনার পরিচয় পাওয়া গেছে,—তা বড়ুচণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন। যথাস্থানে কাব্যটির পরিচয় দিয়েছি। সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় একে "গীতিনাট্য শ্রেণীর গীতিকাব্য" বলে পরিচিত করেছেন। আগাগোড়া কাব্য বিভিন্ন "খণ্ড" বা পালায় বিভক্ত। প্রতি খণ্ডই আবার কতকগুলো 'পদ' বা গীতি-কবিতার সমষ্টি। কিন্তু এই পদগুলো প্রায় সর্বত্র কথোপকথনের আকারে সজ্জিত করা হয়েছে,—এবং কৃষ্ণ, রাধা অথবা বড়াই,—এই তিনটি চরিত্রের সংলাপাংশ হিসেবে রচিত হয়েছে। এর ফলে, গীতি-কাব্যাকারে লিখিত গ্রন্থটিতে একটি সাধারণ নাট্য-পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে।

বাংলা ভাষার প্রথম নাট্যরূপ

কৃষ্ণকীর্তনের গল্পাংশ রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়-বিরোধ,—মান-অভিমান ও মিলনের কাহিনী নিয়ে রচিত। এতে নাটকীয় ঘটনা-সংঘাতের অবকাশ প্রায় নেই; বরং প্রেম-দ্বন্দ্বের ফলে নায়ক-নায়িকার হৃদয়াবেগই উন্মথিত হয়েছে বহুলাংশে। পদগুলোও সেই আবেগকে প্রকাশ করেছে সুরের মাধ্যমে;—কৃষ্ণকীর্তনের সকল পদই আসলে গান,—প্রত্যেক পদের আরম্ভে সুরের নির্দেশও রয়েছে। তবু, আবেগ-ঋদ্ধ এই সংগীতকে সংলাপেক্ষ

আকারে সাজিয়ে জন-মনোহর নাট্যরসও সৃষ্ট হতে পেরেছিল। স্বয়ং চৈতন্যদেব কৃষ্ণকীর্তন-কাহিনীর কোনো কোনো খণ্ড অভিনয় করেছিলেন বলে জানা যায়।

চৈতন্য-তিরোভাবের পরে দীর্ঘদিন নাট্য-রচনা বা নাট্যাভিনয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বড একটা পাওয়া যায় না। তবে, পদকীর্তনের 'আখর' ও উত্তর-প্রত্যুত্তর কলায়, কবির লড়াইয়ে, এবং অনুরূপ অন্যান্য রচনায় নাট্যরসকে ক্ষীণভাবে জিইয়ে রাখবার পরোক্ষ চেষ্টা করা হয়েছিল। এ-সব ছাড়া বাংলার স্বকীয়, স্ব-তন্ত্র, পূর্ণাঙ্গ নাট্যকলার বিকাশ ঘটেছিল 'যাত্রা'-সাহিত্যে।

নাটকের ক্ষীণ পূর্বরূপ

যাত্রার ক্ষীণ, অ-গঠিত পূর্বসূত্র সন্ধান করে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া যায় নিঃসংশয়ে। ডঃ সুশীলকুমার দে কৃষ্ণ-কীর্তনের রচনাঙ্গিক ও মহাপ্রভুর অভিনয়-কলাতেও যাত্রার পূর্বরূপ লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু, যাত্রার জন্ম-লগ্ন যখনই হোক্, আদিযুগের সেই রচনাশৈলী ছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ভাষায়,—"নাটকের জঘন্য অপভ্রংশ স্বরূপ।"

যাত্রা-সাহিত্য

তারপরে, উনিশ শতকের প্রারম্ভে 'যাত্রা'-সাহিত্যে যথার্থ নাট্যরূপের সুসংগঠন ঘটে যাঁদের চেষ্টায়, তাঁদের মধ্যে প্রথম-উল্লেখ্য শিশুরাম অধিকারী। রাজেন্দ্রলাল মিত্র জানিয়েছেন,—এঁর বাড়ি ছিল কেঁদেলি-গ্রামে। যাত্রা-সাহিত্য ও তার রচয়িতাদের পরিচয় এখন দুর্লভ হয়েছে। তবু, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যাত্রার উৎকর্ষ সেদিন একটি বাঙালি-ধর্মী স্বতন্ত্র নাট্যাঙ্গিক-গঠনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে দেখা দিয়েছিল। আর, এই সংগঠকদের মধ্যে শিশুরামের সঙ্গে শ্রীদাম, সুবল, পরমানন্দ প্রভৃতির কীর্তিও ছিল উল্লেখ্য। ডঃ সুশীলকুমার দে বলেছেন, যাত্রার পূর্ণাঙ্গ নাট্য-রূপ লাভের সম্ভাবনা মধ্যপথে নষ্ট হয়ে যায়, তার কারণ, ইংরেজি শিক্ষিত নবীন বাঙ্গালীদের রস-দৃষ্টি ইংরেজি নাট্যাঙ্গিকের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। কাহিনীর বিষয় অনুসারে যাত্রা সাহিত্যে কৃষ্ণ-যাত্রা, ও বিদ্যাসুন্দর যাত্রা সর্বাপেক্ষা জনপ্রীতি লাভ করেছিল।

প্রতীচ্য আদর্শে বাংলাদেশে নাট্যরস পরিবেশনের পথিকৃৎ রুশদেশবাসী গেরাসীম স্টেফানোভিচ্ লেবেডেফ্। ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে M. Joddrel-এর

The Disguise নামক একখানি ইংরেজি নাটকের বঙ্গানুবাদ বাঙালি নটনটী দিয়ে তিনি অভিনয় করিয়েছিলেন। মূল নাটকের অনুবাদ করে দিয়েছিলেন গোলোকনাথ দাস। অনুবাদের নামকরণ করা হয়েছিল 'কাল্পনিক সংবদল বা সাজবদল'। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মদনমোহন গোস্বামী অধুনা গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন। এই নাটকের অভিনয় আশাতিরিক্ত সফলতা লাভ করেছিল,—জনসমাগম হয়েছিল অজস্র। ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দে লেবেডেফ্ আর একবার এই নাটকাভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন।

প্রতীচ্য আদর্শে প্রথম নাট্যাভিনয়

তারপরে দীর্ঘদিন বাংলাদেশে আর মঞ্চাভিনয় হয়নি। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, মঞ্চ তৈরী করে অভিনয় করার রীতি এদেশে প্রতীচ্য দেশাগত। শ্রোতাদের মাঝখানে একটুখানি শূন্য জায়গায় 'আসর' চিহ্নিত করে যাত্রার অভিনয় করা হত। বাঙালির চেষ্টায় প্রথম মঞ্চাভিনয় হয় ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে,—প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত হিন্দু থিয়েটার-এ। এখানে ইংরেজি নাটক ইংরেজি ভাষাতেই অভিনীত হয়েছিল। দেশীয় নাটকের মঞ্চাভিনয়ের প্রথম গৌরব বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর। ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে শ্যামবাজারে নবীন বসুর বাড়িতে এই নাটকের অভিনয় হয়। জনসমাগম ও উৎসাহ-উদ্দীপনার অবধি ছিল না তাতে।

বাঙালির প্রথম মঞ্চাভিনয়-চেষ্টা

আগে বলেছি, দেশীয় যাত্রার প্রথম অবনতি শুরু হয় ইংরেজি শিক্ষিত সমাজের উপেক্ষার ফলে। আর, দেশীয় নাট্যরীতির প্রতি এই অনবধানের প্রধান কারণ ছিল ইংরেজি নাট্যকলার কল্পনাতীত উৎকর্ষের প্রতি মোহাবেগ। হিন্দু কলেজের মাধ্যমে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত হলে শেক্‌স্‌পীয়রের অপরাজিত নাট্যসাহিত্যের বহুলাংশ পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়। আর অধ্যাপক ছিলেন স্বয়ং মহামনা ডি. এল্‌. রিচার্ডসন। শেক্‌স্‌পীয়রের শিল্পকর্মের অতুল্য বিভাকেই তিনি কেবল তরুণ পাঠকদের মর্মলোকে বিচ্ছুরিত করে দিতেন না, শেক্‌স্‌পীয়র-যুগের অভিনয়-কলা ও মঞ্চ-গঠনের বৈভবকেও করে তুল্‌তেন ভাস্বর। ফলে, ইংরেজি নাট্য-সাহিত্যের মত ইংরেজি অভিনয়-কলার প্রতিও শিক্ষিত বাঙালি-মন একান্ত আবেগে ঝুঁকে পড়েছিল। তখন, দেশীয় যাত্রা-শিল্প

যাত্রার বিনষ্টি

অশিক্ষিত জনসমাজে নেমে গিয়ে অমার্জিত-রুচি স্থূলতায় আকীর্ণ হয়ে পড়ে। তার ফলে, শিক্ষিত সমাজে যাত্রার প্রতি বিরূপতা আরো প্রবল হয়ে ওঠে। তখন নব্যজগতের একমাত্র কাম্য হয়েছিল যে-কোনো প্রকারে যাত্রা-রীতিকে অস্বীকার ও পরিহার করার প্রাণান্ত প্রয়াস।

সংস্কৃত নাটকের নাট্যানুবাদ নিয়েই উনিশ শতকের বাংলাদেশে মঞ্চাশ্রয়ী নাট্য-রচনার সূত্রপাত হয়। ১২৪৬ বাংলা সালে কাদিহাটি গ্রামের বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন। রচনাটির সাহিত্যিক মূল্য কিছু নেই; অনুবাদ হিসেবেও নিতান্ত দুর্বল। এই নাটকটি কখনো অভিনীত হয় নি। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ হিসেবে নন্দকুমার রায়ের লেখা শকুন্তলা (১৮৫৫) প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে নাটকটি সাতুবাবুর [আশুতোষ দেব] বাড়িতে তাঁর দৌহিত্রগণের চেষ্টায় অভিনীত হয়।

প্রথম বাংলা নাট্যানুবাদ

কিন্তু, সংস্কৃত নাটকের চেয়ে বাংলা ভাষায় ইংরেজি আদর্শে নাট্য রচনার চেষ্টা সেদিন প্রবলতর হয়েছিল। এই ধারার লেখকদের মধ্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, তারাচরণ শিকদার এবং হরচন্দ্র ঘোষ ছিলেন সমুল্লেখ্য।

যোগেন্দ্র গুপ্তের কীর্তিবিলাস (১৮৫২ খ্রীঃ) বাংলা ভাষার প্রথম প্রকাশিত ট্রাজেডি। বাংলা রূপকথার শীত-বসন্তের মিলনান্ত গল্পকে অশুভ-শেষ আকারে সাজিয়ে ইংরেজি আঙ্গিকের অনুসারে ট্রাজেডি লিখবার চেষ্টা করেছিলেন যোগেন্দ্র গুপ্ত। শেক্স্পীয়রের হ্যামলেট্ নাটকেরও দুর্বল অনুকরণের চেষ্টা রয়েছে এতে। গ্রন্থারম্ভে লেখক ট্রাজেডি রচনার অন্তর্বর্তী জীবন-মূল্যবোধ ও আঙ্গিক-চেতনার বিশদ্ ব্যাখ্যা করেছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় আদর্শে অশুভ-শেষ নাটক রচনা ছিল একেবারে নিষিদ্ধ। সংস্কৃত নাট্যাদর্শের আপত্তি, এবং য়ুরোপীয় আদর্শের ট্রাজেডি-প্রবণতার কারণও তিনি ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু গোটা নাটকটি পড়লে বোঝা যায়,—ট্রাজিক শিল্পকলার একটি পুস্তকাশ্রয়ী জ্ঞানই যোগেন্দ্র গুপ্তের ছিল,—সার্থক ট্রাজেডি রচনার উপযোগী সৃজনী-প্রতিভা ছিল না মোটেই। তাই, নাট্যসৃষ্টি হিসেবে 'কীর্তিবিলাস' একেবারেই দুর্বল এবং অ-সার্থক।

প্রথম বাংলা ট্রাজেডি

প্রথমাংশে রয়েছে সংস্কৃত আদর্শ অনুসারে নান্দী ও সূত্রধার-কথা। ভাষায় আছে ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা-ভঙ্গির ছাপ।

কীর্তিবিলাস ইংরেজি আদর্শে লেখা প্রথম ট্রাজেডি। তেমনি তারাচরণ শিকদারের ভদ্রার্জুন (১৮৫২ খ্রীঃ) প্রতীচ্য অঙ্গিকে লেখা প্রথম বাংলা কমেডি। কাশীরামদাসের মহাভারতের সুভদ্রা-হরণ কাহিনীকে আশ্রয় করে নাটকের গল্পাংশ রচিত হয়েছিল। তারাচরণের আঙ্গিক-চেতনা যোগেন্দ্র গুপ্তের চেয়ে প্রখর ছিল;—ভূমিকাংশে নাট্য-কলার আলোচনা থেকে একথা বোঝা যায়। তাছাড়া মূল গল্পাংশকেও ইংরেজি নাট্যকলার অনুসারে বিশেষ অবধানের সঙ্গে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটক-রীতির পার্থক্য নির্দেশ করে তারাচরণ লিখেছিলেন—"সংস্কৃত নাটক প্রথমতঃ অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইংরেজি ভাষায় এক্ট্ (Act) কহে, কিন্তু প্রত্যেক এক্ট্ (Act) যেমন Scene সিনে বিভক্ত আছে, সংস্কৃত নাটক তাদৃশ নহে। তন্নিমিত্ত Scene সিন্ শব্দের পরিবর্তে সংযোগস্থল ব্যবহার করা গেল। যে স্থানঘটিত ক্রিয়াদি নাটকে ব্যক্ত হয় তাহাকে Scene সিন্ কহে।" ভূমিকার অন্য অংশে লেখক স্পষ্ট জানিয়েছেন,—"এই গ্রন্থ য়ুরোপীয় নাটকের শৃঙ্খলা অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম।"

প্রতীচ্য আঙ্গিকে লেখা প্রথম 'কমেডি'

নাট্যাঙ্গিক রচনায় তারাচরণের শৃঙ্খলাবোধ সুপরিণত এবং ভাষাভঙ্গি পরিচ্ছন্ন ছিল। ফলে, যোগেন্দ্র গুপ্তের তুলনায় তাঁর রস-সফলতা ছিল বেশি। তাহলেও ভদ্রার্জুনকেও সার্থক নাটক বলা চলে না। সংলাপের ভাষা গদ্য-পদ্য মিশ্রিত, কিন্তু পদ্যের পরিমাণ বেশি। আর, সে পদ্যে নাট্যগুণের অভাব সর্বৈব। গদ্যভাষা লেখা হয়েছে সাধুরীতিতে।

হরচন্দ্র ঘোষ চারখানি নাটক লিখেছিলেন। দু'খানি শেক্স্পীয়রের অনুবাদ, একখানি মহাভারতের, এবং আরো একখানি "ব্রহ্মদেশীয় এক মনোহর কাব্য"-কথাকে আশ্রয় করে লেখা। কিন্তু, প্রবল উৎসাহ ও অধ্যবসায়সত্ত্বেও এঁর কোনো প্রয়াসই উল্লেখ্য সফলতা লাভ করে নি।

হরচন্দ্রের ভানুমতী চিত্তবিলাস (১৮৫৩ খ্রীঃ) শেক্স্পীয়রের Merchant of Venice অবলম্বনে লেখা। হুবহু অনুবাদ করা সম্ভব হয় নি, একথা নাটকের ভূমিকায় লেখক নিজেই জানিয়েছেন;—আর জানিয়েছেন,—

"তথাপি বর্ণিত মহাকবি শেকৃস্পীয়রের সম্ভাবের বহুলাংশ অথচ সম্পূর্ণ আখ্যানের মর্ম" গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া, "এতদ্দেশীয় বালকবৃন্দের জ্ঞান বৃদ্ধ্যর্থ" গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল বলেও তিনি জানিয়েছিলেন। পাঠ্যপুস্তক হিসাবে গ্রন্থটির অনুমোদনের জন্য হরচন্দ্র আবেদন করেন; কিন্তু তা মঞ্জুর হয় নি। সাধারণ জনসমাদরলাভও ঘটেনি এই নাটকের ভাগ্যে।

হরচন্দ্রের নাট্যাবলী

প্রথম রচনার ব্যর্থতার পরে হরচন্দ্র দ্বিতীয় 'কৌরব বিয়োগ' নাটক ১৮৫৮ খ্রীঃ) লিখলেন মহাভারতের গল্প নিয়ে। গ্রন্থারম্ভে তিনি নিজেই রচনাশৈলীর সমর্থন ও প্রশংসা করে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় পৃথক্ পৃথক্ ভূমিকা লিখেছিলেন। হরচন্দ্রের ধারণা ছিল, বিদেশী গল্পের অবলম্বনে লেখা হয়েছিল বলেই, তাঁর প্রথম নাটক জন-সমাদৃত হতে পারে নি। দেশীয় গল্প নিয়ে নাটক লিখে তাঁর প্রবল ভরসা ছিল,—এবারে তিনি সফল হবেন। কিন্তু, হরচন্দ্রের ত্রুটি ছিল রচনাভঙ্গিতে, নীরস গল্পের বিবরণাত্মক পদ্ধতিতে তিনি নাটকের কাহিনী বিবৃত করেছেন, রসোত্তীর্ণ নাট্যরচনার প্রকৃতিই তার জানা ছিল না। তাই এবারেও ব্যর্থতা অনিবার্য হল।

হরচন্দ্রের তৃতীয় নাটক চারুমুখ চিত্তহরা (১৮৬৪ খ্রীঃ) আবার শেকৃস্পীয়রের রোমিও-জুলিয়েট্ অবলম্বনে লেখা হয়। সংস্কৃত নাটকের মত এই নাট্যারম্ভে নান্দী আর প্রস্তাবনা রয়েছে। হরচন্দ্রের ব্যর্থতা এবারেও যথাপূর্ব হয়েছিল। আরো দশবছর পরে তিনি রজতগিরি নন্দিনী লিখেছিলেন (১৮৭৪ খ্রীঃ) ব্রহ্মদেশের কাহিনী অবলম্বনে। ইতিমধ্যে ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছিল। এবারে হরচন্দ্র ভরসা করেছিলেন, তাঁর নাটক মঞ্চাভিনীত হবে। কিন্তু, সে আশাও সার্থক হয় নি।

মধুসূদন-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয় নাট্যরচনার সফলতম কীর্তি রামনারায়ণ তর্করত্নের। ইতিহাসে তিনি 'নাটুকে রামনারায়ণ' নামে খ্যাত। সে কেবল অধিক সংখ্যক নাটক রচনার জন্যে নয়, বরং সমকালীন নাট্যকার সমাজে তিনি অতুল্য-কীর্তি ছিলেন বলেই। তাঁর প্রথম নাটক কুলীন-কুলসর্বস্ব (১৮৫৪) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষিত বাঙালি সমাজে

অপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। অথচ, এই নাটক তিনি লিখেছিলেন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভের উদ্দেশ্যে। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে রংপুর কুণ্ডী পরগণার জমিদার কৌলীন্য-প্রথার সফলতম বিরোধিতা করে কুলীন কুল-সর্বস্ব নামক নাটক লেখার জন্যে ৫০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। ঐ বছরই 'পতিব্রতোপাখ্যান' বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে রামনারায়ণ ঐ একই জমিদারের ঘোষিত ৫০৲ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। নাটকখানিও পর বছরে প্রথম পুরস্কার পায়।

নাট্যকে রামনারায়ণ

কলাঙ্গিকের বিচারে রামনারায়ণের নাটক আধুনিকতার দাবি করতে পারে না। নিজে তিনি সংস্কৃত কাব্য ও সাহিত্য-শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত হলেও, ইংরেজি সাহিত্য বা নাট্যাঙ্গিকের সঙ্গে তাঁর পরোক্ষ যোগও কিছু ছিল না। নাটকটি সংস্কৃত নাট্যাদর্শ অনুসরণ করে লেখা হয়েছে। আর সেদিক থেকেও পূর্ণাঙ্গ নাটক না বলে কুলীন-কুল-সর্বস্বকে একটি সফল সামাজিক ব্যঙ্গ-নক্সাই বলা উচিত। তা হলেও পঠিত সাহিত্য এবং অভিনীত নাট্যকর্ম হিসেবে এই নাটকের যুগান্তকারী সফলতার মূলে ছিল তার বিষয়গত বৈশিষ্ট্য। হিন্দুকলেজ-এর ফলশ্রুতি ততদিনে সারা সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। সতী-দাহ নিবারিত হয়েছে, বিধবার বিবাহ-বিধির শাস্ত্রীয় সংগতি নিয়ে তুমুল ঝড় উঠ্‌তে চাইছে;—মধ্যযুগীয় বাংলাদেশে নারী-নির্যাতনের সকল প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ জেগে উঠেছে ইংরেজি-শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে। তার প্রভাব কিছু কিছু করে ছড়িয়ে পড়েছিল বৃহত্তর সমাজের জীবনেও। কৌলীন্য ছিল নারী-নির্যাতনের এইরূপ এক পৈশাচিক প্রথার উৎস। রামনারায়ণের নাটক এই প্রথার অমানুষিক বিভীষিকাকে প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট করে তুলেছিল নাট্য-কাহিনীর মাধ্যমে। তাঁর যুগান্তকারী জনপ্রিয়তার উৎস এখানেই।

কুলীন-কুলসর্বস্ব

৩৬ থেকে ৮ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের চারটি সহোদরা বোন্‌কে এক দড়িতে বেঁধে এক অতিবৃদ্ধ কুলীনপুঙ্গবের সঙ্গে বিবাহের নামে আজীবন দগ্ধ করার বিভীষণ চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছে কুলীন-কুল-সর্বস্ব। সেই সঙ্গে, প্রসঙ্গতঃ কৌলীন্য-জনিত সামাজিক ব্যভিচারের কদর্যরূপও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। গোটা গল্পটিতে নাটকীয় সংঘাত, বা ঘটনা-ঘনতা নেই। কিন্তু,

নিছক বিবৃতি এবং বর্ণনাও সজীবতার জোরে তীব্র উদ্দীপনার সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

কুলীনকুল-সর্বস্ব-এর সফলতায় উৎসাহিত হয়ে রামনারায়ণ এবারে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ এবং পৌরাণিক গল্পের বিষয় অবলম্বন করে নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। অবশ্য, তাঁর একাধিক রচনারই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন সেকালের বিদ্যোৎসাহী ধনপতিগণ। রামনারায়ণের সংস্কৃত নাট্যানুবাদের মধ্যে রয়েছে বেণীসংহার (১৮৫৬), রত্নাবলী (১৮৫৮), অভিজ্ঞান শকুন্তল (১৮৬০) ও মালতীমাধব (১৮৬৭)। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে,—বেলগাছিয়ার নাট্যমঞ্চে রত্নাবলী নাটকের ঐতিহাসিক অভিনয়কে উপলক্ষ্য করেই বাংলা নাটক রচনার ক্ষেত্রে মধুসূদনের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল।

রামনারায়ণের অনুবাদ-নাট্য

পুরাণাশ্রিত বিষয় নিয়ে মৌলিক তিনখানি নাটক লিখেছিলেন রাম-নারায়ণ—রুক্মিণীহরণ (১৮৭১), কংসবধ (১৮৭৫) ও ধর্মবিজয় (১৮৭৫)।

রামনারায়ণের রচনাবলীর মধ্যে কুলীনকুল-সর্বস্ব সর্বাপেক্ষা খ্যাত হলেও, নাটক হিসেবে সর্বোৎকৃষ্ট হচ্ছে নবনাটক (১৮৬৬)। গ্রন্থটির পুরো নাম "বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নবনাটক"। এই নামের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ-পরিচয় রয়েছে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির নাট্যশালার পক্ষ থেকে গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্র-নাথের বিঘোষিত পুরস্কার লাভের উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি রচিত হয় এবং উদ্দিষ্ট পুরস্কার লাভও করে। কুলীনকুল-সর্বস্বকে পূর্ণাঙ্গ নাটক না বলে ব্যঙ্গ-নক্সা বলাই সমীচীন। কিন্তু নবনাটকে নাট্যগুণ স্পষ্ট বিকশিত হয়েছিল। অবশ্য, এই সময়ের মধ্যে মধুসূদনের সব কয়খানি নাটক ও দীনবন্ধুর নীলদর্পণ রচিত হয়ে গিয়েছিল। নবনাটকের উৎকর্ষের মূলে এই সব পূর্বাদর্শের প্রভাব অনুমান করা অন্যায় নয়।

অন্যান্য নাটক

১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে সম্বন্ধ-সমাধি নামে আর একখানি নাটক লিখেছিলেন রামনারায়ণ বাল্যবিবাহের প্রথাকে ব্যঙ্গাঘাত করে। এই নাটক রচনার মূলেও গুণেন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। তাছাড়া নানা সামাজিক সমস্যা

নিয়ে লেখা তাঁর প্রহসনগুলির মধ্যে রয়েছে,—যেমন কর্ম তেমনি ফল, উভয় সংকট ও চক্ষুদান।

রামনারায়ণের সামাজিক সমস্যামূলক নাট্য কৃতির সফলতা দেখে এই ধরনের নানা বিষয়ে নাটক রচনার উৎসাহ সেকালে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল।

রামনারায়ণের অনুকারিগণ

এই সব অনুকৃতনাটকের মধ্যে আছে—তারকচন্দ্র চূড়ামণির সপত্নী নাটক (১৮৫৮), শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়ের বাল্যবিবাহ নাটক (১৮৫৯?), শ্যামাচরণ শ্রীমানির বাল্যোদ্বাহ নাটক (১৮৬০) এবং নফরচন্দ্র পালের কন্যাবিক্রয় নাটক। প্রথম তিনটি গ্রন্থের প্রতিপাদ্য তাদের নাম থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। চতুর্থ নাটকটি লিখিত হয়েছিল শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ সমাজে কন্যাপণ গ্রহণের প্রতিবাদে।

আলোচ্য যুগের নাট্যরচনার ক্ষেত্রে নতুন সমাজ-বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিলেন উমেশচন্দ্র মিত্র 'বিধবা-বিবাহ নাটক' লিখে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একান্ত অনুরাগী ভক্ত ছিলেন উমেশচন্দ্র; বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল সমর্থন। ১৮৫৬খ্রীস্টাব্দে বিধবা-বিবাহ আইন-সিদ্ধ হয়,—

উমেশচন্দ্রের বিধবা-বিবাহ নাটক

আর ঐ বছরেই উমেশচন্দ্র তাঁর নাটক লিখেছিলেন,—বিধবা-বিবাহকে জনসাধারণের চোখে বরণীয় করে তোলার চেষ্টায়। দুটি বাল-বিধবার জীবনকথা নিয়ে নাটকের গল্পাংশ গঠিত হয়েছে। প্রথমটি কীর্তিরাম ঘোষের মেয়ে সুলোচনা,—বাল্যকালে বিধবা হওয়ার পরে তার পদস্খলন হয়, এবং সন্তান সম্ভাবিতা হয়ে নানা লাঞ্ছনা ও দুঃখভোগের পরে তার মৃত্যু ঘটে। অথচ, অদ্বৈত রায়ের বিধবা মেয়ে প্রসন্ন পুনর্বিবাহিতা হয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করতে থাকে। আসলে, সুলোচনা-জীবনের ট্রাজেডি রচনাই লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। আর কেবল প্রচারের দিক থেকেই নয়, সফল নাট্যকলার বিচারেও বিধবা-বিবাহ নাটকের উৎকর্ষ অনস্বীকার্য। সেকালের সামাজিক চিন্তাকেই নয়—রসচেতনাকেও উদ্বোধিত করেছিল এই নাটক। এর অনুসরণে আরো বহু নাট্যকৃতিরও উদ্ভব হয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস অবলম্বন করেও ঐ নামের একখানি নাটক লিখেছিলেন উমেশচন্দ্র।

উনিশ শতকের বাংলাদেশে সৃজন-ধর্মের মুক্তি

সাহিত্য জীবন-সম্ভব। জীবন-ধর্মের বিকাশ, তথা বিশেষ দেশ-কালে জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা উদ্দীপনার সম্ভারকে বক্ষে ধারণ করেই যুগে যুগে সাহিত্য-শিল্পের আবির্ভাব। এদিক্ থেকে, সাহিত্যের সৃজন-কলা জীবন-লক্ষণের অনুসারী। অর্থাৎ, ইতিহাসের কোনো এক পর্যায়ে জীবনের বিশেষ একটি প্রবণতা ও আশা-বাসনা যখন জাতির মর্মলোকে পূর্ণাঙ্গ মূর্তি ধরে, তখনই জীবন-শিল্পী সাহিত্যে তার বাঙ্‌ময় রূপরচনা করেন। রামমোহন-প্রভাবিত নগর-বাংলায় নবীন আকাঙ্ক্ষার দোলা লেগেছিল উনিশ শতকের প্রথমাবধি। তার পরে, হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা, বিদ্যাসাগরের সমাজ-বিপ্লব-সাধনা, নারীশিক্ষার প্রবর্তন,—সবকিছুর মধ্য দিয়ে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির নবজীবন-বাসনা ক্রমশঃ অঙ্কুরিত,—বিকশিত হয়ে উঠ্‌ছিল। সাহিত্যে সেই দোলায়মান জীবন-চিন্তার বিস্রস্ত বিচ্ছিন্ন রূপ আভাসিত হয়ে উঠ্‌ছিল পাঠ্য-পুস্তকের পূর্ণতা-বিধান, সাময়িক পত্র-পত্রিকার সু-গঠন ও জাতীয় আদর্শ-সংগঠনের সর্বাত্মক চেষ্টায়। বহুমুখী এই জীবন-সাধনায় সাহিত্যের প্রধান আশ্রয় ছিল গদ্য। সে গদ্য মৌলিক সৃজন-কর্মের বাহন ছিল না। অনুবাদ, বিজ্ঞান-দর্শনের আলোচনা, সমাজ-আন্দোলনের অপেক্ষাকৃত বহিরঙ্গ বিষয়, ইত্যাদিই ছিল এই গদ্য-প্রধান সাহিত্য-সাধনার প্রধান আশ্রয়। এ-যুগের প্রায় একমাত্র পদ্য-শিল্পী ঈশ্বরগুপ্তের কবি-কর্মও ছিল আসলে তাঁর সাংবাদিক প্রতিভারই ছন্দোময় রূপ। নাটকের রূপাঙ্গিক ও ভাব-সৌন্দর্যও এই যুগে সুগঠিত হয় নি। কেবল বিপ্লবাত্মক আকাঙ্ক্ষার জীবন-স্ফীতি নাটকের নবীন দেহে নূতন প্রাণের সাড়া জাগিয়েছিল।

সাহিত্যের নব-জীবনাঙ্কুর

ফলকথা, জাতির জীবনের সকল দিকেই গতি ও মুক্তির আবেগ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল সেদিন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাঙালি জীবনে তার

ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি ঘোষণা করে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন,—"বলিতে কি, ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ [খ্রীস্টাব্দ] পর্যন্ত এই কাল বঙ্গ সমাজের পক্ষে মাহেন্দ্র-ক্ষণ বলিলে হয়। এই কালের মধ্যে বিধবা-বিবাহের আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান মিউটিনি, নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবির্ভাব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব ও মধুসূদনের আবির্ভাব, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্মসমাজে নব-শক্তির সঞ্চার ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটিই বঙ্গসমাজকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিল।" মধুসূদন-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে এই সর্বমুখী আন্দোলনের ঐতিহাসিক রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু সার্থক সাহিত্য-কর্ম কেবল বাহ্য-বস্তুর হুবহু প্রতিফলন, বা ফটোগ্রাফি নয়। জীবনের মূলীভূত বাসনাকে আত্মস্থ করে তার প্রাণময় মূর্তি রচনাই সফল শিল্পীর সহজ-ধর্ম। মধুসূদনের আগে বাংলার নাগরিক সমাজে নবজীবনের লক্ষণ পূর্ণ প্রকট হয়েছিল। কিন্তু, সেই মহাশক্তিকে ধারণ করে আত্মস্থ করবার মত প্রতিভার ছিল অভাব। এদিক থেকে বাংলা সাহিত্যই নয়, উনিশ শতকেব ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি জীবনেও মধুসূদন ছিলেন প্রত্যক্ষ রেনেসাঁস-মূর্তি। পরবর্তী আলোচনায় তার শিল্প-প্রকাশের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হবে। কিন্তু, তার আগে লক্ষ্য করতে হয় আলোচ্য যুগের রেনেসাঁস-এর আন্তর পরিচয়।

সৃজনী সাহিত্যের মূলীভূত জীবনরূপ

পূর্বে বলেছি, রামমোহন, ডিরোজিও এবং বিদ্যাসাগরেব ত্রয়ী-ব্যক্তিত্ব ছিল উনিশ শতকের বিপ্লব-ধর্মের মূর্ত প্রতীক। রামমোহন তাঁর স্বদেশবাসী তরুণদের ইংরেজি শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিলেন,—মানুষ হিসেবে তাঁদের স্বাধীন, স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ করে তোলার আকাঙ্ক্ষায়। রামমোহন-প্রতিভার দুটি দিক,—এক তাঁর উগ্র-স্বতন্ত্র স্বাধীনতা-প্রীতি,—আর এক স্বদেশ ও স্বধর্মনিষ্ঠ মনের প্রবল আত্মগৌরব। স্বধর্ম বলতে এখানে প্রধানতঃ বুঝি ভারতীয় উপনিষদাশ্রিত মানবিকতা-বোধকেই। রামমোহন-ব্যক্তিত্বের এই বৈশিষ্ট্য আধুনিকবাংলার ঊষালোকে তাঁকে দেশছাড়া করেছিল,—রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষায়। আবার, এই একই ব্যক্তিত্ব স্বদেশে দ্বিমুখী ধারায় প্রবাহিত হয়েছে,—সতীদাহ নিবারণের বৈপ্লবিক চেষ্টা ও আত্মীয়সভা স্থাপনের গঠনমূলক সাধনায়। স্বাতন্ত্র্য ও স্বদেশ-

ভক্তির এই ব্যক্তিগত জীবনাদর্শকেই শিক্ষাগুরু ডিরোজিও অগ্নিবীজ রূপে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বাংলার নব্য শিক্ষিত তরুণদের প্রাণে। ফলে প্রথম থেকেই এঁরা প্রবুদ্ধ হয়ে উঠলেন এক নব জাতীয়তাবাদের দ্বারা। শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার, রাজনীতি, এমন কি সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রেও এই জাতীয় উদ্দীপনাই হল এঁদের একমাত্র লক্ষ্য। জাতিকে শ্রদ্ধেয় করে তোলার জন্য সমাজকে সুস্থ বলিষ্ঠ করে তোলার দায়িত্বও এঁরা অনুভব করেছিলেন।

স্বাতন্ত্র্য, স্বদেশভক্তি, সমাজ-গঠন

মধ্যযুগের বাঙালি সমাজের শ্রেষ্ঠ কলঙ্ক ছিল নারীর প্রতিষ্ঠাহীন লাঞ্ছনার ইতিহাস। মোগল যুগের বাংলায় পুরুষের নৈতিক অধঃপতন প্রায় নির্বার হয়েছিল। আর, কুলাঙ্গনাদের নৈতিক বিশুদ্ধি-রক্ষার অসুস্থ উদ্যমে পুরুষ-সমাজ হয়ে উঠেছিল প্রায় উন্মত্ত। রামমোহন রায় সতীদাহ নিবারণের চেষ্টা করলে, প্রতিপক্ষ এমন কথাও বলেছিলেন যে,—স্বামীর চিতায় দগ্ধ করে মারলে নারীর অ-সতী হবার আশঙ্কা আর থাকে না। অতএব, স্বামিদেবতাদের নিশ্চিন্ততা বিধানের জন্যেও সতীদাহের প্রথা প্রচলিত থাকা উচিত। সেকালে নারীর কোনো পৃথক্ অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকৃত হত না,—সে ছিল একান্তরূপে সমাজের,—তথা পুরুষের সম্পত্তির একটি অংশমাত্র। তাই, প্রাচীন শাস্ত্রাচারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল নারীকে কখনো স্বাধীন হতে দেওয়া চলবে না; বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীন করে রাখতে হবে তাকে। নবযুগের শিক্ষিত তরুণেরা বুঝেছিলেন,—যে-সমাজে নারীর প্রতিষ্ঠা এবং মর্যাদা সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ নয়, সেই জাতির অভ্যুদয় ইতিহাসের হাতে পুনঃ পুনঃ বারিত হয়ে থাকে। তাই, সমাজের মানবিক মুক্তি বিধানের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নারীর স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতার সুযোগ রচনায় উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন তাঁরা।

নারী-স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ

প্রথমতঃ বহু-বিবাহ এবং কৌলীন্য ইত্যাদি মধ্যযুগীয় নারী-লাঞ্ছনাকর প্রথা সমাজে একান্ত নিন্দিত হয়েছে। অপর দিকে, সতীদাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহের প্রবর্তন, নারী-শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা,—সব কিছু মিলে নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বকে স্বীকৃতি, বিকাশ ও পূর্ণতা দেবার প্রয়াস হয়েছে দুর্বার। বলাবাহুল্য মধ্যযুগীয়তার অস্বীকৃতি বা তার প্রতি ব্যঙ্গ-পূর্ণ

আঘাত রচনার চেষ্টা মূলতঃ এই বিচিত্রমুখী প্রয়াসের নেতিবাচক দিক। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা, অথবা রামনারায়ণ তর্করত্নের নাটকে এই সহজ চেষ্টাকেই গতানুগতিক সাহিত্য-রূপের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু, সেকালের বিপ্লব আন্দোলনের গতি ও মুক্তির শক্তি ছিল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের জাগরণে;—যে শক্তি মধ্যযুগীয় সমাজ-দেহ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে ব্যক্তিত্বের অধিকারকে জোরের সঙ্গে জাগ্রত করতে পেরেছে। বিদ্যাসাগরের কোনো কোনো গদ্য লেখায় এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সাহিত্যিক অঙ্কুর মুকুলিত হতে দেখি। কিন্তু উল্কার মত আলো ও উত্তাপের জ্বালাময় আত্ম-বিদারণের মধ্যে যিনি এই বিপ্লবাগ্নিকে সার্থক শিল্প-মূর্তি দিলেন,—তিনি বাংলা সাহিত্যের মহাপ্রাণ শিল্পী শ্রীমধুসূদন।

সাহিত্যে বিপ্লব-চেষ্টা

মধুসূদনের কবি-ব্যক্তিত্ব,—তথা তাঁর কাব্যধর্মেরও দুটি উপাদান,—(১) সুতীক্ষ্ণ জাতিত্ববোধ এবং (২) আবেগকম্পিত মানব-প্রেমের ফল-পরিণাম স্বরূপ নারী-ব্যক্তিত্বের প্রতি সুমহৎ শ্রদ্ধা। মধুসূদনের জাতিত্ববোধ কোনো রাজনৈতিক আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত ছিল না,—তাঁর নারী-প্রীতিও ছিল না কোনো সমাজ বা ধর্মসম্প্রদায়ের বিরোধী। স্বদেশ-প্রীতির একটি মানবিক আদর্শকে তিনি কবির অনুভব দিয়ে একান্তে বরণ করেছিলেন,—জন্মভূমিকে বন্দনা করে বলেছিলেন,—"শ্যামা জন্মদে"।—এই শ্যামা-জননীরই প্রতি সভক্তি নিষ্ঠা নিয়ে তিনি 'National Poetry',—'National Theatre' রচনার ব্রত ধারণ করেছিলেন। তাঁর জাতিত্ববোধ কোনো রাজনীতি-সচেতন জাতীয়তাবাদের (Nationalism) সঙ্গে যুক্ত ছিল না। এক-জন্মভূমির সন্তানদেরই তিনি একটি জাতির গণ্ডি-বন্ধনে বেঁধেছিলেন। অন্যদিকে সেই জন্মভূমির ভৌগোলিক পরিধিও তাঁর চোখে গৌড়-বঙ্গের সীমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। তাই, তাঁর কবিতা রচনার উদ্দেশ্য ছিল বাঙালির জাতীয় কাব্য সৃষ্টি, তাঁর নাট্য সৃষ্টির মূলে ছিল বাঙালির জাতীয় নাট্যশালা সংগঠনের আকাঙ্ক্ষা। বস্তুতঃ, কেবল মধুসূদন নয়, উনিশ শতকের নগর বাংলায় বঙ্গভূমি ও বাঙালি জাতি সম্বন্ধে এই সচেতন শ্লাঘাবোধই ছিল সেকালের বিপ্লব-চেতনার উৎস। আর, সেই শ্লাঘনীয়তাকে বাস্তবরূপ দেবার আকাঙ্ক্ষাতেই সমাজ, রাজনীতি,

বিপ্লব-মূর্তি মধুসূদন

সাহিত্য,—সকল দিকেই আত্ম-মুক্তি বিধান,—ব্যক্তিত্বের বন্ধন মোচন,—নারী-স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা সাধন,—এ ছিল প্রায় সর্বজনীন প্রয়াস। সর্বমুখী মুক্তি-কামনার এই নির্বন্ধন আবেগ-উচ্ছ্বাসই বাংলা সাহিত্যে নবীন স্বজন-ধর্মেরও হয়েছিল মুক্তিবিধায়ক। মধুসূদন ছিলেন এই সর্বাত্মক জাতীয় কামনার দীপ্ততম জীবন্মূর্তি,—তাঁর সমগ্র শিল্প সাহিত্যের সাধনা ছিল এই জীবন্মুক্তির শঙ্খ-নিনাদ। এই জন্যেই, নবযুগের সাহিত্যের তিনি জাতীয় কবি,—রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে, আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম সফল পথিকৃৎ,—মহাভগীরথ।

সাহিত্যের জীবন্মুক্তি

পদ্মিনী উপাখ্যান

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

মুক্তি-যুগের বাংলা কাব্য

আগে বলেছি, বাংলা কাব্য-সাহিত্যে প্রাণধর্মের মুক্তি সাধন করেছিলেন মধুসূদন। আর, এই মুক্তি-সাধনায় তিনি ছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি-চেতনার জীবন্মূর্তি। অর্থাৎ সমগ্র উনিশ শতকের প্রথমার্ধ ধরে বাঙালির শিক্ষা, সমাজ-বিপ্লব, রাষ্ট্রীয় আন্দোলন, এমন কি, গদ্য-পদ্য সাহিত্য-কর্মের মধ্যেও নব-জীবনের যে আকাঙ্ক্ষা গোপনে অঙ্কুরিত হয়েছিল, মধুসূদন তার প্রথম এবং সফলতম রূপ-নির্মাতা। এদিক থেকে বলা উচিত, মধুসূদনের আবির্ভাবের আগেই তাঁর রচনা-যোগ্য শিল্প ও জীবন-লক্ষণ ক্রমশঃ অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল। এই বিচারে কবি রঙ্গলাল (১৮২৭-৮৭) মধুসূদনীয় কাব্য-কলার সফল পূর্ব-সূরিত্ব দাবি করতে পারেন। বস্তুতঃ, তিনি তা করেছেনও।

কবি রঙ্গলাল

মধুসূদনের কবিপ্রতিভার প্রধান প্রেরণা ছিল প্রবল জাতিত্ব-গৌরব ও বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব-চেতনা। বাংলা কাব্যের জগতে রঙ্গলালের প্রথম আবির্ভাব এই জাতিত্ব-গৌরবের পুঁজিকে আশ্রয় করেই। "কিশোরকালাবধি"ই কাব্য কলার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় আসক্তি ছিল; চৌদ্দ-পনের বছর বয়সেই তিনি 'ইংলণ্ডীয় কবিতার বিশুদ্ধ প্রণালীতে" কবিতা লিখে সমসাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশ করতেন। তা ছাড়া প্রথম বয়সেই 'ভেক ও মুষিকের যুদ্ধ' নামে একখানি 'উপকাব্য'ও তিনি লিখেছিলেন। কিন্তু, রঙ্গলালের প্রথম উল্লেখ্য—তথা সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য ছিল 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮)। এর পূর্ববর্তী রচনাবলী তাঁর "ক্ষমতা-পরিচায়ক" নয়, একথা কবি নিজেই স্বীকার করেছেন। 'পদ্মিনী-উপাখ্যান'-এর রচনা-ইতিহাস নিম্নরূপ:—১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে বীটন্ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ড্রিঙ্ক ওয়াটার বীটনের স্মরণোদ্দেশ্যে। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে হরচন্দ্র দত্ত ঐ সভায় Bengali Poetry নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই প্রবন্ধের আলোচনা করেছিলেন কৈলাসচন্দ্র বসু। দুজনেরই উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজি

রঙ্গলালের কবি-কর্মের উৎস,—জাতিত্ব-গৌরব

কাব্য-কবিতার তুলনায় সমধর্মী বাংলা রচনার একান্ত অপকর্ষ ঘোষণা। প্রসঙ্গতঃ তাঁরা বলেছিলেন,—স্বাধীন জাতির পক্ষেই সার্থক কাব্য রচনা সম্ভব। ইংরেজেরা বহু শতাব্দী ধরে স্বাধীন; তাই, তাদের সাহিত্যও দেশ-কালোত্তীর্ণ রসে মণ্ডিত। কিন্তু, বাঙালি দীর্ঘদিন ধরে পরাধীন,—ফলে, তাদের সাহিত্য-কর্মও দুর্বল, নিকৃষ্ট। রঙ্গলাল সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তা ও আলোচকেব স্বজাতি-নিন্দাকর মন্তব্যে তিনি অত্যন্ত পীডাবোধ করেন। অল্পদিন পরে, 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' লিখে তিনি এই অভিমতের তীব্র বিরোধিতা করেন। সেযুগের বাংলাদেশে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ছিলেন রঙ্গলাল; স্বদেশীয় সাহিত্যের প্রতি তাঁর সহজ গৌরব-বোধকে পাণ্ডিত্যের শক্তি-বলে তিনি দীপ্ত করে তুলেছেন। ইংরেজি ও বাংলা কাব্য-কবিতা থেকে বহুল উদ্ধৃতি প্রয়োগ করে তিনি প্রমাণ করেছিলেন, ইংরেজি সাহিত্যেব উৎকর্ষ যদিও তর্কাতীত, তবু বাংলা কাব্যও নিকৃষ্ট নয় কোনো দিক থেকেই।

(রঙ্গলালের এই প্রয়াস আত্ম-সচেতন শিক্ষিত বাঙালি সমাজে একান্ত আদৃত হয়েছিল। অনেকে তখন তাঁকে তাঁর প্রবন্ধের সমর্থনে আদর্শ বাংলা কাব্য রচনার জন্য অনুরোধ জানান। এই অনুরোধের উত্তরেই পদ্মিনী উপাখ্যান-এর জন্ম।) বস্তুতঃ, ভারতবর্ষীয় ঐতিহ্যের সর্বমুখী গরিমা ও মহিমা প্রকাশই ছিল এই কাব্য রচনার প্রধান লক্ষ্য। পদ্মিনী উপাখ্যানই বাংলা ভাষায় প্রথম যথার্থ ঐতিহাসিক কাব্য। রঙ্গলালের মধ্যে একটি প্রগাঢ় ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর ভাষা-জ্ঞানও ছিল প্রখর। বহু দুর্লভ প্রত্নগ্রন্থের অর্থস্ফুট করে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু, কেবল এই ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্যের প্রভাবেই পদ্মিনী উপাখ্যানের বিষয় চয়ন করা হয়নি। গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য কবি নিজেই বিশদ করে বলেছেন ভূমিকায়:—

"ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্তর্ধান-কালাবধি বর্তমান সময় পর্যন্তেরই ধারাবাহিক প্রকৃত পুরাবৃত্ত প্রাপ্তব্য। এই নির্দিষ্ট কাল মধ্যে এ দেশের পূর্বতন ও উচ্চতম প্রতিভা ও পরাক্রমের যে কিছু ভগ্নাবশেষ, তাহা রাজপুতনা দেশেই ছিল। বীরত্ব, ধীরত্ব, ধার্মিকত্ব প্রভৃতি নানা সদ্গুণালঙ্কারে রাজপুতেরা যেরূপ বিমণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদিগের পত্নীগণও সেইরূপ

সতীত্ব, সুধীত্ব এবং সাহসিকত্বগুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা প্রতিপাদ্য পদ্য পাঠে লোকের আশু চিত্তাকর্ষণ এবং তদ্‌দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় আমি উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বন পূর্বক রচিত করিলাম।"

পদ্মিনী উপাখ্যানের ভাব-ভূমি

পদ্মিনী উপাখ্যান-এর বিষয়বস্তু টড্-এর রাজস্থান থেকে নেওয়া। মূল কাহিনী-সার রাজপুত ইতিহাসেব পাঠক মাত্রেরই সুজ্ঞাত। লেখকের স্বীকৃতি থেকেই জানা যায়,—দেশীয় স্বাধীনতা-যুদ্ধ ও অতীত ঐতিহ্য বিষয়ে তিনি ছিলেন গৌরবান্বিত-চিত্ত। আর, সেই বিস্মৃত গৌরব-বোধকে কবি তাঁর স্বদেশীয় লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্য-সাধনে তিনি Byron এবং Moore প্রভৃতি কবিদের রচনাংশের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পদ্মিনী উপাখ্যানে স্বদেশ-প্রীতির উৎসাহে দীপ্ত রচনাংশের একাধিক ক্ষেত্রে ঐ সব কবির রচনার ছাপ আছে। এই কাব্য রচনার এক বছর আগে থেকেই সিপাহী-বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু রঙ্গলাল তাঁর কাব্যে এই আন্দোলনের বিরোধিতাই করেছেন,—

পদ্মিনী উপাখ্যানে স্বদেশ-গৌরব

"হে বিভো করুণাময়! বিদ্রোহ বারিদচয়
আর যেন বিষ না বরিষে।"

বস্তুতঃ, সেকালের ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালিরা সাধারণভাবে এই জন-আন্দোলনের প্রতি বিরূপ ছিলেন, একথা সর্বজনবিদিত। রঙ্গলাল তাঁর কাব্য রচনা করে স্বদেশবাসীদের মধ্যে জাতি-গৌরবের একটি ভাবাবেগ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য, এ-বিষয়ে তাঁর আকাঙ্ক্ষা বহুল ফলপ্রসূও হয়েছিল। সমগ্র শিক্ষিত বাঙালি সমাজের সাধারণ জাতীয় বাসনারই অনুবর্তন করেছিলেন তিনি তাঁর কাব্যে। এদিক থেকে পদ্মিনী-উপাখ্যান নবজাগ্রত বাংলার জাতীয় মহাকাব্যের মর্যাদা দাবি করতে পারত। কিন্তু, রচনাভঙ্গির গতানুগতিক স্তিমিত মন্দগতি ও যুগাকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ বা আত্মস্থ করার ক্ষমতায় কবি-প্রাণের সমুচিত দীপ্তির অভাব সেই সম্ভাবনাকে দূরপরাহত করেছিল। তবু, বাংলা কাব্যে মধুসূদনের আবির্ভাব ঘটেছিল রঙ্গলালের সেই অসাধ্য সাধন করার চরিতার্থতা নিয়ে। বস্তুতঃ,

রঙ্গলাল এ-কথা দাবিও করেছেন তাঁর দ্বিতীয় কাব্য কর্মদেবীর (১৮৬২) ভূমিকায়।

কর্মদেবীর আগেই মধুসূদনের তিলোত্তমা (১৮৬০) এবং মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১) প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। তা-সত্ত্বেও, এই কাব্যও পদ্মিনী উপাখ্যানের আদর্শকেই অনুসরণ করেছিল। একদিকে ছিল জাতীয় গৌরবের আবেগ-দীপ্তি,—আর একদিকে নারীর ত্যাগ-তিতিক্ষাপূর্ণ আত্মদানের করুণা-মহিম আদর্শ-প্রেরণা। পদ্মিনী উপাখ্যানে ভীমসিংহ এবং তাঁর পুত্র ও অনুচরদের দুঃসাহসী সংগ্রামের উদ্দীপনাকে ছাপিয়ে উঠেছিল পদ্মিনীর বীরত্ব, নারীত্ব এবং সতীত্বের মহিমান্বিত রোমান্টিক আবেগ। কর্মদেবী-তেও তাই হয়েছে। এই কাব্যের কাহিনীও রাজপুত-কথা থেকে নেওয়া। যশল্মীরের প্রদেশ-শাসকের ছেলে সাধুর প্রবল দেশ-প্রেম, ও স্বাধীনতার জন্যে দুঃসাহসিক প্রয়াসের বর্ণনা আছে কাব্যের একাংশে। স্বদেশের মুক্তি অর্থে সাধু কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা বোঝে নি; অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যেরও দাবি করে বলেছিল,—"স্বধনে স্বদেশ ধনী হোক, এই চাই।"

রঙ্গলালের কর্মদেবী

ঔরিণ্ট-রাজকন্যা কর্মদেবী এই দুঃসাহসী বীরের প্রতি প্রেম-মুগ্ধ হয়েছিলেন,—সাধুও গোপন সাক্ষাতে তার রূপগুণে মুগ্ধ হয়। অবশেষে দুর্জয় রণাঙ্গনে বিজয়ী সাধুর গলায় প্রকাশ্যে মালা পরিয়ে দিলেন কর্মদেবী। অথচ তিনি ছিলেন রাঠোর রাজের বাগদত্ত। খবর পেয়ে, অপমানিত রাজা নবদম্পতিকে প্রতিরোধ করে দাঁড়ালেন। যুদ্ধে সাধুর মৃত্যু হল। শোকাভিভূতা নববধূ তার বাম বাহু কেটে ভাই-এর কাছে পাঠালেন,—কুলকবি যেন এই হস্ত গ্রহণ করে "সতীত্বের সংগীত আখ্যানে" তার চরিত-কথা রচনা করেন। ডান বাহু কেটে দিয়ে অনুরোধ করলেন সাধুর পিতার কাছে পাঠাতে।

"জানিবেন এই কথা, তিনি ভাই,
বধূ তাঁর সুত-যোগ্য বটে।"

তার পরে বাহু-হীনা কর্মদেবী স্বামীর সঙ্গে অনুমৃতা হলেন বাবার কাছে প্রার্থনা করে,—যেন শ্মশানের "এই স্থানে সরসী খনন করি, নাম দেন কর্ম সরোবর।"

রঙ্গলালের তৃতীয় কাব্য শূরসুন্দরী-ও (১৮৬৮) রাজপুত-কথাশ্রিত। আকবরের হিন্দু-নারীলোলুপতার কাহিনী এই কাব্যের ভিত্তি। তাঁর চতুর্থকাব্য কাঞ্চীকাবেরী (১৮৭৯) রচিত হয়েছিল উড়িষ্যার রাজ-ইতিহাসের সঙ্গে লোক-প্রবাদ ও কল্পনার সূত্র গ্রথিত করে। উড়িষ্যারাজ পুরুষোত্তম ও কাঞ্চি-রাজের বিবাদে কাঞ্চিরাজকন্যার হস্তান্তর ও পুরুষোত্তমের হাতে লাঞ্ছনার পরে উভয়ের বিবাহ-মিলন কাব্যটির বিষয়বস্তু। কাব্য-স্বভাব রঙ্গলালের পূর্ব-কথিত কবিধর্মের অনুগামী; কিন্তু রচনা অপেক্ষাকৃত দুর্বল।

শূরসুন্দরী ও কাঞ্চী কাবেরী

কবির অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে কুমারসম্ভব, এবং নীতিকুসুমাঞ্জলি নামে প্রাচীন নীতি-কবিতাবলীর অনুবাদ। 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' ছাড়াও গদ্যে তিনি লিখেছিলেন 'শরীর সাধন বিদ্যার গুণোৎকীর্তন।' রঙ্গলালের সাংবাদিক দক্ষতাও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। এডুকেশন গেজেটের তিনি ছিলেন প্রথম সহ-সম্পাদক; আর সম্পাদক ছিলেন রসরাজ নামক বাংলা পত্রিকার।

রঙ্গলালের অপরাপর রচনা

রঙ্গলালের কাব্য-সাধনার পরিণতি-পথ বেয়েই কবি-মধুসূদনের আবির্ভাব। এক অর্থে, এঁরা দুজনেই ছিলেন সমকালীন কবি। আগে বলেছি, রঙ্গলালের প্রথম উল্লেখ্য কাব্য পদ্মিনী উপাখ্যানের পরেই মধু-সূদনের তিলোত্তমা সম্ভব ও মেঘনাদবধ কাব্য-দু'খানি রচিত হয়েছিল। রঙ্গলালের দ্বিতীয় কাব্য রচিত হয়েছিল, এই দুটি কাব্যের প্রকাশের পরে। কিন্তু, তখনও মধুসূদনের রচনার পরিণতি রঙ্গলালের কাব্যে লক্ষিত হয় নি। বরং, তাঁর আকাঙ্ক্ষার অপূর্ণতাই যেন পূর্ণতর রূপ পেল মধুসূদনে; উনিশ শতকের বাংলার মহা-বিপ্লব যেন মূর্তি ধরেছিল তাঁর ব্যক্তি-জীবনের সীমায়।

বিপ্লব-মূর্তি মধুসূদন

১৮২৪ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী কপোতাক্ষ তীরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্ম হয়েছিল এই অগ্নি-শিশুর; তাঁর "জন্মদাতা মহামতি রাজনারায়ণ, জননী জাহ্নবী।" জন্ম-বিদ্রোহের জ্বালা এবং সিদ্ধকাম কবি হবার দুরন্ত পিপাসা তাঁকে মাত্র উনিশ বছর বয়সে ধর্মত্যাগে প্রবুদ্ধ করেছিল। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে শ্রীমধুসূদন হয়েছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

প্রথম বিবাহের স্কচ্ পত্নী রেবেকার সঙ্গে মত-বিভেদ হেতু বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছিল তাঁর। কিন্তু, দ্বিতীয়া পত্নী, ফরাসী মহিলা হেন্‌রিয়েটা উল্কা-দীপ্ত কবি-প্রতিভার তাপ ও জ্বালা বক্ষ-তলে বরণ ও বহন করেছিলেন আমৃত্যু।

কবি ও পণ্ডিত মধুসূদন

মধুসূদনের কবি-প্রতিভা ছিল যেমন নির্বন্ধন দুরন্ত, তেম্‌নি তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল প্রায় সীমাহীন। প্রথম বয়সে বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর অবজ্ঞা প্রায় ঘৃণার পর্যায়ে পৌঁচেছিল। অনেক চেষ্টা করে বাংলা বলা বা লেখা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। অথচ, এই বাংলা ভাষাকেই বিপ্লবের অগ্নি-পূত করেছিলেন তিনি,—বাংলা ছন্দের করেছিলেন বন্ধন-মোচন। এখানেই শেষ নয়,—ইংরেজি-বাংলা ছাড়াও হিব্রু, গ্রীক্, ল্যাটিন এবং সংস্কৃত প্রভৃতি প্রত্যেকটি ভাষায় তাঁর অধিকার ছিল অ-দ্বিতীয়। ঐ সব ভাষার কাব্য-সাহিত্যে তাঁহার প্রবেশ-ক্ষমতা ছিল সহজ,—অবারিত। মধুসূদনের জ্ঞান-পাণ্ডিত্য তাঁর উচ্ছ্বসিত নির্বার ভাবানুভূতিকে বাঁধতে পারেনি; কিন্তু তাঁর প্রকাশকে করেছিল স্ব-মিত, সুগঠিত। বস্তুতঃ, মধুসূদন-প্রতিভায় আধুনিকতার বহিরঙ্গ ভিত্তি এখানেই।

বাংলা কবিতায় আঙ্গিক-সচেতনতা

সার্থক শিল্পের দুটি উপাদান,—অনুভূতির অমিশ্র সত্যসন্ধতা, আর সমুচিত প্রকাশের পরিচ্ছন্নতা। সকল সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই দুটি উপাদানই 'অ-পৃথক্ যত্ন-নিবর্ত্য'। কিন্তু সিদ্ধকাম শিল্পীর রচনায় এ-দুটিই আবার সচেতন কলাকৃতির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কালের বহু উৎকৃষ্ট রচনাও অশিক্ষিত-পটু কবি-কর্মের অভিব্যক্তি। আধুনিকতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আঙ্গিক-সচেতনতা; একালের শিল্পীর পক্ষে কলাকর্ম আর কেবল একটি instinct নয়,—সহজাত ভাবানুভূতির সুমিত কর্ষণের ফলশ্রুতি। কেবল বাংলা কাব্যেই নয়,—সাহিত্যের সকল শাখাতেই এই সচেতন আঙ্গিক-চিন্তা,তথা সুগঠিত দেহাবয়বের রচনা মধুসূদনের এক শ্রেষ্ঠ শিল্প-কীর্তি।

বাংলা সাহিত্যের জগতে তাঁর প্রথম আবির্ভাব নাট্যকার হিসেবে। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে বেলগাছিয়ার নাট্যশালায় রামনারায়ণের রত্নাবলী নাটকের

অভিনয় হয়েছিল,—পাইকপাড়ার রাজাদের প্রবল উৎসাহ ও অর্থব্যয়ে। য়ুরোপীয় দর্শকদের সুবিধার জন্যে মধুসূদনকে দিয়ে মূল নাটকের একটি ইংরেজি চুম্বকানুবাদ করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। নাটকের চেয়েও সেই অনুবাদ বেশি প্রশংসিত হয়। মধুসূদনের পক্ষে কিন্তু সেই দুর্বল-দেহ নাটকের অভিনয় দুঃসহ হয়েছিল। আর, শিল্প-শরীরের সেই অসহ্য দুর্বলতা দূর করবার প্রতিশ্রুতি নিয়েই তিনি শর্মিষ্ঠা নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন (১৮৫৯)। কথিত আছে, বাংলা ভাষায় তাঁর অধিকার তখনো হাস্যকরতার সীমা অতিক্রম করতে পারে নি।

কবিতার ক্ষেত্রেও কাব্য-শরীরের সুগঠনের দাবি নিয়েই মধুসূদনের প্রথম আত্মপ্রকাশ। নাটক লিখতে গিয়ে তিনি প্রথম অনুভব করেছিলেন সংলাপ-উপযোগী ভাষার অভাব;—ভেবেছিলেন, দুর্বল-দেহ গদ্যের চেয়ে অমিত্রাক্ষর পদ্যের দ্বারাই নাটকীয় সংলাপ রচনা সফলতর হতে পারবে।

তিলোত্তমাসম্ভব ও অমিত্রাক্ষর

পদ্মাবতী (১৮৬০) নাটকে এই ধরনের সংলাপ রচনার চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। কিন্তু, বাংলাদেশের দর্শক-পাঠকের পক্ষে দুর্বোধ্য হবে ভেবে সেই চেষ্টা পরিত্যাগ করেন। তখন থেকেই তাঁর আকাঙ্ক্ষা হয় অমিত্রচ্ছন্দে কাব্য রচনা করে, এ-বিষয়ে বাঙালি পাঠকের অভ্যাসকে সুগঠিত করে তোলার। এই ব্যাপারে আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন রাজা যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে বাজি রাখেন তিনি,—বাংলা ভাষায় সার্থক সাবলীল অমিত্রাক্ষর কাব্য রচনা করে দেবেন-ই। এই উপলক্ষ্যে অমিত্র-কাব্য তিলোত্তমা সম্ভব (১৮৬০) নিয়ে বাংলা কাব্যের ইতিহাসে মধুসূদনের প্রথম আবির্ভাব। এদিক থেকে দেখি,—কাব্যশরীরের নবীন রূপ-বিন্যাসই ছিল তাঁর কবি-কর্মের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। আর সংশয় নেই, কাব্যাঙ্গিক-সচেতনতার এই আধুনিক বৃত্তি তাঁর প্রতীচ্য কাব্য-সাহিত্য পাঠের প্রত্যক্ষ ফল।

তাই বলে কবির ব্যক্তি-স্বভাব প্রতীচ্যান্ধ ছিল, এমন কথা ভাবা উচিত নয়। অমিত্রচ্ছন্দের মৌল আদর্শ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন মিল্‌টনের Blank Verse-এর অনুকরণে। কিন্তু, কাব্য-সুষমা দূরে থাক্‌, ছন্দের বহিরঙ্গ উজ্জ্বলতাও যে নিছক পরানুকরণের দ্বারা সৃষ্টি করা যায় না, একথা ছিল তাঁর মর্মগত। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে বিতর্ক প্রসঙ্গেও

মধুসূদন বলেছিলেন,—বাংলা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডার সংস্কৃত ভাষার সমৃদ্ধ বংশজাত। অতএব, এই শব্দ-ভাণ্ডারের সু-প্রয়োগের ফলে অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা অসম্ভব নয়। বস্তুতঃ, প্রত্যক্ষ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বাংলা কবিতার মূলগত পয়াররীতির মুক্তি বিধান করেই তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দ সফল রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সমকালীন য়ুরোপীয় সাহিত্যের সমুন্নতির মূলভূমিতে জীবনের যে অপার মুক্তি, ও উত্তাল গতির স্পন্দন তরঙ্গিত হয়ে উঠেছিল, মধুসূদন তাঁর বিপ্লবী প্রাণের আকণ্ঠ পান করেছিলেন সেই গতি ও মুক্তির মহাশক্তি-রস। তারপর উনিশ শতকের নগর-বাংলার দিকে দিকে একই প্রাণের অনুভব-ধারাকে অনন্ত স্রোতে প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন বিচিত্র কাব্য, নাটক ও গদ্য-রচনায়। মধুসূদন যেখানে সিদ্ধকাম কবি, সেখানে তিনি সুমিত-সুন্দর নবীন কাব্য-রূপেরই নয়, পূত নব-জীবন-ধারারও উদ্বাহক,—ভগীরথ।

মধুসূদনের প্রতীচ্য-প্রীতি বনাম স্বকীয়তা

'তিলোত্তমা-সম্ভব'-এ তাঁর কবি-কীর্তির এই সফলতা পূর্ণ প্রতিভাত হতে পারে নি। কারণ, ঐ কাব্য রচনার পেছনে বাইরের উৎসাহ যত ছিল, অন্তরের প্রেরণা ছিল না প্রায় একেবারেই। বাজি রেখে মধুসূদন এই কাব্য লিখেছিলেন, আঙ্গিক-সফল ছন্দ রচনাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল; রসোত্তীর্ণ শিল্প-সৃষ্টি নয়। যথার্থ সৃজনের ক্ষেত্রে ভাষা কেবল ভাবের বাহন,—তিলোত্তমাসম্ভব-এ একথা আর একবার প্রমাণিত হল। এই কাব্যে অমিত্রচ্ছন্দের গতি-প্রকৃতিও আড়ষ্ট-আচ্ছন্ন।

তিলোত্তমার কাব্যমূল

মধুসূদনের দ্বিতীয় কাব্য মেঘনাদবধ প্রকাশিত হায়ছিল ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে। এটি তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট কলা-কৃতি না হলেও সর্বাপেক্ষা কীর্তি-প্রসূ কাব্য। বস্তুতঃ মেঘনাদবধের জন্যেই মধুসূদন আজ নবীন বাংলার কবি-কুল-চূড়ামণি। এই রচনার ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্য রবীন্দ্রনাথের কবি-দৃষ্টিতে ভাস্বর রূপ পেয়েছে!—"মেঘনাদবধ কাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনা-প্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এই পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ

মেঘনাদবধে বিপ্লব-উত্তাপ

আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙ্গিয়াছেন এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেকদিন হইতে আমাদের মনে যে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহারও শাসন ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যে রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোন্‌টা কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ, দৈন্য, আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিযাছেন। এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য: ইহার হর্ম্যচুড়া মেঘের পথরোধ করিয়াছে; ইহার রথ রথী-অশ্ব-গজে পৃথিবী কম্পমান; ইহা স্পর্ধা দ্বারা দেবতাদিগকে অভিভূত করিয়া বায়ু-অগ্নি-ইন্দ্রকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে; যাহা চায় তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের বা কোনো-কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে। এতদিনের সঞ্চিত অভ্রভেদী ঐশ্বর্য চারিদিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, সামান্য ভিখারি রাঘবের সহিত যুদ্ধে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্র, পৌত্র, আত্মীয়-স্বজনেরা একটি একটি করিয়া সকলেই মরিতেছে, তাহাদের জননীরা ধিক্কার দিয়া কাঁদিয়া যাইতেছে, তবু যে অটল শক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনো মতে হার মানিতে চাহিতেছে না, কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে-শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে-শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।"

বিদ্রোহী শক্তির এই স্পর্ধিত উদ্দামতাই মধুসূদনের কবি-কৃতিকে অতুল্য স্বকীয়তা দিয়েছে। বাল্মীকিকে বন্দনা করে কবি তাঁর রচনা শুরু করেছিলেন; রচনাকালে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করেছেন হোমার, মিল্টন, দান্তে, ভার্জিল, ট্যাসোর মত প্রতীচ্য কবি-কুল-শিরোমণিদের কথা। ফলে মেঘনাদবধ প্রাচ্য-প্রতীচ্য কবি-কীর্তির সঞ্চয়-ভাণ্ডার হয়ে উঠেছে। তা হলেও, উনিশ শতকের নবজাগ্রত বাংলার বিপ্লবাগ্নি-পূত হয়ে এই কাব্য

মেঘনাদবধের স্বকীয়তা,—নারী কল্পনা

বিশ্ব-কবিকর্মের সূত্রে বাংলার সমকালীন জীবন-বেদনাকে গ্রথিত করেছে। তার একদিকে ছিল পূর্বোদ্ধৃত সত্য-সন্ধ সংগ্রামী আত্মার মৃত্যু-পথযাত্রা; অন্যদিকে রয়েছে অতীতের জীর্ণ জীবনের ভস্মরাশি ভেদ করে চিরন্তন জীবনালোকের সন্ধিৎসা। বিপ্লবের সেই দাহময় দুর্বার অভিযানের মূর্ত প্রতীক মেঘনাদবধের রাবণ। আর বাংলার চিরন্তন জীবন-ধর্মের মৃত্যু-তীর্ণ রূপ প্রকাশ পেয়েছে অসংখ্য নারী চরিত্রে;—পুত্রের কল্যাণ কামনায় তপস্যারতা মন্দোদরী,—লঙ্কা প্রবেশ-পূর্ব যুদ্ধভূমি এবং পরে স্বামীর শ্মশান-ভূমিতে সাধ্বী বীরাঙ্গনা প্রমীলা,—সীতার চরণোপান্তে সরমা,—বাঙালির জীবন-প্রাঙ্গণে এঁরা সকলেই প্রাণ-ধর্মে জল্ জল্ করছেন,—"তুলসীর মূলে যেন সুবর্ণ দেউটি।" ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য-বোধে দীপ্ত এই নবীন নারী-চরিত্রাবলীর মধ্যে চিরকালের কল্যাণী বাঙালিনীর রূপমূর্তিকে কবি রচনা করেছিলেন,—যাঁরা ত্যাগে, আত্মদানে, পরহিত-সাধনাতে পরম উৎকণ্ঠায় সদার্দ্র-চিত্তা। এই নারী-স্বভাবেরই একটি সুন্দর পরিচয় আভাসিত হয়েছে মেঘনাদবধের নবম সর্গে। ইন্দ্রজিতের মৃত্যু সংবাদ দিয়ে বন্দিনী সীতাকে সরমা মুক্তির আশ্বাস দিয়েছিলেন। সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মুখোমুখি প্রতিষ্ঠিত করে মধুসূদন সীতার মূর্তি এঁকেছেন:—

"ভবতলে মূর্তিমতী দয়া
সীতা-রূপে, পর-দুঃখে কাতরা সতত,
কহিলা, সজল-আঁখি, সম্ভাষি সখীরে;—
'কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি!
সুখের প্রদীপ সখি, নিবাই, লো, সদা,
প্রবেশি যে গৃহে,—হায়, অমঙ্গলা-রূপী
আমি! পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা!
নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী!
বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর সুমতি
লক্ষ্মণ। ত্যজিলা প্রাণ পুত্র-শোকে, সখি,
শ্বশুর! অযোধ্যাপুরী আঁধার, লো, এবে
শূন্য রাজ-সিংহাসন। মরিলা জটায়ু,
বিকট বিপক্ষ-পক্ষে ভীম ভুজ-বলে,

রক্ষিতে দাসীয় মান ! হাদে দেখ, হেথা—
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে ;—"

কেবল রাবণের অপরিণামদর্শী বিপ্লব-চেতনাই নয়,—সীতার মত বিগলিত-প্রাণ নারী-আত্মার স্বজন-শৈলীও মেঘনাদবধের মহাকাব্য-কীর্তিকে বাঙালি ধর্মের স্বকীয়তায় মণ্ডিত করেছে।

অমিত্রাক্ষর কাব্য রচনায় মধুসূদনের যুগোত্তীর্ণ কবিকীর্তির এক শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর মেঘনাদবধ। কিন্তু বাংলা পদ্যের গতানুগতিক মিত্রচ্ছন্দে মর্মস্পর্শী কাব্যরচনার দক্ষতাও তাঁর অসাধারণ ছিল। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে মেঘনাদবধের একই বছরে প্রকাশিত ব্রজাঙ্গনা কাব্য এই সিদ্ধান্তের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ব্রজাঙ্গনা আসলে, মেঘনাদবধের পূর্ব-জাতা। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে মধুসূদন এই স্বয়ম্পূর্ণ লিরিক্ কাব্যটি রচনা করেছিলেন,—তখন এর নাম ছিল 'রাধা-বিরহ'। নামেই কাব্য-বিষয়ের স্পষ্ট প্রকাশ। ডঃ সুকুমার সেন সে পরিচয় আরো স্পষ্ট করে লিখেছেন,—"হৃদয়-পাশে বন্দিনী হইয়া যে নারী অদৃষ্টের নির্যাতন সহিয়াছে সেই নারীই মধুসূদনের কাব্য-নাটকের নায়িকা।......ইহার মধ্যে দুইটি নায়িকা সবার উপরে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে,—ভাগ্য-বঞ্চিতা সীতা, আর বল্লভ-বঞ্চিতা রাধা। বিরহ-বিধুর রাধা এবং যমুনাতীর ও কদম্বতল কবির কল্পনাকে বার বার নাড়া দিয়াছে।"—ব্রজাঙ্গনা কাব্যে এই সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ সমর্থন রয়েছে।

মিত্রাক্ষর কাব্য
ব্রজাঙ্গনা

মিত্রাক্ষর পদ্য-রচনায় নিজের দক্ষতা সম্বন্ধে কবির সংশয় ও কুণ্ঠা ছিল। তাই, রচনার পরেও প্রায় একবছর কাব্যটিকে অপ্রকাশিত রেখেছিলেন। প্রকাশ-কালে 'রাধা-বিরহ' কাব্যের নূতন নাম হয় 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য।'

ব্রজাঙ্গনা কাব্যে মধুসূদনের যে গীতি-ব্যাকুলতা অস্ফুট বীরাঙ্গনা কাব্যে তাই শতদল-এর মত পূর্ণ বিকশিত। মেঘনাদবধ রচনা করতে করতেই কবি তাঁর বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন,—" "I suppose I must bid adieu to Heroic Poetry after Meghnad......... there is the wide field of Romantic and Lyric poetry before me and I think I have a tendency in the Lyrical way." কবির এই রোমান্টিক লিরিক-প্রবণতার উৎকৃষ্ট পরিচয় রয়েছে আগাগোড়া ব্রজাঙ্গনা

কাব্যে,—রয়েছে মেঘনাদবধের চতুর্থ ও নবম সর্গে। কিন্তু, তার সফলতম প্রকাশ বীরাঙ্গনা কাব্যে। কাব্যের সার্থকতা কবি-প্রাণের নির্বাধ মুক্তিতে। এই বিচারে মধুসূদনের আবেগ-ভরা হৃদয়ের অনাবৃত-পূর্ণ শিল্প-রূপ বীরাঙ্গনা কাব্য তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিও। এই কাব্য ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে রচিত হয়ে প্রকাশিত হয় পর বছরের গোড়ার দিকে। আপাত দৃষ্টিতে এর বহিরঙ্গে রয়েছে ইটালীয় কবি ওভিদ্-এর [Publius Ovidius Naso] Heroides নামক কাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব। Heroidesএর প্রত্যেকটি কবিতা একটি করে পূর্ণাঙ্গ পত্র। বিভিন্ন নায়িকা বা নায়ক তাঁদের পতি, প্রিয় বা প্রিয়ার উদ্দেশ্যে প্রেম-ব্যাকুল চিত্তে এই সব পত্র রচনা করেছিল। Ovid-এর কাব্যে একুশটি পত্র-পত্রিকা ছিল; মধুসূদনও সমসংখ্যক কবিতা লিখতে চেয়েছিলেন। প্রথম বারে ১১টি পত্র নিয়েই বীরাঙ্গনার প্রকাশ ঘটে, বাকি জীবনে কবি বীরাঙ্গনাকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলার চেষ্টা করেছেন বারে বারে। কিন্তু আর একটিও পত্র-কবিতা তিনি রচনা করে শেষ করতে পারেন নি।

বীরাঙ্গনায় কবির গীতি-ব্যাকুলতা

বীরাঙ্গনার কেবল বহিরাঙ্গিকেই নয়, অনেক কয়টি পত্র-কবিতার বিষয়-চয়নেও মধুসূদনের ওপরে Ovid-এর প্রভাব স্পষ্ট। কিন্তু, যেমন মেঘনাদবধে, তেম্‌নি বীরাঙ্গনা-তেও, উনিশ শতকের নবীন স্বাতন্ত্র্য-কামনাকে বক্ষে বহন করে বিভিন্ন নায়িকার চরিত্রে রূপ নিয়েছে শাশ্বত বাঙালিনী। রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ বাঙালি-নারীত্বের সুমহৎ লক্ষণ ঘোষণা করে লিখেছেন,—'তুমি যেমন দিবাবসানে সংসারের কাজ শেষ করিয়া নিঃশব্দে পতির পালঙ্কে আরোহণ করিতে, দাম্পত্যলীলার অবসান দিনে সংসারের কার্য-ক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া, তেমনি সহজে বধূবেশে সীমন্তে মঙ্গল সিন্দূর পরিয়া পতির চিতায় আরোহণ করিয়াছ। মৃত্যুকে তুমি সুন্দর করিয়াছ, শুভ করিয়াছ, পবিত্র করিয়াছ, চিতাকে তুমি বিবাহ-শয্যার ন্যায় আনন্দসুন্দর করিয়াছ। বাংলাদেশে পাবক তোমারই পবিত্র জীবনাহুতির দ্বারা পূত হইয়াছে।" নারীর সেই পাবনী রূপ স্পষ্ট হয়েছে মেঘনাদবধের নবম সর্গে;—প্রমীলার চিতারোহণ দৃশ্যে। কিন্তু, কেবল পতির জীবনান্তেই নয়, প্রতিদিনের পথ-চলাতেও, নারীর আত্মাহুতি, তার সংযম ও আত্মত্যাগ বাংলার

বীরাঙ্গনায় অঙ্গনা-ধর্ম

জীবন-ভূমিকে পুণ্য-বাহিত করেছে পদে পদে। উনিশ শতকের স্বভাব-ধর্মে নারী আর কেবল পতির "ছায়েবানুগতা" নয়। তবু তার নবজাগ্রত আত্মসচেতনতাও অন্তরে অন্তরে আত্মদানে সমান অকুণ্ঠ। বীরাঙ্গনার সর্বপ্রথম শকুন্তলা-পত্রের শুরুতেই এই পরিচয় স্পষ্ট :—

"বন-নিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে
হে রাজেন্দ্র! যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে,
ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী!"

পত্রের পরাংশে শকুন্তলা স্পষ্ট ঘোষণা করেছে, রাজার 'বিভব'-এর প্রতি লোভ নেই তার বিন্দুমাত্র; রাজ-সেবা, তথা পতিসেবার মহৎ কর্তব্যের জন্যেই সে বিস্মৃত স্বামীর শরণ নিতে চেয়েছে। বাঙালি নারীর আত্মসম্ভ্রম-বোধের বৃন্তে এই আত্মদানের উৎকণ্ঠা এক অভিনব রোমান্টিক সৌন্দর্যের সম্ভাবনা রচনা করেছিল। তাকে মধুসূদন মোহময় সংগীতের সুরে ছড়িয়ে দিয়েছেন আগাগোড়া বীরাঙ্গনা কাব্যে। মেঘনাদবধে অমিত্রাক্ষরের ওজস্বিতা দৃপ্ত রূপ পেয়েছে,—বীরাঙ্গনায় তা লিরিক প্রবাহে বিগলিত হয়েছে সুললিত গীতি-ঝঙ্কারে। ওপরের প্রারম্ভিক ছত্র কটিই তার সুন্দর প্রমাণ।

মধুসূদনের সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ কাব্য চতুর্দশপদী কবিতাবলী রচিত হয়েছিল প্রবাসে,—১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে। এই কাব্যে মধুসূদন বাংলা ভাষায় প্রথম 'সনেট্' কবিতার প্রবর্তন করলেন,—ইটালীয় কবি দান্তে ও পেত্রার্কা'র অনুসরণ করে। মধুসূদনের অন্যান্য কাব্য-কবিতার মত চতুর্দশপদী কবিতাতেও কাব্য-শরীরে প্রতীচ্য আঙ্গিকের অনুকৃতি রয়েছে; কিন্তু তার অন্তরঙ্গে আছে কবি-আত্মার নিভৃত বেদনার আকুলতা। ডঃ সুকুমার সেন এই আকুলতার পূর্ণ পরিচয় উদ্ধার করে লিখেছেন,—"সেই সুদূর সাগর-পারের দেশে যখন ঘরছাড়া কবির চিত্তে 'মন-কেমনের হাওয়ার পাকে' অনেক স্মৃতি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তখনই সেই সনেট্গুলির জন্ম। দেশের আকাশ-বাতাস-গন্ধ-স্পর্শের জন্য ব্যাকুল মধুসূদনের মনোবেদনার রেশ চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যে ঝঙ্কৃত রহিয়াছে!" এখানেই কবিতাগুলির যথার্থ শিল্প-মূল্য।

চতুর্দশপদী কবিতা

মধুসূদনের পরেই উনিশ শতকের বাংলা কাব্যের স্মরণীয় শিল্পী হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। জীবৎ-কালের বিচারে হেমচন্দ্র ছিলেন মধুসূদনের কনিষ্ঠ।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে একই বছরে (১৮৩৮ খ্রীঃ) তাঁর জন্ম হয়েছিল, হেমচন্দ্র কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষা পাশ করেছিলেন বঙ্কিমের এক বছর পরে। কিন্তু, রচনাকাল ও কবি-মনোভাবের বিচারে তিনি মধুসূদনের সহকর্মী,—তথা তাঁর ভাবানুসারী ছিলেন। মধুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভব-এর প্রকাশকাল ১৮৬০; আর, হেমচন্দ্রের প্রথম কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে; মাত্র এক বছর পরে। কিন্তু, মধুসূদনের সমতুল্য ভাব ও প্রকাশের মুক্তি হেমচন্দ্র প্রায় কেনোদিনই আয়ত্ত করতে পারেন নি। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি কিছু কিছু কবিতা লিখ্‌তেন; তখন ভারতচন্দ্রই ছিলেন তাঁর কবি-গুরু। পরে রঙ্গলালের রচনাদর্শকে তিনি অধিক পরিমাণে অনুসরণ করেছিলেন। এদিক থেকে কবি হিসেবে হেমচন্দ্র ছিলেন মধুসূদনের এক ধাপ পশ্চাৎবর্তী। কিন্তু, বৃত্রসংহার নামে যে কাব্যকে আশ্রয় করে তৎকালীন বাংলায় তাঁর শ্রেষ্ঠ কবি-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল, তাতে তিনি মধুসূদনের মেঘনাদবধেরই অনুসরণ করেন। পূর্বের আলোচনায় দেখেছি, উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে নবজাগ্রত বিপ্লব-চেতনার জাতীয় স্বভাব বাণী-মূর্তি পেয়েছিল মেঘনাদবধ-এ। তাছাড়া আঙ্গিকের দিক্ থেকেও মধুসূদন এই কাব্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মহাকাব্য-কলার একটি মিশ্ররূপকে অনুসরণ করেছিলেন। এদিক থেকে মেঘনাদবধ বাংলা ভাষার প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ জাতীয় মহাকাব্য। মধুসূদনের পরে জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকে উৎসারিত করে এ-ধরনের মহাকাব্য রচনার একটি সাধারণ সংস্কার প্রবল হয়েছিল। এদিক্ থেকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি পর্যায়কে 'মহাকাব্যের যুগ' বলা হয়। মধুসূদনের পরেই মহাকাব্য-যুগের স্মরণীয় কবি হেমচন্দ্র। যদিও এ-পথে তাঁর কবি-কৃতির সফলতা উল্লেখ্য নয়।

কবি হেমচন্দ্র

কিন্তু, আর একদিকে হেমচন্দ্রের স্বকীয়তা ছিল অতুল্য। সেকালের বাংলা সাহিত্যে রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য-কামনা ও স্বদেশ-প্রেমে দীপ্ত কবিতার এমন প্রাচুর্য আর কোনো শিল্পীর রচনায় লক্ষ্য করা যায় না। এদিক্ থেকে হেমচন্দ্রের পরিবেশ-সচেতনতা ছিল অসাধারণ। তাঁর ছাত্রজীবনে কলকাতায় ও বৃহৎ বাংলায় রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠ্‌ছিল একের পর এক ঘটনাবলীর মাধ্যমে। এদেশের ইংরেজ স্বার্থাতুরগণ কর্তৃক তথাকথিত

ব্ল্যাক্‌এক্ট-এর বিরোধিতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে শিক্ষিত বাঙালির সংঘবদ্ধতাই তীব্র হয়েছিল প্রথমে। তখনকার দিনে বাংলাদেশের দূর-দূরান্তে ইংরেজেরা বাস ক'রতেন জমিদারি বা ব্যবসায় উপলক্ষ্যে। অথচ, তাদের অপরাধের বিচার হতে পারত কেবল কলকাতার সুপ্রীম্ কোর্ট-এ, শ্বেতাঙ্গ শাসকদেব দ্বারা। এই সুযোগে দেশীয় প্রজা, এমন কি রাজকর্মচারীদের ওপরেও তারা প্রচুর অত্যাচার করতেন। শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গভেদে আইনেরও যে পার্থক্য ছিল, তারও সুযোগ নেবার চেষ্টা করতেন। ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে এই আইন রদ্ করে মফঃস্বলেও ইংরেজদের জন্য সম-বিচার-ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব হওয়া মাত্র তারা সংঘবদ্ধতার জবরদস্তি দিয়ে তাকে প্রতিহত করেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শিক্ষিত সমাজেও সংঘবদ্ধ প্রতি-আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে, —গড়ে ওঠে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ সোসাইটি। তাছাড়া, সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) ও নীল বিপ্লবের (১৮৫৯-৬০) প্রতিক্রিয়াও দেখা দিয়েছিল হেমচন্দ্রের উদীয়মান যৌবন-সীমায়। রাজনৈতিক উত্তেজনার সেই বিক্ষোভকে আকণ্ঠ পান করেছিলেন কবি হেমচন্দ্র, তাঁর বহু গীতি-কবিতায় সেই ক্ষোভ যন্ত্রণা-তপ্ত আক্ষেপের রূপে প্রকট হয়েছে। ভারত-বিলাপ নামক কবিতায় এই অনুভবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। কলকাতার অমূল্য সম্পদ বর্ণনা করে কবি লিখেছেন,—

হেমচন্দ্রের কবি-কর্মের অতুল্যতা

"অহে বঙ্গবাসী জান কি তোমরা
অলকা-জিনিয়া হেন মনোহরা,
কার রাজধানী কি জাতি ইহারা?
এ সুখ-সৌভাগ্য ভোগে ধরায়।
নাহি যদি জান, এস এই খানে,
চলেছে দেখিবে বিচিত্র বিধানে
রাজপুরুষেরা বিবিধ বিধানে
গরবে মেদিনী ঠেকে না পায়॥
অদূরে বাজিছে "রুল ব্রিটানিয়া"
শকটে শকটে মেদিনী ছাইয়া
চলেছে দাপটে ব্রিটন বাসীরা
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব আছে কোথায়?

হায়রে কপাল ওদেরি মতন
আমরাই কেন করিতে গমন
না পারি সতেজে বলিতে আপন
যে দেশে জনম, যে দেশে বাস ?
ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই
গৌরাঙ্গ দেখিলে ভূতলে লুটাই,
ফুটিয়ে ফুকারি বলিতে না পাই—
এমনি সদাই হৃদয়ে ত্রাস।
কি হবে বিলাপ করিলে এখন
স্বাধীনতা ধন গিয়াছে যখন
চোরে শিরোমণি করেছে হরণ
তখনি সে সাধ ঘুচেছে।"

মূল কবিতাটি সুদীর্ঘতর। তাহলেও, উদ্ধৃত অংশ থেকেই সমকালীন রাজনৈতিক বিক্ষোভের প্রতি হেমচন্দ্রের একাত্মতার স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়। হেমচন্দ্র যেখানে যথার্থ কবি,—সেখানে সমসাময়িক জীবনের অসাম্য ও অসামঞ্জস্য সম্বন্ধে তাঁর আক্ষিপ্ত সচেতনতাই সফল কাব্যরূপ রচনা করেছে। প্রথম উল্লেখ্য কাব্য চিন্তাতরঙ্গিনীতে এই তথ্যেরই সমর্থন রয়েছে।

হিন্দুকলেজের শিক্ষা তরুণ বাঙালিকে এক আদর্শ-সংঘাতের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছিল,—কেবল রাজনীতির প্রেক্ষাভূমিতেই নয়, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও। ফলে বিবাহ, পরিবার ও সমাজ-বন্ধনের আবহমান আদর্শের প্রতি বিরূপতা দেখা দেয়। এমন অবস্থায় একই বছরের মধ্যে পর পর দুই উচ্চ-শিক্ষিত তরুণ আত্মহত্যা করেন। এঁদের একজন ছিলেন শ্রীশচন্দ্র ঘোষ,—হেমচন্দ্রের আবাল্য প্রতিবেশী। দুজনে একসঙ্গে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন (১৮৫৮)। অশিক্ষিত বাল্যবিবাহিতা স্ত্রীকে যথার্থ ভূমিকায় গ্রহণ করতে না-পারার যন্ত্রণাই ছিল শ্রীশচন্দ্রের আত্মবিনাশের প্রধান কারণ। চিন্তাতরঙ্গিনীতে হেমচন্দ্র এই জীবন-সমস্যার চিন্তা করতে গিয়ে অশিক্ষিতা বালিকা বধূর বেদনাকেই করুণায়ন করে

চিন্তাতরঙ্গিনী

তুলেছেন। কিছু কিছু ইংরেজি কবিতার ছাপ থাকলেও এই রচনায় রঙ্গলালের প্রভাব সমধিক।

হেমচন্দ্রের দ্বিতীয় রচনা বীরবাহু কাব্যের (১৮৬৪) সৃষ্টি হয়েছিল একান্তভাবে স্বদেশ-প্রীতির উদ্দীপনাকে আশ্রয় করে। কাব্য-পরিচয় দিয়ে কবি নিজে লিখেছিলেন,—"উপাখ্যানটি আদ্যোপান্ত কাল্পনিক, কোন ইতিহাস-মূলক নহে। পুরাকালে হিন্দু-কুল-তিলক বীরধুন্দ স্বদেশ রক্ষার্থ কি প্রকার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কেবল তাহারই দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এই গল্পটি রচনা করা হইয়াছে।" এই কাব্যে রঙ্গলালের প্রভাব স্পষ্ট।

বীরবাহু কাব্য

১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে আশাকানন নামে একখানি "সাঙ্গরূপক কাব্য" লিখেছিলেন হেমচন্দ্র। "মানব জাতির প্রকৃতিগত প্রবৃত্তিসকলকে প্রত্যক্ষীভূত করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। ইংরেজি ভাষায় এরূপ রচনাকে 'এলিগারি' কহে।" ছায়াময়ী কাব্য (১৮৮০) লিখিত হয়েছিল "প্রসিদ্ধ য়ুরোপীয় কবি ডাণ্টের লিখিত ডিভাইনা কমেডিয়ার কিঞ্চিৎমাত্র আভাস" দেবার জন্যে।

আশাকানন ও ছায়াময়ী

দশমহাবিদ্যা (১৮৮২) হেমচন্দ্রের একটি বহু আলোচিত গীতিকাব্য। কাব্য বিষয়ের আলোচনা করে 'বিজ্ঞাপন'-এ লিখিত হয়েছে,—"দশমহাবিদ্যা লইয়া এই গ্রন্থ বিরচিত হওয়াতে পাঠকগণ ভাবিবেন না যে, তৎসম্বন্ধে পুরাণাদির আখ্যান সকল স্থানে ঠিক্ ঠিক্ অনুসরণ করিয়াছি। বস্তুতঃ, আমি কবিতা রচনার প্রয়াস পাইয়াছি, শাস্ত্রিকতা অথবা চলিত মতের প্রশুদ্ধতা মীমাংসায় প্রবৃত্ত হই নাই।" দশমহাবিদ্যার ভাব-বিষয়েয় অস্পষ্টতা নিয়ে পণ্ডিত মহলে একদা প্রচুর বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। তাছাড়া, এই কাব্যের ছন্দ-শৈলীতেও অভিনবতা সঞ্চারের চেষ্টা আছে ; কবি জানিয়েছেন "সেগুলি কোনো সংস্কৃত অথবা প্রচলিত বাংলা ছন্দের অনুসরণ নয় "

দশমহাবিদ্যা

এর পরে হেমচন্দ্র 'নাকেখৎ' নামে একটি "হাস্যকাব্য" লিখেছিলেন (১৮৮৫ খ্রীঃ)। তারপরে প্রকাশিত চিত্ত-বিলাস কাব্য (১৮৯৮) কয়েকটি গীতিকবিতার সংকলন। হেমচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত রচনা 'বৃত্রসংহার' মহাকাব্যের আকারে লিখিত। ইন্দ্রকর্তৃক বৃত্রবধের পৌরাণিক গল্প নিয়ে

এর বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। একদিকে আলংকারিক মহাকাব্য-রীতি অনুসরণের অতি-প্রয়াস, অন্য দিকে বলিষ্ঠ কল্পনাশক্তির অভাব বৃত্রসংহারের শিল্প-রূপকে সুগঠিত হতে দেয় নি। সুদীর্ঘ ২৪ সর্গে সম্পূর্ণ এই কাব্য প্রথমে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম খণ্ডে (১৮৭৫) সর্গ সংখ্যা ছিল ১১; দ্বিতীয় খণ্ডে (১৮৭৭) ১৩। বৃত্রসংহারের স্থানে স্থানে অমিত্রাক্ষর ছন্দের অ-সফল অনুকরণের চেষ্টা করা হয়েছে; অন্যান্য স্থলে রয়েছে বিচিত্র রকমের মিত্র-ছন্দের ব্যবহার। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নানা কাব্যের অনুসরণের প্রাচুর্যে কবির স্বকীয়তা কোথাও প্রস্ফুট হতে পারে নি এই কাব্যে। তিলোত্তমা সম্ভব এবং মেঘনাদবধেরও দুর্বল অনুকরণ আছে গল্প ও সর্গকল্পনার বহু স্থলে।

বৃত্রসংহার ও অন্যান্য কাব্য

হেমচন্দ্র দুইখানি ইংরেজি নাটকের অনুবাদ করেছিলেন। টেম্‌পেস্‌ট-এর অনুবাদ (১৮৬৮)-এর বাংলা নামকরণ করা হয়েছিল নলিনীকান্ত; দ্বিতীয় নাটকটি রোমিও-জুলিএট্‌-এর অনুবাদ (১৮৯৫)। রচনা হিসেবে কোনোটিই উল্লেখ্য নয়।

হেমচন্দ্রের নাট্যানুবাদ

মহাকাব্যযুগের কবি-কৃতিতে একটি নূতন স্বাদের সঞ্চার করেছিলেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫১-১৮৯৮ খ্রীঃ)। চিন্তার ধীরোদাত্ততা ও বিষয়-বর্ণনার দৃপ্ত ওজস্বিতা মহাকাব্যের একটি সাধারণ লক্ষণ বলে কথিত হয়; এদিক থেকে বাঙালির স্বভ ব-প্রবণতা মহাকাব্য রচনার উপযোগী নয়। মধুসূদন নিজেও মহাকাব্য লিখতে বসে লিরিক-প্রবণতার প্রেরণা অনুভব করেছিলেন। মধুসূদনের মধ্যে তবু ছিল বাঙালি-দুর্লভ ওজস্বী ব্যক্তিত্ব,—বৈপ্লবিক অগ্নিতপ্ততা। তাই, প্রবল ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস ও রোমান্টিক স্বপ্ন-কল্পনা নিয়েও তিনি বাঙালি জীবনের সার্থক মহাকাব্য লিখতে পেরেছিলেন। কিন্তু, উদাত্ত-গভীর ওজস্বিতার অনুসরণ করতে গিয়ে হেমচন্দ্র আসলে নিজ গীতি-স্বভাবের বিরোধিতাই করেছিলেন, তাই কাব্য হিসেবে বৃত্রসংহার আগাগোড়া ব্যর্থ। এই অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতা থেকে সেকালের বাংলা কাহিনী-কাব্যকে মুক্তি দিয়েছিলেন অক্ষয় চৌধুরী। প্রাচীন গল্পের শৌর্য-কথাকে বাঙালিধর্মী প্রেম-বেদনায় মন্থর, কল্পনাঘন এক অভিনব রোমান্টিক সৌন্দর্যে ভরে তুলেছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে নবীনচন্দ্র তাঁর কাহিনী-কাব্যসমূহে এই রোমান্স-নিবিড়

কবি অক্ষয় চৌধুরী

গাথা রচনার শিল্প-পদ্ধতিই অনুসরণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বালক বয়সের গাথাকাব্য রচনাতেও অক্ষয়চন্দ্রের প্রভাব আছে।

বাংলা কাহিনী-কাব্যে রোমান্স-এর নিবিড় স্পর্শ আছে তাঁর উদাসিনী কাব্যে (১৮৭৪)। অজ্ঞাত পরিচয় রাজকন্যা সরলা, ও সুরেন্দ্রনামক যুবকের প্রথম প্রণয়,—দুজনের জীবনে আকস্মিক বিপদ-পাত, এবং প্রায় মৃত্যু-মুখ থেকে ফিরে এসে তাদের পুনর্মিলনের রোমান্স-সকরুণ গল্প উদাসিনী কাব্যের বিষয়বস্তু। এই মিলন ব্যাপারে বনদেবী ও রতির ভূমিকা রোমান্টিক সৌন্দর্যকে আরো ঘনবদ্ধ করেছে। উদাসিনী কাব্য দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল। পার্নেল-এর ইংরেজি হার্মিট্-কাব্যের প্রভাব রয়েছে এতে।

উদাসিনী কাব্য

অক্ষয় চৌধুরীর আর একটি কাব্য ভারতগাথা রচিত-ই হয়েছিল পাঠ্য-গ্রন্থের আকারে। হিন্দুযুগ থেকে শুরু করে ইংরেজ আমল পর্যন্ত ভারত ইতিহাসের পদ্য-চুম্বক রচিত হয়েছিল এতে। পদ্যাংশের অনেক স্থলে প্রকাশ আবেগ-উচ্ছ্বসিত হয়েছিল। 'সাগর সংগমে' গাথা-কাব্য পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে। অক্ষয়চন্দ্রের আরো বহু রচনা লোক-চক্ষুর অন্তরালে হারিয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"নিজের এই সকল রচনা সম্বন্ধে তাঁহার লেশমাত্র মমত্ব ছিল না। কত ছিন্নপত্রে তাঁহার কত পেন্‌সিলের লেখা ছড়াছড়ি যাইত। সেদিকে খেয়ালও করিতেন না।" তা হলেও, যতটুকু রচনা-পরিচয় পাওয়া গেছে, তাতে অক্ষয়চন্দ্রের আত্মবিস্মৃত স্বপ্নাকুলতার প্রকাশ সংশয়াতীত হয়েছে। অভিমানিনী নির্ঝরিণী কবিতায় সেই স্বপ্ন-সুন্দরতার বুভুক্ষা সার্থক রূপ পেয়েছে :—

'ভারতগাথা' ইত্যাদি

"মহান জলধি জলে
প্রাণ ঢেলে দিব বলে
সুদূর পর্বত হতে আসিনু বহিয়া,
পুরাতে প্রেমের সাধ
না গণিয়া পরমাদ
কত বাধা কত বিঘ্ন—দাপটে ঠেলিয়া
এই ত সাগর জলে মিশিনু আসিয়া।"

কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের প্রভাতসংগীত-এর প্রথম সংস্করণে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার পাশাপাশি ছাপা হয়েছিল।

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) আধুনিক বাংলায় মনস্বী ঐতিহাসিক ও প্রাবন্ধিক পণ্ডিত রূপে সুপরিচিত। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এই মহাপণ্ডিত-মনীষীর অন্তরে আত্মগোপন করেছিল একটি স্বভাব-কবির প্রাণ। কবি শিবনাথ শাস্ত্রীর পরিচয় একালে বিস্মৃত-প্রায়। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন,—"ইঁহার অন্তরবাসী কবি-মানুষটি নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিবার সুযোগ ও সুবিধা পায় নাই। শিক্ষকও সংস্কারক বনিয়া গিয়া শিবনাথ এক হিসাবে স্বধর্মচ্যুত হইয়া-ছিলেন।" কিন্তু স্বল্প সুযোগেই শিবনাথ যে-কয়টি কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তাতে সৌন্দর্য-পিপাসু একটি কবি মনের পরিচয় ভাস্বর হয়ে আছে। তাঁর প্রথম কাব্য 'নির্বাসিতের বিলাপ' প্রথমে সূচিত হয়েছিল সোমপ্রকাশ-এর পৃষ্ঠায়। কবি জানিয়েছেন, কঠোর অপরাধের জন্য কোনো ভদ্রসন্তান চিরজীবনের মত নির্বাসিত হয়েছিলেন। তাঁর যাত্রার দিনে তিনি প্রবল মনঃকষ্ট অনুভব করেন এবং "সেই উপলক্ষ্যে গুটিকতক পংক্তি লিখিয়া সোমপ্রকাশ-এ" প্রকাশ করেছিলেন। পরে জনপ্রিয়তার দাবি এড়াতে না পেরে, কবি একে পূর্ণাঙ্গ কাব্য-রূপ দেন (১৮৬৮)।

কবি শিবনাথ শাস্ত্রী

এ ছাড়া শিবনাথ শাস্ত্রী আরো চারখানি কবিতাপুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। তারমধ্যে পুষ্পমালা (১৮৮৫) ও পুষ্পাঞ্জলি (১৮৮৮) নামে কবিতা-সংকলন দুখানি বহু রসোত্তীর্ণ খণ্ড-কবিতার আকর। হিমাদ্রি-কুসুম (১৮৮৭) পাঁচটি ছোট-বড় নীতি-কবিতার সংকলন; আর ছায়াময়ী (১৮৮৯) ছিল একখানি রূপককাব্য।

রচনাপঞ্জী

নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৭-১৯০৯) প্রথম কাব্য অবকাশ রঞ্জিনী প্রথম খণ্ড প্রথমে প্রকাশিত হয় ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে। এদিক থেকে তিনি অক্ষয় চৌধুরীর পূর্ববর্তী কবি; শেষোক্ত কবির প্রথম রচনা উদাসিনীর প্রকাশকাল ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দ। কিন্তু, অবকাশ রঞ্জিনী প্রথম ও দ্বিতীয়খণ্ড (১৮৭৮) গীতি-কবিতার সমষ্টি। নবীনচন্দ্রের ব্যক্তি-স্বভাবের অতি-সচেতন আত্মপ্রীতি প্রথম যৌবনের অপরিণত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে বিশেষকরে এই পুস্তিকার

নবীনচন্দ্র সেন ও অবকাশরঞ্জিনী

প্রথম খণ্ডটিতে। তা না হলে অবকাশরঞ্জিনী দুটি খণ্ডেই কোনো কোনো কবিতায় কবির আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস নিঃসন্দেহে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু, একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, ঐ সব কাব্য-কবিতাতে নবীনচন্দ্রের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেনি,—তা ঘটেছে বিভিন্ন কাহিনী-কাব্যে। রৈবতক (১৮৮৬), কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩), প্রভাস (১৮৯৬) নামক ত্রয়ী কাব্যের সফলতা ও ব্যর্থতার সঞ্চয় নিয়েই সাহিত্য-ইতিহাসে নবীনচন্দ্রের সর্বাধিক প্রতিষ্ঠা। এই কাব্য-ত্রয়ীতে মধুসূদনের মত সফল মহাকাব্য রচনার উদ্যম করেছিলেন তিনি;—ভারতের চিরন্তন মহাকাব্য মহাভারতকে নবীন মূল্যবোধের পটভূমিকায় নবরূপ দিতে চেয়েছিলেন। নবীনচন্দ্রের সে প্রয়াস সফল হয়নি; মহাকাব্য রচনায় তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। তবু রসিক পাঠকের মর্মলোকে তাঁর আবেগ-স্ফীত কাব্য ত্রয়ীর ভাব-আবেদন দুর্লঙ্ঘ্য। তার কারণ, কৃষ্ণ-জীবনের পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ-ইতিহাস যথাক্রমে চিত্রিত হয়েছে ঐ তিনটি কাব্যে—নবীনচন্দ্রের স্বপ্ন-কল্পনাতুর দৃষ্টির রোমান্টিক আতিশয্য নিয়ে। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস মহাকাব্য হিসেবে ব্যর্থ, কিন্তু রোমান্টিক গাথা-কাব্যের আকারে অভিব্যক্ত তাদের বাঙালি-ধর্মী জীবন-বাদের মাধুর্য উপেক্ষা করা অসম্ভব। আর গাথাকাব্যের স্বপ্নালুতা রচনায় নবীনচন্দ্র প্রথমাবধি অক্ষয় চৌধুরীর রোমান্টিক মনোধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন; এখানেই তিনি কবি হিসেবে অক্ষয়চন্দ্রের অনুজ।

ত্রয়ীকাব্য

নবীনচন্দ্রের দ্বিতীয় কাব্য পলাশির যুদ্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে। এর পূর্বে তাঁর একমাত্র প্রকাশিত কাব্য ছিল অবকাশ রঞ্জিনী প্রথম খণ্ড। এই দ্বিতীয় কাব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তার একটি প্রধান কারণ,—এতে বাঙালির পরাধীনতার অব্যবহিত ইতিহাসটিকে অতি-আবেগের বেদনায় সিক্ত করে কবি উপস্থিত করেছিলেন। কিন্তু, পরাধীনতার জ্বালা ও বন্ধন-মোচনের উদ্দীপনার চেয়ে, অকারণ-বেদনার রোমান্টিক আকুতিই এতে প্রবল হয়েছিল। ফলে, পলাশির যুদ্ধেই নবীনচন্দ্রের রচনাধারার রোমান্টিক গাথা-কাব্যের লক্ষণ প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল। এর সফল বিস্তার ঘটে পরবর্তী কাব্য রঙ্গমতী-তে (১৮৮০)।

পলাশির যুদ্ধ

ডঃ সুকুমার সেন এই কাব্যে স্কট্-এর আখ্যায়িকা-কাব্যের আদর্শ অনুসরণের কথাও উল্লেখ করেছেন। পূর্ববর্তী পলাশির যুদ্ধ কাব্যেও স্কট্-বায়রণের অনুসরণ উচ্ছ্বসিত। তাছাড়া, রঙ্গমতী-তেই আবার কাহিনী ও রূপ-বিন্যাসে অক্ষয় চৌধুরীর উদাসিনীর প্রভাব সমধিক। চট্টগ্রামের রাঙামাটি অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় সংঘাতের পটভূমিতে রাজকুমার বীরেন্দ্র ও তার প্রণয়িণী কুসুমিকার বিপদ-মিলনের রোমান্টিক কাহিনী এই কাব্যের বিষয়বস্তু।

রঙ্গমতী

নবীনচন্দ্রের অন্যান্য রচনার মধ্যে প্রধান উল্লেখ্য তিনখানি জীবনী-কাব্য :—খ্রীষ্ট, অমিতাভ ও অমৃতাভ। প্রথম কাব্য দুটির পরিচয় নামেতেই প্রকাশ : অমৃতাভ লিখিত হয়েছিল চৈতন্য-জীবনী অবলম্বন করে। তাছাড়া, ভগবদ্‌গীতা ও মার্কেণ্ডেয় চণ্ডীর পদ্যানুবাদও করেছিলেন নবীনচন্দ্র। পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে লিখেছিলেন নির্মাল্য নামে নাটক ; আর লিখেছিলেন গদ্য আখ্যায়িকা ভানুমতী। তাঁর গদ্য রচনার মধ্যে ঐতিহাসিক মর্যাদা দাবি করতে পারে পাঁচখণ্ডে সমাপ্ত আত্মচরিত 'আমার জীবন।' কবি-জীবনী হিসেবে গ্রন্থটি যেমন কৌতুহল-জনক, তেমনি সমকালীন ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধেও কৌতুককর তথ্যের সমাবেশ রয়েছে। এই গ্রন্থে আলোচিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সমষ্টির মধ্যে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথও।

অপরাপর কাব্য ও রচনাপঞ্জী

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৬—১৮৯৭) ছিলেন হেমচন্দ্রের অনুজ সহোদর আর নবীনচন্দ্রের পরম বন্ধু। এঁর প্রকাশিত কাব্যসংখ্যা চার,—এদের মধ্যে তিনখানিই গীতি-কবিতার সংকলন :—চিত্তমুকুর (১৮৭৮), বাসন্তী (১৮৮০) এবং চিন্তা (১৮৮৭)। গীতি-কবিতা রচনায় ঈশানচন্দ্রের দক্ষতা ছিল সেকালের পক্ষে প্রায় অতুল্য। কিন্তু ইতিহাসের পক্ষ থেকে তাঁর একমাত্র গাথা-রচনা যোগেশকাব্যের প্রয়োজনীয়তা সমধিক। এই কাব্যের কাহিনী ও শিল্প-কর্মে কবির ব্যক্তি-জীবন-যন্ত্রণা আমূল ব্যাপ্ত হয়ে আছে। ঈশানচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ও রস-বিদগ্ধতা ছিল অপার। কিন্তু, জীবনের এই দুর্লভ সমৃদ্ধি সত্ত্বেও মাত্র ৪২ বছর বয়সে তিনি নিজের হাতে নিজের

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়

প্রাণান্ত ঘটিয়েছিলেন। সেই দুর্ঘটনার পশ্চাৎবর্তী কবি-মনোভাব বেদনা-ধূমায়িত রূপব্যঞ্জনা পেয়েছে যোগেশ-কাব্যে। নায়ক যোগেশ নিজের বিবাহ-বাসরে স্ত্রীর একটি বান্ধবীকে দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তখন থেকেই যোগেশের পরিবার-জীবন ও নীতি-চেতনার মধ্যে মানসদ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে ওঠে। সেই জটিলতা আরো তীব্র হয়েছিল মহিলাটির বিবাহের পর। অবশেষে এই দুঃসহ হৃদয়-যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে যোগেশ একদিন আত্মহত্যা করে। যোগেশের এই যন্ত্রণা ছিল, আগেই বলেছি,—কবির গোপন মর্ম-সঞ্জাত। আন্তরিকতার এই তপ্ত স্পর্শ তাঁর কাব্যকে জ্বালাময় সজীবতা দান করেছিল। এই অসহ্য জীবন-জ্বালা ঈশানচন্দ্রের গীতি-সফলতারও প্রধান উৎস।

মধুসূদনোত্তর বাংলা কাব্যে নূতন আঙ্গিক সচেতনতার সৃষ্টি করেছিলেন রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-৯৪ খ্রীঃ)—যদিও তাঁর প্রতিভা তত সবল ছিল না। রাজকৃষ্ণ কেবল কবিতাই লেখেন নি,—গদ্য, পদ্য, নাটক-উপন্যাস খোসগল্পে তাঁর রচনার সংখ্যা ছিল ৭০, কিংবা তারও বেশি। আর, সকল ক্ষেত্রেই ভাব-ঋদ্ধির চেয়ে রূপাঙ্গিকের প্রতি তার উৎকণ্ঠা ছিল সমধিক। প্রথম কাব্য বঙ্গভূষণ (১৮৭৪) মধুসূদনের অনুসরণে লেখা ৬৩টি সনেট-এর সমষ্টি। বিষয় ছিল "বঙ্গদেশোদ্ভূত মৃত মহাত্মাগণের সংক্ষিপ্ত গুণাবলী।" শিশুদের জন্য কবিতা লিখেও ইনি জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তাছাড়া কবি-রাজকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব,—তিনি প্রথম কাব্যাত্মক গদ্য'কে পদ্য-পৌঙক্তিক প্রণালীতে সাজিয়েছিলেন, কবির অজ্ঞাতেই যেন গড়ে উঠেছিল আধুনিক গদ্য-কবিতার অ-সচেতন পূর্বরূপ :—

রাজকৃষ্ণ রায়

"আকাশ নীল,—অনন্ত নীল ,—
মানব চক্ষু অনন্ত নয় ,—
সুতরাং আকাশ অনন্ত নীল।"

রাজকৃষ্ণের নাট্যরচনার পরিচয় উদ্ধৃত হয়েছে পরে যথাস্থানে।

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৫২-১৯২২) কবিতা ছাপাবার এক অদ্ভুত কৌশল আবিষ্কার করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন। নিজের নামে কবিতা লিখে তিনি মুর্শিদাবাদ পত্রিকায় ছাপাতে দিয়েছিলেন,—কিন্তু তা

অনুপযুক্ত বলে প্রত্যাখ্যাত হয়। পরে ভুবনমোহিনী দেবী- এই ছদ্ম নামে কবিতা লিখে পাঠালে ঐ একই পত্রিকায় তা সাদরে গৃহীত হয়েছিল।

নবীন মুখোপাধ্যায়

তাঁর লেখা 'ভুবন মোহিনী প্রতিভা' প্রথম (১৮৬৫) ও দ্বিতীয় ভাগ (১৮৭৭) পড়ে ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার-ও এই 'মহিলাকবির' (?) উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন তাঁর কোনো বন্ধু ভুবন মোহিনীর ঠিকানায় "কাপডটা, বইটা" উপহার পাঠাতেন। নবীনচন্দ্রের লেখা আরো দুটি কাব্যের নাম 'আর্য-সঙ্গীত' ও 'সিন্ধুদূত'।

গোবিন্দচন্দ্র রায়ের (১৮৩৮-১৯১৭) দুটি কবিতা স্বাধীনতা আন্দোলনের

গোবিন্দ রায়

অগ্নিতপ্ত দিনে লোক-মুখে অগ্নিদীপের মতই ঘুরে বেড়াত। একটির নাম যমুনা লহরী, অপরটি ভারত বিলাপ। দ্বিতীয় কবিতাটির প্রারম্ভিক ছত্র ছিল :—

"কতকাল পরে। বল ভারত রে।
দুঃখ সাগর সাঁতারি পার হবে।"

এঁর রচনাবলী 'গীতকবিতা' চার খণ্ডে সংকলিত ও প্রকাশিত হয়েছিল।

কাঙাল হরিনাথ নামে বহুল পরিচিত হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬) আসলে ছিলেন সমাজ-বিপ্লবী সাংবাদিক। তার রচনাপঞ্জীতে কাব্য, উপন্যাস ও নাটক,—এই তিনই রয়েছে। কবিতার মধ্যে কাঙাল ও ফিকিরচাঁদ ভণিতায় লেখা বাউল গানগুলি মনোরম। সুদীর্ঘ আট বছর

কাঙাল হরিনাথ

ধরে 'ফিকির চাঁদ ফকিরের গীতাবলী' ষোল খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া স্কুলপাঠ্য পদ্য-কবিতা বাদ দিলে অক্রুর সংবাদ এবং সাবিত্রী নামে এঁর দুখানি গীতাভিনয় নাটিকার উল্লেখ করতে হয়। হরিনাথের লেখা উপন্যাসের নাম 'চিত্ত চপলা'।

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিরোধিতা করে জগদ্বন্ধু ভদ্র এককালে

ছুছুন্দরীবধ ও জগদ্বন্ধু ভদ্র

কৌতুকের সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর 'ছুছুন্দরী বধ' কাব্যের প্রারম্ভিক ছত্রগুলি নিম্নরূপ :—

'দ্রুহিণ-বাহন সাধু অনুগ্রহণিয়া
প্রদান সুপুচ্ছ মোরে,—

এ ছাড়া বৈষ্ণব পদ-সংকলায়িতারূপে জগদ্বন্ধুর শ্রদ্ধেয়তা অ-পরিসীম।

মধুসূদনের যুগের বাংলা নাটক

বাংলা কাব্যের মত বাংলা নাটকেরও মুক্তি ঘটেছিল মধুসূদনের হাতে। উনিশ শতকের নগর বাংলায় সমাজ-বিপ্লবের যে যৌথ সমবেত আকাঙ্ক্ষা দীপ্ত হয়েছিল, তারই অনুবর্তনে নাটক লিখে রামনারায়ণ তর্করত্ন জনপ্রিয় নাটুকে উপাধি পেয়েছিলেন। কিন্তু, তাঁর রচনায় নাট্যাঙ্গিকের পরিচ্ছন্নতা কিংবা বলিষ্ঠতা, কিছুই ছিল না। আগে বলেছি, রামনারায়ণের কৃতিত্ব সফল নাট্য-নক্সা রচনায়। অন্যদিকে, যোগেশচন্দ্র গুপ্ত, তারাচরণ শিকদার এবং হরচন্দ্র ঘোষ শেক্সপীয়রের সুগঠিত নাট্য-রীতির অনুসরণ করলেও সার্থক নাটক লিখতে পারেন নি,—কারণ বাঙালির যৌথ জীবন-স্বভাব, এবং সমকালীন সমাজের সামগ্রিক চেতনার সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগ ছিল না তাঁদের। মধুসূদন তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার শক্তিতে সফল নাট্য রচনার এই দুটি উপাদানকে ভার-সম মিলন-বন্ধনে আবদ্ধ করলেন,—জেগে উঠলো বাংলা নাটকের শিল্প-রূপ।

বাংলা নাটকে মধুসূদন

আগে বলেছি ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে বেলগাছিয়ার নাট্যশালার উদ্বোধনের সময় রত্নাবলী নাটকের অভিনয় দেখে অতৃপ্ত মধুসূদন নিজে রসোত্তীর্ণ নাট্য-রচনা করতে প্রবৃত্ত হন। সেই চেষ্টার সার্থক ফল তাঁর প্রথম নাটক শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)। এই নাট্যাঙ্গিকে 'foreign-air'-এর কথা মধুসূদন নিজেই লিখেছিলেন একটি চিঠিতে। তাহলেও, কেবল প্লট-এর বিচারেই নয়, রূপসজ্জার দিক থেকেও 'শর্মিষ্ঠা' আগাগোড়া ভারতীয়। সংস্কৃত নাট্যকলার আদর্শেই মূলতঃ এর কল্পনা ও গঠন; এমন কি, নাট্যারম্ভে 'প্রস্তাবনা' এবং শেষে 'ভরতবাক্যে'র অনুরূপ দুটি গীতও ছিল প্রথম সংস্করণে। পরবর্তী সংস্করণগুলি থেকে এই দুই অংশ বাদ পড়েছে। তা-হলেও শর্মিষ্ঠার শিল্প-দেহে আজও প্রতীচ্য নাট্য রূপের ছাপ কম। সফল রচনার উৎস আসলে প্রাণময় জীবনানুভব ও শিল্পীর পরিচ্ছন্ন প্রকাশ-ক্ষমতা। তাছাড়া, রূপাঙ্গিক প্রতীচ্য হল, না প্রাচ্য হল,

শর্মিষ্ঠা

রস-সিদ্ধ নাটক রচনার পক্ষে সেটা কিছু বড কথা নয়। বহু ভাষাবিদ্ মধুসূদনের আধুনিকতা-ধর্মী শিল্পি-প্রাণ কাব্য-দেহের সুগঠিত রূপরচনা সম্পর্কে সদা-সচেতন ছিল। ফলে, দেশীয় রচনারীতিও তাঁর পরিচ্ছন্ন রূপ-সচেতনতার স্পর্শে বলিষ্ঠ ও গতিশীল হয়ে উঠেছে। এখানেই 'শর্মিষ্ঠা'র বহিরঙ্গের যথার্থ সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্য সহজে বৃদ্ধি পেয়েছে সমকালীন জীবন-বেদনার স্বতঃস্ফূর্ত অনুবর্তনের ফলে। এই নাটকে বাংলাদেশের লাঞ্ছিত নারীত্বের ব্যক্তি-সচেতন বেদনাকে কবি নবরূপ দিয়েছেন।

মূল গল্পটি মহাভারত থেকে নেওয়া। সংস্কৃত মহাভারতে দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা দুজনকেই দেখি প্রেমান্ধতার প্রগল্‌ভরূপে। এঁরা দুজনেই অনপেক্ষিতভাবে যযাতির প্রণয়-কামনা করেছিলেন। যযাতির কামাতুরতাও সেখানে অন্ধ এবং একাগ্র। মধুসূদন রোমান্টিক পূর্বরাগ-এর পরিবেশ রচনা করে এই আদিম গল্পকে সুস্মিত মধুরতা দান করেছেন,—তাঁর রচনার উভয়ক্ষেত্রেই যযাতি ছিলেন প্রথম প্রেম-যাচক,— নায়িকা দুটিই সেখানে অনুরাগ-কুণ্ঠায় লজ্জারুণ। প্রণয় মাধুর্যের এই অভিনব রূপ-রচনায় কালিদাসের কবি-কল্পনা মধুসূদনকে অনুপ্রেরিত করেছিল নিশ্চিত। কিন্তু, শর্মিষ্ঠার চরিত্র রচনায় তিনি অনন্য-নির্ভর, স্বতন্ত্র। মহাভারতে দেবযানীর তুলনায় শর্মিষ্ঠা-ই ছিলেন পরুষ-রুক্ষ-ভাষিণী, ঈর্ষা-কাতর-চিত্তা। কিন্তু, উনিশ শতকের বাঙালি-জীবনের স্বপ্ন-দ্রষ্টা শিল্পী মধুসূদন তাঁর কাব্য-লক্ষ্মীর জয়মাল্য পরিয়ে দিয়েছিলেন সর্ব-রিক্ত এই শর্মিষ্ঠার কণ্ঠে। মধ্যযুগীয় বাঙালি সমাজে নারীত্বের অকারণ-নিপীড়ন কবিকে ব্যথিত করেছিল। তেমনি অপার নিরাসক্তি ও করুণ তিতিক্ষার মধ্যে দুঃখ বরণের অকুণ্ঠ দুঃসাহস দেখে তাঁর শিল্পি-প্রাণ শ্রদ্ধা-বিনত হয়েছিল সেকালের নারীধর্মের প্রতি। অপার সৌন্দর্যে স্নাত রাজকন্যা যেখানে জীবনের বহুমুখী সম্ভাবনায় জলাঞ্জলি দিয়ে, সমাজ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে স্বেচ্ছায় আজীবন দাসীত্ব বরণ করেছে,—সেখানে বাঙালি নারীর ত্যাগ-মহিম জীবন-গাথা রচনায় মধুসূদন হয়েছেন স্বপ্ন-তন্ময়। আবেগ-কল্পনার এই উচ্ছ্বসিত প্রাণময়তা শর্মিষ্ঠা নাটককে বাঙালি জীবন-ধর্মে সমৃদ্ধ করেছে,—এখানেই তার যথার্থ শিল্প-সফলতা। শর্মিষ্ঠার

শর্মিষ্ঠার প্লট ও বাঙালি জীবন-ধর্ম

বহিরঙ্গীয় সৌন্দর্যও অপূর্বতা পেয়েছে এই জীবন-উচ্ছ্বাসকে কেবল সুমিত রূপ দান করেই।

শিল্পী হিসেবে মধুসূদন আসলে ছিলেন কবি,—মহাকবি। তাই, নাটকের গদ্য সংলাপ রচনার ক্ষেত্রেও, কাব্যগন্ধী অলংকার-বহুল ভাষার অতিশয় প্রয়োগ করেছেন তিনি। স্থানে স্থানে যেমন চরিত্র রচনায়, তেম্‌নি ভাষা-ভঙ্গিতেও কালিদাসের পূর্ব-প্রভাব অবশ্য রয়েছে। তাহলেও, বাংলা নাটকের পক্ষে পদ্য-স্বভাবিত গদ্য-সংলাপ যে সম্ভব নয়, সে কথা কবি বুঝেছিলেন। তাই নিজের শিল্প-প্রকৃতি এবং নাট্যশৈলীর দাবি,—এই দু'য়ের মধ্যে সমন্বয় বিধান করতে গিয়ে তিনি নাটকে অমিত্রাক্ষর পদ্য সংলাপ প্রবর্তনের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। বস্তুতঃ, সেই উপলক্ষ্যেই মধুসূদনের প্রথম অমিত্রাক্ষর পদ্য রচিত হয়,—তাঁর দ্বিতীয় নাটক পদ্মাবতী-তে (১৮৬০)। শর্মিষ্ঠার সংলাপে কয়েকছত্র মিত্রাক্ষর পদ্য আছে.

পদ্মাবতী নাটক

—পদ্মাবতীতে আছে মাত্র কয়েকছত্র অমিত্রাক্ষর। বাঙালি রসিক-জনের কান এবং মন অমিত্রাক্ষর-সিদ্ধ হয় নি বলেই নাটকের সংলাপে মধুসূদন আর বেশি অমিত্রাক্ষর কবিতা ব্যবহার করেন নি। কিন্তু, পদ্মাবতী নাটকের ঐ কয়টি মাত্র ছত্রই এ বিষয়ে তাঁর চরম দক্ষতার পরিচয় বহন করে। তার চেয়েও বেশি বিস্ময়কর এই নাটকের বিদেশী গল্পে মনোভিরাম দেশীয় জীবন-পরিবেশ রচনার সার্থকতা। গ্রীক্ পুরাণের 'Apple of discord'-এর গল্প দিয়ে পদ্মাবতীর প্লট্ রচিত হয়েছে,—কিন্তু, সে খবর যাঁদের অজানা, তাঁদের পক্ষে এর বিদেশীয় উৎসের কথা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। শর্মিষ্ঠার রোমান্টিক্ রস-ঘনতা এখানে নিবিড়তর হয়েছে।

তার চেয়েও বিস্ময়কর মধুসূদনের প্রহসন দু'টি,—নাট্যকার মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ শিল্প-সৃষ্টি। 'একেই কি বলে সভ্যতা' আর 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' পদ্মাবতী রচনার আগে এবং শর্মিষ্ঠা রচনার প্রায়

মধুসূদনের রচিত প্রহসন-দ্বয়।

একই সময়ে লেখা। তখনকার সমসাময়িক জীবনের বিভিন্নমুখী অনাচারের বিরুদ্ধে মধুসূদনের মোহমুক্ত শিল্প-দৃষ্টি এখানে প্রখর হয়ে উঠেছে। প্রথমটির বিষয়বস্তু সেকালের 'ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের নৈতিক ব্যাভিচার,—আধুনিকতার নামে উৎকট উচ্ছৃঙ্খলতার

কদর্য কাহিনী। অপরটিতে আছে কপট-ধার্মিক নারী-মাংস-লোলুপ বৃদ্ধ জমিদারের দুরাচরণের গল্প। উভয়ক্ষেত্রেই রোমান্স-স্বপ্নাতুর কবির বাস্তব-দৃষ্টির যাথাযাথ্য ও চরিত্রায়ণের পুঙ্খানুপুঙ্খতা বিস্ময়কর। তারও চেয়ে বিস্ময়কর তাঁর রুচির শুচিতা ও প্রকাশের শালীনতা। প্রহসন দুটির সংলাপ পদ্যভাব-মুক্ত, যথাযথ এবং সম্পূর্ণরূপে চরিত্রানুগ হয়েছিল। কিন্তু, তার চেয়েও বড় কথা,—বিভিন্ন চরিত্রের ব্যভিচারী স্বভাবকে প্রকট করেও মধুসূদনেব লেখা সংলাপ কোথাও রুচিহীন হয়ে পড়ে নি। অথচ, অন্যায়ের প্রতি ব্যঙ্গের রূঢ় আঘাতও কৃপাণ-কঠোর হয়ে উঠেছে।

মধুসূদনের সর্বশেষ নাটক কৃষ্ণকুমারীতে (১৮৬১) তাঁর রোমান্স-স্বপ্নাতুর রচনা-শৈলী পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠেছে। এটিই তাঁর একমাত্র পূর্ণাঙ্গ রচনা যাতে সচেতনভাবে প্রতীচ্য নাট্যাঙ্গিক অনুসৃত হয়েছে প্রায় আদ্যন্ত। নাটকটির গল্প টড্-এর 'রাজস্থান' থেকে নেওয়া; এ-সম্বন্ধে কবি জানিয়েছেন,—"For two nights, I sat up for hours pouring over tremendous pages of Tod and at about 1 A. M. last Saturday, the muse smiled." উদয়পুরের রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীব পাণিগ্রহণ বিষয়ে জয়পুর ও মেরুদেশেব রাজা জয়সিংহ এবং মানসিংহের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। দুজনেই নিজ নিজ দাবি আদায় করবার জন্য উদয়পুর আক্রমণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। বাজ্য ও জাতির উদ্ধারের আর কোনো উপায় না দেখে স্বয়ং রাজা তাঁর লক্ষ্মী-প্রতিম একমাত্র কন্যার মৃত্যু-বিধানের আদেশ দেন। সে আদেশ পালনের ভার পড়ে রাজ-ভ্রাতার ওপব, যিনি কৃষ্ণকুমারীকে ভালবাসতেন কন্যার মত। নিদ্রিতা কৃষ্ণকুমারীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে তাঁর হাত কেঁপে ওঠে, কণ্ঠে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে হৃদয়ের ব্যাকুল অভিমান। কৃষ্ণকুমারী জেগে উঠে সব কথা শুনে স্বজাতির কল্যাণে নিজের হাতে নিজের জীবনান্ত করেন,—ঠিক সেই মুহূর্তেই রাজা উন্মত্তবেগে ছুটে আসেন নিজ আদেশ প্রত্যাহার করে নিতে। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে।

কৃষ্ণকুমাবী নাটক

ইংরেজি আদর্শে লেখা প্রথম সফল বাংলা ট্রাজেডি কৃষ্ণকুমারী নাটক। এই সফলতার প্রথম কারণ মধুসূদনের বাঙালি-ধর্মী রোমান্টিক জীবন-বেদনার একান্ততা। আঙ্গিকের দিক্ থেকে এই রচনাতেও জড়তা এবং

শিথিলতা কিছু কম নেই।—বিশেষ করে সংলাপ অংশে এই অ্যাতিশয্য অতিমাত্রায় চোখে পড়ে। তাহলেও প্রতীচ্য ট্রাজেডির মোটামুটি রূপাধারে একটি সত্য-জীবন্ত জীবন-বেদনাকে উপস্থিত করা সম্ভব হয়েছিল, —নাট্য বিষয়ের এই বাঙালি-ধর্মিতাই মধুসূদনের সফলতার প্রধান কারণ।

মায়াকানন নামে আর একখানি নাটক রচনা শেষ হলেও মৃত্যুর আগে তা সংশোধন করে যেতে পারেন নি কবি। রিজিয়া নাটক তাঁর মৃত্যু কালেও ছিল অসম্পূর্ণ।

মধুসূদনের পরেই এ-যুগের নাট্যকারদের মধ্যে প্রথমে উল্লেখ্য দীনবন্ধু মিত্র (১২৩৬-১২৮০ বাংলা সাল)। প্রথম নাটক নীলদর্পণই (১৮৬০ খ্রীঃ) ছিল লেখকের খ্যাতির প্রধান উৎস। এই নাটক কিন্তু রস-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রচিত হয় নি। সমকালীন বাংলাদেশে নীল চাষের জবরদস্তি উপলক্ষ্যে বিদেশী নীলকরেরা এদেশে নারী নির্যাতন, নরহত্যা, লুঠতরাজ ইত্যাদি পৈশাচিক দুষ্কর্মের বাঁধ ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। সেই দুঃসহ অবস্থার যন্ত্রণা অগ্নি-রূপ পেয়েছিল ১৮৫৯-৬০ খ্রীস্টাব্দে নীল-চাষীদের দেশব্যাপী ধর্মঘটে। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে নীল কমিশন বসেছিল,—ঐ একই বছরে নীলদর্পণ রচনা করে গ্রন্থের ভূমিকায় দীনবন্ধু আশা প্রকাশ করেছিলেন,—"নীলকর দুষ্ট রাহুগ্রস্ত প্রজাগণের অসহ্য কষ্ট নিবারণার্থে উক্ত মহানুভব [রাজপ্রতিনিধি] গণ অচিরাৎ সদ্বিচাররূপ সুদর্শনচক্র হস্তে গ্রহণ করিবেন।"

দীনবন্ধু মিত্র

দীনবন্ধুর আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয় নি। নীলদর্পণ রচনার ফলে দেশের শিক্ষিত সমাজের বিক্ষোভ অগ্নিদীপ্ত হয়ে উঠেছিল। এই গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ ইংলণ্ডেও প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করে। বলা বাহুল্য, মূলগ্রন্থে লেখক নিজের নাম গোপন করেছিলেন। ইংরেজি অনুবাদক মধুসূদনের নামও প্রকাশ করা হয় নি। কেবল ইংরেজি সংস্করণের প্রকাশক হিসেবে নাম ছাপানোর অপরাধে পাদ্রী লঙ্-এর এক হাজার টাকা জরিমানা হয়েছিল। রাজা কালীপ্রসন্ন সিংহ সে টাকা তৎক্ষণাৎ আদালতে জমা করে দিয়েছিলেন স্বেচ্ছায়। লঙ্ মুক্তি পেলেন,—কিন্তু বিদ্রোহের আগুন আরো জ্বলে উঠলো, 'নীলদানব'কে শৃঙ্খলিত করে তবেই তা শান্ত হয়ছিল।

নীলদর্পণ নাটক

নীলদর্পণে নাট্য-রসসৃষ্টির চেয়ে অসহায় চাষীদের যন্ত্রণাকে তপ্ত করে তোলার আকাঙ্ক্ষা তীব্র ছিল। ফলে, অনেক সময়ে দুর্ঘটনা, উৎপীড়ন ও পৈশাচিকতার আত্যন্তিক চিত্রণ সহজ রসবোধকে ক্লিষ্ট করেছে। নাটকের সংলাপ ও ঘটনা-বিন্যাসেও শিল্প-দক্ষতার পরিচয় স্পষ্ট নয়। ভাষা কোনো স্থলে অতি গ্রাম্য, কোথাও-বা কৃত্রিম আলংকারিতার আড়ম্বরে অতিস্ফীত। মূল গল্পাংশও দ্বিধাবিভক্ত। প্রথম অংশে রাইচরণ, সাধুচরণ, তোরাপ ইত্যাদি সাধারণ চাষী ও তাদের স্ত্রী-কন্যা পরিবারের প্রতি নীলকর সাহেবদের পাশবিক পীড়নের উৎকট, অথচ সম্পূর্ণ বাস্তব জীবন-রূপ চিত্রিত হয়েছে। তাদের গ্রাম্য বাগ্‌ভঙ্গির মধ্যে আদিম সরলতায় ভরা চারিত্রধর্মকে লেখক ক্যামেরার মত যথাযথ বিশ্বস্ততার সঙ্গে উদ্ধার করেছেন। গল্পের অপর অংশে আছে এক আদর্শ জমিদার পরিবারের কথা, অসহায় প্রজাদের নীলকর-পীড়নের হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে যাঁরা সমূলে বিনষ্ট হয়েছিলেন। জমিদার গোলোক বসু, তাঁর বড় ছেলে, তথা জমিদারির চালক আদর্শ যুবক নবীনমাধব, ছোট ছেলে কলকাতায় পাঠরত বিন্দুমাধব, গোলোক বসুর স্ত্রী ও দুই পুত্র-বধূ সকলে মিলে অপূর্ব সুখের সংসার। তোরাপ ও রাইচরণকে অত্যাচার থেকে বাঁচাতে গিয়ে, এবং রাইচরণের সন্তান-সম্ভবা কন্যা ক্ষেত্রমণিকে উড্‌-এর পাশবিক পীড়ন থেকে রক্ষা করতে গিয়ে নবীনমাধব স-পরিবারে নীলকরদের রোষ-ভাজন হন। মিথ্যা মামলার দায়ে হাজতবাস করতে গিয়ে গোলোক বসু উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন, নবীন বসু নীলকরদের অনধিকার প্রবেশ প্রতিরোধ করতে গিয়ে প্রথমে আহত ও পরে নিহত হন। তাঁর শোক-উন্মাদিনী জননী উন্মত্ত হয়ে কনিষ্ঠ বধূকে গলা টিপে হত্যা করেন, তারপর জ্ঞান ফিরে পেয়ে কৃতকর্মের যন্ত্রণায় নিজেও করেন মৃত্যুবরণ। নীলদর্পণের চাষী ও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেদের কণ্ঠে তাদের নিজেদের ভাষার হুবহু প্রতিরূপ গড়ে তুলেছেন দীনবন্ধু,—স্থানেস্থানে তা শিক্ষিত সমাজের পক্ষে দুর্বোধ্য, এমনকি মাঝে মাঝে অ-শালীনও। তেম্‌নি ভদ্র সমাজের জন্য তিনি যে সংলাপ রচনা করেছেন,—তা কৃত্রিম ও হাস্যকররূপে অলংকার-কণ্টকিত। তবু, নীলদর্পণ সফল সৃষ্টি ;- জীবনের নাট্যরূপ রচনার দক্ষতায় নয়,—নাটকের আধারে সমকালীন জাতীয় জীবন-যন্ত্রণাকে উদ্দীপ্ত করে তোলার সার্থকতায়।

দীনবন্ধুর দ্বিতীয় নাটক 'নবীন তপস্বিনী'তেও (১৮৬৩) দু'টি গল্প পাশাপাশি প্রবাহিত,—একটি কল্যাণ-পরিণামী রোমান্টিক প্রণয়-কথা ;—অপরটি স্থূলতা-ধর্মী অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর জীবন-কাহিনী। দ্বিতীয়োক্ত গল্পটিই নাটকে জমেছে বেশি ;—যদিও তাতে দীনবন্ধুর রসিকতা স্থূল আদিরসকে আশ্রয় করেছে বারে বারে।

সধবার একাদশী (১৮৬৬) দীনবন্ধুর লেখা প্রহসন ; নব্য-বঙ্গ সম্প্রদায়ের নৈতিক ব্যভিচার ও বিনষ্টিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে এতে। নিমচাঁদ চরিত্রে মধুসূদনের ব্যঙ্গ-প্রতিরূপ অঙ্কিত হয়েছে বলে একদা অনুমিত হয়েছিল ; যদিও দীনবন্ধু সে অভিযোগ অস্বীকার করেন। তাঁর অন্যান্য নাট্য রচনার মধ্যে আছে বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো (১৮৬৬), লীলাবতী নাটক (১৮৬৭), জামাই-বারিক (১৮৭২) ও কমলে কামিনী (১৮৭৩)। সাতখানি নাটকের সঙ্গে দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ সুরধুনী কাব্য ও দ্বাদশ কবিতা,—সর্বমোট এই তিনখানি কবিতা-পুস্তকও লিখেছিলেন দীনবন্ধু। দ্বিতীয় খণ্ড সুরধুনী কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল কবির মৃত্যুর পরে।

দীনবন্ধুর অপরাপর রচনা

মধুসূদনের পরেই নাটকে আর এক নূতন সুরের সৃষ্টি করেছিলেন মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) ; মঞ্চাশ্রয়ী বাংলা নাট্যপ্রবাহের ইতিহাসে তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষের পূর্বসূরী ;—প্রায় গুরু-কল্প। কালের দিক থেকে মনোমোহন বঙ্কিমোত্তর শিল্পী। তাঁর প্রথম রচনা রামাভিষেক নাটক (১৮৬৭) প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশের পরে। কিন্তু, ভাবের দিক্ থেকে তিনি ছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য। ঈশ্বর গুপ্তের মতই তাঁর শিল্পি-মানস পুরাতন ও নূতনের সমন্বয়-ভূমিতে দাঁড়িয়েছিল। প্রতীচ্য-ধর্মী 'থিয়েটার'-এর রূপাধারে তিনি বাঙালির নাট্য-স্বভাব-সমুচিত যাত্রা-শিল্পকে নূতন করে গড়ে তুলেছিলেন। লেখক নিজে বলেছেন,—"ভারতবর্ষ যে য়ুরোপ নয়, য়ুরোপীয় সমাজ আর স্বদেশীয় সমাজ যে বিস্তর বিভিন্ন, য়ুরোপীয় রুচি ও স্বদেশীয় রুচি যে সম্যক পৃথক্ পদার্থ", এ-কথা নে তবেই বাংলা নাটক রচনায় ব্রতী হওয়া উচিত। মনোমোহন নিজে তা করেছিলেন, আর এ-বিষয়ে তাঁর বিশেষ সহায়ক হয়েছিল জাতীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা। এ-পর্যন্ত বাংলা

নাট্যকার মনোমোহন

নাটক প্রধানতঃ পারিবারিক বা ব্যক্তিগত রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষিত, বিদগ্ধমনের সহচারিতা করেই ঐসব নাট্য রচনা সফল হয়েছিল। কিন্তু, জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জাতির রস-বাসনাকে চরিতার্থ করাই হয়েছিল প্রধান উদ্দেশ্য। ৺ার, মনোমোহন বুঝেছিলেন বাঙালির জাতীয় প্রবণতা ঘটনা-শ্লথ, আবেগস্ফীত, সংগীত-প্রধান যাত্রা-রস আস্বাদনেব অভিমুখী। প্রথম নাটক 'রামাভিষেক্'-এ তিনি এই প্রবণতার পরিপোষণে ব্রতী হয়েছিলেন। বাংলা পৌরাণিক নাটকের যথার্থ জন্ম এখানেই; পরে গিরিশচন্দ্র এই নাট্য-ধারায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন।

বচনাপঞ্জী ও নাট্যধর্ম

মনোমোহনের অন্যান্য পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকের মধ্যে আছে,—সতী নাটক (১৮৭৩), হরিশ্চন্দ্র নাটক (১৮৭৫), পার্থ পরাজয় নাটক (১৮৮১), রাসলীলা নাটক (১৮৮৯) ও আনন্দময় নাটক (১৮৯০)। এইসব নাটকে ভক্তি-প্রাধান্য ও ধর্মানুরক্তিই একমাত্র বড কথা নয়, সেই সঙ্গে স্বদেশ-প্রীতির উদ্দীপনাও ছিল প্রবল। মনোমোহন হিন্দু মেলা, তথা বাংলার জাতীয় আন্দোলনের উষালগ্নে নবজীবনের চারণ ছিলেন। তাঁর পৌরাণিক নাটকে গান ও সংলাপ উভয়ের মধ্যেই পরাধীনতাব বেদনা ও আত্মমোক্ষণের প্রতিশ্রুতি দীপ্ত হয়ে আছে।

অন্যান্য রচনা

প্রণয়-পরীক্ষা নামে মনোমোহন একটি সামাজিক নাটক লিখেছিলেন; তাঁর লেখা একমাত্র প্রহসনের নাম নাগাশ্রমের অভিনয়। এ-ছাডা, তাঁর পদ্য-কৃতিও ছিল বিচিত্র রকমের,—শিশু-কবিতা, ঈশ্বর-গীতি থেকে আখডাই, পাঁচালী, বাউল, টপ্পা,—এমন কি, সামাজিক ও রাজনৈতিক গান ইত্যাদি। দুলাল নামে একখানি ঐতিহাসিক 'নবন্যাস'ও তিনি লিখেছিলেন; 'সংবাদ বিভাকর' এবং 'মধ্যস্থ' নামে দু'খানি পত্রিকার সম্পাদনাও করেছিলেন।

নাট্যকার রাজকৃষ্ণ

সেকালের বাংলা নাটকে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন মনোমোহন,—রাজকৃষ্ণ রায় তাতে যোগ করলেন নতুন আঙ্গিকের পরিচ্ছন্নতা। কবিতার ক্ষেত্রেও দেখেছি, রাজকৃষ্ণ রায় ছন্দ ও রূপ-কর্ম নিয়ে সচেতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। 'পদ্য পৌংক্তিক'

গদ্য রচনার বৈশিষ্ট্যের কথাও পূর্বে উল্লেখ করেছি। নাটকের ক্ষেত্রে 'হরধনুর্ভঙ্গ'-তে (১২৮৫ বঙ্গাব্দ) তিনি 'ভাঙা অমিত্রাক্ষর' ছন্দের প্রথম সফল প্রয়োগ করেন ;—ইতিহাসের বিচারে নাট্য-সংলাপে গৈরিশছন্দের সার্থক পূর্বরূপ এখানেই সূচিত হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ নাটক, গীতিনাট্য, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক, প্রহসন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারে ত্রিশখানারও বেশি নাটক লিখেছিলেন রাজকৃষ্ণ। তার মধ্যে জনপ্রিয়তার বিচারে অবশ্য-উল্লেখ্য পৌরাণিক নাটক প্রহ্লাদ-চরিত্র, নরমেধ যজ্ঞ ও অনলে বিজলী ; ঐতিহাসিক নাটক বিক্রমাদিত্য ; এবং কলির প্রহ্লাদ, জগা পাগলা ইত্যাদি প্রহসন।

মহিলা রচিত প্রথম বাংলা নাটক

এ-যুগের নাট্যকারদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য আর কেউ নেই। কেবল স্মরণ করতে হয়, মহিলা রচিত প্রথম বাংলা নাটক এই সময়েই লিখিত হয়েছিল। ডঃ সুকুমার সেন জানিয়েছেন, এই লেখিকার নাম ছিল কামিনীসুন্দরী দেবী,—তাঁর প্রথম নাটক 'উর্বশী' রচিত হয়েছিল ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে। এঁর লেখা আরো দু'খানি নাটকের নাম 'ঊষা' ও 'রামের বনবাস'।

চিন্তামূলক বাংলা গদ্য ও বাংলা উপন্যাস

মধুসূদনের প্রথম নাটক রচিত হয়েছিল ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর প্রথম কাব্য তিলোত্তমা-র রচনাকাল ১৮৬০। এরপর মধুসূদন-প্রতিভার বিকাশ-ধর্মকে অনুসরণ করেই বাংলা কবিতা ও নাটক নব-জীবনের শক্তিতে দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। অপরদিকে, রাজনারায়ণ বসুর (১৮২৬-১৮৯৯) প্রথম বক্তৃতা-গ্রন্থিকা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে, আর প্রথম ভাগ ধর্মতত্ত্ব দীপিকা-র প্রকাশকাল ১৮৬৬। বাংলা গদ্যে মননশীল সুগভীর চিন্তার স্পর্শ লেগেছে এখানেই। আধুনিক বাংলা কাব্য ও নাটকে যেমন মধুসূদন, তেমনি বাংলা গদ্য-প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ-এর মর্যাদা রাজনারায়ণ এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের। এঁরা দু'জনেই হিন্দু-কলেজে মধুসূদনের সহপাঠী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। এদিক থেকে বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন-রাজনারাযণ-ভূদেব-প্রভাবিত এই যুগকে হিন্দু-কলেজীয় যুগ বলতেও বাধা নেই। কারণ, হিন্দু-কলেজ-এর শিক্ষা ও রুচি সেকালের তরুণ মনে যে মুক্তি ও নব-জীবন-চিন্তার অনুভব জাগিয়ে তুলেছিল,—বস্তুতঃ সাহিত্যের সকল দিকে এই অভিনব বিকাশের মূলেও আছে সেই প্রাণ-চেতনা।

হিন্দু কলেজীয় যুগ

বাংলা সাহিত্যে রাজনারায়ণ-ভূদেবের শ্রেষ্ঠ কীর্তি প্রথম সার্থকনামা গদ্য-প্রবন্ধের প্রবর্তন। আগে বলেছি, গদ্য আটপৌরে জীবনের প্রয়োজন নির্বাহের ভাষা। এই ভাষায় বলিষ্ঠ চিন্তাশক্তি—তথা, বুদ্ধি ও হৃদয়-ধর্মের কর্ষণ তখনই সম্ভব হয়,—জাতীয় মনীষা ও হৃদবৃত্তি যখন শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ লাভ করে থাকে। বাংলা গদ্যে যুক্তি-নিষ্ঠ চিন্তার প্রথম স্পর্শ লেগেছিল রামমোহনের রচনায়, কিন্তু ভাষা তখনো সুগঠিত হয় নি। অক্ষয় দত্তের হাতে চিন্তা-ঋদ্ধ গদ্য সুগঠিত হয়েছিল। তাহলেও বিদেশী জ্ঞানকে নিজ দেশের আয়ত্তগম্য করার দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি। মনীষী রাজনারায়ণের লেখায় বাংলা গদ্যে লেখকের নিজস্ব-মৌলিক চিন্তার দোলা লেগেছিল। ভাবনা-গভীর গদ্য-প্রবন্ধের জন্ম তাঁর হাতেই।

বাংলা প্রবন্ধের মুক্তি-রূপ

রাজনারায়ণের প্রবন্ধ ছিল বিচিত্র-বিষয়ক।—তাঁর রচনা-সংকলন 'বিবিধ-প্রবন্ধ'-র রচনাভঙ্গিতেও বিষয়ানুমত বিচিত্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। আর বলা উচিত, আশ্চর্য স্বপ্ন, স্বদেশীয় ভাষানুশীলন, আর্যজাতির উৎপত্তি ও বিচার—ইত্যাদি সকল বিষয়কেই বিবিধপ্রবন্ধের অন্তর্গত করা হয়েছে। তাঁর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রচনাবলীর মধ্যে আছে :—

প্রাবন্ধিক রাজনারায়ণ বসু

(১) রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫৫ ও ১৮৭০ খ্রীঃ)।

(২) ধর্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ (১৮৬৬, ১৮৬৭)

(৩) আত্মীয় সভার বৃত্তান্ত (১৮৬৭)

(৪) সেকাল আর একাল (১৮৭৪)

(৫) হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের বৃত্তান্ত (১৮৭৬)

(৬) বাঙালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা (১৮৭৮)

বাংলা প্রবন্ধের আঙ্গিক-সুগঠন আরো বলিষ্ঠ হয়েছিল ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৫-১৮৯৪) হাতে। প্রাবন্ধিক হিসাবে রাজনারায়ণ বসুর চেয়ে ভূদেব অনেক বেশি সচেতন ছিলেন; তাঁর বইগুলির নামকরণ থেকেও এ-কথা বোঝা যায়। এই রচনাপঞ্জীর মধ্যে আছে পারিবারিক প্রবন্ধ (১৮৮২), সামাজিক প্রবন্ধ (১৮৯২), আচার প্রবন্ধ (১৮৯৪), বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ (১৮৯৪) ইত্যাদি। গ্রন্থগুলির নামের মধ্যেই রয়েছে বিষয়ের প্রকাশ। বাঙালির পরিবার, সমাজ, আচার-বিবেক ইত্যাদি জীবনের সকল দিকের আনুষ্ঠানিক আদর্শ ও কর্তব্য বিষয়ে সুগভীর চিন্তা করেছেন ভূদেব,—একের পর এক লিখে গেছেন প্রবন্ধাবলী। তাঁর চিন্তা ও বিচার এ-কালে অতি-রক্ষণশীল বলে উপেক্ষিত হয়। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখি,—এক সুদৃঢ় মতবাদের ওপরে প্রতিষ্ঠিত তাঁর প্রতিটি রচনার পেছনে রয়েছে নিরপেক্ষ চিন্তা ও দূরযানী যুক্ত-বিচারের প্রাঞ্জলতা। সে-বিচার এবং সে-মনীষা একালের পক্ষেও বিস্ময়কর।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধাবলী

প্রধানতঃ প্রাবন্ধিক হিসাবেই সাহিত্যের ইতিহাসে ভূদেবের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু, এ-কথাও ভোলা উচিত নয় যে, বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ

উপন্যাসেরও লেখক তিনি। তাঁর লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৮৫৬-৫৭) দু'টি গল্পের সমষ্টি। প্রথমটির নাম সফল স্বপ্ন,— দ্বিতীয়টি অঙ্গুরীয় বিনিময়। দু'টি গল্প পরস্পর সম্পর্কহীন।

ঔপন্যাসিক ভূদেব

লেখক জানিয়েছেন, Romance of History নামক ইংরেজি গ্রন্থের প্রথম গল্পটি নিয়ে সফল স্বপ্ন লিখিত হয়েছিল। দ্বিতীয়টিরও গল্পাংশে ঐ বই-এর প্রভাব আছে। প্রথম লেখাটি একটি সরস উপাখ্যান,—Tale.—এক পথিকের জীবনে রাত্রির অসম্ভব স্বপ্ন কি আশ্চর্য রকম সত্যে পরিণত হযেছিল,—তারই সকৌতুক বর্ণনা আছে এতে। দ্বিতীয় গল্পটি যথার্থ ঔপন্যাসিক রোমান্স-এর আকারে লেখা। ঔরঙ্গজীবের কন্যা রোসিনারা-কে কৌশলে বন্দী করে আনেন শিবাজী; ক্রমশঃ দুজনে দু'জনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন; এবং পরিণামী ত্যাগেব সকরুণ-মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে রোসিনারার প্রেম,—এইটুকু নিয়েই অঙ্গুরীয় বিনিময়ের গল্প। এই কাহিনীব বহুলাংশের,—বিশেষ করে রোসিনারা চরিত্রের সফল ছায়াপাত ঘটেছে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী-তে;—আয়েষার চরিত্র-কল্পনায়।

ভূদেবেব গদ্য-প্রবন্ধের ভাষা চিন্তা-ভার-সন্নত,—সুগভীর, গম্ভীর। কিন্তু, তাঁর গল্পের ভাষা লঘু না হলেও রস-চঞ্চল। স্বপ্ন-লব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস-এ (১৮৯৫) এই শিল্পি-জনোচিত দৃষ্টি ও প্রকাশভঙ্গি স্বচ্ছতা পেয়েছে। এ-সব ছাড়া ভূদেব বেশ কিছু সংখ্যক স্কুলপাঠ্য গদ্য পুস্তকও লিখেছিলেন।

ভূদেবের ঐতিহাসিক উপন্যাস ছাড়াও এ-যুগে আরো কিছু কিছু গদ্য গল্প-সাহিত্য রচিত হয়েছিল। তার মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস নামে খ্যাত। আসলে, এই বইটি এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' সেকালের সমাজ-জীবনের ব্যঙ্গমূলক নক্সা বলেই গণ্য হওয়া উচিত। এ-ধরনের গদ্য রচনা প্রথমে গ্রন্থবদ্ধ

নববাবু ও নববিবি বিলাস

করেছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নববাবু বিলাস (১৮২৫); দূতীবিলাস (১৮২৫) ও নববিবি বিলাস-এ (১৮৩১?)। প্রথম ও শেষ গ্রন্থটি এ-বিষয়ের সফলতম রচনা; প্রথমটিতে অশিক্ষিত, অর্থ-মত্ত, হঠাৎ-বাবুদের চারিত্র দৈন্যকে ব্যঙ্গ-কষাঘাত করা হয়েছে; শেষগ্রন্থে আঘাতের কেন্দ্র ছিলেন 'নব-বিবি'রা—নব-বাবুদের স্বভাব-ফলের "প্রধান মূল" যাঁরা।

প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-১৮৮৩) 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে ; প্রথম সংস্করণে লেখক ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন,—'টেকচাঁদ ঠাকুর'। ডঃ সুকুমার সেনও বলেছেন, "বইটিকে প্রধানত নক্শা বা চিত্রসমষ্টি বলা চলে।" সেকালের কল্‌কাতার এক ধনী পরিবারের বিনষ্টি ও আলোক-সন্ধানের দু'টি পরস্পর-বিরোধী ধারাকে কেন্দ্র করে এর গল্পাংশ গড়ে উঠেছে ; —পটভূমিতে আছে সেকালের বৃহত্তর সমাজ। এই গ্রন্থের আরো একটি ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য,—তথাকথিত সাধুরীতির গদ্য রচনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। লোকমুখের 'চলিত্' ভাষাকেই প্রচলিত করতে চেয়েছিলেন এতে প্যারীচাঁদ। কিন্তু, ভাষা-শিল্পী হিসাবে এই গ্রন্থ-রচনার জন্য তাঁকে বিশেষ কৃতিত্ব দেওয়া চলে না। শুধু তাই নয়, মূল গল্পের গঠনেও শিথিলতা রয়েছে প্রচুর। যদিও সেকালের ভঙ্গুর জীবন-ধারার নক্সা হিসেবে অনেক জায়গার বর্ণনাই বিচ্ছিন্নভাবে রসবহুল।

প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল

মৌলিক স্রষ্টা হিসাবে প্যারীচাঁদের প্রতিষ্ঠা দূরব্যাপী না হলেও, তাঁর পাণ্ডিত্য ও বিদগ্ধতা ছিল দুর্লভ রকমের। এই তথ্যের অসংশয়িত পরিচয় রয়েছে কৃষিপাঠ (১৮৬১), যৎ কিঞ্চিৎ (ঈশ্বর উপনিষদাদি বিষয়ক আলোচনা—১৮৬৫), ডেবিড্ হেয়ারের জীবন-চরিত ইত্যাদি গ্রন্থ-গ্রন্থিকায়। তাছাড়া, রামারঞ্জিকা (১৮৬০), অভেদী (১৮৭১), আধ্যাত্মিকা (১৮৮০), বামাতোষিনী (১৮৮১) ইত্যাদি কথোপকথন ও গল্পমূলক রচনা আসলে নীতি-বিষয়ে লেখা। গীতাঙ্কুর নামে তাঁর লেখা একটি ব্রহ্মসংগীত-সংকলনও রয়েছে। আলালের ঘরের দুলাল ছাড়া আরো একখানি ব্যঙ্গ-নক্সা লিখেছিলেন প্যারীচাঁদ,—মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায় (১৮৫৯) নামে।

প্যারীচাঁদের রচনাপঞ্জি

একদা 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনার জন্য প্যারীচাঁদ বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক বলে সংবর্ধিত হয়েছিলেন। প্রথমতঃ আঙ্গিকের দিক থেকে 'আলাল' একেবারেই উপন্যাস গুণান্বিত নয়। তাছাড়া আলোচ্য নক্সা জাতীয় ব্যঙ্গ-বাস্তবতাপূর্ণ রচনা শৈলীরও প্রথম প্রবর্তক প্যারীচাঁদ নন,—ভবানীচরণ অনেক আগেই তাঁর সমধর্মী

রচনাগুলি লিখে প্রকাশ করেছিলেন। এমন কি মিসেস হানা ক্যাথেরীন মলেনস্ নাম্নী এক বিদেশিনী মহিলাও অনুরূপ সমাজ-নক্সা লিখেছিলেন প্যারীচাঁদের 'আলাল' রচনারও আগে। গ্রন্থটির নাম 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২)। লেখিকা খ্রীস্টধর্মের প্রচার-সেবিকা ছিলেন। ভারতীয় খ্রীস্টান সমাজের এক বিশেষ শ্রেণীর জীবনযাত্রার নক্সাই এতে প্রতিফলিত।

ফুলমণি ও করুণার বিবরণ

এসব ছাড়াও প্যারীচাঁদের ব্যঙ্গ-নক্সা রচনার চেষ্টা প্রথম শ্রেণীর সফলতা দাবি করতে পারে না,—তাঁর উদ্দেশ্যের পূর্ণ সিদ্ধি ঘটেছিল কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-১৮৭০) হুতোমপ্যাঁচার নক্সা-য়। এই বই-এর প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে; পরে দুইভাগ একত্র করে প্রকাশ করা হয়। কালীপ্রসন্ন ছিলেন বিদ্বান, বিদ্যোৎসাহী, স্বদেশ ও স্বজাতিবৎসল। নিজের তের বছর বয়সে, বাংলা-ভাষার অনুশীলনের জন্য তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; এই সভা পরবর্তীকালে কবি মধুসূদন ও নীলদর্পণ-প্রকাশক লঙ্ সাহেবকে সম্বর্ধিত করে ঐতিহাসিক কীর্তি অর্জন করেছিল। কালীপ্রসন্ন সর্বস্ব পণ করে অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের গদ্যানুবাদ করিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করেছিলেন। যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলী এই মূলানুবাদ কর্মে ব্রতী ছিলেন, তাঁদের পুরোধা হয়েছিলেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আট-নয় বছরের একান্ত পরিশ্রমের পরে দুই খণ্ডে এই মহাগ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হয়; প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে, দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশকাল ১৮৬৬।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

বিদ্যোৎসাহিনী সভার অনুষঙ্গ হিসাবে বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার-এর প্রতিষ্ঠা হয়। এখানে অভিনয়ের জন্য কালীপ্রসন্ন প্রথমে বিক্রমোর্বশী নাটক অনুবাদ করেন; পরে লিখেছিলেন পুরাণাশ্রিত নাটক সাবিত্রী-সত্যবান্। 'বঙ্গেশ বিজয়' নামে একখানি উপন্যাসও তিনি লিখেছিলেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে কালীপ্রসন্নের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হুতোমপ্যাঁচার নক্সা। সেকালের কলকাতার সমাজ, আচার-আচরণ, উৎসব-পার্বণ, সভাসমিতি ইত্যাদি জীবনের বিচিত্র দিকে যে-সব অসংগতি এবং কুশ্রীতা সঞ্চিত হয়েছিল, হুতোম তাদের সব-কিছুর ওপর ব্যঙ্গের কষাঘাত করেছিলেন। এমন কি, সমকালীন সমাজের বহু

হুতোমপ্যাঁচার নক্সা ও অপরাপর রচনা

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের নৈতিক দুর্বলতার ওপরেও তাঁর আঘাত তীব্র হয়ে উঠেছিল। তাতে ঘরে-পরে অকারণ নিন্দার বোঝা সঞ্চিত হয়েছিল তাঁর জীবনে প্রচুর। তবু হুতোম-প্যাঁচার নক্সার সামাজিক ও ঐতিহাসিক মূল্য সুচির-প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। এই গ্রন্থের আর একটি উল্লেখ্য উপাদান,—এর ভাষা। আগাগোড়া বইটি কলকাতার প্রচলিত কথ্য ভাষায় লেখা। তাতে চলিত বাংলার বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গিও অনেক স্থলে উজ্জ্বল হয়ে আছে; এদিক থেকে বীরবলী বাক্‌রীতির পূর্বসূরিতা দাবি করতে পারেন হুতোম।

হুতোমের নক্সা ব্যঙ্গরীতি এবং ভাষা প্রভৃতির বৈশিষ্ট্যে বহুজনের অনুকরণীয় হয়েও উঠেছিল। এইসব অনুসরণকারীদের মধ্যে হুতোমের শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৪২-১৯১৬)। প্রথম গ্রন্থ 'সমাজ চিত্র' (১৮৬৫) তিনি নিশাচর ছদ্মনামে প্রচার করেন এবং "সাহসের অদ্বিতীয় আশ্রয় শ্রীযুক্ত হুতোমচাঁদ দাস মহাশয়েষু" উৎসর্গ করেন। তাঁর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গ্রন্থগুলির মধ্যে 'হরিদাসের গুপ্তকথা' (১৯০৪) অবশ্য স্মরণীয়। এর প্রথম সংস্করণ চার খণ্ডে প্রকাশিত হয় এই এক নূতন। 'আমার গুপ্ত কথা' নামে। এই গ্রন্থের লেখক হিসেবে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছিল শোভাবাজারের উপেন্দ্রকৃষ্ণদেব বাহাদুরের নাম।

হেক্‌টর বধ

আলোচ্য যুগের গদ্য-রচনার ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকবে মধুসূদনের হেক্‌টর বধ-এর উল্লেখ না করলে। এটি ইলিয়াড্‌ কাব্যের বঙ্গানুবাদ। সুর ও ভাষায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এই রচনাটিতে মধুসূদন বাংলা গদ্যের এক অননুকরণীয় ওজস্বী রূপ গড়ে তুলেছিলেন। অথচ সে-ভাষার দুর্বোধ্যতাও কিছু কম নয়।

বাংলা উপন্যাসের জন্ম-যুগ

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে নবীন গতির দোলা লেগেছিল, তাঁর প্রথম পদসঞ্চার মধুসূদনের কাব্য-কবিতায়,—দ্বিতীয় দৃঢ়তর পদক্ষেপ বঙ্কিমের উপন্যাস-সাহিত্যে। উপন্যাস-কলাকে সাধারণ-ভাবে আধুনিক জীবনের শিল্পরূপ বলা হয়ে থাকে। এদিক থেকে তার ভাব-উপাদান প্রধানত দুটি,—(১) মধ্যযুগের আবেগ-ভক্তি প্রধান নির্বিচার আদর্শবাদের প্রতি সংশয় এবং (২) নূতন আত্ম-প্রত্যয়ে দৃঢ়তা নিয়ে জীবন-বিচারের আকাঙ্ক্ষা। মধুসূদনের কাব্যে অন্ধ পুরাতন-প্রীতির প্রতি ক্ষোভ এবং নবীনের প্রতি অনুরাগের বিজয়ধ্বজা গগনচুম্বী হয়েছে। কিন্তু পুরাতনকে ছাড়ব বললেই তার বাঁধন কিছু আলগা হয়ে যায় না। নূতনকে চাইলেই তা তৎক্ষণাৎ করায়ত্তও হয়ে পড়ে না। এই দুইয়ের টানা-পোড়নের দ্বন্দ্বে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নব্য-বঙ্গের জীবন-ধারা তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেছিল। স্বয়ং মধুসূদনের ব্যক্তি-জীবন সেই ঝড়ের আঘাতে জর্জরিত। আর সেকালের ইতিহাস সন্ধান করলে দেখব,—আদর্শ-সংঘাতের দুরন্ত বিপর্যয় আরো বহু শিক্ষিত তরুণ জীবনকে আচ্ছন্ন করেছিল। বাংলার জীবন-ভূমিতে এই সমস্যা-জটিল ক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস-রচনার পথকে নির্ধারিত করেছিলেন। আধুনিক-জীবন যে-পরিমাণে উন্নত,—সেই পরিমাণেই পরস্পর-বিদ্রোহী উপাদান ও আদর্শের আঘাতে কণ্টকিত। যে সভ্যতা যত অগ্রসর,—পথের কাঁটা তুলে এগিয়ে যাবার দক্ষতা ও কৌশল ও তার তেমনি। আর, উপন্যাস যেখানে আধুনিক জীবন-সম্ভব, সেখানে জীবনের এই দ্বন্দ্ব জটিলতা-বৈচিত্র্যের সম্ভারে তা যেমন বাস্তব, তেমনি যথাযথ, পূর্ণাঙ্গ। বাংলাদেশের নবজাগ্রত জীবন-ধর্মকে এমনি যথাযথ সম্পূর্ণ করে দেখার আকাঙ্ক্ষাকে শিল্প-সফল রূপ দিয়ে বঙ্কিমের হাতে প্রথম সার্থক জন্ম নিল বাংলা উপন্যাস-কলা। এর আগে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অঙ্গুরীয় বিনিময়-এ রোমান্টিক উপন্যাসের সফল অঙ্কুর উদ্গত হয়েছিল। বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনীতে তারই পূর্ণাঙ্গ পরিণতি ঘটেছে অনেক দিক থেকে।

বাংলা উপন্যাস ও বঙ্কিমচন্দ্র

দুর্গেশনন্দিনী,—তথা, প্রথম দুই পর্বে লেখা বঙ্কিম-উপন্যাসের কেন্দ্রভূমিতে রয়েছে সেকালের সামাজিক বিপ্লবের সমস্যা-জটিলতা। দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে ; তারপরে পর পর দেখা দেয় কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬) ও মৃণালিনী (১৮৬৯)। এই তিনখানি গ্রন্থ বঙ্কিম-উপন্যাসের প্রথম পর্বের অন্তর্গত। দ্বিতীয় পর্বে আছে বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), ইন্দিরা (১৮৭৩), যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), রাধারাণী (১৮৭৫), রজনী (১৮৭৭) ও কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)। ওপরের তালিকায় বিভিন্ন রচনাবলীর গ্রন্থরূপে প্রথম প্রকাশের কালই উল্লিখিত হয়েছে,—এর আগে প্রায় সব কয়টি গ্রন্থই বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে। বঙ্কিম-উপন্যাসের তৃতীয় পর্যায়ে সমাজ-বিপ্লবের উদ্যোগকেও ছাপিয়ে প্রধান হয়ে উঠেছে শিল্পীর রাজনৈতিক সচেতনতা ও উদ্বেলিত স্বদেশপ্রেম। আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবীচৌধুরাণী (১৮৮৪) ও সীতারাম (১৮৮৮) এই পর্যায়ের উপন্যাস-ত্রয়ী। সীতারাম বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা সর্বশেষ উপন্যাস ; তাঁর একমাত্র সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস রাজসিংহ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে, আনন্দমঠ-এর একই বছরে। শ্রেণীগত বিচারে রাজসিংহ বঙ্কিম-উপন্যাসের জগতে একক,—তাহলেও ঐতিহাসিক চেতনার সঙ্গে শিল্পীর দেশ-বিনম্র-চিত্ততার অঙ্কুর এখানেও অস্পষ্ট নয়।

বঙ্কিম-উপন্যাসের বিভিন্ন পর্যায

বঙ্কিমের প্রথম পর্যায়ের উপন্যাস-ত্রয়ীকে রোমান্স বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু, এখানেই, আগে বলেছি, সমকালীন জীবন-সমস্যার সফল ছায়াপাত ঘটেছে। রামমোহন রায়ের হাতে উনিশ শতকের নবীন জীবন-বিপ্লবের শুরু। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আমরণ সাধনা, ও হিন্দু কলেজের অগ্নিস্নাত তরুণ ছাত্রদলের উদ্দীপনা,—সব কিছু মিলে এই বিপ্লব-যজ্ঞের সফল উদ্‌যাপন সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু, প্রথম থেকে লক্ষ্য করেছি, এ-যুগের আগাগোড়া বৈপ্লবিক অভিযান ছিল নারী-কেন্দ্রিক। আগে দেখেছি, মধ্যযুগের বিপর্যয়-লগ্নে নারীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং ব্যক্তিত্বের মর্যাদা, দুই ই সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে পড়েছিল। সতী-দাহ নিবারণ ও বিধবা বিবাহের প্রবর্তন, নারীর উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, নারী-শিক্ষার প্রবর্তন, ইত্যাদি আন্দোলনের

বঙ্কিম-উপন্যাসের জীবন-প্রচ্ছদ

মধ্য দিয়ে শিক্ষিত সমাজে নারী-ব্যক্তিত্বের নব-জাগরণের পথ ক্রম-উৎসারিত হয়ে উঠ্‌ছিল।) বঙ্কিমচন্দ্র যে-যুগে সাহিত্য রচনা করেছিলেন, তখন থেকেই নগর-বাংলায় ইংরেজি শিক্ষিত নারীসমাজে ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধ ও স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধি অঙ্কুরিত হয়ে উঠ্‌ছিল। আর, তাতেই দেখা দিচ্ছিল এক অজ্ঞাতপূর্ব জটিলতার পূর্ব-সম্ভাবনা। একদিকে পুরাতন সমাজব্যবস্থায় নারীকে মাতা-কন্যা-বধূ-প্রিয়া রূপে পুরুষের প্রয়োজন-লগ্ন করে রাখার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে স্বাতন্ত্র্য-সচেতন নারীর আত্মমর্যাদার দাবি,—এই দুয়ের সংঘাত-সমস্যা ক্রমেই দুরপনেয় হয়ে উঠতে পারত। সেই জীবন-সমস্যাকেই বঙ্কিম অখণ্ড-সম্পূর্ণ রূপে অঙ্কন করেছেন তাঁর উপন্যাস-সাহিত্যে। এদিক থেকে অনেকটা পরিমাণে তিনি ছিলেন অনাগত-বিধাতা। যে জীবন-যন্ত্রণা যুগ-চেতনার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁচেছিল, অথচ যার পূর্ণ প্রকাশ তখনও ঘটেনি,—বঙ্কিম সেই গোপন ধারার অতলে ডুব দিয়েছিলেন,—অনাগত সমস্যার সমাধান কামনা করে।)

দুর্গেশনন্দিনীতে, তাই, এই জীবন-সমস্যা কল্পনা-রঙিন রোমান্স-এর আকার পেয়েছে। তিনটি নারী-চরিত্রের জীবন-জটিলতাকে কেন্দ্র করে গোটা গল্পটির বহিরঙ্গ গতি তরঙ্গিত হয়ে চলেছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেগবান্ সক্রিয় চরিত্র বিমলার। অভিরাম স্বামীর কানীন কন্যা বিমলা—শূদ্রাণী গর্ভজাত। অথচ, অভিরাম স্বামীর দুর্লভ প্রতিভার সফল উত্তরাধিকারিণী সে। অভিরাম-শিষ্য রাজা বীরেন্দ্র সিংহ তার রূপে-গুণে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু, অ-সামাজিক উৎস-সম্ভবা একটি নারীকে রাজবংশের কুলবধূত্বে বরণ করবেন কী করে? যুগ-যুগ-সঞ্চিত সংস্কারের বাধাকে বঙ্কিম এখানে অতিক্রম করতে চেয়েছেন নবযুগের পক্ষ থেকে। বীরেন্দ্র সিংহের লোভাতুরতার কড়িকাঠে বিমলার নারীত্বকে তিনি বলি দেন নি। বৈধ বিবাহানুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই এদের মিলিত করেছেন। কেবল সমাজের মুখ রক্ষার জন্য বীরেন্দ্র সিংহের জীবৎকাল পর্যন্ত এই গোপন বিবাহ-কথা অ-প্রকাশিত থেকেছে। অন্যদিকে বীরেন্দ্র সিংহের একমাত্র কন্যা তিলোত্তমাও অসামাজিক উৎস-জাতা। বীরেন্দ্র সিংহের প্রথমা স্ত্রী, তিলোত্তমার মৃতা জননীও ছিলেন অভিরাম-স্বামীরই অবৈধ সন্তান। দুর্গেশনন্দিনী-তিলোত্তমা

দুর্গেশনন্দিনী

ও বীরেন্দ্রসিংহের শত্রু-পুত্র জগৎসিংহের মধ্যে গোপন-স্বতন্ত্র প্রণয়, এবং পিতৃবন্দী জগৎসিংহের নিকট নবাব-কন্যা আয়েষার গোপন আত্মসমর্পণ, সব-কিছু মিলে যেমন গল্পের, তেমনি সমকালীন জীবন-জটিলতার রূপও পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। নিজের কালের জীবনের এই অন্তর্গত সমস্যাকে নিয়ে বঙ্কিম ইতিহাসের অতলে ডুব দিয়েছেন। ঐতিহাসিক পরিবেশ বা তথ্যযোজনা দুর্গেশনন্দিনীতে মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়;—কিন্তু অতীতের বৃহৎ প্রচ্ছদকে শিল্পী তাঁর কল্পনার অবাধ মুক্তির ভিত্ হিসেবে সফল ব্যবহার করেছেন। এখানেই রোমান্সের যথার্থ উৎস। আয়েষা-জগৎসিংহ-কাহিনীতে অঙ্গুরীয় বিনিময়-এর ক্ষুদ্র-পরিসর গল্প জীবন-সম্পূর্ণতা পেয়েছে।

কপালকুণ্ডলায় মোগল-হারেম-রঙ্গিনী মতিবিবি এবং আবাল্য যোগিনী কপালকুণ্ডলার নারী-জীবন-দ্বন্দ্ব নবকুমারের নিষ্ক্রিয় পৌরুষকে আশ্রয় করে রোমান্স-সুনিবিড় হয়ে উঠেছিল। মৃণালিনীতে বাংলার প্রথম পরাধীনতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নারী-প্রণয়ের বিচিত্র রোমান্স-চিত্র অঙ্কিত হয়েছে—

কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী

মৃণালিনী-হেমচন্দ্র এবং পশুপতি-মনোরমার জীবন-কথা নিয়ে। বঙ্কিম-ব্যক্তিত্বের মৌল প্রবণতা ছিল দুটি বিশেষ পথে:—(১) সমকালীন সমাজ-জীবন-সচেতনতা এবং (২) স্বদেশের অতীত ঐতিহ্য-প্রীতি ও তৎকালিক পরাধীনতার বেদনা-বোধ। প্রথম ক্ষেত্রে বঙ্কিম ছিলেন যুক্তি-চিন্তাশীল বিচারক, এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ছিলেন স্বপ্নাবেগ-বিহ্বল কবি। এই দ্বিবিধ প্রবণতারই অঙ্কুর উদ্গত হতে দেখি প্রথম পর্যায়ের উপন্যাস-ত্রয়ীতে। দ্বিতীয় পর্যায়ে বঙ্কিমের সমাজ-জীবন-চিন্তা পূর্ণ শিল্পমূর্তি ধরেছে ক্রম-বিকশিত উপন্যাসের কলা-দেহে। তৃতীয় পর্যায়ে কবি-বঙ্কিমের স্বদেশ-প্রেমস্বপ্ন চিত্রিত হয়েছে,—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,—'রোমান্সের আতিশয্যে'র মধ্য দিয়ে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের উপন্যাস-ধারার মুখবন্ধে রয়েছে চন্দ্রশেখর। সন্ধি-লগ্নের সমাজ-শিল্পী হিসেবে বঙ্কিম এখানে দুঃসাহসী। চন্দ্রশেখরের মত বরেণ্য পুরুষের গৃহ ত্যাগ করেছে তাঁর বিবাহিতা পত্নী শৈবলিনী। চন্দ্রশেখরকে শৈবলিনী ভক্তি করে তার নারী-হৃদয়ের অণু-পরমাণুতে,—কিন্তু ভালবাসে বাল্যসঙ্গী প্রতাপকে, সামাজিক নিয়মে যার সঙ্গে তার বিবাহ নিষিদ্ধ।

নারী-হৃদয়ে প্রেম ও ভক্তির দ্বন্দ্ব, সধবা নারীর পতি-গৃহ ত্যাগ, ইত্যাদি নানা দিক থেকে বঙ্কিম এই উপন্যাসে বিপ্লবের দূরতম প্রান্তে গিয়ে পৌঁচেছেন। কিন্তু, নারীর স্বাতন্ত্র্য-অধিকারকে সম্ভ্রমের সঙ্গে স্বীকার করেও, সমাজে শৃঙ্খলা-হীনতাকে প্রশ্রয় দেন নি বঙ্কিম। তাই, মানসিক বিকার ও পুনঃসংবিৎ লাভের পরে শৈবলিনীকে পতিগৃহে আবার ফিরে আসতে হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের উপন্যাসাবলী

এখানে বঙ্কিম-রচনায় দ্বৈধ রয়েছে,—ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও সমাজ-কল্যাণের মহৎ আদর্শ,—দুয়ের মধ্যে ভার-সম সামঞ্জস্য বিধানের দিকে ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। তাতে উপন্যাসের পরিণতিতে জটিলতা এবং অস্পষ্টতাও দেখা দিয়েছে,—এমন অভিযোগ করে থাকেন কেউ কেউ। বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল-এ সপত্নীক যুবক এবং বিধবা যুবতীর প্রণয়-দ্বন্দ্বের সামাজিক ও পারিবারিক জটিলতার জীবন-রূপ চিত্রিত হয়েছে সবিস্তারে। আর এখানেও, বিশেষ করে কৃষ্ণকান্তের উইল-এর চতুর্থ সংস্করণে বঙ্কিমের কল্যাণ-পরিণামী জীবন-বিশ্বাস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সকল সমস্যা-জটিলতাকে ছাপিয়ে। রজনীর অভিনব উপন্যাস-দেহে এই জীবন-বিশ্বাসের প্রথম প্রকাশ।

এই পর্যায়ের অন্যান্য রচনা ইন্দিরা ও রাধারাণী পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস নয়,—উপন্যাস-ধর্মী বড় গল্প। এই গল্প-দুটির রোমান্টিক প্রণয়-পরিবেশেও সমকালীন জীবন-চেতনার ছাপ অস্পষ্ট নয়।

রাজসিংহ, আগে বলেছি, বঙ্কিমের একমাত্র সফল ঐতিহাসিক উপন্যাস। গ্রন্থের বিজ্ঞাপন-এ লেখক নিজেও এ-কথা স্বীকার করেছেন,—"আমি পূর্বে কখনো ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই।...এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।" রাজসিংহ ও ঔরঙ্গজীবের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে শিল্পি-বঙ্কিম এই উপন্যাসে একটি অখণ্ড-সফল জীবন-রূপ এঁকে তুলেছেন। আর, এই উপন্যাসেই তাঁর শিল্পি-ব্যক্তিত্বের অপর একটি উপাদান জাতীয় গৌরববোধ প্রথম প্রকট হয়ে উঠেছে। এ-বিষয়ে তিনি নিজেই 'বিজ্ঞাপন'-এ আবার লিখেছেন,—"ইংরেজ সাম্রাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্বে কখনো লুপ্ত হয় নাই। হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য। উদাহরণ স্বরূপ আমি রাজসিংহকে লইয়াছি।"

রাজসিংহ

বঙ্কিমের এই স্বদেশ-ভক্তি রাজনৈতিক বিপ্লব-কামনার সার্থক রূপ পেয়েছে আনন্দমঠ-এ। একদা আনন্দমঠ-এর ঐতিহাসিক ভিত্তি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছিল। বঙ্কিম নিজে বইটির ঐতিহাসিকতার কথা অস্বীকার করেছেন। আনন্দমঠ-এর কাহিনী, বিন্যাস, ও জীবন-কল্পনা সবকিছুই বঙ্কিমের সৃজনী-প্রতিভার রচনা। ডঃ যদুনাথ সরকার এই সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, "তাঁহার [বঙ্কিমের] সন্তানেরা বাঙালি ব্রাহ্মণ কায়স্থের ছেলে, গীতা যোগশাস্ত্র প্রভৃতিতে পণ্ডিত; কিন্তু, যেসব 'সন্ন্যাসী ফকীরেরা' সত্য ইতিহাসের লোক, এবং উত্তরবঙ্গে (বীরভূম নহে) ঐসব অত্যাচার করে, তাহারা কাশী ভোজপুর প্রভৃতি জেলার পশ্চিমে লোক, এবং প্রায় সকলেই নিরক্ষর, ভগবদ্‌গীতাব নাম পর্যন্ত জানিত না। বঙ্কিমের সন্তান-সেনা বৈষ্ণব, আসল 'সন্ন্যাসীরা' ছিল শৈব।" স্পষ্টই দেখছি, বঙ্কিম নবীন যুগের নূতন মানস-ধর্মের বিপ্লবী রূপ আঁকতে চেয়েছেন গীতার সুপ্রাচীন হিন্দু আদর্শবাদকে আশ্রয় করে। এখানেই ছিল তাঁর হিন্দু জাতীয়তাবাদের উৎস। আর, আনন্দমঠ-দেবীচৌধুবাণী-সীতারাম এই উপন্যাস-ত্রয়ী পাঠ করলে দেখ্‌ব,—বঙ্কিম গীতার কর্ম-সন্ন্যাসের আদর্শের সঙ্গে প্রতীচ্যের প্রত্যক্ষবাদ ও হিতবাদ-এর আদর্শ যোগ করে তাঁর নবমানবতার কল্পনাকে উজ্জীবিত করে তুলতে চেযেছিলেন। আনন্দমঠ-এ সেই হিন্দু-মনুষ্যত্বের বৈপ্লবিক মূর্তি অগ্নি-দীপ্ত হয়েছে। দেবীচৌধুরাণীতে দেখি সেই আদর্শ মনুষ্যত্বের পূর্ণরূপ,—'দেবীরানী' প্রফুল্ল বঙ্কিম-কল্পনার আদর্শ কর্মসন্ন্যাসিনী। সীতারাম কর্মবীর হয়েও,—কর্ম-যোগ-ভ্রষ্ট,—তাই তিনি হিন্দু-জাতীয়তার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থকাম-ও। সমাজ-দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক সংঘাতের মূল-ভূমিতে বাঙালির নব-জীবন-সম্ভাবনার যে-অঙ্কুরকে ঔপন্যাসিক বঙ্কিম একদা খুঁজে পেয়েছিলেন, ত্যাগ-বিমুক্ত কল্যাণব্রতের পুণ্যালোকে নিষ্ণাত করে কবি-বঙ্কিম তার ভাবী পূর্ণতার স্বপ্ন দেখেছেন এই শেষ উপন্যাস-ত্রয়ীতে।

বঙ্কিম-উপন্যাসের পরিণামী পর্যায়

বঙ্কিমের পরেই এ-কালের উপন্যাস-লেখক হিসেবে উল্লেখ্য শিল্পী সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-৮৯)। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, গল্প-বলার এক অদ্ভুত দক্ষতা ছিল সঞ্জীবচন্দ্রের। তাঁর লেখাগুলিও প্রায়ই "কথা

কথার অজস্র আনন্দ বেগেই লিখিত—ছাপার অক্ষরে আসর জমাইয়া যাওয়া।" সঞ্জীবচন্দ্রের উপন্যাসগুলির রচনাভঙ্গিতে রয়েছে এই বৈশিষ্ট্য। তাঁর প্রথম উল্লেখ্য উপন্যাস কণ্ঠমালা-র প্রকাশ-কাল ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে। এর আগে মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় রামেশ্বরের অদৃষ্ট ও দামিনী। মাধবীলতা প্রথম গ্রন্থরূপ পেয়েছিল ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে। জাল প্রতাপচাঁদ ঐতিহাসিক রচনা হলেও, সঞ্জীবচন্দ্রের বলার ভঙ্গিতে গল্প-রসে-ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে। ভ্রমণ-কাহিনী 'পালামৌ' সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে।

সঞ্জীবচন্দ্র

বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে বঙ্কিমানুজ পূর্ণচন্দ্রেরও একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। তাঁর লেখা মধুমতী বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ ছোটগল্প। শৈশবসহচরী নামে একখানি উপন্যাসও তিনি লিখেছিলেন।

প্রথম বাংলা ছোট-গল্প ও পূর্ণচন্দ্র

বঙ্কিম-যুগে বঙ্কিম-অনুরাগী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)। অর্থনীতি ও ইতিহাসের গবেষক-পণ্ডিত হিসেবে রমেশচন্দ্রের খ্যাতি ছিল দূর-প্রসারী। কিন্তু, বাংলা উপন্যাস-রচনার শিল্প-ভূমিতে তাঁকে আহ্বান করে এনেছিলেন বঙ্কিম। বঙ্কিমের পুনঃ পুনঃ পীড়া-পীড়িতেই তিনি উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলেন,—এ-কথা নানাভাবে স্বীকার করেছেন রমেশচন্দ্র নিজে। তাঁর রচনা-ভঙ্গিতেও বঙ্কিমানুসরণের ছাপ স্পষ্ট।

রমেশচন্দ্র দত্ত

রমেশচন্দ্র চারখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছিলেন, আর দুখানি লিখেছিলেন, সামাজিক উপন্যাস। প্রথম দুখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪) ও মাধবী কঙ্কণ (১৮৭৭) রচনা হিসেবে একান্ত দুর্বল। বঙ্গ-বিজেতার বিষয়বস্তু আকবর-এর সময়কার; গল্পের ঐতিহাসিক অংশের নায়ক টোডরমল্ল। কিন্তু, গল্পের আর একটি অংশ বঙ্কিম-অনুসারী রোমান্স-চিত্রণে উচ্ছ্বসিত। প্রথম অংশ যেমন ঐতিহাসিকতায় অতি-ভারাক্রান্ত, দ্বিতীয়াংশ তেমনি অতি-কল্পনায় স্ফীত। দুটি গল্প কোথাও একত্র-গ্রথিত হতে পারে নি।

ঐতিহাসিক উপন্যাস

মাধবীকঙ্কণ-এ পারিবারিক জীবন-রূপায়ণই মুখ্য, ইতিহাসের প্রেক্ষাভূমি গৌণ। শাজাহানের শেষ বয়সে তাঁর রাজ্যলোভাতুর পুত্রদের

প্রস্তুত বিপ্লবের স্রোতে দৈবাৎ ভেসে গিয়েছিলেন গৃহত্যাগী নায়ক নরেন্দ্র। মূল গল্পাংশে হেমলতা-নরেন্দ্র-শ্রীশচন্দ্রের প্রণয়-দ্বন্দ্ব রোমান্স-ঘন হয়ে উঠেছে। ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে জীবন-প্রভাত (১৮৭৮) ও জীবন-সন্ধ্যা (১৮৮৮) অ-বিস্মরণীয় শ্রেষ্ঠতায় প্রতিষ্ঠিত। প্রথমটির গল্প-পটভূমি গড়ে উঠেছে শিবাজী-সমকালীন মহারাষ্ট্র-ইতিহাসের প্রভাত-উজ্জ্বলতায়। দ্বিতীয়টির ঐতিহাসিক প্রচ্ছদ রচিত হয়েছে প্রতাপ সিংহোত্তর রাজপুত জীবনের সন্ধ্যালগ্নে। দুটিরই ঐতিহাসিক জীবন-ভূমিকে আলোকিত করে তুলেছে একান্ত প্রাসঙ্গিক রোমান্স-ঘন স্বপ্নাকুলতা।

রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস

রমেশচন্দ্রের দুখানি সামাজিক উপন্যাসের নাম সংসার (১৮৮৬) ও সমাজ (১৮৯৪)। 'সংসার'-এ গ্রামীণ চাষী জীবনের কাহিনী বিবৃত হয়েছে; রচনার আকৃতি ও প্রকৃতি অতীব দুর্বল। উপন্যাস হিসেবে 'সমাজ' বলিষ্ঠতর সৃষ্টি; কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনাতেই রমেশচন্দ্রের কীর্তি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বঙ্কিমানুব্রতী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) চিত্তাকর্ষক ভাষাশৈলী এবং বাস্তব তথ্য-চিত্র-বর্ণনার সাফল্যে একদা বহুল জনপ্রিয় হয়েছিলেন। কাঞ্চন-মালা, বেনের মেয়ে তাঁর স্মরণীয় উপন্যাস-সৃষ্টি।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বঙ্কিম-যুগে সামাজিক উপন্যাসের লেখক হিসেবে বঙ্কিম-প্রতিস্পর্ধী খ্যাতি লাভ করেছিলেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১)। বঙ্কিম-উপন্যাসে সাধারণতঃ ইংরেজি শিক্ষিত উচ্চ বা মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন-রূপ প্রাধান্য পেয়েছে। তারকনাথ লিখেছিলেন অর্ধ বা অশিক্ষিত দরিদ্র গ্রামীণ বাঙালির জীবন-কথা। অনেকটা এই বিষয়-বৈচিত্র্যের জন্যই হয়ত তাঁর প্রথম গ্রন্থ স্বর্ণলতা (১২৮১ বাংলা সাল) সেকালে একান্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। প্লট, চরিত্র অথবা অখণ্ড জীবন-বোধ সৃষ্টির দক্ষতায় স্বর্ণলতা কেন, তারকনাথের কোনো রচনারই ঔপন্যাসিক আঙ্গিক সুদৃঢ় নয়। তবে সমকালীন জীবনের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ নক্সা-রূপ একান্ত সহৃদয়তার সঙ্গে

বিকশিত হয়েছে তাঁর আগাগোড়া রচনায়। মাঝে মাঝে কৌতুক-সরসতাও বেশ দীপ্ত। ফলকথা, শিল্প-শৈলীর উৎকর্ষ নয়, জীবন-বোধের অভিনবতা ও গভীরতাই তারকনাথের রচনাবলীকে একদা হৃদ্য করে তুলেছিল। স্বর্ণলতা ছাড়াও এই রচনাপঙ্ক্তিতে রয়েছে হরিষে বিষাদ বা নায়ক নায়িকা শূন্য উপন্যাস (১৮৮৭), তিনটি গল্প (১৮৮৯) ও অদৃষ্ট (১৮৯২)। বিধিলিপি নামে একখানি উপন্যাস লেখকের মৃত্যুকালে অসমাপ্ত হয়েছিল।

বঙ্কিম-যুগে বঙ্কিম-প্রভাব-মুক্ত আর একজন ঔপন্যাসিক ছিলেন প্রতাপচন্দ্র ঘোষ। ইনি লিখেছিলেন ঐতিহাসিক উপন্যাস বঙ্গাধিপ পরাজয়। বইটি সুদীর্ঘ দুইখণ্ডে সমাপ্ত হয়েছিল। প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে ; দ্বিতীয়খণ্ডের প্রকাশকাল ১৮৮৪। যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের আগাগোড়া জীবন-কথা এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। ঐতিহাসিক তথ্যের খুঁটিনাটি ও অতিবিস্তার গ্রন্থটিকে যেমন প্রামাণ্য করে তুলেছে, তেমন রস-স্নিগ্ধ করতে পারেনি। এমন কি, উপন্যাসের আকারে লিখিত হলেও বইটি সুখপাঠ্য নয়। প্রতাপচন্দ্রের লেখায় স্কট্-এর ইংরেজি উপন্যাসের প্রভাব প্রচুর।

প্রতাপচন্দ্রের বঙ্গাধিপ পরাজয

স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) ছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'ন-দিদি'। নারী-সুলভ স্পর্শকাতরতাকে রোমান্স-এর মাধুর্যে নিবিষ্ট করে উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি। বাংলা সাহিত্যে ইনিই প্রথম সার্থক-কীর্তি মহিলা ঔপন্যাসিক। তাঁর প্রথম উপন্যাস দীপনির্বাণ (১৮৭৬) পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তার ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে লেখা রোমান্স। অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে ছিন্নমুল, মালতী, হুগলীর ইমামবাড়ি, কাহাকে ? ইত্যাদি। এ-সব কয়টিই রোমান্স-প্রধান লেখা। তা ছাড়া, স্বর্ণকুমারীর ইতিহাসাশ্রিত রচনার মধ্যে আছে মেবার-রাজ, বিদ্রোহ, ফুলের মালা ইত্যাদি। আরো আছে বিচিত্রা, স্বপ্নবাণী, মিলন রাত্রি ও স্বর্ণলতা। শেষোক্ত প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন,—"বাঙালি-সমাজে আধুনিকতার সমস্যা লইয়া এই প্রথম উপন্যাস লেখা হইল।"

স্বর্ণকুমারী দেবী

এ-ছাড়া স্বর্ণকুমারী কবিতা ও নাটকও লিখেছিলেন। ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন তিনি দীর্ঘদিন।

বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প-সমাপ্তির রোমান্টিক রহস্যজাল স্পষ্ট করার প্রয়াস নিয়ে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিলেন ঔপন্যাসিক দামোদর মুখোপাধ্যায়। সে-কালের এক-দল উপন্যাস-পাঠকের একমাত্র উপভোগ্য ছিল গল্প-রস। সেই কৌতূহল নিবৃত্তির অতি-উৎকণ্ঠায় রোমান্স-এর রহস্য-সুন্দরতাকেও বিসর্জন দিতে কুণ্ঠা ছিল না তাঁদের। সেই গল্প-কৌতূহল নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে দামোদর বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলার 'ক্রোড়পত্র' হিসেবে মৃন্ময়ী উপন্যাস (১৮৭৪) প্রথম লিখে প্রকাশ করেন। কপালকুণ্ডলা মৃন্ময়ী হয়ে উঠেছেন, এ-খবর জেনেই গল্পামুদে একদল পাঠক খুসি হয়ে ওঠেন,—দামোদরের রচনা জনপ্রিয় হয়। উৎসাহিত হয়ে দামোদর এবার দুর্গেশনন্দিনীর গল্প সম্পূর্ণ করে লিখলেন নবাবনন্দিনী বা আয়েষা। গালগল্প লেখার ভাল হাত ছিল দামোদরের, কিন্তু রসোত্তীর্ণ উপন্যাস রচনার দক্ষতা ছিল না। তাঁর মৌলিক রচনাগুলি প্রায়ই অপরাধ-প্রধান ডিটেকৃটিভ্ গল্প-ধর্মী। অন্যান্যের মধ্যে দামোদর গ্রন্থাবলীতে রয়েছে বিমলা, দুই ভগিনী, জয়চাঁদের চিঠি, মা ও মেয়ে, কর্মক্ষেত্র, সোনার কমল, যোগেশ্বরী, অন্নপূর্ণা, প্রতাপসিংহ, নবীনা ইত্যাদি। এ-ছাড়া ইংরেজ লেখকের উপন্যাসের বঙ্গানুবাদও করেছিলেন দামোদর,—এদের মধ্যে 'কমল-কুমারী' স্কট্-এর এবং 'শুক্লবসনা সুন্দরী' কলিন্স্-এর উপন্যাস অবলম্বনে লেখা। মহাভারতের গল্পাংশ নিয়ে একটি নাটকও তিনি লিখেছিলেন সুকন্যা নামে।

দামোদর মুখোপাধ্যায়

কবি ও প্রবন্ধ-লেখক শিবনাথ শাস্ত্রী উপন্যাসও লিখেছিলেন কয়েকখানি,—এদের প্রায় কোনোটিই উপাখ্যানের পর্যায় ছেড়ে যথার্থ উপন্যাস নামের যোগ্য হয়ে ওঠে নি। এই রচনাপঞ্জীর মধ্যে আছে মেজবৌ (১৮৭৯), যুগান্তর (১৮৯৫), নয়নতারা (১৮৯৯) ও বিধবার ছেলে।

শিবনাথ শাস্ত্রী

পল্লীবাংলার জীবন-চিত্রকে একদা একান্ত হৃদ্য করে এঁকেছিলেন ঔপ-ন্যাসিক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। রবীন্দ্রনাথ এঁকে লিখেছিলেন,—"আপনার লেখা আমার ভারি ভাল লাগে।...সরল মানব-হৃদয়ের মধ্যে যে গভীরতা আছে,

—এবং সুখ দুঃখ-পূর্ণ মানবের দৈনন্দিন জীবনের যে নিরানন্দময় ইতিহাস, তাই আপনি দেখাবেন। শীতল ছায়া, আম-কাঠালের পুকুরের পাড, কোকিলের ডাক, শান্তিময় প্রভাত ও সন্ধ্যা, এরি মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে তরল কল-ধ্বনি, বিরহ-মিলন, হাসি-কান্না নিয়ে যে মানব-জীবন-স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে, তাই আপনি আপনার ছবির মধ্যে আনবেন।" শ্রীশচন্দ্রের শিল্পি-স্বভাব কবিগুরুর উক্তিতেই স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। এঁর চারখানি উপন্যাস হচ্ছে যথাক্রমে শক্তিকানন (১৮৮৭), ফুলজানি (১৮৯৪), কৃতজ্ঞতা (১৮৯৬) ও বিশ্বনাথ (১৮৯৬)। ফুলজানি উপন্যাসের সুদীর্ঘ সমালোচনা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

বঙ্কিমযুগের উপন্যাস-সাহিত্যে নূতন সুর ও স্বাদের প্রবর্তন করেছিলেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। অথচ এঁরা দুজনেই ছিলেন একান্ত বঙ্কিম-ভক্ত। এই অধ্যায়ের শুরুতেই বলেছি, বঙ্কিমের হাতেই বাংলা উপন্যাসের প্রথম মুক্তি। আর, বঙ্কিমের উপন্যাস-সাহিত্য প্রধানতঃ গড়ে উঠেছিল সেকালের সন্ধি-ধর্মী জীবন-জটিলতার যন্ত্রণাভূমিকে কেন্দ্র করে; ফলে কেবল বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীতেই নয়, আলোচ্যকালের উপন্যাস-সাহিত্যের প্রায় সর্বত্র সাধারণভাবে ছড়িয়ে আছে এক গাম্ভীর্যের সুর,—গভীর জীবন-চিন্তার ভারে তা ভারাক্রান্ত। এই গভীরতার পরিবেশে সরস চঞ্চলতার নব সূত্রপাত করেন ইন্দ্রনাথ ও ত্রৈলোক্যনাথ।

হাস্য-রসাত্মক কথা-সাহিত্য

ইন্দ্রনাথের রচনা ছিল প্রধানতঃ ব্যঙ্গরস-প্রধান। তাঁর প্রথম গদ্য রচনা কল্পতরু, (১৮৭৪) বাঙ্গলার প্রথম ব্যঙ্গ-উপন্যাস বলে পরিচিত। লেখক নিজেই প্রসঙ্গান্তরে বলেছেন, "আমি satire-টাকে বাঙালির উপভোগ্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলাম।" কল্পতরু-র satire ব্রাহ্ম-সমাজের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ রচনা করেছিল। এর আগে ইন্দ্রনাথের প্রথম satire রচিত হয়েছিল পদ্যে,—নাম ছিল উৎকৃষ্ট কাব্যম্ (১৮৭০)। ভারত উদ্ধার-ও পদ্যে লেখা,—সেকালের বাঙালির স্বদেশ-প্রেমের দুর্বলতাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে তাতে। ক্ষুদিরাম নামে গদ্য গাল-গল্প প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এ-ছাড়া, ইন্দ্রনাথ পঞ্চানন্দ নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। পরে "পঞ্চানন্দ" বঙ্গবাসী পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়। ঐ সব রচনাকে একত্র গ্রথিত করে তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ পাঁচু ঠাকুর প্রকাশিত হয়েছিল।

ত্রৈলোক্যনাথও বাংলা কথা-সাহিত্যে হাস্য-রসিক হিসেবে প্রখ্যাত। কিন্তু ইন্দ্রনাথের মত তাঁর রচনায় ব্যঙ্গের সুতীব্র জ্বালা নেই। বরং প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের অন্তরালে নিহিত ছিল স্নিগ্ধ কৌতুক-রস। ত্রৈলোক্যনাথের জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল ব্যাপক ও দূর-প্রসারী ; তাঁর চিত্তবৃত্তির মূলে ছিল প্রসন্ন অনাসক্তি। দুঃসাধ্য-সাধনের সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিরাসক্ত কৌতুক-রসাকুলতাকে যুক্ত করে তিনি তাঁর সকল গল্প-উপন্যাস লিখেছিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রথম রচনা কঙ্কাবতী উপন্যাসেই (১২৯৯ বাংলা সাল) এই রচনা-শৈলী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কঙ্কাবতী-কে লেখক বলেছেন "উপকথার উপন্যাস।" রূপকথার কঙ্কাবতীর গল্পকে বাস্তব জীবন-রসে নিষিক্ত করে এক নবরূপ দিয়েছেন লেখক। এ গল্প কেবল শিশুদেরই মুগ্ধ করে না, বিদগ্ধজনকেও রসাবিষ্ট করে। কঙ্কাবতী ছাড়া ত্রৈলোক্যনাথের উপন্যাস-সাহিত্যের মধ্যে আরো রয়েছে ফোকলা দিগম্বর (১৯০১), মুক্তামালা (১৯০১) ও ময়না কোথায়। এঁর গল্প-সংকলনের মধ্যে স্মরণীয় হচ্ছে ভূত ও মানুষ, মজার গল্প ও ডমরু-চরিত। সব কয়টি গল্পেই হাস্যরস-স্নিগ্ধতার সঙ্গে রয়েছে কৌতুক-প্রসন্নতা। ডমরু-চরিত প্রকাশিত হয়েছিল ত্রৈলোক্যনাথের মৃত্যুর পরে। ডঃ সুকুমার সেন ডমরু-চরিতের সাহিত্যিক অমরতা-গুণের প্রশংসা করেছেন,—এর তুলনা করেছেন Cerventes-এর Don Quixote এর সঙ্গেও।

ইন্দ্রনাথের মত ত্রৈলোক্যনাথও একদা বঙ্গবাসী পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠপোষিত জন্মভূমি পত্রিকাতেও তাঁর বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। ফলকথা বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী যোগেশচন্দ্র বসু এঁদের ব্যঙ্গ-হাস্য-মিশ্রিত রচনার উপাসক ছিলেন। তাঁর নিজের মধ্যেও তীব্র ব্যঙ্গরস দক্ষতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সাংবাদিকের তথ্য দর্শনক্ষমতা।

যোগেশচন্দ্র বসু

আর, তার সফল সাহিত্য-রূপ প্রকাশ পেয়েছে চারভাগে সমাপ্ত মডেল

ভগিনীতে (১২৯৩-১২৯৫? বাংলা সাল)। যোগেন্দ্রচন্দ্রের রচনায় শোভনতার অভাব প্রকট হয়েছে বহু স্থানে। তা হলেও সেকালের কল্‌কাতার পরিবেশ ও সামাজিক অনাচার-দুর্বলতা তীব্র ব্যঙ্গ-উজ্জ্বল বর্ণনায় ফ্রেমে-আঁটা-ছবির মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এঁর অন্যান্য ব্যঙ্গ রচনার মধ্যে আছে বাঙালি-চরিত, চিনিবাস চরিতামৃত, মহীরাবণের আত্মকথা, পাঁচ পর্ব কালাচাঁদ ইত্যাদি। এই সব রচনায় সেকালের পরিচিত ব্যক্তিদের উপলক্ষ্য করে ব্যঙ্গের পরোক্ষ আঘাত করা হয়েছে। শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী নামে তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ একটি রোমান্স-ও লিখেছিলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র। ডঃ সুকুমার সেন এই গ্রন্থকে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে অভিহিত করেছেন। সমকালীন জীবনের বাস্তব-রূপ এই গ্রন্থেও চিত্র-সমতুল যাথাযাথ্যের সঙ্গে রূপায়িত হয়েছে।

বাংলা প্রবন্ধের বিকাশ-কথা

গদ্য-শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'সব্যসাচী'। সৃজনী-শিল্পের নিত্য-নব রূপ রচনায় তিনি ছিলেন অনবদ্য। কিন্তু, জাতির চিন্তা ও মননকে ঋদ্ধ-বলিষ্ঠ করে তোলার দিকেও তাঁর সাধনা অতন্দ্র ছিল। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সমালোচক বঙ্কিমের কথাই বলেছেন বিশেষ করে। সে-ছিল আসলে বঙ্কিমের প্রাবন্ধিক সত্তা। আগে বলেছি, বাংলা গদ্য-প্রবন্ধের দেহ-সংগঠন প্রথমে গড়ে উঠেছিল মনীষী রাজনারায়ণ ও ভূদেবের রচনাকে আশ্রয় করে। বাঙালির সমাজ, সাহিত্য, পরিবার, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, আচার-আচরণকে যুক্তি-চিন্তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বর্ষণে বিচার করেছেন এঁরা বুদ্ধির আলোকে। কিন্তু, বঙ্কিম বাংলা প্রবন্ধে বুদ্ধি-ধর্মের সঙ্গে হৃদয়াবেগের পরিণয়-বন্ধন স্থাপন করলেন। তাঁর হাতে মননশীল প্রবন্ধের রচনা হয়ে উঠ্‌ল সাহিত্য-স্বাদী। এই সাহিত্যগত স্বাদ-ভেদে বঙ্কিমের রচনা দ্বিবিধ।

প্রাবন্ধিক বঙ্কিম

প্রথম শ্রেণীর রচনায় প্রাবন্ধিক বঙ্কিম রাজনারায়ণ-ভূদেবেরই উত্তরসূরী। ওঁদের মতই মনন-চিন্তা-বলিষ্ঠ তাঁর ঐসব প্রবন্ধ;—অথচ তাতে সাহিত্যিকের প্রাণের আবেগ যুক্ত হয়ে অপূর্ব রসানুভবের সৃষ্টি হয়েছে। দুই ভাগে সম্পূর্ণ বিবিধ-প্রবন্ধের অধিকাংশ রচনাই এই ধরনের সাহিত্য-রসান্বিত প্রবন্ধের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

সাহিত্য রসান্বিত প্রবন্ধ

বিবিধ প্রবন্ধ ছাড়া, বঙ্কিমের লেখা গুরু-গম্ভীর প্রবন্ধের পর্যায়ে আছে বিজ্ঞান রহস্য, সাম্য, কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্মতত্ত্ব। কিন্তু, আর এক রকমের প্রবন্ধ রচনায় তিনি প্রবন্ধ-বন্ধন মোচন করেছেন। প্রথম প্রকারের রচনাকে সাহিত্য-স্বাদী প্রবন্ধ বল্‌লে, এদের বল্‌তে হয় প্রবন্ধ-সাহিত্য। অর্থাৎ, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখা আসলে সাহিত্যিক নির্মিতি;—কিন্তু তা অনেকটা পরিমাণে প্রবন্ধের আকারে লেখা। প্রতীচ্য সাহিত্যে এই অভিনব রচনাঙ্গিকের প্রবর্তক ছিলেন Montaigne (১৫৩২-৯২) নামে এক ফরাসী

লেখক। তাঁর বইয়ের নাম দিয়েছিলেন 'Essais'; ইংরেজিতে তাই এই ধরনের রচনা 'Essay' নামেই পরিচিত,—আমরা এদের বল্‌ব 'সাহিত্যিক-প্রবন্ধ'। এই রচনাশৈলীর সাহিত্য-স্বভাব ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে,—"As a form of literature, the essay is a composition of moderate length, usually in prose, which deals in an easy, cursory way with a subject, and in strictness with that subject only as it affects the writer." সাহিত্যিক প্রবন্ধ সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা,—এর বিষয়বস্তু হচ্ছে এমন কিছু, যা লেখকের হৃদ্‌বৃত্তিকে স্পর্শ করতে পারে,—তাকে করে তুলতে পারে উদ্দীপ্ত। আসলে এই ধরনের রচনায় যে-কোনো বিষয়কে অবলম্বন করে লেখক তাঁর নিভৃত-স্বকীয় শিল্পি-প্রাণকে অনাবৃত মুক্তি দিতে পেরেই যেন পরমানন্দিত হন। শিল্পিহৃদয়ের আত্মলীন মুক্তির এই আনন্দই সাহিত্যিক-প্রবন্ধের রস-উৎস। দৃষ্টান্ত হিসেবে কমলাকান্তের দপ্তরের 'আমার দুর্গোৎসবে'র উল্লেখ করা যেতে পারে।

সৃজনধর্মী প্রবন্ধ-সাহিত্য

'কমলাকান্তের দপ্তর' ছাড়া বঙ্কিমের লেখা সাহিত্যিক-প্রবন্ধের আরো দুটি গ্রন্থ রয়েছে লোক-রহস্য ও মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত। পরের দুটি রচনার সুর বহিরঙ্গে রস-লঘু; কিন্তু অন্তরঙ্গে ব্যঙ্গ-তীব্র। 'মুচিরামগুড়'-এর satire-ই বঙ্কিম-রচনার মধ্যে সবচেয়ে ঝাঁঝালো।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই সে-যুগে সাহিত্যিক-প্রবন্ধ লিখে যাঁরা খ্যাত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সমুল্লেখ্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। এঁদের দুজনেরই লেখা বঙ্কিম তাঁর কমলাকান্তের দপ্তর-এ গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্কিমের সঙ্গে এঁদের রচনার সমধর্মিতার প্রমাণ এখানেই। অক্ষয়চন্দ্র প্রধানতঃ রস-প্রবন্ধ রচনাতে দক্ষ ছিলেন। তিনি নিজে সাধারণী নামে একটি সাপ্তাহিক ও নবযুগ নামক মাসিক পত্রের সম্পাদনা করতেন। ঐ সব পত্রিকা এবং বঙ্গদর্শন-এও তাঁর বহু রস-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। পরে যে-সকল গ্রন্থে ঐ-সব রচনাবলী সংকলিত হয়, তাদের মধ্যে আছে,—সমাজ-সমালোচনা (১৮৭৪), আলোচনা (১৮৮২), সনাতনী (১৯১১), রূপক ও রহস্য (১৯২৩) ইত্যাদি। অক্ষয়চন্দ্র কিছু কিছু পদ্য-ও লিখেছিলেন;

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

শিক্ষানবীশের পত্ত ও গোচারণের মাঠ-এ তার পরিচয় আছে। 'হাতে হাতে ফল' নামে একখানি প্রহসনও ইনি লিখেছিলেন।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের গন্থ রচনায় রস-ভাবনার সঙ্গে তথ্য-জিজ্ঞাসা ও গবেষণার বৈজ্ঞানিক আকাঙ্ক্ষাও যুক্ত হয়েছিল। নানাপ্রবন্ধ গ্রন্থের (১৮৮৫) নানা-বিষয়ক প্রবন্ধ-সম্ভারে এই দুর্লভ সমন্বয়ের শিল্প-রূপ উদ্ভাসিত হয়ে আছে। রাজবালা নামে একখানি উপন্যাস, এবং কিছু সংখ্যক কবিতাও তিনি লিখেছিলেন।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বঙ্কিম-ভক্ত এবং অতি-রক্ষণশীল প্রবন্ধ-লেখক হিসেবে চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০) অ-বিস্মরণীয়। চন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ও রচনাশৈলীর সঙ্গে বঙ্কিমের চেয়ে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের লেখার সাদৃশ্যই বরং বেশি। কিন্তু, ভূদেবের চিন্তার প্রসার ও মতবাদের বলিষ্ঠ উদারতা চন্দ্রনাথে দুর্লভ ছিল। তাঁর তীক্ষ্ণ যুক্তি-বিচার কচিৎ রক্ষণশীলতার অতি-সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করতে পেরেছিল। এঁর প্রবন্ধ-রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে শকুন্তলা-তত্ত্ব (১৮৮১), ফুল ও ফল (১৮৮৫), হিন্দুবিবাহ (১৮৮৭), ত্রি-ধারা (১৮৯১), হিন্দুত্ব (১৮৯২), কঃ পন্থা (১৮৯৮), সাবিত্রীতত্ত্ব (১৯০০) ইত্যাদি। পশুপতি-সম্বাদ নাম দিয়ে একখানি উপন্যাসও লিখেছিলেন চন্দ্রনাথ।

চন্দ্রনাথ বসু

বঙ্কিমোত্তর প্রবন্ধ-রচনার ইতিহাসে সাহিত্য-আলোচনা করে সুখ্যাত হয়েছিলেন ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়। তাঁর একমাত্র সন্দর্ভ-সঙ্কলন সাহিত্য-মঙ্গল প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে। আরো বহু নিবন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকায়। এ-ছাড়া, বিবিধ কাব্য ও কৌতুক-চিত্রও তিনি রচনা করেছিলেন। সে-সবের মধ্যে রয়েছে দুর্গোৎসব, উদ্ভট কাব্য, সাতনরী, খণ্ডকাব্য, সহরচিত্র ও সোহাগ চিত্র, কৌতুক চিত্রাবলী।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

বঙ্কিম-শিষ্য প্রাবন্ধিকদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও ছিলেন শীর্ষবর্তী একজন। বঙ্কিম-ধারার অনুরক্ত উত্তরসাধক হিসেবে একাধিক ঐতিহাসিক রোমান্টিক উপন্যাসও তিনি লিখেছিলেন। সর্বাংশে সফল না হলেও ঐ সব রচনা মনোহর বাগ্‌ভঙ্গির গুণে ব্যাপক জনসমাদর লাভ

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

করেছিল। প্রবন্ধের শরীরেও সেই স্নিগ্ধ ভাষার অন্বয় সাধন করেছেন হরপ্রসাদ। বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক গবেষণারীতির প্রবর্তকদের মধ্যেও তিনি স্মরণীয় একজন। তাঁর গবেষণা-নিবন্ধ ও অপরাপর গদ্য-রচনা প্রকাশভঙ্গির সরসতার জন্যই অনেক সময় ভাবহীন হাল্কা বলে প্রতীয়মান হয়। তাঁর স্মরণীয় গদ্যগ্রন্থের মধ্যে গবেষণা প্রবন্ধগুলি ছাড়াও রয়েছে 'বাল্মীকির জয়' নামক পুরাণাশ্রিত উপাখ্যান এবং মেঘদূত ব্যাখ্যা।

বাসেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বঙ্কিম-ভক্ত তরুণতম বাংলা গদ্য-লেখক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) বাংলা প্রবন্ধ-বিকাশের ইতিহাসে সবিশেষ স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতি রামেন্দ্রসুন্দরের ভক্তি অন্তিমকাল পর্যন্ত একান্ত প্রগাঢ় ছিল। তাহলেও লেখক হিসাবে তিনি বঙ্কিম যুগেরই উত্তরসাধক। অক্ষয়কুমার দত্ত দুটি গ্রন্থে বিজ্ঞান ও ধর্ম প্রসঙ্গে প্রবন্ধ লিখেছিলেন একই লেখনী দিয়ে। বঙ্কিমের প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। তারই নূতন ফলশ্রুতি লক্ষ্য করি রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায়। বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত-নামা অধ্যাপক পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে প্রথম প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেন। পরে তার সঙ্গে ক্রমশঃ যুক্ত হয় দার্শনিক চিন্তন এবং আধ্যাত্মিক ভাবনা। এই ত্রি-বিষয়ের সংযোগে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে এক নূতন ত্রিবেণীবন্ধন ঘটেছিল রামেন্দ্রসুন্দরের সরল প্রাঞ্জল রসোত্তীর্ণ রচনাবলীতে। প্রকৃতি (১৩০৩), জিজ্ঞাসা (১৩১০), কর্মকথা (১৩২০), শব্দকথা (১৩২৪), বিচিত্র জগৎ ও যজ্ঞকথা রামেন্দ্রসুন্দরের রচনাবলীতে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয়।

প্রবন্ধ-লেখক হিসেবে কালীপ্রসন্ন ঘোষের জনপ্রিয়তা সমসমায়িক কালের সীমা অতিক্রম করতে পারে নি। এককালে এঁর প্রভাত-চিন্তা,

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

নিভৃতচিন্তা, নিশীথচিন্তা ইত্যাদি প্রবন্ধ সংকলন বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। নিছক ঐতিহাসিক কৌতূহল নিবৃত্তি করা ছাড়া আজ এদের সার্থকতা আর বড় একটা নেই।

কেশবচন্দ্র সেন-এর খ্যাতি লেখক হিসেবে তত নয়, যত বাগ্মী হিসেবে।

কেশবচন্দ্র সেন

আর, তাঁর অধিকাংশ বক্তৃতাই ধর্মীয় প্রসঙ্গে বিবৃত। তাহলেও, পরবর্তীকালে লিখিত আকারে সংকলিত হওয়ার পরে এদের প্রাবন্ধিক গুণ ভাস্বর হয়ে উঠেছে। ধর্ম-চিন্তার সঙ্গে

তাঁর ঐ-সব রচনায় সহজ স্বদেশানুরাগ যুক্ত হয়ে নব-স্বাদুতার সৃষ্টি করেছিল। তাঁর রচনাবলীর অন্তর্গত হয়ে আছে ব্রহ্মোৎসব, আচার্যের উপদেশ, সেবকের নিবেদন ইত্যাদি। জীবনবেদ (১৮৮৪) অনেকটাই যেন কেশবচন্দ্রের আত্মজীবনী।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, —এই তিন জনেই আলোচ্য কাল-সীমার মধ্যে গদ্য-রচনা করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে গদ্য-লেখক হিসেবে সবচেয়ে উল্লেখ্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর মননের মধ্যে সহজ-দার্শনিকের প্রবণতা ছিল,—অথচ হৃদয় ছিল রোমান্টিক্ কবির। দার্শনিক ভাবনার সঙ্গে কবির ভাবুকতা যুক্ত হয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের আলোচনা একদিকে হয়েছে তথ্য-বিচার-তির্যক; আর একদিকে ভাষা ও বর্ণনা-ভঙ্গিতে দেখা দিয়েছে কবি-সুলভ ঋজুতা আর স্বচ্ছতা। কাব্য, গণিত, ভাষা-তত্ত্ব, ধর্ম, দর্শন, ইত্যাদি নানা-বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ; অথচ প্রকাশভঙ্গী সর্বত্রই ছিল সরস। দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-গ্রন্থাবলীর মধ্যে আছে,—চারখণ্ডে সম্পূর্ণ তত্ত্ববিদ্যা, নানা চিন্তা, প্রবন্ধ-মালা, চিন্তামণি ইত্যাদি।

সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতীয় সিবিল সার্ভিসের প্রথম ভারতীয় কর্মী। সংখ্যায় যথেষ্ট না হলেও তাঁর সাহিত্যিক প্রয়াস গুণগত বিচারে উপেক্ষণীয় নয়। সত্যেন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য বাংলা প্রবন্ধের মধ্যে ছিল বোম্বাইচিত্র, বৌদ্ধধর্ম, আমার বাল্যকথা ইত্যাদি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কীর্তি নাট্যকার হিসেবে প্রায় অ-তুল্য। ইনি কিছু কিছু প্রবন্ধও লিখেছিলেন; প্রবন্ধ-মঞ্জরীতে তা অংশত সংগৃহীত হয়ে আছে।

স্বামী বিবেকানন্দ

উনিশ শতকের বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকে স্বামী বিবেকানন্দের উল্লেখ না করলে। স্বামিজী প্রধানতঃ ধর্মগুরু রূপেই দেশ-পূজ্য। কিন্তু, তাঁর ধর্ম-সাধনার আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিক-তার লোভে আধিভৌতিকতাকে বর্জন করে নি; বিশ্ব-জননীর আরাধনায় বসে তিনি দেশ-জননীকেও বন্দনা করেছেন আবেগ কম্পিত ভাব ও ভাষায়। স্বামিজীর হৃদয়ের সহজ-বিশ্বাসের তীব্র আকুলতা

তাঁর গদ্যকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছন্দান্বিত কবিতার কম্পন-মুখরতা দান করেছে। তাঁর বহু প্রবন্ধই প্রথমে বক্তৃতার আকারে কথিত হয়েছিল। কী কথার ভাষায়, কী রচনার ভাষায়, সর্বত্র স্বামিজীর আবেগমথিত মননশীল গদ্য পদ্য-স্বভাবিত। তাঁর স্বল্পসংখ্যক বাংলা গদ্য রচনার মধ্যে বর্তমান ভারত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, পরিব্রাজক ইত্যাদি অবিস্মরণীয়।

জীবনচরিত ও আত্মচরিত

এই সময়ে কিছু সংখ্যক জীবন-চরিত ও আত্মচরিত-জাতীয় গ্রন্থও রচিত হয়েছিল, বাংলা গদ্যের ইতিহাসে বা অবিস্মরণীয়। এই সব রচনাবলীর মধ্যে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের—'রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত' (১৮৮১); যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত' (১৮৮৫); বিহারীলাল সরকার ও চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুখানি বিদ্যাসাগরের চরিত ; শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত এবং রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের 'ক্ষিতীশ বংশাবলী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রাবন্ধিক শিবনাথ

এঁদের মধ্যে শিবনাথের সাহিত্য-কৃতি নানা দিক থেকেই স্মরণীয়। গদ্য, পদ্য, উপন্যাস-গল্পের বিচিত্র পথে তিনি লেখনী চালনা করেছিলেন। শিবনাথের মধ্যে একটি শিল্পিপ্রাণ আত্মগোপন করেছিল। সে সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ বিকাশের সুযোগ না দিয়েই তিনি সম-সাময়িক সমাজ ও ধর্মীয় আন্দোলনে আত্মনিক্ষেপ করেন। সেই বৈপ্লবিক কর্মক্ষেত্রেও তাঁর নেতৃশক্তি স্মরণীয় মর্যাদা লাভ করেছিল। বিপ্লবি-মনীষী শিবনাথের অন্তর-স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের পরিচয় পূর্ণস্ফুট হয়েছে তাঁর প্রবন্ধ-গুলির মধ্যে। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালান বঙ্গসমাজ (১৯০৪), আত্মচরিত (১৯১৮), রামমোহন রায় ইত্যাদি তার মধ্যে প্রধান।

মঞ্চাশ্রয়ী বাংলা নাটক

বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়েছিল ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে। তখন থেকেই নাট্য রচনাতে নূতন উদ্দীপনা ও প্রয়োজনবোধের সূচনা হয়েছিল। নাটককে এ-দেশে বলা হয়েছে দৃশ্য-কাব্য। কেবলমাত্র পড়ে বা শুনে নাট্য-কলার পূর্ণ রসাস্বাদ সম্ভব নয়; অভিনয়-দর্শনের মধ্য দিয়ে এর রস উপভোগ করতে হয়। ফলে, নাট্যমঞ্চ একদিকে যেমন নাটকের পূর্ণ রস-স্ফুরণের সহায়তা করে, তেমনি মঞ্চের প্রয়োজন ও দাবি নাট্যকারের রচনাকে উৎসাহিত এবং সুনিয়মিত করতেও সহায়তা করে; ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে বাংলার নাট্যাভিনয় পারিবারিক বা ব্যক্তিগত রঙ্গমঞ্চের সীমায় আবদ্ধ ছিল।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক

এমন অবস্থায় মঞ্চ-মালিক বা তাঁর অন্তরঙ্গ সম্প্রদায়ের রুচি বা খেয়ালের ওপরেই অনেক সময় নাটকের নির্বাচন ও অভিনয় নির্ভর করত। পেশাদারি আদর্শে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হওয়ার ফলে নিয়মিত নাটকাভিনয়ের পথ সুগম হল। সেই সঙ্গে দর্শক-সাধারণের আকাঙ্ক্ষা পূরণের দায়িত্ববোধও জাগ্রত হল। এইরূপে, সাধারণ রঙ্গমঞ্চকে আশ্রয় করে বাংলা নাটক জাতীয় রস-বাসনার অভিমুখী হয়ে উঠল ক্রমশঃ। আর নগর-বাংলার ইতিহাসে তখন জাগরিত হয়ে উঠেছে হিন্দুমেলার যুগ। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করে সারা বাংলা দেশে নূতন জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয় ঘটেছে। এই জাতীয়তার আদর্শ কেবল অতীত-গর্ব-সর্বস্ব ছিল না,—শিক্ষা, সংস্কৃতি, দেহ ও শিল্প-চর্চা, অর্থনৈতিক উন্নতি,—জাতীয় জাগরণের সকল দিকেই এই আন্দোলনের প্রচেষ্টা ছিল ঐকান্তিক। নাটকের মধ্যেও সেই কর্ম-প্রবর্তনাময় আদর্শবাদ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ছিল ধীরে ধীরে।

হরলাল রায় আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্য-সাহিত্যেই এই নবচেতনার প্রথম বিকাশ লক্ষ্য করি। হরলালের হেমলতা নাটকে (১৮৭৩) এ-যুগের পরাধীনতার বেদনা-বোধ প্রথম প্রকট হয়েছে। তাঁর বঙ্গের সুখাবসান নাটকের (১৮৭৪) বিষয়বস্তু বখ্‌তিয়ার খিল্‌জির বঙ্গবিজয় ও তৎপরবর্তী ঘটনাকে কেন্দ্র করে গঠিত। গ্রন্থের নাম থেকেই বুঝি, জাতীয় পরাধীনতার বেদনানুভব এতেও

হরলাল রায়

সুগভীর। হরলাল আরো তিনখানি অনুবাদ-নাট্য লিখেছিলেন,—শত্রুসংহার সংস্কৃত বেণীসংহার অবলম্বনে লেখা; কনকপদ্ম-র উৎস সংস্কৃত নাটক অভিজ্ঞানশকুন্তল। ইংরেজি হ্যামলেট্ অবলম্বনে লিখিত হয়েছিল রুদ্রপাল (১৮৭৪)। হরলালের নাট্যাবলী সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বহুল অভিনীত-ও হয়েছিল।

হরলালের রচনা সেকালে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে থাকলেও তাদের নাট্যগুণ সংশয়াতীত নয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরই (১৮৪৯-১৯২৫) এ-যুগের প্রথম নাট্যকার, যাঁর রচনায় হিন্দুমেলার জাতীয় প্রণোদনার সঙ্গে নাট্যশৈলীও প্রশংসনীয় উৎকর্ষ লাভ করেছিল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্যপ্রভাব জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শিল্প-চেতনায় একটি সুমিত সংযমের অনুভব জাগরিত করেছিল। তাছাড়া, প্রাচ্য-প্রতীচ্য একাধিক ভাষা-সাহিত্যের মধ্যে ফরাসী ভাষার সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল অন্তরঙ্গ। তাঁর স্বভাব-অভিজাত চেতনা ফরাসী শিল্প-শৈলীর আভিজাত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক অপূর্ব শালীন সৌন্দর্য রচনায় সহায়তা করেছিল। এ-দিক থেকে নাট্যকার জ্যোতিবিন্দ্রনাথের শিল্প-কীর্তি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রায় অতুল্য।

নাট্যকার জ্যোতিবিন্দ্রনাথ

প্রথম রচনা কিঞ্চিৎ জলযোগ-এই (১৮৭২) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শিল্পস্বভাবের অনাবৃত প্রকাশ ঘটেছে। কেশবচন্দ্র সেনের প্রবর্তিত স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতি কটাক্ষ করে এই প্রহসনটি লিখিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নারী-স্বাতন্ত্র্যের আন্দোলনে অগ্রণীর আসন অধিকার করেছিলেন। কিন্তু, প্রথম বয়সের এই প্রথম প্রহসনে তিনি এর বিরোধিতাই করেছিলেন। ব্যঙ্গের আঘাত স্থানে স্থানে তীব্র হলেও কোথাও অশালীন হয় নি, এবং অনেকটা এই কারণেও রসের মাত্রা সীমা অতিক্রম করে নি। এখানেই নাট্য-শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব।

কিঞ্চিৎ জলযোগ

এঁর দ্বিতীয় প্রহসন অলীকবাবু, প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল (১৮৭৭) 'এমন কর্ম আর করবো না' নাম দিয়ে। ঠাকুরবাড়ির একাধিক অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ এ'র নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্যান্য প্রহসনের মধ্যে রয়েছে,

অলীকবাবু

'হিতে বিপরীত', 'হঠাৎ নবাব' এবং 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ'। শেষোক্ত দুটি রচনা ফরাসী শিল্পী মলেয়ঁারের প্রহসন অবলম্বনে লেখা।

সিরিয়াস্ নাটকের ক্ষেত্রেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনুবাদই বেশি করেছেন। এই শ্রেণীর লেখার মধ্যে আছে,—অভিজ্ঞানশকুন্তল, মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশী, উত্তরচরিত, মালতীমাধব, রত্নাবলী, বেণীসংহার ইত্যাদি প্রায় ১৭ খানি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ। দুখানি ইংরেজি নাট্যানুবাদের মধ্যে জুলিয়াস্ সিজার-ও ছিল। অধিকাংশ নাটকেরই অনুবাদ-কালে মূল রচনার সমকালীন জীবন-পটভূমিকে লেখক স্বত-উদ্‌ঘাটিত করে তুলেছেন। একালের অনুভব-সীমায় সেকালের জীবন-পরিচয় অপূর্ব রস-মূল্যের আকর হয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদ নাট্য

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিক নাটকের সংখ্যাই সবচেয়ে কম,—মাত্র চারখানি। কিন্তু, নাট্য-শৈলীর উৎকর্ষ ও সমকালীন জীবনানুভূতির গভীরতার বিচারে ঐ কয়খানিই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। আগেই বলেছি, ভারতের নবজাগ্রত স্বদেশ-প্রেমের একটি সক্রিয় রূপ-সৃষ্টিই ছিল তাঁর শিল্পি-প্রাণের প্রাধান আকাঙ্ক্ষা। এদিক থেকে, অতীত-ভারতের গৌরব-গাথাকে ভবিষ্য-কল্পনার রোমান্টিক স্বপ্নের সূত্রে গেঁথে হৃদ্য রসানুভূতির সৃষ্টি করেছেন তিনি। প্রথম নাটক পুরু-বিক্রম-এ (১৮৭৪) এই নাট্য-স্বভাবের সফল বিকাশ ঘটেছে। গ্রীক-বীর সেকেন্দার ও পুরুর বিক্রম-কথা নাটকটির প্রধান বিষয়বস্তু। পুরুর প্রতি কুল্লুপর্বতের কুমারী রাজ্ঞী ঐলবিলার, ঐলবিলার প্রতি রাজা তক্ষশীলের, এবং সেকেন্দরের প্রতি তক্ষশীল-ভগ্নী অম্বালিকার রোমান্টিক প্রণয়-কথা মূল কাহিনীর সৌন্দর্য ও নাটকীয় ঘটনা-জটিলতাকে ঘনতর করেছে। আর, কি ঘটনা-বিন্যাসে, কি সংলাপ-রচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিমিতিবোধ গোটা নাটকটিকে রসনিবিড় করে তুলেছে।

মৌলিক নাটক
১। পুরুবিক্রম

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দ্বিতীয় নাট্য রচনা 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক' (১৮৭৫) আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণের পটভূমিতে লেখা। নারী-প্রণয়ের বিচিত্র-মুখী জটিলতা ঐতিহাসিক গুণ ক্ষুণ্ন না করেও এই নাটকের রোমান্টিক ঐশ্বর্য অপার

২। সরোজিনী

বর্ধিত করেছিল। 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ দ্বিগুণ'—ইত্যাদি বিখ্যাত গানটি কিশোর রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন এই নাটকের জন্যে।

৩। অশ্রুমতী

অশ্রুমতী (১৮৭৯) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ মৌলিক নাটক। প্রতাপের কন্যা অশ্রুমতী দৈবক্রমে সেলিমের অন্তঃপুরে আবদ্ধ হয়ে থাকার সময় উভয়ের মধ্যে গভীর প্রণয়-আকর্ষণ ঘটে, প্রতাপের অনুজ শক্তসিংহ অশ্রুমতীকে উদ্ধার করে আনেন। মুমূর্ষু পিতার শয্যাপার্শ্বে অশ্রুমতী আমরণ ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করে। প্রণয়-বুভুক্ষু সেলিম অবশেষে শ্মশানে অশ্রুমতীর শেষ প্রণয়ের পরিচয় বক্ষে করে ফিরে যান—ততক্ষণে তাঁর প্রেম কামনা-মুক্ত হয়েছিল।

৪। স্বপ্নময়ী

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শেষ মৌলিক নাটক স্বপ্নময়ী-র (১৮৮২) গল্প ইতিহাসাশ্রিত হলেও আগাগোড়া রচনায় রোমান্টিক গুণই সমধিক।

অপরাপর রচনা

কিছু সংখ্যক ফরাসী গল্প-কবিতারও অনুবাদ করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ,—ফরাসীপ্রসূন গ্রন্থে তা বহুলাংশে সংকলিত আছে। তা ছাড়া, আরো কিছু প্রবন্ধাদিও রয়েছে তাঁর রচিত।

উপেন্দ্রনাথ দাস

হিন্দু-মেলার আদর্শে উদ্বুদ্ধ আর একজন উল্লেখ্য নাট্যকার ছিলেন উপেন্দ্রনাথ দাস। এঁর লেখা সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটক-এর (১৮৭৫) অভিনয় রাজ-আদেশে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পরাধীনতার প্রতপ্ত জ্বালার সঙ্গে হুগলির শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেটের ব্যভিচার-কথা যুক্ত হয়ে এই নাট্য-কাহিনী একদা প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। উপেন্দ্রনাথ শরৎ-সরোজিনী নামে আর একখানি নাটক এবং 'দাদা ও আমি' নামে একখানি প্রহসনও লিখেছিলেন।

গিরিশচন্দ্র :—
নট ও নাট্যকার

মঞ্চাশ্রয়ী বাংলা নাটকের ইতিহাসে নট এবং নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের (১৮৪৪-১৯১১) ভূমিকা প্রায় অ-তুল্য। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নটশ্রেষ্ঠ রূপেই গিরিশচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব ঘটে। গিরিশচন্দ্রের নিজের অলৌকিক অভিনয় নিপুণতার প্রভাবে অসংখ্য দর্শকের মনে সেকালে তাঁর নিজের ও অপরের বহু নাটক অ-বিস্মরণীয় রস-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে, আজ সেই অভিনয় উৎকর্ষের পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে অনেকে গিরিশচন্দ্রের নাট্যাবলীর

যথার্থ গুণ আর বিচার করে উঠতে পারেন না। গিরিশচন্দ্র নিজেই কেবল সু-অভিনেতা ছিলেন না, বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চের পরিচালক হিসেবে অমৃতলাল বসু, অর্দ্ধেন্দু মুস্তাফি, মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ইতিহাসখ্যাত অভিনেতৃ-প্রতিভার লালন ও পরিচালনাও করেছিলেন।

কিন্তু, নট হিসাবে যত, নাট্যকার হিসাবে গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা তত সমুচ্চ ছিল না। সবসুদ্ধ ৭৫ খানি সম্পূর্ণ ও চারখানি অসম্পূর্ণ নাটক-নাটিকা-প্রহসনের রচয়িতা ছিলেন তিনি। আর তাদের অধিকাংশের মধ্যেই স্বদেশ-প্রীতি এবং ধর্মোন্মাদনা উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। আগে বলেছি, নাট্যকার হিসাবে গিরিশচন্দ্র ছিলেন বিশেষভাবে মনোমোহন বসুর ভাব-শিষ্য। প্রাচীন ভারতবর্ষের পৌরাণিক গল্পাদিতে বাঙালির নিত্যকালের ভক্তি-রসধারার উৎস সঞ্চিত হয়ে আছে। মনোমোহন তাকেই নব-যুগের নবীন স্বদেশ-প্রীতির মূল্যে সিক্ত করে নূতন নাট্যাবেদন সৃষ্টি করেছিলেন। গিরিশচন্দ্রের মধ্যে সমসাময়িক দেশ-ভক্তির প্রবণতা প্রায় সহজাত হয়েছিল। তার ওপরে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাব-প্রভাবের ফলে তাঁর পৌরাণিক নাটকে আধ্যাত্মিক ভক্তিরস সব চেয়ে নিবিড় হয়ে ওঠে। বাঙালির চেতনা সহজে আবেগ-মথিত। তাই, ভক্তি-স্নেহ-প্রীতির মহৎ আদর্শ মাত্রই তার চেতনাকে উদ্বেলিত করে থাকে। গিরিশের ব্যক্তি-চিত্তও ছিল অতি-আবেগে স্ফীত। ফলে তাঁর রচনায় ভক্তি-স্নেহ-প্রেমপূর্ণ হৃদ্‌বৃত্তির অতি-কর্ষণ সেকালের বাঙালি দর্শকের ভাবুকতাকেও আবেগাপ্লুত করে তুলেছিল। কিন্তু, আবেগবৃত্তির এই আতিশয্যের পথ বেয়েই গিরিশচন্দ্রের রচনায় নাটকীয় অসংযম ও পরিমিতি-হীনতার প্রবেশ ঘটেছিল। ফলে, তাঁর নাটক যেমন অভিনয়-সফল হয়েছিল, শিল্প-সুগঠিত হতে পারে নি তত।

গিরিশ-নাট্য-প্রতিভা

গিরিশচন্দ্রের রচনায় পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক-পারিবারিক বিচিত্র বিষয়ে লিখিত নাটক-প্রহসন ইত্যাদি রয়েছে। এঁর লেখা শ্রেষ্ঠ নাট্যাবলীর মধ্যে আছে পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস (১৮৮৩), চৈতন্যলীলা (১৮৮৫), বুদ্ধদেব-চরিত (১৮৮৫), বিল্বমঙ্গল ঠাকুর (১৮৮৬), প্রফুল্ল (১৮৯১), জনা (১৮৯৩), বলিদান ও

রচনা-পরিচয়

সিরাজদ্দৌলা ইত্যাদি। গিরিশচন্দ্রের লেখা ম্যাকবেথ নাট্যানুবাদও একদা প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেছিল।

নাটক প্রহসনাদি ছাড়া গিরিশচন্দ্র তিনটি উপন্যাস, কয়েকটি গল্প ও নক্সা, এবং কিছু সংখ্যক কবিতা এবং প্রবন্ধ-ও লিখেছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের পরেই নট ও নাট্যকার হিসাবে প্রথমে স্মরণীয় অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯)। অভিনয় ও নাটক-রচনার উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন গিরিশের নিষ্ঠাবান অনুসারী। কিন্তু, রস-প্রবণতার দিক থেকে এই দুই শিল্পী ছিলেন বিভিন্ন। গিরিশচন্দ্র যেমন গভীর আবেগ-উচ্ছ্বাসের অভিমুখী ছিলেন, তেমনি অমৃতলালের প্রবণতা ছিল ব্যঙ্গতীব্র রসিকতার প্রতি। বাংলা দেশে 'রসরাজ' নামে তিনি একদা বিপুল খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। অমৃতলালের এই খ্যাতি অকারণ ছিল না। কিছু কিছু গুরুগম্ভীর নাট্যরচনার চেষ্টা তিনি করেছিলেন। কিন্তু গিরিশ-অনুসরণের প্রয়াস সে সকল ক্ষেত্রে হাস্যকর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ঐ সব রচনার মধ্যে আছে হীরকচূর্ণ, হরিশ্চন্দ্র, যাজ্ঞসেনী ইত্যাদি। প্রথম-উক্ত লেখাটি অমৃতলালের রচিত প্রথম নাটক —রচনাকাল ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দ। অন্যপক্ষে অমৃতলালের রস-দৃষ্টি ছিল ব্যঙ্গ-তীব্র,—স-হাস। ফলে, বিভিন্ন প্রহসনকে অবলম্বন করে ঝাঁঝালো satire রচনায় তিনি বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। এ-সব ক্ষেত্রে তাঁর রুচিও ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মত সুমিত-শালীন। গিরিশচন্দ্রের মত স্খলিত-রুচি প্রহসন অমৃতলাল খুব বেশি সংখ্যায় লেখেন নি। তাঁর একাধিক প্রহসন রচনায় ফরাসী শিল্পী মলেয়ঁার-এর প্রভাব রয়েছে। কৃপণের ধন, চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যে মলেয়ঁার-প্রভাবিত রচনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

রসরাজ অমৃতলাল

প্রহসনের মধ্য দিয়ে জাতির বিচিত্রমুখী দুর্বলতার caricature করার লঘুতাই অমৃতলালের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। ব্যঙ্গের তীব্র আঘাত দিয়ে জাতির চিত্তকে উদ্বোধিত করার পরোক্ষ চেষ্টাও ছিল তার অন্তর্নিহিত। বিবাহ বিভ্রাট, বাবু, খাসদখল, বৌমা, দ্বন্দ্বে মাতনম্ ইত্যাদি এদিক থেকে তাঁর সমুল্লেখ্য প্রহসন-রচনা। নাটক, প্রহসন, চিত্রনাট্য ও গীতিনাট্য মিলে ৩২ খানারও বেশি নাটক লিখেছিলেন অমৃতলাল।

নাট্যপল্লী

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের (১৮৬৪-১৯২৭) পৌরাণিক নাটকে গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনার ছাপ রয়েছে। কিন্তু, নাট্যকার হিসেবে তাঁর শিল্পি-ব্যক্তিত্ব ছিল অপেক্ষাকৃত সংযত; তাঁর কলাজ্ঞান ছিল সু-পরিমিত-তর। ফলে মনোমোহন-গিরিশের প্রবর্তিত পৌরাণিক নাটকের যাত্রাধর্মী আবেগাতিশায়িতাকে সংযত করে দৃঢ়-বদ্ধ নাট্য-ঘনতা দিতে চেয়েছেন তিনি। ক্ষীরোদপ্রসাদের স্বভাবে আবেগের অতি-শায়িতাই যে কেবল সুমিত ছিল, তা নয়,—সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিক আকূতির-ও প্রাবল্য খুব যে ছিল, তা মনে করার কারণ নেই। প্রাচীন পুরাণের গল্প-কহিনীকে ক্ষীরোদপ্রসাদ উনিশ শতকের মানব-মাহাত্ম্যের নব-মূল্যে উদ্ভাসিত করে দেখিয়েছেন। সেই সঙ্গে ছিল সমকালীন স্বদেশ-ভক্তিরও প্রেরণা। বিশেষ করে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে দেশপ্রেমের আকুলতাই ছিল প্রবল। অন্য পক্ষে আবেগ-আতিশয্য থেকে মুক্ত ছিল বলে ক্ষীরোদপ্রসাদের রচনায় নাট্যাঙ্গিকের গঠনও অপেক্ষাকৃত দৃঢ় এবং সংহত। এঁর শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে ভীষ্ম, নরনারায়ণ, আলিবাবা, প্রতাপাদিত্য, আলমগীর ইত্যাদি। ঐতিহাসিক, সামাজিক, পৌরাণিক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে লেখা ক্ষীরোদপ্রসাদের মোট নাট্যসংখ্যা প্রায় ৪০ খানি।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

সাহিত্যের ইতিহাসে দ্বিজেন্দ্রলালের (১৮৬৩-১৯১৩) চিরস্থায়ী পরিচয়,—তিনি ছিলেন 'হাসির গানের রাজা'। গুরু গম্ভীর বিষয়ে,—বিশেষ করে স্বদেশ-প্রেমের আকূতিভরা সংগীত রচনাতেও তাঁর কীর্তি দুর্লভ সফলতা অর্জন করেছিল। কিন্তু, বাংলা নাটকের ক্ষেত্রেও তাঁর অবিসংবাদী জনপ্রিয়তা এসব কোনো কিছুর চেয়েই কোনো অংশে কম নয়। বরং, সমকালীন সাহিত্য-জগতে তাঁর নাট্য-কীর্তিই সবচেয়ে বেশি খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার আকর হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্র-সমকালীন শিল্পী ছিলেন। কিন্তু, কী কাব্যে, কী নাটকে, রবীন্দ্র-পূর্ব ধারার পূর্ণতা-বিধানেই তাঁর ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা। উনিশ শতকের নগর-বাংলায় নাট্য-শিল্প-রচনার ধারা নূতন পথে মোড় ফিরেছিল, বিশেষ করে ইংরেজি নাট্যশৈলীর অনুসরণ করে। এদিক থেকে শেক্‌স্‌পীয়রের বিশ্বজয়ী নাট্যকলার প্রভাবই ছিল সবচেয়ে বেশি। অন্যান্যের মধ্যে

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

গিরিশচন্দ্র ও ক্ষীরোদপ্রসাদ সচেতনভাবে শেক্‌স্‌পীয়রীয় কলাঙ্গিকের অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু, কোথাও শিল্পি-প্রাণের প্রবণতার অভাবে, কোথাও-বা বিষয়-বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধ-ধর্মিতার জন্য সে চেষ্টা যথেষ্ট সফল হতে পারে নি। দ্বিজেন্দ্রলালই সেই শ্রেষ্ঠ বাঙালি শিল্পী, শেক্‌স্‌পীয়রের অনুসরণে বাংলা রোমান্টিক নাট্য রচনায় যিনি সবচেয়ে বেশি সফলতা অর্জন করেছিলেন। কেবল আঙ্গিক সৃষ্টির দক্ষতাতেই নয়,—প্রাণবান জীবন-রসের রচনাতেও শিল্পী দ্বিজেন্দ্রলাল সমান সফলতা অর্জন করেছিলেন।

প্রধানতঃ ঐতিহাসিক বিষয়াশ্রিত নাটক লিখেই দ্বিজেন্দ্রলাল সবচেয়ে বেশি সার্থক হয়েছিলেন। কিন্তু, যথার্থ অর্থে তাঁর রচনাকে ঐতিহাসিক নাটক বলা চলে না। শেক্‌স্‌পীয়রের মত ইতিহাসের গল্প নিয়ে তিনি রোমান্টিক নাটক লিখেছিলেন। তবু, বিশুদ্ধ শেক্‌স্‌পীয়রীয় আঙ্গিক-বিচারে দ্বিজেন্দ্রলালের অধিকাংশ রচনাকেই 'মেলোড্রামা' না-বলে উপায় থাকে না। বস্তুতঃ, অতি-আবেগে স্ফীত এই জীবনাবেদনের জন্যই তাঁর রচনা বাঙালির হৃদয় মথিত করেছিল একদিন। শেক্‌স্‌পীয়রীয় নাট্যদেহে বাঙালির নাট্যপ্রাণকে অনুস্যূত করতে পেরেছিলেন,—এখানেই দ্বিজেন্দ্রলালের সফলতম নাট্যকীর্তি। তাঁর শ্রেষ্ঠ ইতিহাসাশ্রিত রোমান্টিক নাটকের মধ্যে আছে,—প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, নুরজাহান, মেবার পতন, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত ইত্যাদি।

নাট্যপঞ্জী

দ্বিজেন্দ্রলালের সামাজিক নাটকের মধ্যে 'পরপারে' একদা বহুল জনপ্রিয় হয়েছিল; কিন্তু তার স্থায়ী নাট্যমূল্য উৎকৃষ্ট পর্যায়ের নয়। অপরাপর রচনার উল্লেখও নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু, তাঁর প্রহসনগুলি আবার অনেক কয়টিই বেশ ভাল রচনা। বস্তুতঃ, পর পর দুটি প্রহসন লিখেই দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যক্ষেত্রে প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই প্রহসন দুটির নাম যথাক্রমে কল্কি অবতার ও বিরহ। তাঁর অন্যান্য উল্লেখ্য প্রহসনের মধ্যে আছে ত্র্যহস্পর্শ বা সুখী পরিবার, প্রায়শ্চিত্ত, ও পুনর্জন্ম।

বাংলা গীতি-কবিতার মুক্তি

রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা কাব্যের ইতিহাসে বিহারীলাল চক্রবর্তীর (১৮৩৫-১৮৯৪) ভূমিকা ছিল অভূতপূর্ব। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিজের কিশোর-বয়সের কাব্য-গুরু বলে স্বীকার করেছেন,—তাঁকে বলেছেন 'বাংলা সাহিত্যের ভোরের পাখি।' বিহারীলালের শিল্প-প্রতিভার সফল মূল্য-ব্যঞ্জনা এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। মধুসূদনীয় কাব্য-যুগের আলোচনায় দেখেছি,—জাতীয় প্রয়োজন-মথিত বৈপ্লবিক আকাঙ্ক্ষা গীতি-কবির প্রাণেও মহাকাব্য লেখার প্রেরণা দুর্নিবার করে তুলেছিল। সে ছিল বাংলা কাব্যে নব-ক্লাসিকতার যুগ। অথচ বাংলার কবি-প্রাণ চিরকালই আবেগ প্রবণ;—বাঙালির জাতীয় স্বভাব চিরদিন ভাব-উচ্ছ্বসিত। মধুসূদনের মধ্যে সৃজন-সফলতার চরম ক্ষণেও সেই ভাব-প্রবণ গীতিবাসনার মর্মপীড়া লক্ষ্য করা চলে;—মেঘনাদবধ লিখতে লিখতে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে তিনি লিখেছিলেন,—"Probably I have got a tendency in the lyrical way।" পরবর্তীকালে বীরাঙ্গনা ও চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে মধুসূদন সেই গীতি-প্রবণতাকে আংশিক মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু, যুগ-প্রয়োজনে তাড়িত কবিমনের পূর্ণ মুক্তি ঘটেনি ঐ সব কবিতায়। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র প্রভৃতি মধুসূদনের উত্তর-সূরী কবিদের মর্মচেতনায় গীতিকাব্যের প্রবল আবেগ মহাকাব্য রচনার ফাঁকে ফাঁকে প্রমত্ত আবর্তের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু বাঙালির lyric বাসনার পূর্ণ মুক্তি হয়নি ওঁদের কারো রচনাতেই। ক্লাসিকতা লাঞ্ছিত গীতিধর্মের সেই আড়ষ্ট যুগে বিহারীলাল,—"নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন। তাঁহার সেই স্বগত-উক্তিতে বিশ্বহিত, অথবা সভা-মনোরঞ্জনের কোনো উদ্দেশ্য দেখা গেল না।"—অর্থাৎ, বিহারীলাল বহির্জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও দাবির থেকে নিজের কবি-চেতনাকে একান্ত মুক্ত রেখে, একান্তে বসে শুনেছেন আপন মনের নিভৃত বাণী। আর অন্য-নিরপেক্ষ আত্মলীনতাই আসলে রোমান্টিক গীতিধর্মের উৎস। বিহারী-

বিহারীলাল ও রোমান্টিক গীতিকাব্য

লালের প্রতিভাকে আশ্রয় করে বাংলা কাব্যে রোমান্টিক লিরিসিজম্-এর প্রথম সফল প্রকাশ ঘটেছিল। এখানেই তাঁর কবি-কর্মের ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু, উৎকৃষ্ট কাব্যের পক্ষে আত্মলীন অনুভূতির একান্ততাই একমাত্র সম্পদ নয়, প্রকাশের যথৌচিত্য, এবং সম্পূর্ণতাও কাব্য-ধর্মের আবশ্যিক উপাদান। বিহারীলালেব কাব্যে প্রথমটি যেমন অ-পরিমিত-প্রচুর ছিল, তেমনি দ্বিতীযটিব ঘটেছিল একান্ত অভাব। তাই, রবীন্দ্রনাথ কবিকে বলেছেন 'ভোরের পাখি'। নবীন ভাব-উষার আলোক-সম্পাৎ কবি-প্রাণকে ভোরের পাখির মতই কলকণ্ঠ করেছিল। কিন্তু নূতনের আবির্ভাবের সেই অনন্ত আনন্দভাণ্ডারকে তিনি পূর্ণ মূল্যে বাণী-মণ্ডিত করতে পারেন নি। বিহারীলালের কবিপ্রাণ তাঁর কাব্য-প্রবাহে পূর্ণ প্রকাশ পায় নি। ভাবের অতিস্ফীতির সঙ্গে অস্পষ্ট গদ্‌গদ ভাষণ তাঁর রচনাকে শৃঙ্খলাহীন,—কখনও বা দুর্বোধ্য করেছে।

বিহারীল'লের কবি স্বভাব

নিজের ভাব-স্তিমিত অর্ধাবিষ্ট, অর্ধ-উল্লসিত কবি-সত্তাকে নিজেই কবি সম্বোধন করেছেন তাঁর সারদামঙ্গল (১২৮৬ সাল) কাব্যে :—

"হে যোগেন্দ্র যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু দু' নয়নে
কাহারে ধেয়াও।"

নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজের মনের মধ্যেও কখনো খুঁজে পান নি কবি,—তাই, 'সাধের-আসন'-কাব্যে তিনি বলেন,—

"কাহারে ধেয়াই, দেবি,
নিজে আমি জানি নে।"

এই দ্বিতীয়োক্ত কাব্য-রচনার একটি বিশেষ ইতিহাস রয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী,—রবীন্দ্রনাথের 'নতুন বৌঠান্' কাদম্বরী দেবী বিহারীলালের কাব্যের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। 'সারদামঙ্গল' প্রকাশেব পব তিনি নিজের হাতে একখানি আসন সেলাই করে তার মাঝখানে সারদামঙ্গলের উদ্ধৃত ছত্র তিনটি লিখে দিয়েছিলেন। আসনটি উপহার দেবার সময়ে কাদম্বরী দেবী কবিকে ঐ কটি ছত্রের উত্তর লিখতে অনুরোধ

করেন। সেই উত্তর হিসেবেই কল্পিত হয়েছিল 'সাধের আসন'। কিন্তু অনেকদিন পরে রচনা যখন শেষ হয়েছিল, তখন আসনদাত্রী লোকান্তরিত হয়ে গিয়েছিলেন।

যাই হোক, বিহারীলালের কবি-কল্পনার মধ্যে আত্মলীন উচ্ছ্বাসের অধীরতা ও অকৃত্রিমতা যত ছিল, প্রকাশের সংযত সুমিতি ও স্পষ্টতা ছিল না তত। তাই, কবি হিসেবে তিনি কেবলমাত্র নব-ভাবনার অগ্রদূত,—নবীন রচনার রূপদক্ষ শিল্পী নন। এঁর প্রথম রচনা ছিল একটি পদ্য রূপক,—স্বপ্ন-দর্শন (১৮৫৮)। তাঁর পদ্য-রচনাবলীর মধ্যে আছে সংগীত শতক, বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গসন্দর্শন, বন্ধু-বিলাস ও প্রেম প্রবাহিণী, সারদামঙ্গল, বাউল বিংশতি, সাধের আসন ইত্যাদি। পূর্ণিমা, সাহিত্য সংক্রান্তি ও অবোধ-বন্ধু, পত্রিকার সম্পাদনা অথবা পরিচালনা-কর্মের সঙ্গে কবির প্রত্যক্ষ যোগ দিল।

রচনাপঞ্জী

বিহারীলাল-এর রচনায় আত্মলীন গীতি-ভাবনার প্রথম প্রকাশ অসীম উচ্ছ্বাসে অতি স্ফীত হয়েছিল। সেই পথ ধরেই বাংলা কাব্যের জগতে এলেন কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-৭৮), অনেকটাই যেন পূর্বসূরীর আলুলায়িত কাব্য-ভাবনার ওপরে নূতন রূপ-শৃঙ্খলার বিন্যাস সাধন করতে। রোমান্টিক ভাবনার ধারাকে তিনি ক্লাসিক্যাল দেহাধারে সংযত করে ধরেছেন। সুরেন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা মহিলা কাব্য দুইখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮০ ও ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে। ভগ্নস্বাস্থ্য কবি অল্প বয়সে লোকান্তরিত হয়েছিলেন। রোগশয্যায় শুয়ে "মাতা, জায়া, ভগ্নী ও নন্দিনীর মমতার ঋণ" শোধ করবার মানসেই তিনি এই কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। মাতা ও জায়া অংশ রচনার শেষে, ভগ্নী-অংশ লিখ্‌তে আরম্ভ করেই কবির মৃত্যু হয়। ডঃ সুকুমার সেন সিদ্ধান্ত করেছেন, সুরেন্দ্রনাথের মহিলা কাব্য বিহারীলালের বঙ্গসুন্দরী পাঠের ফল। বিহারীলাল বঙ্গসুন্দরীতে বাঙালি নারীর নয়টি বিচিত্র রূপ-সৌন্দর্য দেখে আবিষ্ট হয়েছিলেন; সুরেন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য-সূচনায় বলেছেন,—

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

"গাবো গীত খুলি হৃদি দ্বার,—
মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার।"

আগেই বলেছি, সুরেন্দ্রনাথের নারী-মহিমা-গাথা চারটি রূপমূর্তিরই

সাধনা করতে চেয়েছিল। ভাব-কল্পনায় বিহারীলালের অনুসারী হলেও প্রকাশ-শৈলীর বিচারে তিনি ছিলেন তাঁর পরিণততর উদ্ভব-সাধক। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে ষড়ঋতু বর্ণন, সবিতা-সুদর্শন ও ফুলরা কাব্য। টড্-এর 'রাজস্থান'-এর বঙ্গানুবাদ করেছিলেন কবি রাজস্থানের ইতিবৃত্ত নামে ;—বিশ্বসন্দর্ভ নামে একটি গদ্য-প্রবন্ধ গ্রন্থও তিনি লিখেছিলেন। তাঁর আরো কিছু গদ্য-রচনা বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকায় বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে।

রবীন্দ্র-পূর্ব যুগে বাংলা-কবিতার রোমান্টিক গীতি-ধর্ম দেহ-মনের প্রথম পূর্ণাঙ্গতা পেয়েছিল দেবেন্দ্রনাথ সেনের (১৮৫৫-১৯২০) রচনায়। তাঁর বহু কাব্য রবীন্দ্র-সমসাময়িক হলেও প্রায় সকল রচনাই রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত। অথচ, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের দেহে ও ভাবে রোমান্টিক বিভার যে ব্যঞ্জনাময় উজ্জ্বলতা, তার প্রথম প্রকাশ লক্ষ্য করি দেবেন্দ্রনাথের রচনাতে। এর থেকেই বুঝি, এই দুই কবির মৌল সৃজনী-স্বভাব ছিল সমধর্মী। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই সত্যকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন 'সোনারতরী' কাব্যের উৎসর্গ পত্রে,—দেবেন্দ্রনাথকে "কবি-ভ্রাতা" সম্বোধন করে। বিহারীলালের সহজে-আত্মলীন ভাব-স্বপ্ন ও সুরেন্দ্রনাথের অতিশয় রূপ-সচেতনতা দেবেন্দ্রনাথের রচনায় সমন্বিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ রোমান্টিক কাব্য-স্বরূপকে জাগ্রত করে তুলেছিল। ফুলের প্রতি তাঁর কবি-মনের এক আশ্চর্য স্বপ্নময় প্রীতি-মধুরতা ছিল। অশোকগুচ্ছ আর গোলাপগুচ্ছ তাঁর দুটি শ্রেষ্ঠ কাব্য ;—আর সর্বপ্রথম প্রকাশিত কাব্যের নাম ফুলবালা (১৮৮০)। শেষোক্ত রচনায় ১৮টি বিভিন্ন ফুলের রূপ-সুষমা সম্ভোগ করেছেন কবি.—১৮টি বিভিন্ন কবিতায়। ফুলের নামে দেবেন্দ্রনাথের আরো দুটি কাব্য আছে শেফালিগুচ্ছ এবং পারিজাতগুচ্ছ। এ সব কিছুই কবির নিবিড় পুষ্প প্রীতির পরিচায়ক। প্রেমানুভূতির জগতেও তাঁর রোমান্টিক সৌন্দর্যপ্রীতি ছিল অতলস্পর্শ। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে ঊর্মিলা কাব্য, নির্ঝরিণী ; আর, হরিমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, অপূর্ব নৈবেদ্য ইত্যাদি অজস্র অধ্যাত্ম ভাবময় কাব্য-কবিতা। শেষ জীবনে কবির লোকোত্তরতা-প্রীতি সুগভীর হয়ে উঠেছিল।

দেবেন্দ্রনাথ সেন

দেবেন্দ্রনাথের কবি-স্বভাবের পরিচয় রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে সফল ব্যঞ্জনা পেয়েছে,—তিনি "অশোক মঞ্জরী হইতে তরুণতা এবং বধূর ভূষণ ঝঙ্কার হইতে তাহার রহস্য চুরি করিয়া লইতে পারেন।"

বিহারীলালের প্রত্যক্ষ ভাব-শিষ্যদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কবি অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯)। বয়সের বিচারে তিনি রবীন্দ্রনাথের সমবয়স্ক ছিলেন , কিন্তু কাব্য-ভাবনার দিক্ থেকে ছিলেন রবীন্দ্র-পূর্ব বিহারীলালের যুগের শিল্পী। নারীর গার্হস্থ্য-সুন্দর রূপ-পিপাসায় তিনি ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের সমধর্মী উত্তর সাধক। অক্ষয়কুমারের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য 'এষা' (১৯১২) লিখিত হয়েছিল পত্নী-বিয়োগ উপলক্ষ্যে। রোমান্টিক উৎকণ্ঠা তাঁর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য ;—স্পর্শকাতরতার অনুভব কোথাও আনন্দে উদ্বেল, কোথাও বা বিষণ্ণ-উদাস। এ ছাড়া আরো চারখানি কাব্যগ্রন্থ তিনি লিখেছিলেন,—প্রদীপ, কনকাঞ্জলি ভুল, ও শঙ্খ। এষা তাঁর সবশেষে প্রকাশিত কাব্য।

অক্ষয়কুমার বড়াল

রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) বিহারীলালের অনুসারী ছিলেন না,—ছিলেন তাঁর সমান-কর্মা বন্ধু। বিহারীলালের সমকালে কাব্য-রচনা করেও রোমান্টিক ভাবনার সঙ্গে অপূর্ব চিন্তা-সংসক্তির যোজনা করেছিলেন তিনি। এদিক্ থেকে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল অনন্য-তুল্য। তার কারণও অবশ্য ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের মধ্যে কবি-সুলভ স্বপ্নাবিষ্টতার সঙ্গে অনুস্যূত হয়েছিল দুর্লভ দার্শনিক চিন্তা। এ-দুয়ের সফল-সম্পূর্ণ কাব্যরূপ ধরা পড়েছে তাঁর স্বপ্ন-প্রয়াণ (১৮৭৫) কাব্যে। যৌতুক না কৌতুক (১৮৮৩) নামে একটি গাথাকাব্যও লিখেছিলেন তিনি।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী (১৮৫৬-১৯৩২) কবিতা রচনা করেছিলেন বিহারীলালের অনুসরণ করে। তাঁর একখানি কাব্যের নাম 'গাথা' ; অপরটি 'কবিতা ও গান'। এঁর উপন্যাস-সাহিত্যের কথা পূর্বে বলেছি।

স্বর্ণকুমারী

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪) বাঙালি গার্হস্থ্যের কর্ণধারণ করেও কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর ভাব-কল্পনার কেন্দ্র ছিলেন তাঁর স্বামী। এঁর কবিতা-গ্রন্থাবলীর মধ্যে আছে কবিতা-হার, ভারত কুসুম, অশ্রুকণা, আভাষ, শিখা, অর্ঘ্য, স্বদেশিনী, সিন্ধুগাথা ইত্যাদি।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

কবি মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪২) ছিলেন মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী।

প্রিয়-প্রসঙ্গ তাঁর গদ্য-পদ্য বিমিশ্র রচনা,—স্বামীর মৃত্যুর পরবর্তী শোকার্তির অনুভবে রচনাটি আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এঁর কাব্য-গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে,—কাব্য কুসুমাঞ্জলি, বীরকুমার বধ, বিভূতি, সোনার সাথী ইত্যাদি। প্রবন্ধ এবং গল্প-উপন্যাসও লিখেছিলেন মানকুমারী।

মানকুমারী বসু

কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) আলোচ্য কালের মহিলা কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আলোছায়া (১৮৮৯) তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য;—এটিই তাঁর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত কাব্য-ও। অন্যান্য রচনার মধ্যে উল্লেখ্য হচ্ছে,—নির্মাল্য, পৌরাণিকী, মাল্য ও নির্মাল্য ইত্যাদি। এঁর কবিতায় উৎকৃষ্ট সনেট্-সংকলনও রয়েছে। তাছাড়া, গদ্য প্রবন্ধ, নাটিকা, গল্প, জীবনী ইত্যাদিও তিনি রচনা করেছিলেন।

কামিনী রায়

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবি-খ্যাতি তাঁর নাট্য-কীর্তির চেয়ে কম ছিল না। আর্য-গাথা ১ম ভাগ (১৮৮২) তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য। অন্যান্য কাব্য-রচনাবলীর মধ্যে আছে আর্যগাথা ২য় ভাগ, আষাঢে, হাসির গান, মন্দ্র, আলেখ্য ত্রিবেণী।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল

রজনীকান্ত সেনের (১৮৬৫-১৯১০) কাব্যের অধিকাংশ সুমধুর সংগীত-রসে সিক্ত। বাণী, কল্যাণী, অমৃত ইত্যাদি কাব্যে তাঁর কবিতা ও সংগীত সংকলিত হয়ে আছে। এঁর রচনার হৃদয়ামোদিতা তাঁকে একদা জনপ্রিয় 'কান্ত-কবি' নামে পরিচিত ও অভিষিক্ত করেছিল।

রজনীকান্ত সেন

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-যুগ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ একজন ব্যক্তি নন; একটি যুগ-প্রতিভূও কেবল নন। বাঙালি জীবনের একাধিক যুগপ্রবাহকে আজীবন ধারণ ও বহন করে ফিরেছেন তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের অতলে; অনন্ত রচনা-সম্ভারের মধ্যে সেই বিচিত্র যুগ-স্বভাবকে রূপ দিয়েছেন নব নব মূর্তিতে। রবীন্দ্রনাথ যুগমানব নন,—বাঙালি জীবন-ধর্মের যুগ-যুগান্তরের মহা-অধিনায়ক তিনি। আজও তাঁর সেই নায়কতার ভূমিকা প্রায় অচঞ্চল হয়ে আছে। ফলে, রবীন্দ্র-রচনাবলীর ঐতিহাসিক আলোচনা একটিমাত্র পর্যায়সীমার মধ্যে বেঁধে রাখা প্রায় অসম্ভব। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে কবির জন্ম;—উনিশ শতকের সমাপ্তি লগ্নে তিনি উত্তর-যৌবন প্রৌঢ়ী-মুখে উপনীত হয়েছিলেন। ১৯৪১ তাঁর দেহান্ত-কাল; তাই, বিশ শতকের প্রথমার্ধও অস্ত-রবির রক্তিম আলোকে ভাস্বর। এদিক থেকে উনিশ শতকীয় বাঙালি জীবন-চেতনার পরমা পরিণতি লাভ ঘটেছে তাঁর রচনাপ্রবাহে; বিশ শতকীয় নব-ভাবনার উদ্গম ও প্রতিষ্ঠাও তাঁর সৃজন-পীঠমূলে। বংলা সাহিত্য-ইতিহাসে ত্রি-যুগের ত্রিবেণী-সংগম রবীন্দ্রনাথ।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ

নিজের লেখা প্রথম যে পূর্ণাঙ্গ কাব্যের কথা কবি জানিয়েছেন, তার নাম পৃথ্বীরাজ-পরাজয়; পিতার সঙ্গে হিমালয় যাত্রার পথে বর্তমানের শান্তিনিকেতনবাসকালে কাব্যটি রচিত হয়। সে ১২৭৯ সালের কথা;—কবির বয়স তখন প্রায় ১২ বছর পূর্ণ হবার মুখে। তার আগেও শিশু-রবি নীল বাঁধানো খাতায় ছন্দের মিল বেঁধে বেঁধে কবিতা লিখ্‌তেন গোপনে,—স-কৌতুক ভঙ্গিতে কবি নিজেই তার বর্ণনা করেছেন জীবনস্মৃতি-তে। কবি-কিশোরের হাতের সৃষ্টির সে আদি রূপ লুপ্ত হয়ে গেছে,—পরবর্তী কালে কোনো সন্ধান মেলে নি তাদের। আজ পর্যন্ত যতদূর সন্ধান পাওয়া গেছে, তাতে 'অভিলাষ' নামক কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত রচনা বলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের তেরো বছর বয়সে কবিতাটি

'ভারতী' পত্রিকায় 'দ্বাদশবর্ষীয়' বালকের রচনা বলে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া "হিন্দুমেলার উপহার রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর সমন্বিত প্রথম মুদ্রিত রচনা"—বলেছেন ডঃ সুকুমার সেন। প্রকাশ কালে কবির বয়স ছিল চৌদ্দ প্রায় পূর্ণ হবার মুখে।

রবীন্দ্র-রচনার অঙ্কুর ও প্রথম পর্ব

তারপরে পূর্ণাঙ্গ গাথাকাব্য প্রকাশিত হয়েছে একের পর এক,—কবিকাহিনী, বনফুল, ভগ্নহৃদয়, রুদ্রচণ্ড ইত্যাদি। কিন্তু, ঐ সব লেখায় কবি-স্বভাবের স্বতন্ত্র ছাপ পড়ে নি। পরের কথার অনুকরণ—পরের ওপরে নির্ভরশীলতা ছিল সেকালের রচনা-বিষয় আর রচনা-শৈলীর বিশিষ্টতা। কবি নিজে জানিয়েছেন, তাঁর প্রথম মৌলিকতা-চিহ্নিত কাব্য সন্ধ্যাসংগীত,—গ্রন্থাকারে এই কাব্যের প্রথম প্রকাশ কাল ১২৮৮ বাংলা সাল। তার পরে সোনার তরী (১৩০০ সাল) আর চিত্রা (১৩০২) পর্যন্ত ব্যাপ্ত কাব্যের ধারায় আত্মলীন গীতি-কবিতা রচনার উনিশ শতকীয় ইতিহাসের পরমা পরিণতি ঘটেছে। মোহিতনাথ সেন হিতবাদী সংস্করণ রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী সম্পাদনা করে সোনারতরী পর্যন্ত কাব্য-ধারাকে শিল্পীর হৃদয়-অরণ্য সীমার অন্তর্ভুক্ত করে-ছিলেন। চিত্রা কাব্যে কবি-চৈতন্য হৃদয়-অরণ্যের দিগন্ত ভূমিতে বিশ্ব-জীবনের অভিমুখে এসে দাঁড়িয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে চলেছে তার বিশ্বাভিসার। বিহারীলালের রচনায় বাংলা গীতিকবিতার প্রথম স্বভাবের পরিচয় দিয়ে কবি বলেছিলেন "সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর" রূপ পেয়েছিল। কবির নিজের মনের কথা মনের মতো করে বলার সেই রোমান্টিক গীতি-প্রয়াস শিল্প-সুন্দর পূর্ণতা পেয়েছে চিত্রা পর্যন্ত কাব্যধারায়। রবীন্দ্র-কবিতার প্রথম যুগ,—প্রথম পর্যায় শেষ হয়েছে উনিশ শতকীয় রেনেসাঁসকে পূর্ণতা দান করে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের সুরু চিত্রা-উত্তর কাল থেকে। নিজের কথাকে বিশ্বের কথার সূত্রে গেঁথে,—আত্মলীন স্বপ্ন-দৃষ্টিকে বিশ্ব-বিরাট ব্যাপ্তির মধ্যে ছড়িয়ে নিজের বিশ্ব-রূপকেই সন্ধান করেছেন কবি এই পর্যায়ে। নিজের সৃজনশীল সত্তার পরিচয় দিয়ে তিনি বলেছিলেন,—"আমারই মধ্যে দুই দিক আছে এক আমাতেই বদ্ধ আর এক সর্বত্র ব্যাপ্ত। এই দুয়েতে মিলেই আমার পরিপূর্ণ সত্তা।" অর্থাৎ, তাঁর ব্যক্তি-মন, সকল স্বপ্ন-কামনা, আশা-নিরাশা-উষ্ণতা নিয়ে তাঁর ব্যক্তি-সীমাতেই একান্ত বদ্ধ। আর একদিকে, কবির

জীবন জঙ্গম,—কৌতূহল ও সুদূর-পিপাসা তাঁর মনকে গতি আর দ্রুতি-চপল করেছে প্রাতিবেশিক বিশ্ব-পরিচয়কে জানবার অদম্য আকাঙ্ক্ষায়। ফলে, একদিকে পরিচিত পৃথিবীর পরিবেশে বিবর্তন-পরিবর্তনের বিন্দুমাত্র আলোড়নও কবির চেতনাকে মাতিয়ে তুলেছে। আর একদিকে, তিনি নিজের কল্পনার আলোকে সেই বহির্জীবন-আন্দোলনকে নব নব রূপ দিয়েছেন তাঁর রচনা-প্রবাহে। বস্তু-বিশ্বের যতটা চোখে দেখা যায়, তার সঙ্গে বাকিটা ব্যক্তি-মনের কল্পনায় রাঙিয়ে তাঁর সৃজন-প্রেরণা চরিতার্থ-সফল হয়েছে। আর এই সফলতাতেই তো কবি-সত্তার পরিপূর্ণতা।

দ্বিতীয় পর্বের রচনা

নিজের ব্যক্তিত্বের গণ্ডিকে অতিক্রম করে কবির বিশ্ব-মুখীনতার কৌতূহল প্রথম সন্নিবিষ্ট হয়েছিল ভারতীয় ঐতিহ্য-ধর্মের প্রতি। নৈবেদ্য-কাব্যে সেই আত্মসমাহিত ধ্যানী-চেতনার কর্ম-সাধনা পূর্ণ পরিচয়ে রস-সফল হয়েছে। আর, নৈবেদ্যের আধ্যাত্মিক অনুভূতিই কর্ম-বিযুক্ততার মধ্যে গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যের ভগবদ্-ভাবুকতায় পরিণতি পেয়েছে। এখানেই কবির সৃজন-ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটতে পারত। বস্তুত, সমকালীন শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্র-সমালোচক অজিত চক্রবর্তীও তাই প্রত্যাশা করেছিলেন। নদীর যেমন পরিণতি সমুদ্রে,—তেমনি,—তিনি মনে করেছিলেন,—কাব্যেরও পরম পরিণাম আধ্যাত্মিকতায়। গীতাঞ্জলির মোহনায় এসে রবীন্দ্র-কাব্য-ধারার বিকাশে সমাপ্তি ঘটবে,—এই ছিল তাঁর স্বাভাবিক প্রত্যাশা। কিন্তু, কবির চির-চঞ্চল প্রাণ সে আশাকে সফল হতে দেয়নি। গীতাঞ্জলি-উত্তর পৃথিবীতে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের অগ্নিদাহ মানবতার ইতিহাসকে যন্ত্রণাদগ্ধ করেছিল। সমকালীন ভারতবর্ষ-ও সেই বিশ্বব্যাপী বিষ-দহন থেকে মুক্ত থাকতে পারে নি। ভারতবর্ষের বেদনার তরী বেয়ে কবির বিশ্বাভিমুখী মন এবার প্রতীচ্য-পৃথিবীর জীবন-ভূমিতে গিয়ে পৌঁছাল। এবার আর কেবল প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রীতি নয়,—কেবল ভাব এবং বিশ্বাস দিয়ে নয়,—তার সঙ্গে যুক্তি, বিচার, চিন্তাকেও গ্রথিত করে কবি-মন বলকা-তে নব-জীবন-পথের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে। বলাকা-যুগে রবীন্দ্র-কবি-মনীষার প্রথম স্পষ্ট প্রকাশ তারপরে, পূরবীর সুরে নূতন বিশ্বানুভবকে শেষবেলাকার বেদনার রঙে রাঙিয়ে চলেছে নূতন কাব্য-পথে অভিসার।

মহুয়ার (১৯২৯) পরে কবি-চৈতন্যে নূতন পালের হাওয়া লেগেছে,—বনবাণী-পরিশেষ পেরিয়ে পুনশ্চ-তে (১৯৩২) তার প্রথম স্পষ্ট পদসঞ্চার। ১৯৩০-এ বিশ্বব্যাপী আর্থিক বিপর্যয়ের (economic depression) আঘাতে পৃথিবীর সমাজ-সংস্কৃতির ভিত্তিতে ভাঙন ধরেছিল। অপর পক্ষে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পরে পৃথিবী-ব্যাপী বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও যন্ত্র-সভ্যতার প্রসার নূতন উজ্জ্বলতার সঙ্গে নবীনতর সমস্যাকেও জাগিয়ে তুলছিল ক্ষণে ক্ষণে। উত্থান-পতনে বন্ধুর বিশশতকীয় সভ্যতার জীবন-পথকে ক্রমে ছেয়ে ফেলেছিল দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের দুর্ভেদ্য অন্ধকার। সেই দুর্ঘটনার অমালগ্নে কবির দেহান্ত ঘটে;—কিন্তু যুদ্ধোত্তর সম্ভাবনার অনাগত রূপ-সৌন্দর্যকে আভাসিত করে গেছেন তিনি সেই দুর্দিনেই। বিশ শতকে মানব-সভ্যতার পথ-নির্দেশের সূচনা-পরিণামকে ব্যাপ্ত করে রেখেছে রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহের তৃতীয় পর্যায়। 'শেষ-লেখা'-তে তার পরিশেষ।

রবীন্দ্র-রচনার পরিণতি যুগ

এই ত্রি-পর্যায়ে বিন্যস্ত কাব্য-রচনার প্রবাহকে সুচিহ্নিত করেছে গল্প-উপন্যাস, নাটক-প্রবন্ধের বিচিত্র-দেহ তীর-ভূমি। সপ্ততি-বর্ষের জয়ন্তী-উৎসবে আত্মপরিচয় ঘোষণা করে কবি বলেছেন,—"নিজের সত্য পরিচয় পাওয়া সহজ নয়। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতরকার মূল ঐক্য সূত্রটি ধরা পড়তে চায় না।—নানাখানা করে নিজেকে দেখেছি, নানা কাজে প্রবর্তিত করেছি, ক্ষণে ক্ষণে তাতে আপনার অভিজ্ঞান আপনার কাছে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ ভ্রমণ করতে করতে বিদায়-কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম, তখন একটা কথা বুঝেছি যে,—একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে,—সে আর কিছু নয়, আমি কবি মাত্র।" এর থেকেই স্পষ্ট বুঝি, কথা-সাহিত্য, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদিকেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবি-কর্মেরই অনুষঙ্গ বলে মনে করেছিলেন। তাঁর নিজের কাব্যাস্বাদনের পদ্ধতি নির্দেশ করে কবি বলেছেন,—"আমার কাব্যের ঋতু-পরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে। প্রায়ই সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে। কালে কালে ফুলের ফসল বদল হয়ে থাকে, তখন মৌমাছির মধু-যোগান নতুন পথ নেয়। ফুল চোখে দেখবার পূর্বেই মৌমাছি ফুলগন্ধের

সূক্ষ্ম নির্দেশ পায়, সেটা পায় চারদিকের হাওয়ায়। যারা ভোগ করে এই মধু, তারা এই বিশিষ্টতা টের পায় স্বাদে।”

রবীন্দ্রনাথের সকল রচনাই তাঁর বিভিন্ন মনো-ঋতুর বিচিত্র ফুল ও ফল। কবি-মনের সেই সব বিশেষ ঋতু, তথা পৃথক্ পৃথক্ অনুভবের সূত্র থেকেই তাঁর রচনাবলীর শিল্প-স্বাদ আহরণ করে নিতে হয়। আর, সেই সূত্র অবলম্বন করে যে-কোনো ঋতুর পরিচয় সন্ধান করলে দেখব,—প্রায় একই সময়ে লেখা কবিতা ও গল্প-নাটক-প্রবন্ধে মোটামুটি একটি কাব্যানুভবই বিচিত্র রূপে প্রকাশ পেয়েছে। এদিক থেকে রবীন্দ্র-রচনার ইতিহাসকে কাব্য, নাটক, গল্প, প্রবন্ধের পৃথক ভাগে বিভক্ত না করে, কবি-মনোভাবের ঋতু-বিকাশের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গে বিধৃত করে দেখতে পারাই ভাল।

রবীন্দ্র-রচনা ও রবীন্দ্র যুগ

তাছাড়া, এ-কথাও স্মরণীয় যে, রবীন্দ্র-যুগের বিভিন্ন পর্যায়ের ইতিহাস কবির একক রচনা-সীমাতেই আবদ্ধ নয়;—সমসাময়িক নানা শিল্পীর রচনায় তাঁদের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সেই যুগ-স্বভাবের পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে বিচিত্র রস-রূপে।

রবীন্দ্র যুগ ঃ উন্মেষকাল

১। অ-পরিণতির অঙ্কুর

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগের সূচনা আকাস্মিক নয় ;—উনিশ শতকের রোমাণ্টিক্ গীতি-কবিতার পূর্বসূত্র অনুসরণ করেই তিনি বাংলা-কাব্যের স্ব ন-ভূমিতে পদক্ষেপ করেছিলেন। বিশেষ করে, অস্ফুট-চেতন কিশোর কবির রচনায় পর-নির্ভরতা ও পূর্বানুস্মৃতির পরিচয় স্পষ্ট। আগে বলেছি এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিহারীলালের ভাব-শিষ্য। অপরাপর পূর্বসূরীর রচনার প্রভাবও রয়েছে এই সময়কার বিভিন্ন কাব্য-কবিতায়।

প্রথম বয়সের প্রায় সব কয়টি কাব্যই গাথার আকারে লেখা। গ্রন্থাকারে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কাব্য কবিকাহিনী (১২৮৫ সাল)। এটি আসলে কবির রচিত দ্বিতীয় কাব্য ; প্রথম রচিত কাব্যখানি—বনফুল—আগে রচিত হলেও মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় আরো এক বছর পরে। বনফুল-এর গল্পে অক্ষয় চৌধুরীর 'উদাসিনী'র ছাপ একান্ত স্পষ্ট। কবি-কাহিনী-তে বিকচ-যৌবন কবির স্বপ্নাবেশে স্বকীয়তা আছে। কিন্তু, স্থানে স্থানে, বিশেষ করে সরস্বতীর কল্পনায় বিহারীলালের ছাপ রয়েছে,—বৃদ্ধ 'কবি'র শেষ অনুভূতিতে! তার পরেই রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল বাল্মীকি-প্রতিভা (১২৮৭ সাল)। এই নাট্য-গীতির রচনা ও পরিকল্পনায় বিহারীলালের প্রভাব কবি নিজেও অকুণ্ঠ ভাষায় স্বীকার করেছেন। ভগ্ন-হৃদয় ও রুদ্রচণ্ড (১২৮৮) একই সালে প্রকাশিত আরো দুখানি অ-পরিণত নাট্য-গাথা। কালমৃগয়া প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮৯ বাংলা সালে। শৈশব সংগীত ১২৯১ সালে প্রকাশিত হলে রচিত হয়েছিল অনেক আগে,—কবির বারো থেকে আঠারো বছর বয়ঃসীমায় রচিত কবিতাবলীর নির্বাচিত সংকলন এটি।

অ-পরিণতির যুগের কাব্য

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর প্রকাশ ঘটে ১২৯১ সালে,—সন্ধ্যাসংগীতের প্রায় তিন বছর পরে। কিন্তু এ'র অধিকাংশ কবিতা রচিত হয়েছিল বহু আগে,—ভানুসিংহের প্রথম কবিতার রচনাকাল ১২৮৪ সাল। বৈষ্ণব

কবিতার রস আস্বাদন করে কবি একান্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন ;—বয়স তখন ষোল বছর মাত্র। প্রায় একই সময়ে "অক্ষয়বাবুর" কাছে ইংরেজ বালক-কবি চ্যাটার্টন-এর গল্প শুনেছিলেন,—"চ্যাটার্টন প্রাচীন কবিদের এমন নকল করিয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন যে অনেকেই তাহা ধরিতে পারেন নাই।" বৈষ্ণব ব্রজবুলি কবিতার রূপ-রসময় অভিনবতার সঙ্গে এই আশ্চর্য গল্পের প্রেরণা বালক-কবিকে পুলকিত করেছিল। অতএব, "কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।" এই প্রেরণা থেকেই ভানুসিংহ-পদাবলীর জন্ম ;—"একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলা দিনের ছায়া-ঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা শ্লেট লইয়া লিখিলাম, 'গহন কুসুম কুঞ্জমাঝে'।" এইটিই "ভানুসিংহের" প্রথম পদ, কবির ছদ্ম নামে "রবীন্দ্র-নাথ"-শব্দার্থের অভিনব রূপান্তর সত্যই কৌতুককর। পরবর্তী ইতিহাসে কৌতুক আরো ঘন-বদ্ধ হয়ে উঠেছে। কবি তাঁর এক বন্ধুকে কিছু পদ পাঠিয়ে জানিয়েছিলেন ব্রাহ্মসমাজের লাইব্রেরীতে আবিষ্কৃত একটি পুরাতন পুঁথি থেকে পদগুলি সংকলিত। সকলেই এ-কথা বিশ্বাস করেছিলেন। এমন কি কবি জানিয়েছেন, এই প্রাচীন কবি সম্বন্ধে সমালোচনা-নিবন্ধ লিখে নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় জার্মানিতে ডক্টর উপাধি পেয়েছিলেন। রবীন্দ্র-জীবনী-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তথ্যাদি উদ্ধার করে জানিয়েছেন, কবির দেওয়া খবর "ভ্রমশূন্য নহে।" যাই হোক, ভানুসিংহ-পদাবলী-ও অ-পরিণতি যুগের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। পরানুকরণ,—পর-নির্ভরতার প্রবণতাই ছিল সে-যুগের প্রধান ধর্ম। তবু, এই রচনা পরিণত রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইতিহাসেও স্থান পেয়েছে, তার কারণ, ভাবের অস্ফুটতা ভাষা ও রচনাশৈলীর পরিণতির অন্তরালে আত্মগোপন করে আছে। তাছাড়া, সেকালের পাঠকদের কৌতুককর প্রতিক্রিয়াও এর রচনা-ইতিহাসকে সরস করে রেখেছে।

এই অ-পরিণতি-কালের একমাত্র উল্লেখ্য গদ্য গ্রন্থ য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮৮ সালে। ১২৮৫ বাংলা সালে কবি বিলেত গিয়ে-ছিলেন প্রথম বার,—'মেজদা' সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে। সেখান থেকে পুরোদস্তুর ব্যারিস্টার হয়ে আসবেন, এই ছিল গুরুজনদের আশা। কিন্তু,

ফিরে আসতে হয়েছিল দু বছরের মধ্যেই। কবির এই প্রত্যাবর্তন আকস্মিক ও রহস্যময়। তবু, এর পেছনে 'য়ুরোপযাত্রী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্র' ভারতীতে প্রকাশিত হওয়ার প্রভাব কিছুটা পরিমাণে অনুমান করা অন্যায় নয়। য়ুরোপে নারী-স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদির তুলনায় এ-দেশের সমাজ-ব্যবস্থার মুখর প্রতিবাদ ঐ পত্রাবলীর প্রধান বিষয় ছিল। ঠাকুর পরিবারের বহুদিনের আশা-বিশ্বাস-সংস্কার তাতে শংকিত হয়ে উঠেছিল। এ-বিষয়ে ভারতী-সম্পাদক দ্বিজেন্দ্র-নাথের সঙ্গে 'পত্র' লেখকের তীব্র মত বিনিময় হয় 'ভারতীর' পৃষ্ঠাতেই। পরে, সংযত পরিশোধিত আকারে লেখাটি গ্রন্থ-বদ্ধ হয় 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' নামে। এ-রচনার মধ্যেও অপূর্ণ কিশোর মনের অ-পরিণতির পরিচয় প্রধান। কবি বলেছেন,—"এই চিঠিগুলির অধিকাংশই বাল্য বয়সের বাহাদুরি।" পৃথক্ প্রবন্ধ হিসেবে ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখ সঙ্গিনী নামক সাহিত্য-সমালোচনা-নিবন্ধ কবির প্রথম প্রকাশিত রচনা বলে কথিত হয়। জ্ঞানাঙ্কুর প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮৩ বাংলা সালে।

অপরিণত গদ্য রচনা

২। উন্মেষকালের কাব্য-কবিতা

কবি বলেছেন,—"সন্ধ্যাসংগীতে আমি সর্বপ্রথম নিজের সুরে নিজের কবিতা লিখিয়াছিলাম। তাহার ছন্দ, ভাষা, ভাব সমস্তই কাঁচা হইতে পারে এবং কাঁচা হইবারই কথা। কিন্তু দোষগুণ সমেত আমার।" অর্থাৎ, এখান থেকেই কবির রচনা-পদ্ধতি স্বধর্মের অভিমুখী হয়েছে। তাতে কবি উৎসাহিত হয়েছেন। কিন্তু, সেই সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণ করে অনুভব ও আবিষ্কার করতে না পারার বেদনাও অপার। সেই রহস্যময় রোমান্টিক বেদনাই সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাবলীর মূল উপজীব্য। কবি বলেছেন.—"মানুষের মধ্যে একটি দ্বৈত আছে। বাহিরের ঘটনা, বাহিরের জীবনের সমস্ত চিন্তা ও আবেগের গম্ভীর অন্তরালে যে-মানুষটা বসিয়া আছে, তাহাকে ভাল করিয়া চিনি না ও ভুলিয়া থাকি, কিন্তু জীবনের মধ্যে তাহার সত্তাকে তো লোপ করিতে পারি না। বাহিরের সঙ্গে তাহার অন্তরের সুর যখন মেলে না—সামঞ্জস্য যখন সুন্দর ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না, তখন সেই অন্তর-নিবাসীর পীড়ার বেদনায় মানস-প্রকৃতি

সন্ধ্যাসংগীত

বঞ্চিত হইতে থাকে। এই বেদনাকে কোনো বিশেষ নাম দিতে পারি না,—ইহার বর্ণনা নাই—এই জন্য ইহার যে রোদনের ভাষা, তাহা স্পষ্ট ভাষা নহে—তাহার মধ্যে অর্থবদ্ধ কথার চেয়ে অর্থহীন সুরের অংশই বেশি। সন্ধ্যাসংগীতে যে বিষাদ ও বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে তাহার মূল সত্যটি সেই অন্তরের রহস্যের মধ্যে।"

সন্ধ্যাসংগীতের আলো-আঁধারে সেই সুরময় অনুভব-বেদ্য ভাষাকে সন্ধান করে ফিরেছেন কবি তাঁর মানস-দৃষ্টিতে—

"বুঝিগো সন্ধ্যার কাছে শিখেছে সন্ধ্যার মায়া
ওই আঁখি দুটি,
চাহিলে হৃদয় পানে মরমেতে পড়ে ছায়া
তারা উঠে ফুটি।
আগে কে জানিত বলো কত কী লুকানো ছিল
হৃদয় নিভৃতে,
তোমার নয়ন দিয়া, আমার নিজের হিয়া
পাইনু দেখিতে।"

সন্ধ্যাসংগীতের পরের কাব্য প্রভাতসংগীত প্রথম গ্রন্থিত হয় ১২৯০ বাংলা সালে। রবীন্দ্র-কাব্যের ইতিহাসে প্রভাতসংগীত প্রথম আত্ম-চৈতন্যের প্রভাত-আলোক বয়ে এনেছিল। এদিক থেকে কাব্যগুলির নামকরণ ব্যঞ্জনাবহ। সন্ধ্যার মত আলো-আঁধারি আবছায়ার রহস্য-লোকে নিজের অজানা স্বরূপকে খুঁজে ফিরেছেন কবি সন্ধ্যাসংগীত-এ। কিন্তু, তাতে না-পাওয়ার অতৃপ্তি রোমান্টিক বিষণ্ণতার জন্ম দিয়েছে সারাটি কাব্য-কবিতায়।

প্রভাতসংগীত

প্রভাতসংগীতে সেই অজ্ঞাত মনোলোকে প্রথম নিঃসংশয় আলোকচ্ছটা প্রবেশ করেছে,—প্রভাতের মত অনাবৃত সেই আলোতে কবি নিজের পরিচয় খুঁজে পেয়ে বিস্মিত, স্তম্ভিত, উল্লসিত হয়েছেন। তারই উচ্ছ্বসিত রূপ প্রকাশ পেয়েছে 'নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ' কবিতায়। এই কবিতা রচনার ইতিহাস বিবৃত করে জীবনস্মৃতিতে কবি বলেছেন,—"শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম।" তারই ফলে জীবনে এই সর্বপ্রথম কবির মনে হতে লাগল,—

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি।
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি॥"

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বানুভবের অঙ্কুর-জন্ম এখানেই। জগতের ক্ষুদ্র,—তুচ্ছতম বস্তুকেও তিনি কখনো একান্ত তুচ্ছ করে দেখেন নি। সমগ্র বিশ্বের নাড়ি-চলার ওঠা-পড়ার ছন্দে মিলিত করে দেখেছেন। কোনো কিছুকেই তিনি স্বতন্ত্র একক করে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন না,—সব কিছুকেই সমষ্টিগতভাবে সম্পূর্ণ করে দেখতে চাইতেন। ফলে, কবি বলেছেন,—কোনো এক মুহূর্তে "পৃথিবীর সর্বত্রই নানা লোকালয়ে, নানা কাজে, নানা আবশ্যকে কোটি কোটি মানব চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে—সেই ধরণীব্যাপী সমগ্র মানবের দেহ-চাঞ্চল্যকে সুবৃহৎভাবে এক করিয়া দেখিয়া আমি একটি মহা সৌন্দর্য-নৃত্যের আভাস পাইতাম।" কিংবা,—"রাস্তা দিয়া মুটে মজুর যে-কেহ চলিত, তাহাদের গতিভঙ্গী, শরীরের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে ভারি আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইত; সকলেই যেন নিখিল সমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মতো বহিয়া চলিয়াছে।" ব্যক্তিকে এমনি করে বিশ্বের প্রেক্ষা-ভূমিতে দাঁড় করিয়ে—বিশেষকে নির্বিশেষের সঙ্গে জড়িয়ে অখণ্ড করে দেখবার আকাঙ্ক্ষাকে ক্রম-সম্পূর্ণ করার সাধনাই বস্তুত রবীন্দ্র-কবি-জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত। প্রভাতসংগীতের কবিতায় এই অনুভবের প্রথম জন্ম।

ছবি ও গান

'ছবি ও গান' প্রভাতসংগীতের পরবর্তী প্রকাশিত কাব্য;—দুটি কাব্যই প্রকাশিত হয়েছিল এক সালে। প্রভাতসংগীতের পরবর্তী ভাবানুভবের অনুষঙ্গ চলেছে 'ছবি ও গানে।' কবি জানিয়েছেন,—"নানা জিনিসকে দেখিবার যে দৃষ্টি, সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তখন একটি একটি স্বতন্ত্র ছবিকে যেন কল্পনার আলোক ও মনের আনন্দ দিয়া ঘিরিয়া লইয়া দেখিতাম····· গানের সুর যেমন শাদা কথাকেও গভীর করিয়া তোলে, তেমনি কোন একটা সামান্য উপলক্ষ্য লইয়া সেটিকে হৃদয়ের মধ্যে বসাইয়া তাহার তুচ্ছতা মোচন করিবার ইচ্ছা ছবি ও গান-এ ফুটিয়াছে।"—অর্থাৎ প্রভাতসংগীতের 'চৈতন্য-দিয়ে' দেখার প্রথম অনুভব তখনও সারা দেহ-মন-প্রাণে নতুন সৌন্দর্য-চেতনার সঞ্চার করে ফিরছে। তাই, কবির সুন্দর-পিপাসু দৃষ্টি বাইরের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময় জগতের প্রতি উন্মুখ হয়ে আছে। কোনো তুচ্ছতাকেই তুচ্ছ বলে মনে

হচ্ছে না,—সব কিছুকেই পরিব্যাপ্ত করে আছে নিখিলের অন্তহীন সৌন্দর্যের আভা। সেই মধুরিমাকে নিজের সুর-সুন্দর মন দিয়ে আকণ্ঠ পান করছেন, —আর শব্দে ছন্দে রূপ গ্রহণ করছে একটি করে সুর-তরঙ্গিত ছবি,—গানে আঁকা সৌন্দর্যের ছবি।

ভাবানুভবের পরম্পরা বিচারে ছবি ও গানের পরের কাব্য কড়ি ও কোমল (১২৯৩)। দীর্ঘদিন ধরে এই কাব্যের কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল। কিছু সংখ্যক প্রাথমিক কবিতার রচনাকাল ১২৯১ বাংলা সালে কবির নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু-শোকের মধ্যে। ইনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী এবং কিশোর-কবির কল্পনা-বিধাত্রী,—তথা তাঁর ভাব-প্রেরণার কেন্দ্র-শক্তি ছিলেন। জীবন-স্মৃতিতে 'মৃত্যুশোক' প্রসঙ্গে এবং অন্যান্য আরো বহু উপলক্ষ্যে কবি এই মানসী শক্তির অজস্র উল্লেখ করেছেন। মৃত্যুর পরেও তাঁর অমূর্ত প্রভাব কবির শেষ বয়সের কাব্য-কবিতাদিতেও পরিস্ফুট হয়ে আছে। কড়ি ও কোমলের কিছু সংখ্যক কবিতায় এই মৃত্যু-শোকের অভিভূত আর্তি রয়েছে। কিন্তু, মূলতঃ কড়ি ও কোমল যৌবন-উন্মাদনার কাব্য। জীবনের সৌন্দর্য-রূপকে পৃথিবীর স্তরে স্তরে বিচিত্র মধুরিমার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন কবি। প্রথম যৌবনের উল্লসিত আকাঙ্ক্ষা দিয়ে সেই অনন্ত সৌন্দর্য-সত্তার প্রেয়সী নারীর অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে ভোগ করার স্পৃহা ক্ষণে ক্ষণে অদম্য হয়েছে :—

কড়ি ও কোমল

"অধরের কানে যেন অধরের ভাষা,
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে—
গৃহছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালবাসা
তীর্থ যাত্রা করিয়াছে অধর সংগমে।"

লক্ষ্য করা উচিত, দেহের সীমাতেও প্রেমের যে রূপ কবি প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন, তা কেবল ইন্দ্রিয়াকৃতির সীমায় বদ্ধ থাকে নি,—দেহের দেহলিতেও কবি "ভালবাসার তীর্থযাত্রী" স্বরূপকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্র-কবি-কল্পনার মধ্যে নিছক দেহাসক্তি,—রক্তমাংসময় রূপের লালসা ছিল না কোথাও। তাই, যৌবনের কামনা যখন সুন্দরকে দেহের মধ্যে বাঁধতে চেয়েছে, কবির সহজ প্রবণতা তখন দেহকেও ইন্দ্রিয়-সর্বস্বতা থেকে মুক্ত করে প্রেমকে করেছে বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষ।

যৌবনের বাসনা যত শান্ত হয়েছে, নিঃসীম প্রেমকে দেহের সীমায় বাঁধতে গিয়ে কবি-মনের অতৃপ্তি ততই পুঞ্জিত হয়ে উঠেছে ক্ষণে ক্ষণে। কড়ি ও কোমলের শেষ পর্যায়েই সে অনুভবের কারুণ্য ফুটে উঠেছে ধীরে ধীরে :—

"এ মোহ কদিন থাকে, এ মায়া মিলায়,
কিছুতে পারে না আব বাঁধিয়া রাখিতে—
কোমল বাহুর ডোর ছিন্ন হয়ে যায়
মদিরা উথলে নাকো মদির আঁখিতে।"

মানসী

মানসী কাব্যে (১২৯৭) এই মোহ মুক্তি ঘটেছে, বহু ঘাত-সংঘাতের মানসিক ঝড পেরিয়ে। বাইরে যে প্রেমের শক্তি ছিল রূপান্বিত,—এই কাব্যের পরিণতি-পর্যায়ে তাই মনের মাধুরীময় হয়ে 'মানসী' মূর্তি ধরেছে। এই কাব্যের উপহার অংশে স্বয়ং কবি তাঁর বিশেষিত মানস-ঋতুর পরিচয় দিয়ে বলেছেন,—

"নিভৃত এ চিত্ত মাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ আঘাত,
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারাদিন বাত।
এ চির জীবন তাই, আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা,
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা।"

জগতের রূপ-রস-গন্ধময় বহিঃসৌন্দর্যকে কবি তাঁর সীমায়িত মনের মধ্যে তখনও সম্পূর্ণ করে পেতে চেয়েছেন ;—অনন্ত-বিচিত্রকে উপলব্ধি করেছেন নিজের একান্ত-একক মনোময়ী রূপে। কিন্তু, বিশ্ব জগৎক হৃদয়ের গভীরে অনুভব করায়,—দেহের আকৃতিকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করে মানস লোকে উত্তরণের চেষ্টায় কবিকে আত্মজয় করতে হয়েছে ধাপে ধাপে। ফলে, 'মানসীর' ক্রমপরিণত ভাবনার ধারাও চলেছে দীর্ঘদিন ধরে,—১২৯৪ বাংলা সালের বৈশাখ থেকে ১২৯৭ সালের কার্তিক পর্যন্ত। এই সাডে তিন বছরে কবিতা-রচনার প্রবাহ অবিরত থাকে নি,—বারে বারে ছেদ পড়েছে,— প্রত্যেক নূতন পর্যায়েই পরিণততর ভাবনার আন্দোলনে নূতন বাঁকের

কবিতা-রচনা চলেছে কিছুদিন। মানসীর কবিতা-প্রবাহকে কবি-মনোভাবের বিকাশের হিসাবে চার পর্যাযে ভাগ করা হয়। প্রথম পর্যায়ে আছে আক্ষেপ ও অভিমান। দেহের আকাঙ্ক্ষায় কেন আর প্রাণে সাড়া জাগে না,—অতৃপ্ত যৌবনের সে ব্যাকুল জিজ্ঞাসা। 'ভুলে' 'ভুলভাঙ্গা' ইত্যাদি কবিতা এই পর্যায়ের রচনা। দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে, সুতীক্ষ্ণ যন্ত্রণাবোধ। কবি নিশ্চয় বুঝেছেন, দেহের বাসনার তৃপ্তি নেই,—নেই কোনো চবিতার্থতা। তবু, অন্ধ আকাঙ্ক্ষার অভ্যস্ততা কাটিয়ে ওঠা দুঃসহ হয়,—মনে হয়:—

"বিশ্বজগতের তরে ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি ;
সুতীক্ষ্ণ বাসনা ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে ?
ভালবাস, প্রেমে হও বলী,
চেয়ো না তাহারে।"

ক্রমে, এই প্রত্যয় দৃঢ় হয়ে উঠেছে মনে মনে,—তৃতীয় পর্যায়ব্যাপী সুদীর্ঘ আত্ম-সংগ্রামের পরে। সেই অনুভবের আনন্দে লিখ্লেন রাজা ও রানী নাটক। সে-কথা পরে বলছি ;—এখানে কেবল স্বীকার করে রাখি,—'সুরদাসের প্রার্থনা' প্রভৃতি কবিতার উন্মত্ত সীমিত প্রেমকে অতিক্রম করে অসীম প্রেমে উত্তরণের সফল সংঘাতচিত্র রয়েছে রাজা ও রানী নাটকে। এদিক থেকে নাটকটি 'মানসী' কাব্য-ভাবনারই অনুস্মৃতি।

'রাজা ও রানী'র পরে মানসীর চতুর্থ স্তর। সীমা-মুক্ত 'অনন্ত-প্রেমের' সন্ধান মিলেছে এই পর্যায়ের আনন্দ-শান্ত কবি মনে,—মনে হয়েছে:—

"তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।
আজি সেই চির-দিবসের প্রেম অবসান লভিয়াছে।
রাশি রাশি হয়ে তোমার প্রেমের কাছে।
নিখিলের সুখ, নিখিলের দুখ, নিখিল প্রাণের প্রীতি—
একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে সকল প্রেমের স্মৃতি—
সকল কালের সকল গীতি ॥"

প্রেমের এই ধ্যান-তন্ময় স্বভাব উপলব্ধি করতে পারার আনন্দ-চঞ্চলতা সক্রিয়-সুন্দর রূপ পেয়েছে বিসর্জন নাটকে। এই ধারারই কাব্যানুবর্তন চলেছে বিসর্জন-উত্তর আরো কিছু সংখ্যক কবিতায়।

মানসী কাব্যে কবি প্রথম আত্ম-বিমুক্ত প্রেমের সন্ধান পেয়েছেন নিজের নিভৃত হৃদয়-অনুভবে। এখানেই কবি-চেতনার প্রথম মুক্তি; এদিক থেকে রবীন্দ্র-কাব্যের ইতিহাসে 'মানসীর'র প্রতিষ্ঠা অতুল্য। তা ছাড়া, আরো একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন কবি স্বয়ং :—"মানসীতেই 'ছন্দের' নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।" এক কথায়,—ভাবে ও রূপ-শৈলীতে রবীন্দ্র-কবি-চেতনার প্রথম মুক্তি-ভূমি 'মানসী'।

মানসীর পরে সোনারতরী কাব্যে (১৩০১ বঙ্গাব্দ) এই মুক্তির পটভূমি আরো ব্যাপক পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে। কাব্য-সাহিত্য মাত্রই জীবন-সম্ভব। জীবনের অনুভব আর অভিজ্ঞতা যত বিস্তৃত হয়, শিল্পীর কল্পনা ও রচনার প্রচ্ছদ ততই হতে থাকে ব্যাপ্ত,—ব্যাপ্ততর। এদিক থেকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির সন্তান কিশোর রবীন্দ্রনাথের বাধা ছিল অনেক। পিতা থাকৃতেন দূরদেশে,—প্রায়ই হিমালয়ের দুর্গমতায়;—বাড়ি ফিরে যখন আস্তেন, তখনো বিনা অনুমতিতে তাঁর ছায়া মাড়াবার অধিকারও ছিল না শিশুদের। অগ্রজ, যাঁরা বয়সে এবং চিন্তা ভাবনায় ছিলেন কবির পিতৃতুল্য, তাঁদের মহলেও ছিল প্রবেশ নিষেধ। ঘুমিয়ে পড়বার আগে মার কাছে ঘেঁসবার উপায়ও নিরুদ্ধ ছিল। তাঁর শৈশব-কৈশোর কেটেছে ভৃত্য-রাজকতন্ত্রে, পিতার সঙ্গে হিমালয় চূড়ায়,—পেনেটির বাগান বাড়ির সীমা-বন্ধনে। মাতৃবিয়োগের পরে 'নতুন বৌঠান্' কাদম্বরী দেবী বন্ধন-যন্ত্রণাতুর শিল্পীর মনকে মুক্তি দিলেন,—টেনে নিলেন তাঁকে নিজের স্নিগ্ধ সান্নিধ্যে। সেখানে কবি বড়ো-মনের সঙ্গ পেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছেন,—কিন্তু মনকে জীবনের অপার বৈচিত্র্যের মধ্যে ছড়িয়ে—উড়িয়ে দিতে পারেন নি। হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় উদাত্ততা আছে, সীমাহীনতা আছে,—আছে পাথরে গড়া কাঠিন্যের ঢেউ। কিন্তু, প্রকৃতির উত্তাল-উচ্ছলতা, কোমল-সুন্দরতার তরঙ্গমালা নেই তাতে। তাছাড়া, হিমালয়ের মহিমা বরণীয় হলেও,—তা নিঃসঙ্গ-একক, মানব-সান্নিধ্যহীন।

ঠাকুর বাড়িতে কবির সঙ্গী ছিলেন চির-রসিক অক্ষয় চৌধুরী; আদর্শ ছিলেন বিহারীলাল,—আরো তাঁর মনকে টেনেছিলেন রাজনারায়ণ বসু ও অপরাপর অনেকে। মানব-ধর্মের উত্তুঙ্গ-মহৎ রূপকে দেখেছেন কবি সেখানে। তাতে হৃদয়ের প্রসার বাড়ে; কিন্তু বিচিত্রতার ক্ষুধা মেটে না। তাই, যৌবন-সীমায় এসে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত যখন হয়েছেন, তখন থেকেই তিনি বাইরের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন দেহে-মনে। এর আগে, ভৃত্যরাজকতন্ত্রে বা পেনেটি পর্যায়ে তাঁর মুক্তি-কামী প্রাণ মানস-অভিযানের সীমাতেই তৃপ্ত হয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। 'মানসী' লিখ্‌বার সময়ে কবি গাজিপুরে গিয়েছিলেন,—সেখানে গোলাপ-ক্ষেতের অনন্ত-প্রাচুর্যের মধ্যে নিজের হৃদয়কে নিঃসীম মুক্তি দেবার আকাঙ্ক্ষায়। নতুন পরিবেশে নতুন সুর লেগেছে মনে। কিন্তু আত্মার মুক্তি ঘটে নি। তাতে কেবল ছিল "নতুন স্বাদের উত্তেজনা।" ফলে "নতুন নতুন ছন্দের বুনুনির কাজ" চলেছে, কিন্তু আত্মার গভীরে নতুন গানের সুর জাগে নি। তা জেগেছে সোনারতরীব পর্যায়ে। এই সময়ে পিতার আদেশে কবিকে উত্তরবঙ্গের জমিদারিতে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল দীর্ঘদিন। এই অবকাশে চেতনার আমূল প্লাবিত করে দেখা দিয়েছে নব জীবন-বোধের উত্তাল তরঙ্গ-ধারা।

সোনারতরী :—
প্রেরণা ও পটভূমি

সোনারতরী-কাব্যের পশ্চাৎবর্তী ভাব-প্রেরণা সম্বন্ধে কবি বলেছেন :—"আমি শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা মানি নি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি—বৈশাখের খররৌদ্রতাপে শ্রাবণের মুষলধারা বর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা. মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানা বর্ণের আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জন-সজনের নিত্য সংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছাচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি,—সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয়নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শে সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে

আরম্ভ হল আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সমন্বয়কার প্রবর্তনা,—বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্য-সচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা। এই সমন্বয়কার প্রথম কাব্যের ফসল ভরা হয়েছিল সোনারতরীতে।"

সোনারতরী সম্বন্ধে সবচেয়ে বড কথা,—এখানেই জীবনের সু-বিস্তারিত অনন্তরূপের পরিচয় কবির মনে সর্ব প্রথম অখণ্ড প্রত্যয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ-পর্যন্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে মানুষের এমন মুক্ত,—বিচিত্র-রূপ কখনো ধরা পড়েনি তাঁর চেতনায়। অভিনবকে,—অসীমকে জানার আনন্দ তাতে নির্বাধ হয়ে দেখা দিল। কত রহস্য, কত অজ্ঞাত অনুভব উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। একদিকে অনন্ত পাথার পদ্মা,—পদ্মাতীরের গগনচুম্বী নিঃসীম প্রান্তর,—আর তারই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে বিচিত্র সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনায় চঞ্চল মানব জীবনের চিত্র ছুটে চলেছে চলচ্চিত্রের মত। কবি তাঁর অনুভব দিয়েই কেবল এদের স্বাদ গ্রহণ করেন নি, নিজের জীবনের কর্মপ্রবাহকে এদের জীবন-ধারার সঙ্গে দিয়েছেন মিলিয়ে। অপার-বিস্তৃত জীবন-রূপের লীলা চলেছে কেবল মনে মনে নয়,—"দেহে আর মনে প্রাণে হয়ে একাকার।" নতুন অনুভব ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এই কাব্য-ভূমিতে দাঁড়িয়ে নিজ কবি-জীবনের আদর্শ ও সাধনাকে এবারে সুদৃঢ় প্রত্যয়ে ঘোষণা করলেন কবি :—

হৃদয়-অরণ্যের পথ-সংমোচন

"অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দলোক করি বিরচন,
গীত রসধারা করি সিঞ্চন
  সংসার ধূলিজালে।
ধরণীর শ্যাম করপুট-খানি
ভরি দিব আমি সেই গীত আনি,
বাতাসে মিশায়ে দিব এক বাণী
  মধুর অর্থ ভরা।
ধরণীর তলে, গগনের গায়।
সাগরের জলে, অরণ্য ছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায়

রঙিন করিয়া দিব।
সংসার মাঝে দু-একটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর
দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর—
তারপরে ছুটি নিব।
না পারে বুঝাতে, আপনি না বুঝে,
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে,
কোকিল যেমন পঞ্চমে কুজে
মাগিছে তেমনি সুর—
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা
বিদায়ের আগে দুচারিটা কথা
রেখে যাব সুমধুর।"

বস্তুতঃ, এখানেই রবীন্দ্রনাথের আত্ম-উন্মোচন বিকশিত হয়ে উঠেছে। আগে বলেছি, সোনারতরী পর্যন্ত কাব্য-প্রবাহকে কবির "হৃদয় অরণ্য"-বাসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বিহারীলালের কবি-স্বভাব-চিহ্নিত উনিশ শতকের আত্ম-বিহ্বলতার থেকে মুক্তির সুর লেগেছে এখানেই। মানুষের জীবনের অব্যক্ত ব্যাকুলতা,—তার ছোট সুখ, ছোট হাসির অপার কাব্য-সম্ভাবনা কবিমনকে আলোড়িত করে তুলেছে,—এবার থেকে তাই দৃঢ় প্রত্যয়ে স্থির করেছেন নতুন কবিতা লিখবেন—এই বৃহৎ পৃথিবীর জন্যে, —এই পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের সুখ-দুঃখের অসংখ্য ছোট-বড় কথা নিয়ে। নিজের আত্মগত কুণ্ঠার গভীরতা থেকে একবার যখন পৃথিবীর দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন,—তখনি মনে হয়েছে,—এ যেন কত জন্ম-জন্মান্তরের চেনা :—বলেছেন,—

"আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের ; তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃ মণ্ডল, অসংখ্য রজনী দিন

যুগ যুগান্তর ধরি আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্র ফুল গন্ধরেণু।"

"সমুদ্রের প্রতি" তাকিয়ে মনে হয়েছে,—এর ভাষা যেন কত জন্ম-জন্মান্তরের জানা,—মর্মের গভীরে যে অজ্ঞাত ভাষার রহস্য সঞ্চারিত হতে আরম্ভ করেছে চেনা-অচেনা ধ্বনির ব্যঞ্জনায়।

তবু 'সোনারতরী'র প্রায় সব কবিতাই প্রচ্ছন্ন বেদনার সুরে করুণ। কারণ, বিশ্বের বিস্তার ও বৈচিত্র্যের অনন্তলোকে কবি-আত্মার আহ্বান এসে পৌঁচেছে; এ-কথা কবি নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করেছেন, সর্বপ্রথম সোনার তরী কবিতাতেই। অথচ সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে, মুক্ত পৃথিবীর তলায় বেরিয়ে আসবার সাধ্য ছিল না তখনো তাঁর। ঠাকুরবাড়ির মুখচোরা, আত্ম-কেন্দ্রিক শিশুটি,—এই মুক্ত-যোবনেও নিজের মনের কল্পলোকের খাঁচায় বাঁধা পাখিটি যেন,—তার আক্ষেপ :—"হায়, মোর শকতি নাহি উড়িবার।" আসলে তখনো চলেছে হৃদয়-অরণ্যে বাস।

সোনারতরীতে অপূর্ণতার কারুণ্য

তার থেকে পূর্ণ মুক্তি প্রথম ঘটলো 'চিত্রা' কাব্যে (১৩০২)। এর আগে, একই বছরে গ্রন্থিত হয়েছিল 'নদী' কাব্য। এটি শিশু-কবিতা,—এখন 'শিশু' কাব্য গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তিনটি কবিতা ছাড়া আগাগোড়া কাব্যটি যুক্তাক্ষর হীন, কাব্যের ছন্দেও শিশু-হৃদয়ের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। একই সময়ে রবীন্দ্রনাথের নদী-বাসের অনুভব অক্ষয় রসরূপ পেয়েছে এই কাব্যে।

নদী

'চিত্রা' কাব্যের পরিচয় 'চিত্রা' নামক মুখবন্ধ-কবিতাতেই স্পষ্ট হয়ে আছে। জীবনের অনামিকা প্রেরণাময়ীকে ডেকে কবি বলেছেন,—

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্র রূপিণী।"

আবার দ্বিতীয় স্তবকে তাঁকেই বলেছেন,—

"অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তর বাসিনী।"

'চিত্রা'

এই অনুভবের তাৎপর্য স্বয়ং কবি-ই ব্যাখ্যা করেছেন;—"বাইরে যার প্রকাশ বাস্তবে সে বহু, অন্তরে যার প্রকাশ সে একা। এই দুই ধারার প্রবাহেই কাব্য সম্পূর্ণ হয়। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কর্ম-জীবনের সেই বিচিত্রের ডাক পড়েছে। 'আবেদন' কবিতায় ঠিক তার উল্টো কথা। কবি বলেছে, 'কর্মক্ষেত্রে যেখানে কার্যক্ষেত্রের জড়তায় কর্মীরা কর্ম করছে, সেখানে আমার স্থান নয়। আমার স্থান সৌন্দর্যের সাধকরূপে একা তোমার কাছে।' জীবনের ভিন্ন মহলে কবির এই ভিন্ন ভিন্ন কথা। জগতে বিচিত্ররূপিণী আর অন্তরে একাকিনী, কবির কাছে এই দুই-ই সত্য, আকাশ এবং ভূতলকে নিয়ে ধরণী যেমন সত্য।"

অর্থাৎ, বাইরের রূপ-রস-গন্ধাদির মধ্যে সৌন্দর্যের যে বর্ণালি স্বাদ আভাসিত হয়ে ওঠে চৈতন্যের বহিরঙ্গে, অন্তরে অন্তরে তার সব-কিছুর সৌরভময় নিরঙ্গ অনুভবকে অখণ্ড করে পাবার আকাঙ্ক্ষা হয় তীব্র। বাইরের বিরাট্ বিশ্বভূমিকে অন্তরে অন্তরে যখন বলতে পারি, "আমার,—একান্ত আমার"—তখনই কবি-চৈতন্য সফল সম্পূর্ণ, সার্থক। 'চিত্রা' কাব্যে এই দ্বিমুখী প্রাপ্তির পূর্ণতা ঘটেছে। তাই, এর একদিকে রয়েছে উর্বশী, প্রেমের অভিষেক, প্রভৃতি কবিতায় নিরঙ্গ সৌন্দর্য-রস-সম্ভোগের আন্তর তৃপ্তি। আর একদিকে সুখ, পূর্ণিমা ইত্যাদি কবিতায় বহিঃসৌন্দর্যকে আকণ্ঠ পান করতে পারার চরিতার্থতা হয়েছে নির্বাধ,—সংযত-মুক্ত।

'চিত্রা' কাব্যানুভবের আর একটা বিশেষত্ব "জীবনদেবতা"-কল্পনার উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা। অন্তর্যামী, জীবনদেবতা, চিত্রা প্রভৃতি কবিতায় কবি তাঁর অন্তর-চেতনার লালন-রতা এক সর্বময়ী অধীশ্বরীকে উদ্বোধিত করতে চেয়েছেন একসঙ্গে মনের গহনে এবং বাইরের অনুভবে। 'জীবনদেবতা' কবিতায় এই অনামিকা শক্তির নামকরণ হল। তখন থেকেই, এঁর দার্শনিক স্বরূপ ব্যাখ্যা নিয়ে নানা বিতর্কের উদ্ভব হয়ে চলেছে। বিভিন্ন মতের তালিকায় কবি তাঁর নিজের মতটুকুকেও লিপিবদ্ধ করে গেছেন :—"যিনি 'আমি' নামক এই ক্ষুদ্র নৌকাটিকে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র হইতে লোক-লোকান্তর যুগ-যুগান্তর হইতে একাকী কালস্রোতে বাহিয়া লইয়া আসিতেছেন, যিনি অনাদি-কালের ঘাটের দিকে কী মনে করিয়া চলিয়াছেন আমি জানি না, সমস্ত ভালোবাসা সমস্ত সৌন্দর্যে আমি যাঁহাকে খণ্ড খণ্ড

স্পর্শ করিতেছি, যিনি বাহিরে নানা এবং অন্তরে এক, যিনি ব্যাপ্ত ভাবে সুখ-দুঃখ অশ্রু হাসি এবং গভীরভাবে আনন্দ, চিত্রা গ্রন্থে আমি তাঁহাকেই বিচিত্রভাবে বন্দনা ও বর্ণনা করিয়াছি। ধর্মশাস্ত্রে যাঁহাকে ঈশ্বর বলে তিনি বিশ্বলোকের, আমি তাঁহার কথা বলি নাই, যিনি বিশেষরূপে আমার, অনাদি অনন্ত কাল একমাত্র আমার, আমার সমস্ত জগৎ সংসার সম্পূর্ণরূপে যাঁহার দ্বারা আচ্ছন্ন······চিত্রা কাব্যে তাঁহারই কথা আছে।"

অর্থাৎ, সোনারতরী-চিত্রার পর্যায়ে কবি আপন চেতনার অন্তহীনতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়েছিলেন,—মনে মনে বুঝেছিলেন,—জন্মে জন্মান্তরে, দেশে দেশান্তরে বিচিত্ররূপে তাঁর নিজেরই চেতনার নিরন্তর লীলা চলেছে। তাদের সকল কিছুর খবর কবির নিজের জানা নেই। তবু, এ-বিশ্বাস তাঁর সুদৃঢ় যে,—বহু জীবনের খেয়াতরী বেয়ে আজকের বেলাভূমিতে পৌঁচেছেন তিনি,—আবার এই জীবনের নৌকা বেয়ে পাড়ি দিতে হবে অনাগত অনন্ত জীবনের ঘাটে ঘাটে। অথচ, যেমন অতীতে, তেমনি অনাগতে ঐ সব জীবন-লীলায় কবির নিজের কোনো অধিকার ছিল না, থাকৃবেও না।

জীবনদেবতা ও কবির আত্মমুক্তি

এমন কি এই চলমান জীবনের প্রত্যক্ষ সৃজন-ভূমিতেও নিজের পূর্ণ অধিকারের প্রতিষ্ঠা অনুভব করতে পারছেন না কবি। তাঁর নিজের কথা যখন কবিতায় রূপ পাচ্ছে, তখন সে-যেন আর কারো কথা, আর কারো ভাবনায় অপরূপ হয়ে উঠ্‌ছে। ভেতরকার সেই রহস্যময়ী শক্তি-রূপাকে ডেকে তাই কবি বলেন :—

"একি কৌতুক নিত্য নূতন,
ওগো কৌতুকময়ী!
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।
অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ,
মিশায়ে আপন সুরে।"

ইনিই কবির জীবন-দেবতা;—তাঁর 'অন্তর্যামী'। তাহলেও যুগে যুগান্তরে,—জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে কবির এই যে ক্রম-বিকাশ, তা তো

বিশ্ব-বিহীন নয়! বিশ্বের একজন হয়ে বিশ্বের সঙ্গেই কবি পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হয়ে উঠ্‌ছেন দিনে দিনে। কিন্তু, আত্ম-চেতনা-দীপ্ত একান্তবদ্ধ আত্ম-প্রীতির ফলে, বিশ্বের সঙ্গে নিজের প্রাণের যোগ-সূত্র খুঁজে পাচ্ছেন না কবি। তা পেয়েছিলেন পরবর্তী পর্যায়ে,—বল্‌তে পেরেছিলেন :—

"বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো।
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো॥"

সেদিন জীবন-দেবতা ও বিশ্ব-দেবতার বিভেদ গণ্ডী লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল কবির মনে প্রাণে। কিন্তু, চিত্রা কাব্যে কবি-চৈতন্য 'আমি'-রসময়। বিশ্ব থেকে নির্বাসিত হয়ে, বিশ্বকে নির্বাসিত করে নিজের একক-সুন্দর বিকাশের রূপলোকে ডুব দিতেই তাঁর আকাঙ্ক্ষা। চিত্রা কাব্যে যৌবন-সৌন্দর্যের আকৃতি নিয়ে কবি-আত্মার বিশ্বাভিসার শুরু হয়েছে। এখানেই "হৃদয়-অরণ্য" থেকে তাঁর মুক্তি।

'চিত্রা'র পরে গ্রন্থিত কাব্য 'চৈতালি' প্রথমে পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত হয় নি; ১২০৩ সালে কাব্য-গ্রন্থাবলীর অঙ্গ হিসেবে এর প্রথম প্রকাশ। ডঃ সুকুমার সেন 'চৈতালি' থেকে রবীন্দ্র-প্রতিভার "জীবনমুক্তির কাল" নির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ, এই সময় থেকে কবি 'আমি-ময়' জগতের সীমা-ভূমি পেরিয়ে বিশ্বের সহজ সৌন্দর্য-লোকে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। এখান থেকে রবীন্দ্র-কাব্যের ইতিহাসে নব-পর্যায়ের অঙ্কুর আভাসিত হতে আরম্ভ করেছে। সে আলোচনা চল্‌বে পরের অধ্যায়ে।

৩। উন্মেষ কালের নাট্য-সাহিত্য

আগে দেখেছি,—রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিচিত্র কর্ম-প্রবর্তনা, ও আজীবন সাধনার সকল ক্ষেত্রেই নিজের অন্তরের একটি মাত্র সত্তার পুনঃ পুনঃ প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন,—সে আর কেউ নয় "কবিমাত্র।" নাটকে, গল্পে, প্রবন্ধে,—রচনার অনন্ত ধারায় এই কবি-ভাবনাই নানামুখী প্রকাশ লাভ করেছে। একদিক্ থেকে রবীন্দ্র-নাট্যও রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহেরই অংশ। প্রত্যেকটি নাট্য-বিষয়ের অন্তরালে সমকালীন কবি-মনোভাবের আভাস কাব্য-ব্যঞ্জিত হয়ে আছে।

নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি

আগে বলেছি, 'বাল্মীকি-প্রতিভা' প্রথম রচিত হয়েছিল অপরিণতির কালে। তারপরে লেখা হয় 'কালমৃগয়া' (১২৮৯)। এই নাটকটি সন্ধ্যা-সংগীতের পরে লেখা হয়েছিল ;—দশরথের হাতে অন্ধমুনির পুত্রের মৃত্যু ছিল এর গল্পের ভিত্তি। রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া নাটক দুটিকে বলেছেন, "গানের সূত্রে নাট্যের মালা" ;—বলেছেন,—"একটা দস্তুরভাঙ্গা গীত-বিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই দুটি নাট্য লেখা।" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ মিলে তখন বাংলা গানে ইংরেজি সুর বসিয়ে নতুন সুর-বিপ্লব রচনার নেশায় মেতেছিলেন। নতুন ভাবের বিশেষিত দোলা লাগেনি তাতে। কাল-মৃগয়ার কয়েকটি গান বাল্মীকি-প্রতিভার দ্বিতীয়-সংস্করণে গৃহীত হয়েছিল। তাছাড়া এই নাটকটি আর প্রকাশিত হয় নি।

কাল মৃগয়া

পরের নাটক 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' লিখিত হয়েছিল কারোয়ার-এর সমুদ্র-বেলায়। কাব্যে তখন ছবি ও গানেব যুগ চলেছে,—প্রকৃতির সর্বব্যাপক পটভূমিতে কবি-চিত্তের চলেছে নিত্য-লীলা-সংগম। সেই অনুভব অনুপূরিত হয়েছে 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'। কবি নিজেই বলেছেন,—এটি 'নাট্যকাব্য।' "ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনই পাই, তখনই যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি, সীমার মধ্যেও সীমা নাই।"—প্রকৃতির প্রতিশোধ-এ কবিমনের এই অনুভবই কাব্য-স্বাদুতা পেয়েছে নাটকের রূপাধারে। গল্পের নায়ক এক সন্ন্যাসী,—বিশ্ব-সংসার ছেড়ে অনন্তকে লাভ করবাব সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন ; স্নেহ-মায়ার বন্ধনকে জয় করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। একটি বালিকা তাকে স্নেহ-পাশে বেঁধে ফিরিয়ে আনল সংসার-লোকে,—সন্ন্যাসী তখন অনন্তকে খুঁজে পেলেন ঐ ছোট্ট বালিকার প্রীতির গহনে,—অসীমকে খুঁজে পেলেন সীমার বন্ধনে। কারোয়ারের সমুদ্র-বেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কবি-কল্পনার এই বিশ্বাসকে সীমাহীন মুক্তি দিয়েছিল।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

'মায়ার খেলা' (১২৯৫) রচিত হয়েছিল কড়ি ও কোমল-এর পরে। মানসীর কবিতাবলী তখন রচিত হচ্ছিল। কড়ি ও কোমল-এর দেহ-বুভুক্ষু প্রণয়লিপ্সা ও মানসীর দ্বিতীয় পর্যায়ের সবেদন মুক্তি-কামনার মধ্যে কবি-

হৃদয় যে মানসিক দ্বন্দ্বে বিক্ষত হচ্ছিল, তারই দৃশ্য-রূপ আভাসিত হয়েছে মায়ার খেলার নাট্য দেহে। কবি নিজে একে "গীত নাট্য" বলেছেন,—বলেছেন, "এতে নাট্যরস মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য।…ঘটনাস্রোতের 'পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ।" এই হৃদয়াবেগের স্বরূপ নির্দেশ করেছেন জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—"কড়ি ও কোমলের যৌবন-সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ ও মানসীর মানস-সুন্দরীর জন্য অন্বেষণ জনিত দুঃখবাদ—এই দুই-এর মাঝে যখন কবির মন দোল খাইতেছে, তখনই মায়ার খেলা রচিত হয়। লিখিবার সময় সে যুগের মনের প্রধানতম সুরটি কবি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।"

মায়ার খেলা

মানসীর দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুভব অনুযায়ী এই নাটকে সুখ ও প্রেমকে কবি দুভাগে ভাগ করে দেখেছেন। মায়ার খেলার শেষ কথা :—

"এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না।
শুধু সুখ চলে যায়, এমনি মায়ার ছলনা।"

শান্তা অমরকে ভালবেসেছিল ;—তার প্রেমে আত্মসুখের উল্লাস ছিল না ; অনুচ্ছ্বসিত সে প্রেম ছিল শান্ত, মৌন, গোপনচারী। অমরকে সে প্রেম খুশি করতে পারে নি। দেশ-দেশান্তরে ঘুরে সে কাছে এল প্রমদার। প্রমদা প্রেমে বিশ্বাস করে না ; ভোগ-সুখ তার একমাত্র কাম্য। অবশেষে অমরের হৃদয়-স্পর্শে তার মধ্যে প্রেমের অনুভব জেগে উঠেছে যন্ত্রণার তপ্ততা নিয়ে। কিন্তু, ততদিনে অমরও নিজের সীমায়তি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। তার অতৃপ্ত অ-পূর্ণ জীবনের ম্লান মালিকাখানি যখন তুলে ধরেছে নিরুদ্দেশের পানে, তখন শান্তা স্বেচ্ছায় তাকে নিয়েছে বরণ করে :—

"যদি কেহ নাহি চায় আমি লইব।
তোমার সকল দুখ আমি সহিব।
আমার হৃদয় মন, সব দিব বিসর্জন
তোমার হৃদয় ভার আমি হরিব।"

এই তদাত্ম প্রেমে শান্তা অমরকে ভরে তুলেছে, কিন্তু প্রমদার হৃদয় হয়েছে চিরসুখহীন।

মায়ার খেলার পরে দুবছরে দুটি নাটক প্রকাশিত হয়েছিল পরপর,—

রাজা ও রানী (১২৯৬) এবং বিসর্জন (১২৯৭ সাল)। মানসীর কবি-মনোভাবের বিকাশ ও পরিণতি চলেছে তখনো ; এই নাটক দুটি সেই কাব্য-ভাবনারই অনুপূরক। এখানে স্বতঃই প্রশ্ন হবে,—কবির ভাবনা ও কল্পনা যেখানে নূতন পূর্ণতার মুখোমুখি হয়েছে,—সেখানে কবি-কথার অভিব্যক্তির জন্য নাট্য-রূপের কেন প্রয়োজন হয়। সন্দেহ নেই, প্রত্যেকটি রচনার পেছনেই বহিরঙ্গ প্রেরণার ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু, অন্তরের দিক্ থেকে সন্ধান করলে দেখ্‌ব,—কবির উপলব্ধির আনন্দ-আবেগ প্রথম উচ্ছ্বাসের প্লাবনে যখন মনের বাঁধ ভেঙেছে, তখন গীতি-কবিতার সংক্ষিপ্ত কোমল পরিসরে তাকে আর ধরে ওঠা যায় নি। উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ যেখানে কর্মের উত্তেজনায় অনূদিত হতে চেয়েছে, সেখানেই কবির অনুভব নাটকের আধারে খুঁজেছে আপন আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল নাটকেই তাঁর কবি-হৃদয়ানুভূতি কর্মসংঘাতময় রূপে অনূদিত হয়েছে ; তাঁব নাট্য-রচনা আসলে কাব্যপ্রবাহের রূপান্তর।

রবীন্দ্র-নাট্যপ্রবাহের মৌল স্বভাব

'রাজা ও রানী', আগে বলেছি, মানসীর তৃতীয় পর্যায়ের পরে এবং চতুর্থ পর্যায়ের আগে রচিত হয়েছিল। সীমা-সংকীর্ণ প্রেমের গণ্ডী পার হয়ে মুক্ত প্রেমের নভোলোকে আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হৃদয়াঘাতে কর্মানূদিত হয়েছে এই নাটকে। রাজা বিক্রম রানী সুমিত্রাকে ভালবাসেন সাবা দেহ-মনের শক্তি দিযে। কিন্তু, অন্ধ তার প্রেম,—রানীকে তার বৃহৎ ব্যাপক কর্মক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে,—একান্ত, একক ভাবে লাভ করতে চান নিজের জন্যে। কিন্তু, রানীর প্রেম সর্বব্যাপ্ত,—অসীম। তিনি চান বৃহৎ কর্তব্য সাধনার মধ্য দিয়ে তার পতিপ্রেম বিশ্বপ্রেমে হবে যুক্ত। এখানেই বাঁধল দুজনের বিরোধ, অবশেষে "সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হলো।"

রাজা ও রানী

সুমিত্রা ও বিক্রমের এই ভাব-দ্বন্দ্ব সমুচিত ঘটনা-সংঘাতের মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ নাট্যরূপ ধারণ করেছে। এই কারণেই, অনেকে মনে করেন, রাজা

ও রানীই রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক। কিন্তু, কবি নিজে বলেছেন, এর পরিণতিতে দুর্বলতা দেখা দিয়েছে; "কুমার ও ইলার বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে।" কুমারসেন সুমিত্রার ভাই, এবং ইলা তার প্রণয়িনী, বাগ্‌দত্তা। এদের মধ্যে মুক্ত প্রেমেব পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। সম্ভাবিত বিবাহের মুখ থেকে, তাই, কুমার অনায়াসে ছুটে আস্‌তে পেরেছে মৃত্যু বরণ করবাব দীপ্ত উৎসাহে। কিন্তু, সফল-প্রেমেব এই ত্যাগ-মহিমার চিত্রণে মানসীর কবি-হৃদয়ের লিরিক্ উৎসাহ অতি-উচ্ছ্বাসে স্ফীত হয়েছে। ফলে, বিক্রমদেব ও সুমিত্রার মূল ভাব ও কর্ম-সংঘাতকে ছাপিয়ে কুমারসেনের রোমান্‌টিক্ মৃত্যুর পরিণামী মূল্যই প্রধান হয়ে উঠেছে নাট্যশেষে। তাতে, নাট্যগুণ কাব্য-কল্পনার অন্তরালে আত্মগোপন করে ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে গেছে।

বিসর্জন

'বিসর্জন' রচিত হয়েছিল মানসীর চতুর্থ পর্যায়েব পরে। তখন 'অনন্ত-প্রেম'-এর অনুভব কবি-চিত্তকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে আ-মূল। আর তাই নাট্যরূপ পেয়েছে 'বিসর্জন'-এ। চিরাগত প্রথায় রচিত রবীন্দ্র-নাটকের মধ্যে এটিই সর্বাপেক্ষা সুগঠিত। নাট্য-বিষয়ের পরিচয় দিয়ে কবি লিখেছিলেন,—"এই নাটকে বরাবর এই দুটি ভাবের মধ্যে বিরোধ বেঁধেছে,—প্রেম আর প্রতাপ। রঘুপতির প্রভুত্বের ইচ্ছার সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের প্রেমের শক্তির দ্বন্দ্ব বেঁধেছিল। রাজা প্রেমকে জয়ী করতে চান, রাজপুরোহিত নিজের প্রভুত্বকে। নাটকের শেষে রঘুপতিকে হার মানতে হয়েছিল। তাব চৈতন্য হল, বোঝবার বাধা দূর হল, প্রেম হল জয়যুক্ত।"

বিসর্জন নাটকে প্রেমের এই শক্তি প্রথম গতি পেয়েছে দেবী-মন্দিরে বলি-প্রথার বিরোধিতায়। অপর্ণা ভিখারিণী মেয়ে, তার পালিত ছাগশিশুকে ধরে এনে দেবীর মন্দিরে বলি দেওয়া হয়েছে। রাজা গোবিন্দমাণিক্যের কাছে তাই নিয়ে সে নালিশ জানায়, দেবী-মন্দিরের চত্বরে রক্তচিহ্ন দেখে আর্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, জীব-জননীর তৃপ্তি কী হয় জীব-রক্তপাতে? তার আকুল কণ্ঠ রাজার প্রেমানুভবকে জাগরিত করে; ত্রিপুরা রাজ্যে বলি নিষেধ করে দেন তিনি। রঘুপতি দেবীর পুরোহিত; সংসার-ত্যাগী। মাতৃ-পিতৃহীন জয়সিংহ একাধারে তার পালিত পুত্র এবং

শিষ্য। দুইজনে মিলে সংস্কার-নিয়মিত পূজা-আরাধনা করে তাদের দিন কাটে। তাই, বলি-নিরোধের প্রস্তাবে রঘুপতি দীপ্ত হয়ে উঠেন, নিজের স্বার্থের জন্যে নয়—ব্রাহ্মণ্য আদর্শের বিলুপ্তি, তথা দেবীর রোষের ভয়ে! তাই, তিনি বলেন,—সমস্ত রাজশক্তির বিরুদ্ধেও "আমি আছি মায়ের সেবক।" সংস্কারান্ধ রঘুপতি নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে যে-কোনো উপায় গ্রহণ করতে প্রস্তুত। রানী গুণবতীর অন্ধ সংস্কারকে জাগিয়ে তুলে পত্নীকে তিনি পতির বিরোধী করে তোলেন। রাজার পুত্রতুল্য অনুজ নক্ষত্ররায়কে তপ্ত করে তোলেন বিদ্রোহ ও নর-হত্যার পথে। প্রজাদের মধ্যে রচনা করতে চান অন্ধ বিপ্লব।

নাট্য-রূপের সফলতা

রাজা গোবিন্দমাণিক্য আঘাত পান স্ত্রীর কাছে, ভাইয়ের কাছে, বাইরে পরিজনদের কাছে। তবু, তিনি নিঃসংশয়। কেবল দ্বিধা-সংশয়ের যন্ত্রণায় মর্মে মর্মে অধীর হয়ে ফেরে জয়সিংহ। একদিকে তার আজন্মের সংস্কার আর গুরুভক্তি তাকে টানে হিংসার পথে;—আর একদিকে ক্ষণে ক্ষণে প্রেমময়ী অপর্ণা এসে মনকে দোলা দিয়ে ডাক দেয়—"জয়সিংহ,—চলে এস এ মন্দির ছেড়ে।"—সংস্কার ও শক্তির অন্ধতা বিদীর্ণ করে প্রেমের মুক্ত ভূমিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে নেবার এই আহ্বান। কিন্তু, জয়সিংহ আজন্ম দুর্বল। নিজের শক্তিতে ভর করে দাঁড়াবার সাধ্য তার নেই; তাই ভেতরে-বাইরে সংশয়ের দ্বন্দ্বে সে ক্ষত-বিক্ষত। অবশেষে সকল জ্বালার অবসান হয় দেবীমন্দিরে তার আত্মহত্যায়;—জয়সিংহ নিজের বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করে প্রার্থনা করে:—"এই যেন শেষ রক্ত হয়, মাতা!"

জয়সিংহের মৃত্যুতে রঘুপতির আযৌবন স্নেহাতুর পিতৃ-চেতনা চরম আঘাতে বিদীর্ণ হয়ে প্রেমের সত্যকে প্রথম সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ করে। পাষাণী মূর্তিকে নদীজলে 'বিসর্জন' দিয়ে, অপর্ণার হাত ধরে তিনি বেরিয়ে আসেন মুক্ত পথে। জয়সিংহের আত্ম-'বিসর্জনের' মধ্য দিয়ে রানী গুণবতীরও সংস্কার মুক্তি ঘটে,—মুক্ত-প্রেমের পূর্ণ রূপ আচেতনায় অনুভব করে রাজার কাছে আত্ম-সমর্পণ করেন তিনি। উভয়ে উভয়ের মধ্যে প্রেমের শাশ্বত শুদ্ধ রূপকে নূতন করে আবিষ্কার করেন। 'মানসীর' 'অনন্ত-প্রেম'-চেতনার নাটকীয় সম্পূর্ণতা এখানেই।

বিসর্জনের মূলগত ভাব-কল্পনা ব্যাখ্যা করে কবি বলেছেন,—"যে শক্তি এই নাটকে জয়ী হয়েছে অর্পণা তাকেই প্রকাশ করছে।...ক্ষুদ্র বালিকার বেশে সত্য প্রেমের দ্বার দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করে বিশ্বমাতার মূর্তিটিকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেল। প্রেমের সৈন্য-সামন্ত, অর্থ প্রতিপত্তি কিছুই নেই, কিন্তু হৃদয়ের গোপন দুর্গে তার শক্তি সঞ্চিত হতে থাকে।" অর্পণা ও গোবিন্দমাণিক্যের অবিচল দৃঢ়তা এবং জয়সিংহের ব্যাকুল অন্তঃসংঘাত এই কবি-ভাবনাকে দ্ব্যর্থহীন ব্যঞ্জনা দিয়েছে আগাগোড়া নাটকে। অপর পক্ষে পশুবলির প্রসঙ্গে রাজা ও রঘুপতির বিরোধে নাটকের বহিঃ-সংঘাতও হয়েছে ঘন-নিবদ্ধ। বাইরের ঘটনা ও হৃদয়ের অনুভব সমসূত্রে কেন্দ্রিত হয়ে অখণ্ড রস-ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে।

বিসর্জনের পরের নাটক চিত্রাঙ্গদা,—এটি গীতি-নাট্য। প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১২৯৯ সালে,—যদিও রচনা শেষ হয়ে গিয়েছিল এক বছর আগে। কবি-মনে মানসীর 'ঋতু' তখন অবসিত হয়েছে;—মানসীর প্রকাশও ঘটে গেছে তার আগে। মনের অবচেতনায় গোপনে এগিয়ে আসছিল সোনার তরীর 'ঋতু'। তাই, বি-দেহ প্রেমের উৎকণ্ঠা আজ দ্বিধাহীন। দেহী প্রেমের সীমায়তি আর যন্ত্রণা সম্বন্ধে কবি যেমন নিঃসংশয়, তেমনি দেহহীন প্রেমের সম্পূর্ণতায় সুস্থির-বিশ্বাসী। সেই অসংশয়িত বিশ্বাস অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার মহাভারতীয় গল্পকে আশ্রয় করে সার্থক কাব্য-রূপ পেয়েছে। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, চিত্রাঙ্গদা নাট্য নয়, পূর্ণাঙ্গ গীতিকাব্য।

চিত্রাঙ্গদা

আজীবন পৌরুষ-ব্রত-চারিণী চিত্রাঙ্গদার সুপ্ত নারীত্ব জেগে ওঠে অর্জুনের বিশ্বজয়ী শূরত্বের স্পর্শে। কিন্তু, নারীর কোমল যে দেহ-বল্লরী পুরুষের লালসার ধন,—তাকে কখনো তো সাজিয়ে তোলে নি বীরাঙ্গনা চিত্রাঙ্গদা! তাই পরুষ-কঠিন দেহের আপাদ-মস্তকে প্রত্যাখ্যানের গ্লানি বহন করে ফিরতে হল তাকে অর্জুনের কাছ থেকে। এবারে মদন ও মদন-সখা বসন্তের শরণ ভিক্ষা করলেন চিত্রাঙ্গদা। মদন-বসন্তের যুগ্ম চেষ্টায় বল্লরিত চিত্রাঙ্গদার অপরূপ দেহ-সৌরভ এবার অর্জুনের পৌরুষকে উন্মত্ত-বুভুক্ষু করে তোলে। দিনের পর দিন যায় তাদের আত্ম-বিস্মৃত দেহ-সম্ভোগে। তারপর একদিন যথারীতি অতৃপ্তি দেখা দিল অর্জুনের

অবসন্ন দেহে-মনে। এবার তিনি মুক্তি কামনায় অস্থির। সেই চরম মুহূর্তে বৎসরান্তে ঝরে পড়ল চিত্রাঙ্গদার ধার-করা রূপ-সম্ভার। চিত্রাঙ্গদাকে তার যথাযথ রূপে আবিষ্কার করে অর্জুনের মুমুক্ষু প্রেম হল ধন্য, পূণ্য—সম্পূর্ণ।

পরিবেশ-কল্পনা ও সংলাপের ব্যঞ্জনাময় সমগ্র রচনার মধ্যে একটি অখণ্ড গীতি-সুরই ঝঙ্কৃত হয়েছে; গীতিকবির স্পর্শকাতর সূক্ষ্ম অনুভব নাটকের আধারে কবিতার সৌরভে হয়েছে বিভান্বিত।

'গোড়ায় গলদ' (১২৯৯ সাল) রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম গদ্য নাটক। কেবল গভীর ভাবের নাটক রচনাতেই নয়, সরস নাট্য-সৃষ্টিতেও কবি-প্রতিভার দক্ষতা ছিল অতুল্য। 'গোড়ায় গলদ' একটি সরস কমেডি। ভ্রান্তি-বিলাসই এর মূল।

৪। উন্মেষ যুগের গল্প-উপন্যাস

রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'করুণা' পূর্বে কখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি; ভারতী পত্রিকার (১২৮৪-৮৫ সাল) পাতাতেই আবদ্ধ হয়ে ছিল। অধুনা গল্পগুচ্ছ চতুর্থখণ্ডে ভারতীর পৃষ্ঠা থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। কবি যে তাঁর এই কৈশোর রচনাকে পরে আর প্রকাশিত হতে দেন নি, এর থেকেই 'করুণার' অপূর্ণ-গঠনের প্রমাণ স্পষ্ট হয়ে আছে। বস্তুতঃ, এই পর্যায়ের অপরাপর উপন্যাসেও কবি-স্বভাবের সহজ প্রকাশ সম্ভব হয় নি;—সব ক'টিতেই বঙ্কিম-রচনার অনুকরণের ছাপ স্পষ্ট।

প্রথম উপন্যাস 'করুণা'

প্রথম গ্রন্থিত উপন্যাস বৌ-ঠাকুরাণীর হাট (১২৮৯) প্রকাশিত হয় সন্ধ্যাসংগীতের পরে। কবিতার জগতে কবি-স্বভাবের স্বাতন্ত্র্য তখন সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু, গদ্যে,—বিশেষতঃ গদ্য উপন্যাসে স্বকীয়তার সুর জাগে নি তখনো। তার একটি কারণ আগেই বলেছি,—রবীন্দ্রনাথের শিল্প-চেতনা মূলতঃ ছিল কবি-স্বভাবান্বিত। গদ্যের ভূমিতে কবির অধিকার বিস্তার করতে সময় লেগেছিল। তাছাড়া, অব্যবহিত পূর্ব যুগে, কবির চোখের ওপরে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অ-তুল্য সিদ্ধিময় গদ্য-শিল্প রচনা করে গেছেন, দিনের পর দিন। এমন অবস্থায়, পূর্ব-সূরীর প্রখর-দীপ্ত প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া সহজসাধ্য ছিল না। 'বৌ-

বৌঠাকুরাণীর হাট

ঠাকুরাণীর হাট' বঙ্কিমের ঐতিহাসিক রোমান্স-এর আদর্শে লেখা। অথচ, রবীন্দ্রনাথের কবি-মানস ইতিহাসাশ্রিত শিল্প-রচনার অনুকূল ছিল না। তাই, অপরিণত অনুকরণের পর্যায় অতিক্রম করতে পারে নি এ উপন্যাস।

তবে, গল্পের ভাব-বিষয়ে কবি-মনের মৌলিকতা প্রস্ফুট হয়েছে। প্রতাপাদিত্যের কাহিনী নিয়ে লেখা হয়েছিল বৌ-ঠাকুরাণীর হাট। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্য বাংলার জাতীয় বীর রূপে বন্দিত হয়ে আসছিলেন; মোগল বাদশাহীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীন হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু, এই উপলক্ষ্যে নিজের পিতৃ-প্রতিম স্নেহাতুর খুল্লতাতকে হত্যা করেছিলেন, মতভেদের জন্যে। রবীন্দ্রনাথের শিল্পিপ্রাণে স্বাধীনতার চেয়ে মানবিকতার দাম ছিল তুলনারহিত। তাই, প্রতাপাদিত্যকে তিনি বীর বলে শ্রদ্ধা করেন নি,—হৃদয়হীন বলে তিরস্কার করেছেন। মূল গল্পাংশের কাঠামো প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়' থেকে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু, ইতিহাসের দ্বন্দ্বভূমি পরিত্যাগ করে কবি পারিবারিক জীবনের প্রেম-ঘন পটভূমিতে গল্পের ভিত্তি রচনা করেছেন। প্রতাপাদিত্য ক্ষমতান্ধ—ক্ষমতার লোভে পিতৃব্য বসন্ত রায়কে হত্যা করেছিলেন; পুত্র উদয়াদিত্যকে প্রথমে কারারুদ্ধ এবং পরে নির্বাসিত করেছিলেন। একমাত্র জামাতা রামচন্দ্রকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন; পালিয়ে গিয়ে সে আত্মরক্ষা করে। পিতৃরাজ্য ছেড়ে যাবার সময় ছোট বোন বিভাকে সঙ্গে নিয়েছিল উদয়াদিত্য,—স্বামীর কাছে পৌঁছে দেবে বলে। কিন্তু ক্ষিপ্ত রামচন্দ্র ততদিনে অন্য বিবাহ করেছে,—বিভা প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এল উদয়াদিত্যের কাছে; ভাইবোনে যাত্রা করল কাশীতে। রামচন্দ্রের রাজ্যখণ্ডে যে ঘাটে বিভার নৌকা এসে লেগেছিল, অনুরক্ত প্রজাদের মুখে মুখে তার নতুন নামকরণ হল 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট'।

গল্পে কবি-ধর্মের পরিচয়

এর পরের উপন্যাস রাজর্ষি (১২৯৩ সাল) প্রকাশিত হয় কড়ি ও কোমলের পরে। কিন্তু, প্রকৃত গ্রন্থ রচনার সময়ে কড়ি ও কোমলের সুরই চলেছিল মনে মনে। ত্রিপুরার রাজবংশের ইতি-কাহিনীর টুকরো নিয়ে মূল গল্পাংশ গড়ে উঠেছে। কিন্তু, কড়ি ও কোমল যুগের অনুমত রোমান্স-ঘন ভাবনাই আসলে প্রকাশ পেয়েছে এই ঐতিহাসিক কাহিনীর কাঠামোয়।

'জীবনীকার' প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনুমান করেছেন,—'স্বাধীন ত্রিপুরার ইতিহাস রাজমালা'-র সম্পাদক কৈলাসচন্দ্র সিংহের কাছে হয়ত কবি এই গল্পের চুম্বকটুকু পেয়েছিলেন। কৈলাসচন্দ্র এই সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। যাই হোক,—রচনার মূল প্রেরণা যে স্বপ্ন-লব্ধ, সে কথা স্বয়ং কবিই জানিয়েছেন। রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে দেওঘর যাচ্ছিলেন, ট্রেনে ভীষণ ভীড়; রাত্রে তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় স্বপ্ন দেখ্লেন,—কোনো এক মন্দিরের সিঁড়িতে রয়েছে রক্ত চিহ্ন,—আর একটি ছোট্ট বালিকা তার বাবার হাত ধরে সকরুণ প্রশ্ন করছে,—"এ কি, এ যে রক্ত!"—এখানেই কবি-মনে উপন্যাসের প্রথম জন্ম; তারপরে ত্রিপুরেশ্বর গোবিন্দমাণিক্যের গল্প যোগ করে দিনে দিনে চলেছে তার রচনা।

রাজর্ষি

গোবিন্দমাণিক্য দেবীর মন্দিরে পশুবলি বন্ধ করে দিয়েছিলেন; তাতেই সর্বত্যাগী, অথচ সংস্কারান্ধ রঘুপতির সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধল। গোবিন্দ মাণিক্য জানেন, জীবজননী কখনো জীব-রক্তপাতে সন্তুষ্ট হতে পারেন না। রঘুপতির অন্ধ-বিশ্বাস, বলি বন্ধ হলে দেবীর রোষ হবে দুর্নিরোধ্য। অতএব, পশু-হত্যার বদলে নরহত্যা ঘটাতেও তার বাধা নেই। কারণ, রঘুপতি বিশ্বাস করেন, পশুবলির অভাবে জাগ্রত দেবী-রোষ নরবলিতে শান্ত হবে। রাজভ্রাতা,—নিঃসন্তান রাজার একমাত্র স্নেহের আশ্রয় দুর্বল-চেতা নক্ষত্ররায়কে নিয়ে তিনি ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাতলেন। অবশেষে সমস্ত রাজ্যকে বিদেশীর আঘাতে জর্জরিত করতে না চেয়ে গোবিন্দমাণিক্য বেছে নিলেন স্বেচ্ছাকৃত নির্বাসন। এই গল্পকেই আশ্রয় করে পরবর্তী কালে বিসর্জন নাটক রচিত হয়েছিল। কিন্তু, উপন্যাস ও নাটকে তফাৎ প্রায় আমূল। রাজর্ষির যুগে প্রেমাতুর কবি-চিত্তের প্রচ্ছন্ন অতৃপ্তি আর অভিমান রূপ পেয়েছে গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রে,—বিশেষ করে উপন্যাসের সমাপ্তি মুহূর্তে। কিন্তু, কাহিনীর ঐতিহাসিক অংশ এবং কল্পনাশ্রিত অংশের মধ্যে সুষমতা বিহিত হতে পারে নি। শুধু তাই নয়, গল্পের অতি-বিস্তার এবং শিথিলতাও মূল আবেগকে জমাট বাঁধতে দেয় নি। ফল-কথা, সফল উপন্যাসের প্রেরণা জাগে নি তখনো কবির মনে।

রাজর্ষির শিল্পরূপ

(খ) ছোটগল্প

অথচ, সার্থক ছোটগল্পের জন্ম হয়েছে আবার এই যুগেই। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা উপন্যাসের জন্ম ও বিকাশ, রবীন্দ্রনাথের হাতে তেমনি ছোটগল্পের জন্ম, বিকাশ এবং পরিণতি-ও। ১২৮৪ সালে ভারতী পত্রিকায় কিশোর কবি প্রথম গল্প লিখেছিলেন,—ভিখারিণী। এটি ছোট গল্প নয় ঠিক,—দীর্ঘ চারখণ্ডে বিভক্ত 'বড় গল্প'। কিন্তু, বাস্তব জীবন-প্রেক্ষণার পরিচয় নেই গল্পের প্লট্-এ; কিশোর মনের অকারণ ভাবোচ্ছ্বাস ও বিষাদঘনতাই প্রকাশিত হয়েছে গল্পের ক্ষীণ সূত্রকে উপলক্ষ্য মাত্র করে।

প্রথম গল্প ভিখারিণী

এর পরে ঘাটের কথা ও রাজপথের কথা নামে দুটি গল্প প্রকাশিত হয় ১২৯১ সালে,—যথাক্রমে ভারতী ও নবজীবন পত্রিকায়। এ-গুলোকেও যথার্থ ছোটগল্প বলা চলে না; ডঃ সুকুমার সেন এদের যথার্থ নামকরণ করেছেন—'গল্প-চিত্র'। 'মুকুট' প্রথমে গল্পরূপে আবির্ভূত হলেও পরে নাট্যরূপে স্থায়িত্ব পেয়েছে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রথম ছোটগল্পের মরসুম দেখা দেয় উত্তরবঙ্গে—পদ্মা-পারের জীবনভূমিতে। বাইরের প্রকৃতি, আর অন্তরের মনোলোকে এই সৃজন-লীলার পরিপ্রেক্ষিতকে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন স্বয়ং কবি। "শিলাইদহে পদ্মার বোটে ছিলাম আমি একলা; নির্জনে নদীর বুকে দিন বয়ে যেত নদীর ধারারই মত সহজে। বোট বাঁধা থাকৃত পদ্মার চরে। সেদিকে ধু-ধু করত দিগন্ত পর্যন্ত পাণ্ডুবর্ণ বালুরাশি, জনহীন, তৃণশস্যহীন। মাঝে মাঝে জল বেঁধে আছে। সেখানে শীত ঋতুর আমন্ত্রিত জলচর পাখির দল। নদীর ওপারে গাছপালার ঘনছায়ায় গ্রামের জীবনযাত্রা। মেয়েরা জল নিয়ে যায়, ছেলেরা জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটে, চাষীরা গোরু মোষ নিয়ে পার হয়ে চলে অন্য তীরের চাষের ক্ষেতে, মহাজনী নৌকা গুণের টানে মন্থর গতিতে চলতে থাকে, ডিঙি নৌকা পাট্কিলে রঙের পাল উড়িয়ে হু-হু করে জল চিরে যায়, জেলে নৌকা জাল বাচ করতে থাকে, যেন সে কাজ নয়, যেন সে খেলা, এর মধ্যে প্রজাদের প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ আমার গোচরে এসে পড়ত তাদের নানা প্রকার নালিশ নিয়ে, আলোচনা নিয়ে।...বোট্ ভাসিয়ে

ছোটগল্প ও উত্তর বঙ্গের জীবনভূমি

চলে যেতুম পদ্মা থেকে পাবনার কোলের ইছামতীতে, ইছামতী থেকে বাড়লে, হুড়ো সাগরে, চলন বিলে, আত্রাইয়ে, নাগর নদীতে, যমুনা পেরিয়ে সাজাদপুরের খাল বেয়ে সাজাদপুরে।...আমার গল্পগুচ্ছের ফসল ফলেছে আমার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের পথে-ফেরা এই অভিজ্ঞতার ভূমিকায়।"

ছোটগল্প সেই শিল্পরূপ, যাতে 'বিন্দুর মধ্যে' জীবনের 'সিন্ধুরূপ'কে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। কল্লোল-মুখরিত জীবনের স্রোত নদীস্রোতের মত প্রবাহিত হয়ে চলে অনন্তের পানে। কত পর্বত, কত প্রান্তর. কত জনপদের সীমা পেরিয়ে,—তাদের কোল ঘেঁষে চলে কল্লোলিনী স্রোতস্বিনীর জলধারা। কেউ সে জলে স্নান করে,—তৃষ্ণার্ত হয়ে কেউ করে তা পান। আবার কেউ তা কলসী ভরে বয়ে নিয়ে যায় ঘরে। সেখানে সেই জলে স্নান-পানের প্রয়োজন নির্বাহিত হয়। ঘরে বয়ে নিয়ে যাওয়া সেই জলের স্বাদ-বর্ণ-গন্ধের কোনো পার্থক্য ঘটে না মূল নদীর জলের সঙ্গে। তাতে কেবল থাকে না স্রোতস্বিনীর নিরন্তর প্রবহমানতা। তেমনি জীবন-স্রোতও চলেছে ইতিহাসের ঘাটে ঘাটে বিভিন্ন যুগের কোল ঘেঁসে; নানা শিল্পীর ভাব-কল্পনাকে মুখরিত করে। কেউ বা সেই স্রোতস্বিনীর অতলে ডুব দেন,—তারই ধারায় ভাসতে ভাসতে স্নান-পানের প্রয়োজন সিদ্ধ করেন। তিনি আধুনিক মহাজীবনের মহাকাব্যকার;—ঔপন্যাসিক। কিন্তু ছোটগল্পের শিল্পী সেই জীবন-স্রোতের তীরে এসে নিজের কল্পনার কলসীটি ভরে নেন, এক মুহূর্তের অনুভবের অতলে ডুবিয়ে। তারপর নিজের ব্যক্তিমনের গভীরে বসে, নিজের শিল্প-ভাবনা দিয়ে রচনা করেন জীবনের এক একটি নিটোল মুক্তা-রূপ।

ছোটগল্প-শৈলী

এই বিশেষ ধরনের শিল্প-সাধনার পক্ষে নদী-মাতৃক উত্তরবঙ্গের জীবন-ভূমিতে কবির নিয়ত চলমানতা এক আশ্চর্য সার্থক পটভূমি রচনা করেছিল। নদীস্রোতের মাঝখান দিয়ে চলেছে কবির বোট্; দুপাশ বেয়ে ছুটে চলেছে প্রকৃতি ও মানব-জীবনের অপার বিস্তীর্ণ পাথার। চল্‌তে চল্‌তে, জীবনের এক একটি ক্ষণ-দৃষ্ট রূপের গভীরে ডুব দিয়েছেন কবি; তাকে আশ্রয় করে গড়ে তুলেছেন মুহূর্তের বিন্দুতে নিটোল মুক্তার মত সম্পূর্ণ এক একটি গল্প।

এক দিক্ থেকে এ-ছিল সমকালীন কবিতা-রচনারই আর এক রকমফের। কবি বলেছেন.—"একটি মেয়ে নৌকো করে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল,

তার বন্ধুরা ঘাটে নাইতে নাইতে বলাবলি করতে লাগল, আহা, পাগলাটে মেয়ে, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ও'র কী না দশা হবে। কিংবা ধর, একটা ক্ষ্যাপাটে ছেলে সারাগ্রাম দুষ্টুমির চোটে মাতিয়ে বেড়ায়, তাকে হঠাৎ একদিন চলে যেতে হল শহরে তার মামার কাছে। এইটুকু দেখেছি, বাকিটুকু নিয়েছি কল্পনা করে।"— ওপরের বর্ণনায় যথাক্রমে 'সমাপ্তি' ও 'ছুটি' গল্প দুটির অভিজ্ঞতার উৎস বিবৃত হয়েছে। কিন্তু, সেটুকু বড কথা নয়। লক্ষ্য করলে দেখি,—টুক্‌রো ছবির অসম্পূর্ণ দেখাকে কবি সম্পূর্ণ অখণ্ডতা দিয়েছেন তাঁর কবি-কল্পনার মাধুরী মিশিয়ে। এ-যেন জীবনের টুক্‌রো কথা নিয়ে কবিমনের গদ্যে কবিতা লেখা। রবীন্দ্রনাথের হাতে আলোচ্য যুগে বাংলা ছোটগল্প একেবারে জন্মলগ্নেই পূর্ণাঙ্গ দেহ পেয়েছে; এর পেছনে রয়েছে তাঁর কবি-দৃষ্টিরই অখণ্ডতা।—একথা যেন না ভুলি যে,—গল্পগুচ্ছের শিল্পীও আসলে কবি।

রবীন্দ্র-ছোটগল্পের স্বরূপ

গ্রন্থাকারে মুদ্রিত প্রথম গল্পগ্রন্থ ছোটগল্প ১৩০০ বাংলা সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এতে গল্পসংখ্যা ছিল সর্বমোট ষোলটি। অধিকাংশ গল্পই পরে গল্পগুচ্ছের প্রথম খণ্ডে গ্রন্থিত হয়। আলোচ্য সময়ের সীমায় প্রকাশিত আরো তিনটি গল্পগ্রন্থের মধ্যে আছে বিচিত্র গল্প (১৩০১), কথাচতুষ্টয় (১৩০১) ও গল্পদশক। এই গ্রন্থগুলির কোনোটিই পরে আর মুদ্রিত হয় নি; প্রায় সকল গল্পই স্থান পেয়েছে গল্পগুচ্ছের বিভিন্ন খণ্ডে। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে গ্রন্থ প্রকাশের সাল-তারিখই প্রধান বিবেচ্য নয়; সমসাময়িক কালে রচিত গল্পাবলীর মর্মগত ভাবসূত্রটিকেই সন্ধান করতে হয়। বাইরের বিচারে এ-সময়ে গল্প লেখার দাবি এসেছে সাময়িক পত্র-পত্রিকার পক্ষ থেকে। কবি জানিয়েছেন,—"সাধনা [পত্রিকা] বাহির হইবার পূর্বেই হিতবাদী পত্রিকার জন্ম হয়।...সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোটগল্প, সমালোচনা ও সাহিত্য-প্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোটগল্প লেখার সূত্রপাত ঐখানেই। ছয় সপ্তাহ লিখিয়াছিলাম।" হিতবাদীতে ছয়টি গল্প প্রকাশিত হবার পরে সাধনাপত্রে ছোটগল্পের প্লাবন এসেছিল। কিন্তু, এটুকু বাইরের কথা। ভাবের স্বরূপ সন্ধান করলে দেখি, পদ্মার ভূমিকা মনের কোণে বৃহৎ জীবন ও ব্যাপক প্রকৃতির অনুভব তিলে তিলে পুঞ্জিত করে তুলছিল। পরবর্তীকালে কবি বলেছেন,—"আমার

গল্প-গ্রন্থাবলী

সমগ্র কাব্য-সাধনার এই একটি মাত্র পালা আছে ; তাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার সঙ্গে অসীমের মিলন সাধনের পালা।" কাব্যের ইতিহাসে দেখেছি,—"অসীমের সীমা" রচনার প্রথম আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরিত হয়েছে 'মানসী'র পর্যায়েই। কিন্তু, সে আকাঙ্ক্ষার মুক্তি সোনারতরী-চিত্রায়। সেই ঋতুরই ফসল এই ছোটগল্পগুলিও।

হিতবাদীতে প্রকাশিত ছয়টি গল্প হচ্ছে,—দেনা-পাওনা, পোস্টমাস্টার, গিন্নি, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, ব্যবধান ও তারাপ্রসন্নের কীর্তি। সাধনায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির মধ্যে আছে, কঙ্কাল, একরাত্রি, জীবিত ও মৃত, কাবুলিওয়ালা, ছুটি ইত্যাদি। নিছক নাম করেও গল্পের সংখ্যা প্রায় অ-নিঃশেষ হবে। কিন্তু, গল্পগুচ্ছের পাঠক লক্ষ্য করবেন,—এই সময়কার অধিকাংশ গল্পেই বিশেষ জীবনের বিশেষ অনুভূতি সর্বজনীন অনুভবের নির্বিশেষ রসলোকে উন্নীত হয়েছে। পোস্টমাস্টার গল্পের জীবন-বেদনা যে কেবল দুর্ভাগিনী রতনের নয়, সর্বরিক্ত মানবতাব অনিবার্য ট্রাজেডি-ভারাতুর,—কবি নিজেই সে-কথা বলেছেন ;—পোস্টমাস্টার চিরদিনের জন্যে তাকে ছেড়ে গেলেও "রতনের মনে কোন তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোস্ট-আফিস গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে— সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না। হায় বুদ্ধিহীন মানব হৃদয়! ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহু বিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে ; প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের মধ্যে প্রাণ-পণে জড়াইয়া ধরা যায়। অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ি কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।"

উন্মেষ যুগের গল্প-স্বভাব

'কাবুলিওয়ালা' গল্পে ব্যক্তি-হৃদয়ের নিরঙ্গ অনুভব সর্বব্যাপ্ত বিশ্বজনীনতায় আরো অপরূপ হয়ে উঠেছে। কাবুলিওয়ালা গল্প হিসেবে পোস্টমাস্টারের চেয়ে উৎকৃষ্ট ; কারণ বাৎসল্যের যে সূত্র এক বাঙালি বাবু ও দূরদেশবাসী আর এক কাবুলিওয়ালার অন্তর-চেতনাকে মানবতার রাখিবন্ধনে একই

মিলনের ডোরে বেঁধে দিয়েছিল,—গল্পের সহজ প্রকাশ-ধারায় তা স্বতোভাস্বর হয়ে উঠেছে। এই সময়ে লিখিত গল্প-সংখ্যা প্রায় ৩৭টি,—সর্বত্রই বিশেষ মুহূর্তের অনুভব সর্বজনীন বিশ্বানুভবের সুরে অনুরণিত হয়ে উঠেছে। বিশেষ জীবনের বিশেষ ক্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে বিশ্বজীবনের ব্যঞ্জনা এসে পৌঁচেছে ;—এখানেই নিহিত আছে গল্পগুচ্ছের ছোটগল্পের শিল্প-প্রাণ।

৫। উন্মেষ যুগের গদ্য প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ বয়সে বলেছিলেন,—"আমি কখনো কখনো এমন সব লেখা লিখেছি যা পাঠকেরা সমালোচনা বলে গণ্য করে নিয়েছেন। কিন্তু তা বস্তুত শিল্পকর্ম—বিশ্লেষণের সামগ্রী নয়।" তাঁর সমালোচনা-জাতীয় রচনা সম্বন্ধেই কেবল একথা সত্য নয়,—সমান সত্য সকল রকমের গদ্য প্রবন্ধাবলী সম্বন্ধেই। তাই বলে, রবীন্দ্র-প্রবন্ধে চিন্তা ও মনীষার অভাব রয়েছে, বিন্দুমাত্রও একথা মনে করবার কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথ কবি-মনীষী। তাঁর পদ্য রচনাবলীর রসস্রোতেও মনীষার অতলতা অনুভবনীয়। কিন্তু, লোক-দুর্লভ চিন্তা ও মনীষাকে শিল্পীর সৌন্দর্য-কল্পনায় রাঙিয়ে বুদ্ধির দীপ্তিকে কাব্যের লাবণ্যে ভরে তুলেছেন কবি। তাঁর গদ্য রচনায় পাণ্ডিত্যের উজ্জ্বলতা আছে, প্রখরতা নেই। তাঁর চিন্তায় আছে গভীরতা-জনিত স্বচ্ছতা, কিন্তু জটিলতা নেই। সব কিছুই কবি-চেতনার ভাব-বিভায় সমুজ্জ্বল। একেবারে প্রথম যুগের গদ্য প্রবন্ধাবলীতেই এই রস-স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

উন্মেষ যুগের গদ্য-রচনা

এই সময়ে প্রকাশিত দুটি মাত্র গদ্য গ্রন্থের মধ্যে আছে সমালোচনা (১২৯৪) এবং য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি। দ্বিতীয় গ্রন্থটি প্রথমে দুভাগে প্রকাশিত হয়েছিল ; য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারির ভূমিকা (১২৯৮) ও য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি (১৩০০)। প্রথম গ্রন্থটির পরিচয় নামেতেই প্রকাশ ;—এটি সমালোচনা,—সাহিত্য-সমালোচনা মূলক প্রবন্ধের সংকলন। এই প্রাথমিক আলোচনাতেই তরুণ কবির সাহিত্য-বিচার-বোধ ও সত্য দৃষ্টির নিঃসংশয় পরিচয় স্বতঃ প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্য বা কাব্য মাত্রই যে জীবন-সম্ভব, গভীর জীবনানুভব ছাড়া সার্থক কাব্যের সৃষ্টি যে অসম্ভব, সে কথা নিঃসংশয় প্রাঞ্জলতার সঙ্গে তিনি প্রতিপন্ন

গদ্য গ্রন্থাবলী

করেছেন।—একাধিক প্রবন্ধে জীবন-বোধহীন কল্পনাকে বলেছেন উন্মাদের স্বভাব। আবার অনুভূতির সত্যতাই যে কাব্য-সৃষ্টির একমাত্র উপাদান নয়,—সুষ্ঠু প্রকাশও সফল কাব্যের অপরিহার্য গুণ, এ-কথাও বল্‌লেন নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি নামক প্রবন্ধে। বস্তুতঃ কাব্যতত্ত্বকে রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থেই প্রথম বৈজ্ঞানিক বিচার-ভিত্তিব ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দেখলেন।

যুরোপ যাত্রীর ডায়ারির সূচনা কবির দ্বিতীয়-বার বিলাত যাত্রার উপলক্ষ্যে। ১২৯৭ বাংলা সালে মাস দু-তিনের জন্যে কবি ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে। সেই সময়কার দিনলিপির মত করে লেখা এই গ্রন্থ। এতে ছোট-বড অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি-কবির প্রতিদিনকার অন্তরঙ্গ রূপটি যেমন ক্ষণে ক্ষণে আভাসিত হয়েছে, তেমনি, কবি-স্বভাবের কল্পনা-সৌন্দর্যও মাঝে মাঝে পেয়েছে অনবদ্য প্রকাশ।

রবীন্দ্র-যুগ ঃ বিকাশ কাল

১। বিকাশ কালের কাব্য-কবিতা

সোনারতরী-চিত্রার পরে রবীন্দ্রকাব্যে নূতন ঋতুর পুনঃ-প্রতিষ্ঠা হয় নৈবেদ্যের যুগে। কিন্তু, যেমন প্রকৃতির জগতে, তেমনি কবির মনোলোকেও, ঋতুর পরে ঋতুর আবির্ভাব হয় না একের পর এক করে। দুই ঋতুর মাঝখানে ঋতু-সন্ধির কালও রয়েছে। দোটানার যুগ সেটা। গ্রীষ্মের পরে আসে বর্ষা। মাঝখানের ঋতু-সন্ধির কালটাতে এক একদিন হঠাৎ-বর্ষার মাঝে নেমে আসে হিমের স্পর্শ। আবার দিনের পর দিন চলতে থাকে উগ্র গ্রীষ্মের তপ্ততা। একদিন যদি প্রকৃতি অনাগতের প্রতি উন্মুখ হয়ে ওঠে, তখনি আরো দুদিন ফিরে তাকায় পিছুর টানে। কবি-মনের অবস্থাও তেমনি। চিত্রার পরে নৈবেদ্যর পূর্ববর্তী কাব্য-প্রবাহে চলেছে কবি-প্রাণের ঋতু-সন্ধি ;—একবার ঝুঁকছে অনাগতের প্রতি, আর একবার,—বার বার ফিরে তাকাচ্ছে অতীত চিত্রা-ঋতুর দিকে।

রবীন্দ্রকাব্যে ঋতু-সন্ধি

এইভাবের প্রথম অভিব্যক্তি চৈতালিতে। চিত্রার ঠিক পরের কাব্য চৈতালি। চিত্রাতে দেখেছি, 'আমি-ময়' কবি-চেতনা বিশ্বাভিসারে বেরিয়েছিল। নিজের আমূল চৈতন্যের পূর্ণতার মধ্যে জগতের অনন্ত-বিচিত্র সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করে চরিতার্থ হয়েছিলেন কবি। সেই আনন্দিত চিত্তের অধীরতা নিয়ে ক্ষণে ক্ষণে আপন অন্তরবাসী একান্ত-গোপন অহং-কে উদ্বোধিত করতে চেয়েছেন কবি চৈতালিতেও : তারই অতলে দেখে নিতে চেয়েছেন জীবনের অপার বিস্তীর্ণ বিশ্বরূপ :—

"তুমি এসো নিকুঞ্জ নিবাসে,
এসো মোর সার্থক সাধন।
লুটে লও ভরিয়া অঞ্চল
জীবনের সকল সম্বল
নীরবে নিতান্ত অবনত
বসন্তের সর্ব সমর্পণ।

চৈতালিতে ঋতু-সন্ধি

হাসিমুখে নিয়ে যাও যত
বনের বেদন-নিবেদন।

আবার এই কাব্য-ঋতুতেই আর একদিন সেই "অন্তর-বাসিনী"-কে ডেকে কবি বলেছেন,—

"বৃথা চেষ্টা রাখি দাও। স্তব্ধনীরবতা
আপনি তুলিবে গড়ি আপনার কথা।
আজি সে রয়েছে ধ্যানে—এ হৃদয় মম
তপোভঙ্গ-ভয়ভীত তপোবন সম।
এমন সময়ে হেথা বৃথা তুমি প্রিয়া,
বসন্ত কুসুমমালা এসেছ পরিয়া;
এনেছ অঞ্চল ভরি যৌবনের স্মৃতি—
নিকুঞ্জে নিভৃতে আজি নাই কোনো গীতি।"

নতুন যে গীতি-ধারার ধ্যানে কবির হৃদয-তপোবন এখন স্তব্ধ হয়ে আছে, বারে বারে বলেছি,—তা নৈবেদ্যেব যুগ-চেতনার বাহক। আপন অনুভবের আবেগ-লোকে বিশ্ব-জীবনেব যে স্বাদ কবি একবাব পেয়েছিলেন, তাকেই ভারতের শাশ্বত আদর্শের আলোকে নবায়িত কবে দেখবার আকাঙ্ক্ষা সুদৃঢ় হয়েছে নৈবেদ্য কাব্যে। সাধাবণ ধারণা, ভারতের দৃষ্টি স্বভাবতঃ আধ্যাত্মিক; তাই কর্মমুখর জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে সে সহজে বিমুখ। এই ভাবনার মধ্যে ভারতের বিশ্বচেতনার সম্পূর্ণ সত্য-স্বভাব প্রকাশিত হয় না। কর্ম ও ধ্যান-যোগের সামঞ্জস্য বিধান; কর্মকে ধ্যানে, ধ্যানকে কর্মে পরিণত করার যৌথ প্রয়াসেই ভারতীয় সাধনার সম্পূর্ণ পরিচয়। নৈবেদ্যের যুগে সুনিশ্চিত প্রত্যয়ে কবি এই সত্য আবিষ্কার করেছিলেন। তাই বলেছিলেন :—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"

চৈতালিতে অনাগতের আকাঙ্ক্ষারূপে সেই জীবন-প্রত্যয় অঙ্কুরে আভাসিত হতে আরম্ভ করেছে—

"কহিল গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী,
'গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি।
কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছে এখানে'।
দেবতা কহিলা, 'আমি', শুনিল না কানে।
সুপ্তিময় শিশুটিরে আঁকড়িয়া বুকে
প্রেয়সী শয্যার প্রান্তে ঘুমাইছে সুখে।
কহিল, 'কে তোরা ওরে মায়ার ছলনা।'
দেবতা কহিলা, 'আমি', কেহ শুনিল না।
ডাকিল শয়ন ছাড়ি, 'তুমি কোথা প্রভু।'
দেবতা কহিলা, 'হেথা।' শুনিল না তবু।
স্বপনে কাঁদিল শিশু জননীরে টানি,
দেবতা কহিলা, 'ফির।' শুনিল না বাণী।
দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন, 'হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়'।"

চৈতালি-উত্তর কাব্য-ত্রয়ী

চৈতালির পরে গ্রন্থিত কাব্য-প্রবাহের মধ্যে আছে যথাক্রমে কণিকা, কথা, এবং কাহিনী। তিনটি কাব্যেরই প্রকাশকাল ১৩০৬ বঙ্গাব্দ। কিন্তু, কবিতা রচনার হিসেবে 'কথা' আর 'কাহিনী' এই কাব্য দুটির সূচনা হয়েছিল প্রথমে; ১৩০৪ বাংলা সাল থেকে এই কাব্য-প্রবাহের রচনার শুরু। চৈতালির ভাব-প্রেরণা ক্রমশ পরিণতি পেয়েছে এই কাব্য ত্রয়ীতে।

কণিকায় আছে মহৎ, বৃহৎ, নিরঙ্গ জীবনাদর্শকে ক্ষুদ্রাবয়ব কথার আধারে ধরে পিনদ্ধ দেহ-রূপ দানের চেষ্টা। ভারতবর্ষের জীবন, ভারতবর্ষের মূল্যবোধ, সংক্ষিপ্ত কথনের ব্যঞ্জনাময় স্পষ্টতার মধ্যে সর্বদেশকালীন মহিমা-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে;—

কণিকা

"তপন উদয়ে হবে মহিমার ক্ষয়,
তবু প্রভাতের চাঁদ শান্তমুখে কয়—
অপেক্ষা করিয়া আছি অস্ত সিন্ধু তীরে
প্রণাম করিয়া যাব উদিত রবিরে।"

কবিতাটির নাম 'নতি স্বীকার' ;—নামেতেই রচনার ভাব-ব্যঞ্জনা দ্ব্যর্থহীন হতে পেরেছে। সর্বস্ব দিয়েও, আ-মৃত্যু মহৎকে নতি জ্ঞাপনের ভারতীয় জীবনাদর্শ বৃহত্তম মানবিক আদর্শ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এখানে। কণিকার সকল কবিতাতেই ভাবনার এই বৈশিষ্ট্য সর্বজনীন।

কণিকায় যা তত্ত্ব বা আদর্শ, কথা এবং কাহিনীকাব্যে তাই গল্প-রস-রূপ পেয়েছে। প্রথম সংস্করণ 'কথা'র বিজ্ঞাপন-এ কবি জানিয়েছিলেন,—"এই গ্রন্থে যে-সকল বৌদ্ধ-কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সংকলিত নেপালী বৌদ্ধ সম্বন্ধীয় ইংরেজি গ্রন্থ হইতে গৃহীত। রাজপুত কাহিনীগুলি টডের রাজস্থান ও শিখ বিবরণগুলি দুই-একটি ইংরেজি শিখ ইতিহাস হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। ভক্তমাল হইতে বৈষ্ণব গল্পগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। মূলের সহিত এই কবিতাগুলির কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হইবে।" এখানে লক্ষ্য করবার কথা দুটি। প্রথমতঃ,—ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে কবি এবার প্রাচীন ভারতের পুরাণ-গল্প-ইতিহাসের জগতে প্রবেশ করেছেন। এক একটি পদ্য-'কথা'য় ভারতীয় জীবনাদর্শের এক একটি নিটোল সুন্দর রূপ অখণ্ড পূর্ণতায় বাঁধা পড়েছে। দ্বিতীয়তঃ, কবি নিজেই স্বীকার করেছেন,—মূলের সঙ্গে এইসব কবিতার যোগ হুবহু নয়। বলা বাহুল্য, কবিতার বিষয় নির্বাচনে এবং তার কল্প-রূপ রচনায় কবির নিজস্ব স্বাধীনতা রয়েছে সীমাহীন। কিন্তু, এ কেবল তাই নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন যুগের আদর্শ ও মূল্যবোধকে তাঁর সমসাময়িক নবযুগের পরিপ্রেক্ষিতে নূতন মূল্যে উদ্ভাসিত করেছিলেন।

কথা ও কাহিনী

কথা, এবং কাহিনী রচনার কাল বাংলাদেশে 'কার্জনী' দুঃশাসনের প্রস্তুতি এবং বিধ্বংসের সূচনা-লগ্নে। উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে শুরু করে ইংরেজ আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ইংরেজি, শিক্ষিত নাগরিক বাঙালির বিক্ষোভ অগ্নিতপ্ত হয়ে উঠ্‌ছিল,—দিকে দিকে চল্‌ছিল জাতীয় বিপ্লব রচনার সর্বমুখী প্রস্তুতি। অন্যদিকে, দেশীয় প্রজাদের আত্মমুক্তির উদ্দীপনা যত বেড়েছে, বড়লাট এল্‌গিনের আওতায় আমলাতন্ত্রের নিপীড়ন ততই হতে চেয়েছে শ্বাস-রোধী। ফলে, দেশীয়দের উৎসাহ আবার ততই উত্তেজনাতপ্ত হয়েছে। সেই উত্তপ্ত বারুদ-স্তূপে জলন্ত অগ্নিশলাকার মত এসে পড়লেন বড়লাট লর্ড কার্জন। তার

হৃদয়হীন অমানবিকতা বঙ্গভঙ্গ-কে উপলক্ষ্য করে ভারতব্যাপী প্রথম বিপ্লবান্দোলনের সৃষ্টি করল। বিপ্লবের একটা ধারা চিরকাল বয়ে গেছে ফল্গু প্রবাহের মত লোক-চক্ষুর অন্তরালে। সে-ধারা ছিল স-শস্ত্র; রক্তাক্ত বিপ্লব-রচনার প্রয়াসী। ১৯৪২-৪৩ খ্রীস্টাব্দে তার অগ্নি-রূপ ঘরে বাইরে জ্বলেছিল দাবানলের মত, ১৯৪৫-৪৬-এ বিহারের পুলিশবিদ্রোহ, বোম্বাই-এর নৌ-বিদ্রোহের পরিণামে জাতীয় স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তার সার্থক উদ্‌যাপন ঘটে। জাতির মুক্তি-সাধনায় এই শক্তিব্রতের সমুচিত মূল্য ইতিহাসকে একদিন আবিষ্কার করতেই হবে। কিন্তু, এ-দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের যে রূপটি স্বতঃপ্রকাশিত, তা জনমনের ঐতিহ্য-প্রীতি ও স্বদেশভক্তির অবিচল ভিত্তিকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছিল। পরবর্তী-কালে, মহাত্মা গান্ধীর আজীবন তপস্যা সেই সহজ প্রীতি ও ভক্তিকে আত্ম-শক্তির বোধনে সুদৃঢ়,—অপরাজেয় করেছে। বাংলাদেশে বঙ্গভঙ্গের আলোচ্য প্রস্তুতি-লগ্নে জাতির ঐতিহ্য সম্বন্ধে নবীন মহিমাবোধ,—ভারতবর্ষের আদর্শ ও জীবন-মূল্য সম্বন্ধে নবতর সচেতনতা জাগ্রত হচ্ছিল দিনে দিনে। দেশের পুরাতন জীবনাদর্শকে নব যুগের উপযোগী করে নবীন মূল্যে উদ্ভাসিত করার এই মহাব্রত গ্রহণ করেছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ;—কথা, এবং কাহিনীকাব্য দুটি সেই ব্রত-উদ্‌যাপনের মহাবেদী।

এদিকে থেকে কবির নিজস্ব আদর্শ চেতনার বিশিষ্টতা ছিল অতুল্য। সমসাময়িক কালে রাজনৈতিক আন্দোলনে 'আবেদন-নিবেদন', প্রস্তাব পেশ ও প্রস্তাব পাশের উৎসাহই ছিল প্রবল। কবি চিরকাল তার প্রতিবাদ করেছেন,—সেদিনও করেছিলেন। আত্মজাগরণ ও আত্মশক্তির বিকাশেই ভারতের মুক্তি,—বিদেশী রাজার দ্বারে ভিক্ষা চেয়ে নয়; এ-কথা সেদিন থেকেই তিনি অনুভব করেছিলেন দৃঢ় মনে। তাই, ভারতের পুরাণ-কথা ও গাথা, প্রাচীন ইতিহাস ও কিংবদন্তীকে আশ্রয় করে, শাশ্বত ভারতের স্বরূপকেই তিনি খুঁজে ফিরেছেন,—আবিষ্কার করেছেন কথা এবং কাহিনীর বিভিন্ন কবিতায়। রবীন্দ্রনাথ আমরণ কাব্য-সাধনা করে গেছেন জীবন-সিন্ধুর তীরে বসে। তাই, বিভিন্ন যুগের বিচিত্র পরিপ্রেক্ষিতে যখনই নতুন নতুন অভিঘাতের তরঙ্গ জেগেছে জীবনের মূলে, তার কবি-ভাবনার অতলেও তখনই আবর্ত রচিত হয়েছে সেই অভিনব জীবন-চিন্তার। তাই, অনেক

সময়ে মনে হয়েছে,—বুঝি কোনো বিশেষ সমকালীন ঘটনার ছান্দসিক রূপই প্রকট হয়েছে তাঁর কোনো কোনো কবিতায়। কিন্তু, জীবনের প্রত্যক্ষ দাবিকে যেমন অস্বীকার করেন নি, তেমনি তারই পায়ে নিঃশেষে অঞ্জলি দিয়ে বসেন নি কবি নিজের সকল সাধনাকে। প্রত্যক্ষকে আশ্রয় করে চিরন্তনের উদ্বোধনে সিদ্ধকাম হয়েছিলেন তিনি।

কাহিনী-র 'গান্ধারীর আবেদন' কবিতার প্রসঙ্গে এই বক্তব্য স্পষ্ট হতে পারবে। কথা এবং কাহিনীর কবিতা-রচনার ধারা প্রথম যখন সূচিত হয়েছে, তার প্রায় এক বছর পবে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে কার্জন বডলাট হয়ে এসেছিলেন। 'গান্ধারীর আবেদন' রচিত হয় তার স্বল্পকাল আগে, সম্ভবত ১৮৯৭-এর শেষার্ধে। তাহলেও, কার্জনের কালে দীপ্ত বিদ্রোহের যে আগুন সারা ভারতে ছড়িয়ে পডেছিল,—তাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়ে গিয়েছিল পূর্ববর্তী বডলাট এল্‌গিনের (১৮৯৪-৯৮) কাল থেকেই। "বাস্তবিক লর্ড এল্‌গিনের আমলেই ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাহিরে ভারতীয়দেব দুর্গতি শুরু হয়। লর্ড কার্জন এসে প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলেন মাত্র।" 'গান্ধারীর আবেদন' কবিতায় সেই সর্বভারতীয় রোষের ছবি অনেকে প্রত্যক্ষ করে-ছিলেন সেদিন। প্রকাশ করবার আগে কবি য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট্‌-এ কবিতাটি পডে শুনিয়েছিলেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,—ঐ কবিতা পাঠের সময় "আমরা ছাত্র। তখন আমাদের মনের মধ্যে নূতন স্বদেশ-প্রেম জাগ্রত হইয়াছিল। সেই জন্য আমরা ঐ নাটিকার মধ্যে আমাদের দেশের সাময়িক ইতিহাসেব ছায়াপাত হইয়াছিল মনে করিয়া-ছিলাম।" তাতে অনুমান করা হয়েছিল, ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন বৃটিশ পার্লামেণ্ট, —ভারতে অবস্থিত বৃটিশ শাসক-শিশুদের প্রতি যা স্নেহান্ধ, দুর্যোধন নাকি ছিলেন আমলাতন্ত্রের স্বৈরাচার; গান্ধারী ব্রিটিশ জাতির ন্যায়নিষ্ঠা ইত্যাদি। এমনি করে পাণ্ডবদের মনে করা হয়েছিল নির্যাতিত ভারতীয়ের প্রতীক। সমসাময়িক প্রেস-আইনের প্রতিবাদ এবং আরো নানা ছোটখাটো ঘটনার ছায়াপাতও এতে কল্পনা করা হয়েছিল। আজ সে-সব অনুমান অর্থহীন হয়ে পড়েছে। কিন্তু, সে যাই হোক, একথা অবিস্মরণীয় যে, স্বদেশ ও স্বজাতির সমকালীন প্রয়োজনের আলোকে কবি রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন

গান্ধারীব আবেদন কবিতা

ভারতবর্ষকে নূতন করে আবিষ্কার করতে আরম্ভ করেছিলেন কথা এবং কাহিনীতে। এই সাধনারই পূর্ণ সিদ্ধি ঘটেছে নৈবেদ্যে।

কল্পনার অতুল্যতা

কথা এবং কাহিনীর পরের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কল্পনা (১৩০৭)। কিন্তু, এর অধিকাংশ কবিতাই ১৩০৪ সালে লেখা, অল্প কয়েকটি কবিতা রচিত হয়েছিল ১৩০৫-০৬ সালে। তাই, এই কাব্যের-ও প্রধান বৈশিষ্ট্য যুগসন্ধি-লক্ষণের প্রচুরতায়। বস্তুত, চিত্রা-উত্তর ঋতু-সন্ধির কাব্য হিসেবে 'কল্পনা'র সৌন্দর্য অতুল্য,—অপরূপ। রবীন্দ্র-কাব্যেব ইতিহাসেও এ'র শ্রেষ্ঠতা অবশ্য-স্বীকার্য। তার কারণ, সন্ধি-লগ্নের দ্বিমুখী আকাজ্ক্ষা এই পর্যায়ের কবিতায় পূর্ণ মুক্তি পেয়েছে। কিছু কিছু কবিতায় চিত্রার আত্ম-নিমগ্ন চেতনার বিশ্ব-সৌন্দর্য-লোভাতুরতা অপরূপ মাধুর্যে ভরে উঠেছে। প্রেমের সত্যালোকে আপন আত্মার বিশ্বরূপ দেখেছেন কবি 'প্রণয় প্রশ্ন'তে :—

"চির মন্দার ফুটেছে আমার মাঝে কি,
চরণে আমার বীণা ঝংকার বাজে কি,
এ কি সত্য।
নিশির শিশির ঝরে কি আমারে হেরিয়া,
প্রভাত-আলোকে পুলক আমারে ঘেরিয়া,
এ কি সত্য।
তপ্ত-কপোল-পরশে অধীর সমীর মদির-মত্ত,
হে আমার চিরভক্ত,
এ কি সত্য।
কালো কেশপাশে দিবস লুকায় আঁধারে,
জীবনমরণ-বাঁধন বাহুতে বাঁধা রে,
এ কি সত্য।
ভুবন মিলায় মোর অঞ্চলখানিতে,
বিশ্ব নীরব মোর কণ্ঠের বাণীতে,
এ কি সত্য।
ত্রিভুবন লয়ে শুধু আমি আছি, আছে মোর অনুরক্ত,
হে আমার চির ভক্ত,
এ কি সত্য।"

'মদন ভস্মের পরে' কবিতায় এই ব্যক্তি-প্রেমকেই বিশ্বে ব্যাপ্ত করে দেখেছেন কবি :—

"পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ-কি সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বাসি,
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।
ভরিয়া উঠে নিখিল ভব রতি-বিলাপ-সংগীতে,
সকল দিক কাঁদিয়া উঠে আপনি।
ফাগুনমাসে নিমেষমাঝে না জানি কার ইঙ্গিতে
শিহরি উঠি মুরছি পড়ে অবনী।"

কেবল সৌন্দর্যের পিপাসা নয়,—ওপরের কবিতাংশগুলির প্রকাশ-ভঙ্গিতেও সুন্দরের অপরূপ বিকাশ অবশ্য লক্ষ্য করবার মত।

এই অতীত-ভাব-সুরভিত স্বপ্নলোকের পাশে পাশে মনের গহনে এসে পৌঁচেছে অনাগত যুগ-চেতনার 'আহ্বান', সবকিছু ফেলে তারই সুরে সাড়া দিয়েছেন কবি :—

"রহিল রহিল তবে আমার আপন সবে
আমার নিরালা,
মোর সন্ধ্যাদীপালোক পথ চাওয়া দুটি চোখ
যত্নে গাঁথা মালা।

* * *

রাত্রি মোর, শান্তি মোর, রহিল স্বপ্নের ঘোর ;
সুস্নিগ্ধ নির্বাণ,
আবার চলিনু ফিরে, বহি ক্লান্ত নত শিরে
তোমার আহ্বান।"

কিন্তু, চলতে চাইলেই এগিয়ে চলা যায় না। অতীতের আকর্ষণ অকারণ-মায়ার গ্রন্থিজালে পায়ে পায়ে বেড়ি পরিয়ে দেয়। সেই মোহ-জাল ছিন্ন করে এগিয়ে চলার সাধনা, নিজের বক্ষ-দীর্ণ করার দুঃসাধ্যতায় ভরপুর। বর্ষশেষ কবিতায় সেই আত্মমুক্তির নিষ্ঠুর নির্মায়িক সাধনায় আত্ম-সমর্পণ করলেন কবি,—

"হে দুর্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ, প্রবল।
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে
বাহিরায় ফল—
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ,—
প্রণমি তোমারে।"

'বৈশাখ'-এর রুক্ষ-মূর্তির সম্মুখে কবি অবশেষে মায়া-মোহবিমুক্ত রুদ্র-তপস্যায় নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করেছেন। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান যখন হয়েছে চিরকালের জন্য, তখন চিন্তা-ভারমুক্ত মনের 'অকারণ পুলক' ক্ষণিক উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে 'ক্ষণিকায়'।

গ্রন্থরূপে ক্ষণিকার প্রকাশ কল্পনার পরেই; ১৩০৭ সালে। এর কবিতাগুলিও রচিত হয়েছিল এক ঝোঁকে,—একই বছরে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে; গ্রন্থ প্রকাশিত হয় শ্রাবণে। এদিক থেকে 'ক্ষণিকা' নামেরও তাৎপর্য আছে। ক্ষণিক পুলকের এক ঋতু-লগ্ন মাত্র এই দুই মাস ধরে কবি-মনে উদ্ভাসিত হয়ে ফিরেছিল। কালের দিক থেকে কবিতাগুলি 'ক্ষণিকা', ভাব-চিন্তার বিচারেও তাই।

ক্ষণিকা

'কল্পনা'র দ্বন্দ্ব-মুক্ত অনুভব নিয়ে শেষ কবিতা লেখা হয় ১৩০৬ বাংলা সালের শেষে। তারপরের কবিতাগুচ্ছ ক্ষণিকার। বন্ধনহীন মুক্তির নির্ভার আনন্দানুভব এই কবিতাগুচ্ছের একমাত্র বৈশিষ্ট্য। অতীতের সঙ্গে তার যেমন যোগ নেই, তেমনি অনাগত সম্বন্ধে সে ভ্রূক্ষেপহীন। কিন্তু, মানব-জীবনের মুক্তি সর্ব-বিযুক্ত হতে পারে না, নিরবলম্ব জীবন বায়ুভূত নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে। তাই অতীতের তীরকে কবি যে মুহূর্তে একেবারে ত্যাগ করেছেন, ঠিক্ সেই মুহূর্তেই জীবন-স্রোত পেরিয়ে অনাগতের ভিত্তি-ভূমির আশ্রয় অনিবার্য হয়েছে। অতীত থেকে অনাগতের এই তীর-ভূমিতে পৌঁছুবার মধ্য-লগ্নে তরঙ্গায়িত আনন্দসাগরে সাঁতার কাটার পুলকিত অনুভব ছড়িয়ে আছে ক্ষণিকায়,—আগেই বলেছি নিরালম্ব ভাব-লোকের ভাসমানতা স্থায়ী হয় না, হতে পারে না। তা ক্ষণিক,—ক্ষণিকা।

এই বিভগ্ন ঋতু-লগ্নের "উদ্বোধন" করে কবি নিজেই তার স্বভাব ব্যাখ্যা করেছেন ;—

"শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গা রে আজি প্রাণ, ক্ষণিক দিনের আলোকে।
যারা আসে যায়, হাসে আর চায়,
পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়,
নেচে ছুটে ধায়, কথা না শুধায়, ফুটে আর টুটে পলকে—
তাহাদেরি গান গারে আজি প্রাণ ক্ষণিক দিনের আলোকে।
ফুরায় যা দে রে ফুরাতে।
ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম ফিরে যাস্ নে কো কুড়াতে।
বুঝি নাই যাহা, চাহি না বুঝিতে,
জুটিল না যাহা চাই না খুঁজিতে,
পুরিল না যাহা কে রবে যুঝিতে তারি গহ্বর পুরাতে,
যখন যা পাস মিটায়ে নে আশ, ফুরাইলে দিস ফুরাতে।"

* * *

এই ক্ষণ-আশা-চারণের অবসান ঘটল নৈবেদ্যে (১৩০৮ বাংলা সাল)। জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন,—"ক্ষণিকা প্রকাশিত হইবার (১৩০৭ শ্রাবণ) অনতিকালের মধ্যে নৈবেদ্য রচিত হইতে আরম্ভ হয়।" নৈবেদ্য রবীন্দ্র-কবি-আত্মার ভারত আবিষ্কারের কাব্য। ভারতীয় চেতনার প্রধান বৈশিষ্ট্য তার আধ্যাত্মিকতায়। কিন্তু, আত্মার সে সাধনা কর্ম-বিমুখ নয়,—নয় বিশ্ব-বিমুখ! সমস্ত কর্তব্য সাধনায় পদে পদে আত্মার সম্পদ স্মরণ করে, আত্মপরিণামের অভিমুখে কর্মের প্রয়াসকে পরিচালিত করা ভারতের স্বধর্ম। ধর্ম এবং কর্মশাস্ত্র এদেশে অভিন্ন।

নৈবেদ্য

ঈশ্বরকে প্রতিদিনকার জীবনাচরণের মধ্যে আবিষ্কার ও আরাধনাতেই ভারতীয় আর্য-ধর্মের স্বকীয়তা। নৈবেদ্য-কাব্যে আধুনিক জীবন-ভূমিতে দাঁড়িয়ে কবি সেই শাশ্বত ভারত-ধর্মকে আবিষ্কার করেছেন নিজের চৈতন্যের মূলতম গভীরে। তাই, কবি বলেন, কর্মমুখর জগতের পথে যখন চলছিলেন আপন মনে :—

"তখন সহসা দেখি মুদিয়া নয়ন,
মহা জনারণ্য মাঝে অনন্ত নির্জন
তোমার আসনখানি,—কোলাহল মাঝে
তোমার নিঃশব্দ সভা নিস্তব্ধ বিরাজে।
সব দুঃখে, সব সুখে, সব ঘরে ঘরে,
সব চিত্ত, সব চিন্তা, সব চেষ্টা 'পরে,
যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু যায় দেখা
হে সঙ্গ-বিহীন দেব তুমি বসি একা।"

সমস্ত কর্ম-সঙ্গে যুক্ত থেকেও যে দেবাদিদেব সঙ্গ-বিহীন,—যিনি সকলের মধ্যে বিলীন-ব্যাপ্ত থেকেও সর্বাতিরিক্ত একক,—চির-'একা'; নৈবেদ্য কাব্যে তাঁকেই কবি আবিষ্কার করেছেন। জীবন-দেবতার একক-চারণ আজ বিশ্বদেবতার সর্বব্যাপ্ত 'একমেবাদ্বিতীয়'তার অতলে আত্মসমর্পণ করে চরিতার্থ সম্পূর্ণ হয়েছে। তাই, নৈবেদ্যের কবির ধ্যান-দৃষ্টিও আজ দ্বিমুখে সম-সচেতন। সমকালীন বিশ্বের কর্মভূমির জটিল অভিব্যক্তির প্রতি কবির সন্ধানী দৃষ্টি ঘরে-বাইরে সদা সচকিত। অপর দিকে প্রতিটি ঘটনা, প্রতি সম্ভাবনাকে সর্বত্র পরিমাপ করেছেন তিনি শাশ্বত আত্মার মূল্য-চেতনার আলোকে। আফ্রিকায় ব্রিটিশের বুয়র-নির্যাতনের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে কবি বলেছেন,—

"এই পশ্চিমের কোণে রক্তরাগ রেখা
নহে কভু সৌম্যরশ্মি অরুণের লেখা
তব নব প্রভাতের। এ শুধু দারুণ
সন্ধ্যার প্রলয় দীপ্তি। চিতার আগুন
পশ্চিম সমুদ্রতটে করিছে উদ্গার
বিস্ফুলিঙ্গ—স্বার্থ দীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার
মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা।"

সেই সঙ্গে তিনি একান্ত ভরসা করেছেন,

"তোমার নিখিলব্যাপী আনন্দ-আলোক
হয়ত লুকায়ে আছে পূর্ব সিন্ধুতীরে॥
বহু ধৈর্যে নম্র স্তব্ধ দুঃখের তিমিরে

সর্বরিক্ত অশ্রুসিক্ত দৈন্যের দীক্ষায়
দীর্ঘকাল ব্রাহ্ম মুহূর্তের প্রতীক্ষায়।"

তাই, স্বদেশের জন্য কবির একমাত্র 'প্রার্থনা' :—

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস—শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎস মুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি—
পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম-চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত ॥"

নিজের জন্য কবির আকাঙ্ক্ষা ,—

"ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি উঠে খর খড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান ॥
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।"

নৈবেদ্য কাব্য স্বদেশ-প্রেম ও সর্বমানব-প্রেমের যৌথ সূত্রে বাঁধা পড়ে বিশ্বদেবের শ্রীচরণে উৎসর্গিত হয়েছে ধ্যানী প্রাণের নৈবেদ্য-রূপে।

নৈবেদ্যের জীবন ও কর্মসচেতন অধ্যাত্ম-সাধনা কবি-কল্পনাকে কোথায়

পৌঁছে দিত তা বলা তঠিন। কেবল কাব্য-সাহিত্যে নয়, বৈষয়িক জীবনের কর্ম-ভূমিতেও সম-কালীন প্রত্যয়ের বাস্তবরূপ গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছিল শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে (১৩০৮)। সেখানে কবি "ব্রহ্মচর্যের প্রাচীন আদর্শে ছাত্রদিগকে নির্জনে নিরুদ্বেগে পবিত্র নির্মল ভাবে মানুষ" করে তুলতে চেয়েছেন,—"ভারতবর্ষেয় গ্লানিহীন পবিত্র দারিদ্র্যে দীক্ষিত" করতে চেয়েছিলেন তাদের। অন্তরে অন্তরে এই আদর্শের রূপ-বিধাত্রী ছিলেন আশ্রম-জননী কবি-জায়া! কিন্তু আশ্রম-জীবনের সূচনাতেই তাঁর দেহে দেখা দিল কালব্যাধি। ১৩০৮ বাংলার পৌষ মাসে শান্তিনিকেতন ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ১৩০৯ বাংলার আষাঢ় মাসে মৃণালিনী দেবী অসুস্থ হলেন; ভাদ্রে তাঁকে কলকাতায় আনতে হল চিকিৎসার জন্য; আর অগ্রহায়ণে হল তাঁর দেহান্ত। কবির অন্তর এবং বাইরের জীবনে এ-ক্ষতি অপূরণীয় হয়েছিল। কবি-জীবনে মৃণালিনী দেবীর প্রভাব সম্বন্ধে প্রভাতকুমার লিখেছেন,—"কবির উপর কবি-প্রিয়ার অখণ্ড প্রতাপ ছিল। এমন কি কবি তাঁহাকে মনে মনে ভয় করিতেন।···বিদ্যালয় আরম্ভ করিয়া কবি যে ভীষণ দায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আর্থিক অস্বচ্ছলতার দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছিল তাঁহার স্ত্রীকেই।"

স্মরণের উৎস

মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর সময়ে আশ্রম-বিদ্যালয়ে কেবল অর্থাভাব নয়, নানা রকম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। পরিবারের ভিতরে শিশু সন্তান কয়টি হয়েছিল নিরাশ্রয়। বিশেষ করে দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকার অসুস্থতার দরুণ কবিকে নানা জায়গায় ঘুরতে হয়েছে হাওয়া বদলের উদ্দেশ্যে। রথীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতন স্কুলে। শিশু শমীন্দ্রনাথ কলকাতায়। মৃণালিনীর তিরোভাব কবির কর্মক্ষেত্রে ও পরিবার ক্ষেত্রে একসঙ্গে টেনে এনেছিল ভাঙন, সেই সঙ্গে জীবন-সঙ্গিনীর অভাব মনেও যে ভাঙন ধরিয়েছিল তারই স্বতঃস্ফূর্তি প্রত্যক্ষ করি স্মরণ-কবিতাবলীতে।

স্মরণ

স্মরণ কাব্য কবি-প্রিয়ার স্মরণে লেখা। ১৩১০ বাংলা সালে মোহিতচন্দ্র সেনের সম্পাদিত কাব্য গ্রন্থাবলীতে এর প্রথম প্রকাশ। রবীন্দ্রকাব্যের ইতিহাসে স্মরণ একদিক থেকে অনন্য। নিজের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখকে নিজের সৃজন-লোক থেকে চিরকাল কবি সন্তর্পণে পরিহার

করেছেন। ব্যক্তিমনের অনুভব যতক্ষণ ভাব-ব্যাপ্তির মধ্য দিয়ে সর্বজনীন হয়ে না উঠেছে, ততক্ষণ প্রায়ই তাকে কাব্যে স্থান দেন নি। নিজের আনন্দ-বেদনার ব্যক্তিগত আবেগকে নিজের মধ্যে সংহত-গোপন করে রাখাই ছিল তাঁর স্বভাব। ব্যক্তি-মনের দুর্বলতাকে প্রকাশ করা লজ্জাকর মনে করতেন তিনি। তবু জীবনের এই চরম অভাবকে অপ্রকাশিত রাখতে পারেন নি। স্মরণ-কবিতাবলীতে মৃণালিনী দেবীর পতি ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথ নিজেকে ধরা দিয়েছেন সম্পূর্ণ করে। এর আগে সদ্য-বিকচ যৌবন-লগ্নে 'নতুন-বৌঠান' কাদম্বরী দেবীর অকস্মিক মৃত্যুতে একই রকম ব্যক্তিগত অভিভূতির প্রকাশ করেছিলেন গদ্য-কাব্য 'পুষ্পাঞ্জলি'-তে। কিন্তু পুষ্পাঞ্জলি প্রধানতঃ উচ্ছ্বাস ;—স্মরণ সার্থক কাব্য। এই কবিতা-গুচ্ছের স্বাদ অভিনব,—রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-মনকে এই কবিতাবলীতে নিরাবরণ পরিচয়ে ধরা যায় :—

"—মরণের সিংহ দ্বার দিয়া
সংসার হইতে তুমি অন্তরে পশিলে আসি, প্রিয়া,—
আজি বাজে নাই বাদ্য, ঘটে নাই জনতা-উৎসব,
জ্বলে নাই দীপ-মালা ; আজিকার আনন্দ গৌরব
প্রশান্ত গভীর স্তব্ধ বাক্যহারা অশ্রু-নিমগন।
আজিকার এই বার্তা জানে নি শোনে নি কোনো জন।
আমার অন্তর শুধু জ্বেলেছে প্রদীপ একখানি,
আমার সংগীত শুধু একা গাঁথে মিলনের বাণী।"

নিঃসঙ্গ, নিভৃত, একক কবি-মনের এই রূপ অভূতপূর্ব।

স্মরণ-এর পরের গ্রন্থিত কাব্য শিশু,—এটিও ১৩১০ বাংলা সালে মোহিতচন্দ্র সেনের সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থাবলীতে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। উপক্রমণিকা সহ এতে কবিতা সংখ্যা ৬২ ; তার প্রথম ত্রিশটি-ই কেবল এই সময়ে (১৩০৯-১০ সাল) লেখা। বাকি কবিতাগুলি পূর্বে বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছিল। পৃথক্ গ্রন্থরূপে পূর্বে প্রকাশিত নদী কবিতাটিও এবার 'শিশু' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। চিরদিনই রবীন্দ্র-নাথের বিশেষ আকর্ষণ ছিল শিশুদের প্রতি। প্রথম

শিশু

জীবনের শিশু-কবিতা রচনার সঙ্গে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর শিশুমনের

ব্যক্তিগত স্পর্শের কথা উল্লেখ করেছেন জীবনীকার প্রভাতকুমার। কিন্তু সে সব কবিতা বিভিন্ন সময়ের খুচরো লেখা। শিশু-কাব্যের বিশেষ ঋতুর বিকাশ ঘটেছে আলোচ্য স্মরণ-উত্তর কালে রচিত প্রথম ত্রিশটি কবিতায়। এই কবিতাগুলির মধ্যে একদিকে উত্তর-যৌবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবি নিজের শিশু-সত্তাকে নূতন করে আবিষ্কার করেছেন। তার চেয়েও বেশি করে এই সকল কবিতায় ছড়িয়ে আছে নিজের সন্তানদের মন-পরিচয়,—তাঁদের সদ্যোবিগতা জননীমূর্তির পরিপ্রেক্ষিতে। শিশু কাব্যের ভাব-পটভূমি ব্যাখ্যা করে কবি লিখেছেন,—"খোকা এবং খোকার মার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ মধুর সম্বন্ধ সেইটে আমার গৃহস্মৃতির শেষ মাধুরী। তখন [মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পূর্বকালে] খুকী ছিল না—মাতৃ-শয্যার সিংহাসনে খোকাই [শমীন্দ্রনাথ] তখন চক্রবর্তী সম্রাট ছিল। সেইজন্য লিখতে গেলেই খোকা এবং খোকার মার ভাবটুকুই সূর্যাস্তের পরবর্তী মেঘের মতো নানা রঙে রঙিয়ে ওঠে। সেই অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ এবং বর্ণ আকর্ষণ করে আমার অশ্রুবাষ্প এই রকম খেলা খেলবে—তাকে নিবারণ করতে পারি নে।"

স্মরণ রাখতে হয়, শিশু কাব্যের আলোচ্য কবিতাবলী লেখা হয়েছিল আলমোড়ায় রেণুকার রোগশয্যার পাশে। এই কাব্যেও কবি নিজের বেদনার্ত চিত্তের উৎকণ্ঠাকে বিগত পরিবার-সুখের স্নিগ্ধ-স্মৃতিতলে ডুবিয়ে নবতর জীবন-রসের সঞ্চার করেছেন। স্মরণ-এর কবি কেবল বল্লভ,—শিশুর কবি একাধারে 'খোকা' এবং তার মা এবং বাবা-ও :—

"মেঘের মধ্যে মাগো যারা থাকে
তারা আমায় ডাকে আমায় ডাকে।

* * *

আমি বলি মা যে আমার ঘরে
বসে আছে চেয়ে আমার তরে,
তারে ছেড়ে থাকব কেমন করে?
শুনে তারা হেসে, যায় যে মা ভেসে।
তার চেয়ে মা আমি হব মেঘ
তুমি যেন হবে আমার চাঁদ

দুহাত দিয়ে ফেল্‌ব তোমায় ঢেকে
আকাশ হবে আমাদের এই ছাদ !"

'শিশু'র পরের কাব্য হিসেবে স্মরণীয় 'উৎসর্গ'। এটির প্রথম গ্রন্থন-কাল ১৩২১ বাংলা সাল ; কিন্তু অধিকাংশ কবিতাই লেখা হয়েছিল ১৩০৮ সালের মধ্যে। এই কবিতা-গুচ্ছে বিশেষ মনোঋতুর অভিব্যক্তি নেই। কারণ প্রায় সব কবিতাই লেখা হয়েছিল মোহিতচন্দ্র সেনের সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থাবলীর বিভিন্ন পর্যায়ের ভাব-ভূমিকা হিসেবে। তবে 'কল্পনা'-উত্তর যুগে রচিত হয়েছিল বলে,—ঐ ঋতুর ভাব-কল্পনার সঙ্গে সাযুজ্য রয়েছে 'উৎসর্গ'-কবিতাবলীর।

উৎসর্গ

গ্রন্থন-কালের হিসাবে শিশুর পরের কাব্য 'খেয়া' ; এর প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৩১৩ বাংলা সালে ; কবিতা রচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল ১৩১২-তেই। ঐ একই বাংলা সালে ঐতিহাসিক বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূচনা। কবি সেই ঝড়ের মুখে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন দেহ-মন-প্রাণে। বাংলার এক প্রত্যন্ত থেকে অপর প্রত্যন্তে ছুটে বেড়িয়েছিলেন বিপ্লবের উল্কাবেগে। কিন্তু, প্রথম আবেগের উদ্দীপনা মন্দীভূত হতে না হতেই দেহ-মন ছাপিয়ে এল অপার ক্লান্তি। কবি আর কর্মী যে অভিন্ন নয়, এ-কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন। শুধু তাই নয়, এর আগে নৈবেদ্যের কবিতাবলী রচনা শেষ হয়ে গেছে। ভারতের প্রাচীন তপস্বীর দৃষ্টিতে মানব-আত্মার অজরামর সত্য স্বরূপ তাঁর মর্মের গোচরীভূত। তাই স্বদেশ ও স্বজাতির জন্যেও তিনি এমন কোনো সম্পদ চান না, যা বিশ্বের কোনো এক কোণেও মানব-ধর্মকে আঘাত করে। রবীন্দ্রনাথের চোখে তখন থেকেই জাতি-প্রেম এবং মানব-প্রেম অভিন্ন ; বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন তাঁর মনকে টেনেছিল, কারণ বঙ্গভঙ্গের মূলে ছিল তাঁর স্বজাতীয় মানুষের কামনার প্রতি বিদেশী শাসকদের উপেক্ষা ও উৎপীড়নের ভাব। কিন্তু, কাজে নেমে যখন দেখলেন আন্দোলনের স্বপক্ষীয়েরাও ন্যায়-অন্যায় বিচার না করে প্রতিপক্ষকে দুর্বল করবার একমাত্র চেষ্টাতেই ব্যস্ত ; তখন ক্লান্তির সঙ্গে দেখা দিল মনের বিরোধিতা। কর্মী যখন সংগ্রামী হয়, তখন প্রতিপক্ষকে পরাজিত করাতেই তার উৎসাহ। অথচ, কবি যেখানে ধ্যানী, সেখানে সকল পক্ষে সর্বত্র আত্মার সত্যকে অব্যাহত রাখাই তাঁর

খেয়া

সাধনা। তাই, দেহকে টেনে চালালেও, মনকে আর কিছুতেই চালানো সম্ভব হল না। অথচ কর্মের স্রোতে তখন গিয়ে পড়েছেন অনেক দূরে; ফিরে আসা দুষ্কর; অনেক তর্ক, অনেক বিরোধের ঝড় উঠবে। তবু, শেষ পর্যন্ত কবিকে মনের কথাই শুনতে হল,—ফিরতে হল স্বধর্মে। বাইরের জগতের নিন্দা-তর্ক-কোলাহল থেকে বহু দূরে নিজের মনের নিভৃত-লোকে আপন আত্মার বাণীকে শুনবার,—আবিষ্কার করবার ধ্যানে বসলেন কবি এবারে। খেয়া কাব্য কবি-জীবনের খেয়া-তরী। বাইরের কর্মান্ধতার গতিবন্ধন থেকে আত্মার নিভৃত নিঃসীম সত্যানুভবের মাঝখানে পাড়ি দেবার কাব্য।

এর পরের গ্রন্থিত কাব্য গীতাঞ্জলি। গীতাঞ্জলি-গীতালি-গীতিমাল্যের বৈশিষ্ট্য ঈশ্বর-তপস্যার আত্ম-নিমগ্নতায়। অনেকে খেয়াকেও ঈশ্বর-ভাবুকতার কাব্য বলেছেন। কিন্তু, 'খেয়া' গীতাঞ্জলির ভূমিকা নয়,—রবীন্দ্র-কাব্য-ঋতুতে নৈবেদ্য-রই পরিণাম। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এ-কথা স্পষ্ট করে বলেছেন, কবির পূর্ব-কাব্য ও জীবনের প্রমাণ উদ্ধৃত করে।—"খেয়া গীতাঞ্জলির ন্যায় কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক গীতিকাব্য নহে। খেয়ায় কবির অন্তরতম অনুভূতি রূপকে, চিত্রে, ছন্দে অকল্পিত সৌন্দর্যে বিশুদ্ধ কবিতা রূপে প্রকাশ পাইয়াছে।" এই সময়কার ব্যক্তিমনের আত্মাভিমুখী উৎকণ্ঠা সার্থক গীতিরূপ পেয়েছে বিচিত্র কবিতায়। তারই একটি:—

"আমি এখন সময় করেছি—
তোমার এবার সময় কখন হবে ?
সাঁঝের প্রদীপ সাজিয়ে ধরেছি—
শিখা তাহার জ্বালা দেবে কবে ?
নামিয়ে দিয়ে এসেছি সব বোঝা,
তরী আমার বেঁধে এলেম ঘাটে,—
পথে পথে ছেড়েছি সব খোঁজা
কেনা বেচা নানান হাটে হাটে।"

খেয়ার পরের গ্রন্থিত কাব্যই 'গীতাঞ্জলি', কিন্তু, এর রচনা ও প্রকাশ ঘটে অনেক পরে। গ্রন্থাকারে গীতাঞ্জলির প্রথম প্রকাশ ১৩১৭ বাংলা সালে; আক্

কবিতা রচনা শুরু হয় ১৩১৬-র আষাঢ়ে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন একাধিক ঝাঁকে হলেও, মাত্র সাড়ে দশ মাস সময়ের সীমায় গীতাঞ্জলির ১৩৭টি কবিতা বা গান রচিত হয়েছিল,—"যথার্থ রচনার দিন হইতেছে ৯০ দিন।" একটা গভীর অনুভবের দোলা কবির মনে এসে সেদিন লেগেছিল,—যা ঘরে-বাইরের অজস্র কর্মসাধনার মধ্যে,—নিত্য দিনের ছুটে চলার মধ্যেও একাধিক সংগীতকে স্বতউৎসারিত করেছে প্রায় প্রতিদিন। 'গীতাঞ্জলি' কাব্য রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কার লাভের অধিকারী করেছিল। কিন্তু, এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য-সমূহের মধ্যেও একটি নয়। কেউ কেউ একে রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহের অনুল্লেখ্য উপ-প্রবাহ বলেও মনে করেছেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে, নোবেল পুরস্কার পেয়েছিল ইংরেজি গীতাঞ্জলি, যাতে অন্যান্যের মধ্যে নৈবেদ্যের কবিতা ছিল প্রধান সংখ্যক। তা-ছাড়া, প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের মুখোমুখী প্রতীচ্য পৃথিবী পুরস্কার দিয়েছিল বিশুদ্ধ কবি-কর্মকে নয়, সেই মহৎ বিশ্বাস ও তপস্যাকে, যাকে আশ্রয় করে তাঁরা সেদিনকার মৃত্যু-তরণের ভরসা ও সংকেত আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন।

গীতাঞ্জলি

সেই নূতন আশার আশ্রয় স্বয়ং কবিকে একদিন আবিষ্কার করতে হয়েছিল অপার দুঃখ-শোকের ঝড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। 'বলাকা' কাব্যের শঙ্খ কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে কবি গীতাঞ্জলি-যুগের পটভূমি ব্যাখ্যা করে পরে বলেছিলেন,—"জীবনে এমন একদিন এসেছিল, যখন বেদনার আঘাতে মনে হয়েছিল, জীবনের কাজ বুঝি সব সারা হয়ে গেছে, এখন ভজন-পূজন, সাধন-আরাধনার মধ্যে জীবনের শান্তি খুঁজতে হবে।" গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি পর্যন্ত কবি-চেতনার এই ভজন-পূজন, সাধন-আরাধনার যুগ। যে বেদনাকে আশ্রয় করে, এই ধ্যানলোকের পরপারে কবি-মনের যাত্রা শুরু হয়েছিল, গোপনে গোপনে তার প্রথম মানস সঞ্চার "স্মরণ"-যুগে,—কবি-প্রিয়ার মৃত্যুতে। অজানার সেই গোপন পদক্ষেপ ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে এল নবতর আঘাতের পর আঘাতে। মার মৃত্যুর নয় মাস পরে কন্যা রেণুকা-ও কবিকে ছেড়ে গেল ইহজন্মের বন্ধন ছিঁড়ে। তার চার বছর পর কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রের আকস্মিক মৃত্যু ঘটল বন্ধু-গৃহে। বিদ্যালয়ের ছুটিতে শমী বেড়াতে গিয়েছিলেন বন্ধুর বাড়িতে, হঠাৎ তাঁর কলেরার খবর পেয়ে

কবি ছুটে যান। কিন্তু, ১৩০৯ সালে যেদিন মৃণালিনী দেবীর দেহান্ত হয়েছিল, ১৩১৪ সালের ঠিক্ সেই দিন মৃত্যু হল শমীন্দ্রের। দূর থেকে, অবচেতনার মধ্যে যার ধীর পদক্ষেপ চল্‌ছিল বহুদিন ধরে,—এই শোকের আঘাতে সেই রহস্যময় উপলব্ধির মুখোমুখি এসে দাঁড়াল কবি-প্রাণ। পুত্রের মৃত্যুর দিন-কয় পরে চিঠিতে লিখ্‌ছেন,—"সমস্ত আঘাত কাটিয়ে জীবনযাত্রা যেমন চল্‌ছিল তেমনই চল্‌ছে, হয়ত একটা পরিবর্তন ঘটেছে—কিন্তু সে পরিবর্তন উপর থেকে দেখা যায় না—সে পরিবর্তন নিজের চোখেও হয়তো সম্পূর্ণভাবে লক্ষ্য গোচর হতে পারে না।"

গীতাঞ্জলির উৎস ও ধর্ম

মনেরও অগোচর সেই পরিবর্তনের সুর প্রথম প্রকাশ পেল আরো দিনকয় পরে,—যখন শিলাইদহের মাটিতে ফিরে গিয়ে নূতন গানের সুর গুন্‌গুনিয়ে উঠ্‌লো মনে মনে। ২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩১৪ বাংলা সালে লেখা হল—"অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে।"—বাইরে যখন শোক, ভয়, সংশয়, তখন সেই 'অন্তরতর',—অন্তরতমকে একমাত্র আশ্রয় করে নূতন সাধনার, নব উপলব্ধির তরী ভাসিয়ে দিলেন জীবনের দুঃখ-সিন্ধুতে :—

"চেতনা আমার কল্যাণ-রস-সরসে
শতদল সম ফুটিল পরম হরষে
সব মধু তার চরণে তোমার ধরিয়া।
নীরব আলোকে জাগিল হৃদয়-প্রান্তে
উদার উষার উদয়-অরুণ কান্তি,
অলস আঁখির আবরণ গেল সরিয়া।"

গীতাঞ্জলি-ঋতুর জন্ম এখানেই, মাঝে কিছুদিন মনোলোকের সেই ঋতুস্বভাব বহিঃপ্রকাশ স্থগিত রেখেছিল। অনুকূল কালের হাওয়ায় হঠাৎ একদিন অঝোর ধারায় ঝরে পড়েছে। রবীন্দ্র-কাব্যে গীতাঞ্জলির শিল্প-মর্যাদা নিয়ে বিতর্ক আছে। কিন্তু, রবীন্দ্র-কাব্যের উত্তর যুগের বিকাশে গীতাঞ্জলি-ঋতুর অবশ্যম্ভাবিতা নিয়ে তর্কের অবকাশ নেই। আগে দেখেছি, আত্ম-সত্য, মানব-সত্য ও বিশ্ব-সত্যকে একসূত্রে জড়িয়ে অবিনশ্বর সত্যের অখণ্ড স্বরূপ কবি আবিষ্কার করেছেন বারে বারে। তাঁর কবি-কর্মের এবং কবি-ধর্মেরও শ্রেষ্ঠ সম্পদ এখানে। চিত্রা-ঋতুতে এই সত্য-বোধই কবির

ব্যক্তিগত আবেগকে উদ্বোধিত করেছিল ; নৈবেদ্য-ঋতুতে এই সত্য-বোধকেই আবিষ্কার করেছেন প্রাচীন ভারত সম্বন্ধীয় সজ্ঞান-প্রত্যয়ের মধ্যে। কিন্তু, কবি-প্রতীতির পূর্ণতা ধ্যানীর উপলব্ধিতে। আবেগ ও জ্ঞানের জগতে যে সত্যকে জানা গিয়েছিল,—উপলব্ধির অতলে ডুবে কবি তাকে চিরদিনের মত আত্মার সম্পদ করে নিলেন। সেই শক্তিতে দীপ্ত হয়ে বল্‌তে পারলেন,—"বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো, সেইখানেই যোগ তোমার সাথে আমারো।" গীতাঞ্জলির উপলব্ধিকে আমূল আত্মার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে বেরিয়ে এলেন কবি নূতন বিশ্ব-লোকে বলাকার ঋতুতে। গীতাঞ্জলি কবি-মানস-ইতিহাসের বিচারে বলাকা-ঋতুর প্রবেশ-দ্বার।

গীতিমাল্য ও গীতালি

গীতাঞ্জলির পরে গীতিমাল্য, তার পরে গীতালি। এই দুটি কাব্যই গ্রন্থিত হয়েছিল ১৩২১ বাংলা সালে। গীতাঞ্জলিতে উপলব্ধি-সাধ্য সত্য-লোকে প্রবেশ, গীতিমাল্যে সেখানে প্রতিষ্ঠা ; এবং সর্বশেষে গীতালিতে হৃদয়ের উপলব্ধি-ভূমি থেকে বৃহৎ-বিশ্বের মুক্তি-লোকে পুনঃ প্রবেশের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে ; মনে হয়েছে,—

"জীবন আমার দুঃখে সুখে
দোলে ত্রিভুবনের বুকে।
আমার দিবানিশির মালা
জড়ায়ে শ্রীচরণে।
আপন মাঝে আপন জীবন
দেখে যে মন কাঁদে।
নিমেষগুলি শিকল হয়ে
আমায় তখন বাঁধে।"

এই বন্ধন থেকে নব মুক্তি বলাকায়।

২। বিকাশ-যুগের নাট্যসাহিত্য

এ-যুগে রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক মালিনী—এটিও গীতিনাট্য ; রচনা-কাল ১৩০৩ বাংলা সালের প্রারম্ভ। চৈতালির কবিতাগুচ্ছের মধ্য-ভূমিতে মালিনীর জন্ম ; কিন্তু, গল্পের মূল সূত্রটি মনে জড়িয়েছিল পূর্ব থেকে

বিলেতে থাকবার সময় একবার কবি 'তারক পালিতের বাসায়' শুয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন,… "যেন আমার সামনে একটা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। বিষয়টা একটা বিদ্রোহের চক্রান্ত। দুই বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু কর্তব্যবোধে সেটা ফাঁস করে দিয়েছেন রাজার কাছে। বিদ্রোহী বন্দী হয়ে এলেন রাজার সাম্‌নে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে তাঁর বন্ধুকে যেই তাঁর কাছে এনে দেওয়া হল, দুই হাতে শিকল তাঁর মাথায় মেরে বন্ধুকে দিলেন ভূমিসাৎ করে।" পরে মহাবস্তু অবদান-এর উপাখ্যানের সঙ্গে পুরাতন সেই স্বপ্ন-সূত্র গেঁথে নূতন নাট্যকাব্য গড়ে উঠ্‌ল।

মালিনী

কাশীরাজ-কন্যা মালিনী বুদ্ধ-শিষ্য কাশ্যপের কৃপালাভ করে বৌদ্ধ-ভিক্ষুণী হয়েছেন। সনাতন হিন্দু-ধর্মের মহাপীঠ বারাণসী কাশী; প্রজারা ব্রাহ্মণ্য নেতৃত্বের ছত্রতলে দাঁড়িয়ে রাজকুমারীর নিবাসন দাবি করল রাজসভায়। খবর শুনে স্বয়ং মালিনী রাজসভায় এসে উপস্থিত হলেন। বুদ্ধ-কৃপা-পুষ্টা নারীর শান্তস্নিগ্ধ বিভায় অভিভূত হয়ে ব্রাহ্মণ্য রোষ স্তিমিত হয়ে এল; থামল্‌ না কেবল বিপ্লব-নেতা ব্রাহ্মণ ক্ষেমংকর ও তার বন্ধু সুপ্রিয়। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের প্রতিটি আনাচে-কানাচে ক্ষেমংকরের গতি ছিল গ্রন্থ-কীটের মত। তাই সংস্কার তার অন্ধ, কঠিন, নিষ্ঠুর. ক্ষেমংকর বিদেশ যাত্রা করল,—সেখান থেকে সৈন্যদল এনে বিপর্যস্ত হিন্দু-ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবে বলে। দেশে রেখে গেল আত্মার আত্মীয় সুপ্রিয়কে।

কাহিনী

সুপ্রিয় মাঝে মাঝে শাস্ত্র-বিচার করতে যেত মালিনীর সঙ্গে। পুঁথির কঠিন বন্ধন থেকে শাস্ত্রের রুক্ষ-নীরস নীতিকথাকে কখনো আত্মস্থ করতে পারে নি সুপ্রিয়; এবার ধর্মের প্রাণ-চঞ্চল রূপ প্রত্যক্ষ করল মালিনীর মধ্যে; প্রাণের আকর্ষণে ধরা দিল প্রাণ। এমন সময়ে ক্ষেমংকর সুপ্রিয়কে গোপনে খবর পাঠালো,—সৈন্য জুটেছে, এবার সে দেশে ফিরছে স্ব-ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য। সুপ্রিয় সে খবর রাজাকে না জানিয়ে পারলো না,—তিনি গোপনে গিয়ে ক্ষেমংকরকে বন্দী করে আনলেন। ফিরে এসে, এবারে তিনি স্থির করলেন মালিনী ও সুপ্রিয়-র হৃদয়-বন্ধনকে স্থায়ী রূপ দেবেন বিবাহ-বন্ধনে। ক্ষেমংকরের হত্যার ব্যবস্থা হল রাজ-নির্দেশে। কিন্তু,—মালিনীর

প্রার্থনায় রাজা তাকে ক্ষমা করবার সিদ্ধান্ত করলেন মনে মনে। এমন সময় ক্ষেমংকর সুপ্রিয়কে কাছে ডেকে গোপনে কথা বলার অছিলায়, তার মাথায় শিকলের আঘাত করে হত্যা করল তাঁকে। রাজা তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ করলেন, কিন্তু মালিনী ছুটে এসে তার প্রাণভিক্ষা করেই অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

এখানেও, বিসর্জনের মতই প্রাণের ধর্ম ও সংস্কার-ধর্মের সংঘাত ঘটেছে, —জয় হয়েছে প্রেম ও ত্যাগ-ধর্মের। কিন্তু, মালিনীর যুগ চৈতালি-ঋতুর কবি-মনোভাবের দ্বারা বিশেষিত। তাই, বিসর্জনের সংঘাত তীব্রতা নেই এতে,—সুদৃঢ় প্রত্যয়ের অবিচলতাই বরং প্রখর। ফলে, মালিনী-তে নাট্য-ধর্মের চেয়ে গীতিধর্ম নিবিড়তর হয়েছে। নাটকের আধারে মালিনী একটি ঘনবদ্ধ গীতি-কাহিনী।

কাব্য-স্বাদ

এর পরের নাটক বৈকুণ্ঠের খাতা (১৩০৩ সাল) রবীন্দ্র-শিল্পের ইতিহাসে একটি অভিনব ধারার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করেছিল। এ-ধারার সূত্রপাত ব্যঙ্গ-কৌতুক-এ ধৃত বশীকরণ ইত্যাদি ব্যঙ্গ-নাটিকায়। গোড়ায় গলদ-এ তার প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাট্য-প্রকাশ দেখেছি পূর্বের পর্যায়ে। কিন্তু, গোড়ায় গলদ-এর শিল্প-সুষমা অবিস্মরণীয় নয়। ফলে, রবীন্দ্রনাথের রস-নাট্যের প্রথম স্থায়ী সৌন্দর্য-রূপ প্রকাশ পেল বৈকুণ্ঠের খাতা-তে।

কবিকে আমরা চিরকালই ভাবুক, মনীষী বলে জানি। তাই, গভীর অনুভব ও একান্ত চিন্তার প্রখর জ্যোতিই তাঁর কাছে প্রত্যাশা করি চিরকাল। সেই ছায়াহীন দৈবী দ্যুতির ফাঁকে ফাঁকে স্মিত হাস্যের মৃদু নক্ষত্রালোকও যে ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হয়েছে, তা সাধারণ বাঙালির কল্পনাতীত। কারণ, হাসিকে আমরা লঘু বলেই জানি। অর্থহীন চপলতার মধ্যে কৌতুক-হাস্যের জন্ম; অকারণ অসূয়া থেকে জেগে ওঠে জ্বালা-তীব্র ব্যঙ্গ-রস;—এইটুকুই আমাদের সাধারণ ধারণা। কিন্তু, রবীন্দ্র-সাহিত্যে অসংশয়িত ভাবে দেখি হাসির মধ্যে জীবনের নির্বন্ধন দীপ্তি ঠিকরে পড়েছে অকারণে; ব্যঙ্গের অতলে আত্মগোপন করে আছে কবি-হৃদয়ের গোপন সহৃদয়তা। সমকালীন জীবনের অসংগতি যেখানে কবি-চিত্তকে ব্যথিত করেছে, অথচ সহানুভূতির প্রলেপে তাকে সুমিত করা সম্ভব হয় নি, সেখানেই শিল্পীর সহৃদয়তা ব্যঙ্গের কুঠার হাতে নিয়েছে;—ধ্বংসের ভূমিতে নব-জীবনের ফসল রচনা

রবীন্দ্রনাথের রস-সাহিত্য

করতে। মানসী-কাব্যে নিজের ব্যঙ্গ-রচনার মূলীভূত উদ্দেশ্য,কবি নিজেই ব্যক্ত করেছেন :—

"সবারে চাহে বেদনা দিতে বেদনা ভরা প্রাণ।
হাসির ছলে সবারে চাহি করিতে লাজ দান॥"

এই উদ্দেশ্যকে সার্থক করেই রবীন্দ্রনাথের রস-চেতনা সুকুমার শিল্প-রূপের সৃষ্টি করতে পেরেছে হাস্যকর প্রসঙ্গেও। হাসি ও বিদ্রূপের মধ্যেও কবি-প্রাণ সংশয়াতীত ব্যঞ্জনায় বিকাশ পেয়েছে,—আর আগেই বলেছি, সে-বিকাশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সফলতা বৈকুণ্ঠের খাতা-তে। বৈকুণ্ঠের খাতার মূল রস ব্যঙ্গরস নয়,—পণ্ডিতেরা বলেছেন,—কৌতুক-রস। লক্ষ্য করলে দেখব,—হাসির লঘু ছন্দে গভীর জীবন-রসকে,—জীবনের বিচিত্র দুর্বলতার প্রতি কবি-হৃদয়ের সকরুণ মমতাবোধকেই অভিব্যক্ত করেছে এই নাটক। তাই, এর কাহিনীই নয় কেবল,—অভিনয়ও রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠকের সর্বজনীন প্রীতি-পুষ্ট। বৈকুণ্ঠের খাতা চিত্রা-ঋতুর রচনা; কবির সমকালীন মানসের মানব-জীবনাকৃতিকে স্বচ্ছন্দ-স্নিগ্ধ রূপ দিয়েছে এই লঘু নাটকটি।

বৈকুণ্ঠের খাতার পরে অনেক দিন আর নাটক লেখা হয় নি; নূতন আঙ্গিকে নূতন নাটক লিখ্‌তে দেখি ১৩১৫ বাংলা সালে;—'শারদোৎসব'। কাব্যে তখন খেয়ার যুগ শেষ হয়েছে। গীতাঞ্জলির কবিতা লেখা চল্‌ছে একটি-দুটি করে। গীতাঞ্জলির যুগ উপলব্ধি-তন্ময়তার রসে পূর্ণ। জীবনের একটি ধ্রুব সত্যরূপের সন্ধানী কবি চিরকাল। সন্ধ্যা-সংগীতের যুগ থেকে তারই আকাঙ্ক্ষায় চলেছে কবি-চিত্তের নিয়ত অভিসার। এক কথায় তাকে বল্‌তে পারি বিশ্বসত্য,—বিশ্ব-জীবন-সত্য। চিত্রার যুগের আবেগ-স্পন্দিত মনে,—নৈবেদ্য-যুগের জ্ঞান-তপস্যায়, সেই সত্য-রূপের সন্ধান ধরা দিয়েছে দুবার। কিন্তু, গীতাঞ্জলির সাধনা ধ্যানীর;—জীবনের অজরামর-অক্ষয়, অথচ আনন্দ-রূপ-অমৃত সত্যের সন্ধানে সেই আনন্দ-লোকেরই অতলে ডুব দিয়েছে কবি-আত্মা। সেখানে প্রত্যয় কেবল বোধির দ্বারা নয়, উপলব্ধির শক্তিতে নিঃসংশয়। তাই, এবার থেকে যেমন শংকা নেই, তেম্‌নি নেই দ্বন্দ্ব-সংঘাত। ফলে এবার থেকে কেবল নাটকই নয়, উপন্যাস-গল্প-প্রবন্ধও হয়ে উঠেছে অখণ্ড কাব্য-কবিতা। যে জীবনের আভাস তারা ব্যঞ্জিত করে, তা বাইরের

শারদোৎসব ও রবীন্দ্র-নাট্যের সাংকেতিকতা

কর্ম-মুখর জটিল জীবন নয়,—সেই জীবনের অগ্নি-পূত নবীন কল্প-রূপ ;—সে রূপের পূর্ণতা কবির অবিচল প্রত্যয়ের তপঃপূত যজ্ঞবেদীতে। প্রথম সংস্করণ শারদোৎসবের নান্দী শ্লোকে নাটকের এই নবীন কাব্য-ধর্মের ব্যঞ্জনা অসংশয়িত প্রকাশ পেয়েছে :—

"শরতে হেমন্তে শীতে বসন্তে নিদাঘে, বরষায়
অনন্ত সৌন্দর্য ধরে যাঁহার আনন্দ বহি যায়,
সেই অপরূপ, সেই অরূপ, রূপের নিকেতন
নব নব ঋতুরসে ভরে দিন সবাকার মন।"

এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হতে পারে যে,—কবি আজ জীবনের যে পরিচয়কে সন্ধান করে ফিরছেন,—বহিরঙ্গ রূপের জগতে তা বাঁধা নেই।—জীবনের অরূপ, অপরূপ, আনন্দ-স্বরূপকে আবিষ্কার করতে ব্রতী হয়েছে তাঁর কবি-প্রাণ। ইনি নিছক ঈশ্বর নন। জীবনের আদিশিল্পীকে ঈশ্বর বলে জেনে কবির স্রষ্টা-মনের তৃপ্তি নেই ; সৃষ্টির আনাচে-কানাচে সেই ঐশ্বর্যকে আনন্দরূপে, সুন্দররূপে আস্বাদ করেই তাঁর তৃপ্তি। তাই, শারদোৎসব এবং পরবর্তী নাট্যপ্রবাহে ঈশ্বর-তত্ত্বই প্রধান হয়ে নেই ; বস্তুতঃ কোনো তত্ত্বকেই কবি বিশেষ ভাবে প্রকাশ করেন নি। জীবনের ছোট-বড়ো অভিজ্ঞতা ও অনুভবের মধ্যে আনন্দময় সুন্দরের অনন্ত পরিচয়কেই করেছেন আবিষ্কার। কবির এই অনির্বাচ্য আনন্দ-সৌন্দর্য-চেতনার সংকেতকে বহন করেই শারদোৎসবের পরবর্তী অধিকাংশ নাট্যকৃতি সাংকেতিক নাটকের রূপ পেয়েছে।

শারদোৎসবে জীবনের স্বাদ ও সংকেত

শারদোৎসবে শরৎ-প্রকৃতির মধ্যে অরূপ-সৌন্দর্যের সন্ধান চলেছে। একান্ত শৈশব থেকেই রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি ও মানব-প্রাণের মধ্যে "নাড়ি-চলাচলের যোগ" অনুভব করেছিলেন। সেই নাড়ির বন্ধনকে আশ্রয় করে প্রকৃতি ও মানবাত্মার মূলীভূত অপরূপ-সুন্দরের পরিচয়কে অনুভব করতে চেয়েছেন। সেই অনুভব-কামনার মূলে রয়েছে গীতাঞ্জলি যুগের অবিচল প্রত্যয়। কবি বলেছেন,—"শারদোৎসব থেকে আরম্ভ করে ফাল্গুনী পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি, তখন দেখ্‌তে পাই প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়োটি একই। ' রাজা বেরিয়েছেন সকলের সঙ্গে মিলে

শারদোৎসব করবার জন্তে। তিনি খুঁজছেন তাঁর সাথী। পথে দেখলেন ছেলেরা শরৎ-প্রকৃতির আনন্দে যোগ দেবার জন্তে উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু, একটি ছেলে ছিল—উপনন্দ—সমস্ত খেলাধুলো ছেড়ে সে তার প্রভুর ঋণশোধ করবার জন্তে নিভৃতে বসে এক মনে কাজ করছিল। রাজা বল্‌লেন, তাঁর সত্যকার সাথী মিলেছে, কেননা, ঐ ছেলেটার সঙ্গেই শরৎ-প্রকৃতির সত্যকার আনন্দের যোগ—ঐ ছেলেটি দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণশোধ করেছে, সেই দুঃখের রূপ মধুরতম। আত্মার প্রকাশ আনন্দময়, এই জন্তেই সে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে, ভয়ে কিংবা আলস্তে কিংবা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে যে-লোক এড়িয়ে চলে, জগতে সেই আনন্দের থেকে বঞ্চিত হয়। শারদোৎসবের ভিতরকার কথাটা এই, ও তো গাছতলায় বসে বসে বাঁশির সুর শোনাবার কথা নয়?"

শারদোৎসবের পরবর্তী নাট্য-প্রবাহের প্রায় সব কয়টিতেই একজন 'রাজা' আছেন অধিরাজ হয়ে; ইনিই আনন্দময় অমৃত, কবি এঁকে বলেছেন "দুঃখ রাতের রাজা!" দুঃখের জ্বালাময় তপস্যার অগ্নি-পথ পেরিয়ে তবে তাঁর সান্নিধ্য পেতে হয়, পেতে হয় পরমানন্দ সুন্দরের অধিকার। প্রায় প্রতিটি নাটকে একজন করে বৃদ্ধ রয়েছেন—অথবা রয়েছেন একজন করে ঠাকুর্দা;—যিনি আনন্দের বার্তাবহ—সুন্দরের দূত। শারদোৎসবে রাজা ও ঠাকুর্দা অভিন্ন।

এই নাটকে লক্ষেশ্বর নামে বণিক স্বার্থের জন্য, টাকা উপার্জনের জন্য সকলকে ভয় করে, ঈর্ষা করে;—সংশয় করে সকলের কাছ থেকে নিজের সম্পদ গোপন করতে চায়। অন্য দিকে রাজা হলেন সমগ্র উৎসবের মহা-পুরোহিত, "যিনি আপনাকে ভুলে সকলের সঙ্গে মিলিত হবার জন্তে বার হয়েছেন; লক্ষ্মীর সৌন্দর্যের শতদল পদ্মটিকে তিনি চান। সেই পদ্ম যে চায়, সোনাকে সে তুচ্ছ করে। লোভকে সে বিসর্জন দেয় বলেই লাভ সহজ হয়ে সুন্দর হয়ে তার হাতে আপনি ধরা দেয়।"

কিন্তু সুন্দর পেলব নয়,—রুদ্র-কঠিন। দুঃখের তপস্যা দিয়ে, আত্মত্যাগের চরম মূল্য দিয়ে এই সুন্দরের অধিকার পেতে হয় তিলে তিলে—দিনে দিনে। শারদোৎসবের ছুটির মাঝখানে বসে উপনন্দ তার প্রভুর ঋণ শোধ করছে। রাজ-সন্ন্যাসী এই প্রেম-ঋণ শোধের, এই অক্লান্ত আত্মোৎসর্গের সৌন্দর্যটি

দেখতে পেলেন। তাঁর তখনই মনে হলো শারদোৎসবের মূল অর্থ ঐ ঋণশোধের সৌন্দর্য।”—এই অনুভবটি, অসংশয়িত প্রত্যয়ের আলোকে অখণ্ড অনবদ্য কবিতা-রূপ পেয়েছে সারাটি নাটকে। এই গীতি-সুন্দর রচনার অভিনয়ে নাটকীয়তার যে দৌর্বল্য ছিল, তাকেই পরিশোধিত করে পরে লেখা হয়েছিল ঋণশোধ (১৩২৮ বাংলা সাল)।

ঋণশোধ

শারদোৎসবের পরের নাটিকা মুকুট (১৩১৫)। ১২৯২ বাংলা সালে মুকুট নামে গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল বালক-পত্রিকায়। সেই কাহিনীই এবারে রূপান্তরিত হল নাটকের আকারে, নাটকটি বালকদের জন্যেই লেখা;—স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত বলে স্কুলের বালকদের পক্ষে সহজে অভিনয়-যোগ্য হতে পেরেছে। সাধারণ নাট্যাকৃতিতে লেখা মুকুট সহজ সংক্ষিপ্ত আকারে একটি রস-বদ্ধ নাটিকা।

মুকুট

মুকুটের পরে লেখা হয় প্রায়শ্চিত্ত (১৩১৬)। বৌঠাকুরাণীর হাট-এর নাট্যরূপ এটি ; কিন্তু, প্রথম সংস্করণ বৌঠাকুরাণীর হাট উপন্যাসের থেকে এই নাটকের তফাৎ দূর-প্রসারী। প্রায়শ্চিত্ত আসলে হয়েছিল রাজা রামচন্দ্রের ;—বিভার স্বামীর! যিনি দ্বিতীয়বার দার-গ্রহণ করতে গিয়েও বিভাকে ভুলতে পারছিলেন না,—বলেছিলেন,—“সেনাপতি, আমি তোমাকে গোপনে বলছি কাউকে বলো না, আমি তাকে কিছুতে ভুলতে পারছিনে। কাল রাত্রে আমি তাকে স্বপ্নে দেখেছি।” রামচন্দ্রের মধ্যে বিভা-প্রেমের বিকাশ আত্মম্ভরিতার কাঠিন্যকে গলিয়ে গলিয়ে দুঃখ-তাপের মধ্য দিয়ে তাকে করেছে অপরূপ। প্রায়শ্চিত্তকে পরিণত-তর রূপ দিয়েছেন কবি পরিত্রাণ-এ (১৩৩৬)। এই নাটক দুটিতে, ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন,—“ন্যায় ও সত্য ধর্মের একটা অধ্যাত্ম আকৃতি” থাকলেও, “তাহা রূপক অথবা সাংকেতিক রহস্যময় নয়।”

প্রায়শ্চিত্ত ও পরিত্রাণ

রাজা (১৩১৭) ও ডাকঘর (১৩১৮) নামক নাটক দুটি রচিত হয়েছিল গীতাঞ্জলির পরে,—প্রায় পর-পর। রবীন্দ্র-নাটকে সাংকেতিকতার প্রথম স্পষ্ট রূপায়ণ ঘটে এই দুটি রচনাতেই। কবি বলেছেন,—“রাজা নাটকে [রানী] সুদর্শনা আপন রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে

ভুল রাজার গলায় দিলে মালা, তারপরে সেই ভুলের মধ্য দিয়ে পাপের মধ্য দিয়ে যে অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে, অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে, তাতেই তো তাকে মিলনে পৌঁছে দিলে। প্রলয়ের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির পথ।" রাজার নাট্য-বিষয় এতে স্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে। রূপের মোহজাল অরূপের আনন্দ-সুন্দর অমৃত-রূপকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সুদর্শনার রূপ-তৃষ্ণা তার সামনে অরূপের স্বত-আবির্ভাবকে বিড়ম্বিত করেছিল। অথচ দাসী সুরঙ্গমা! জীবনের সকল তৃষ্ণাকে অকাতরে ত্যাগ করে,—সহজ আত্মদানের মাধ্যমে অরূপের প্রেম-রূপকে নিজের মধ্যে অনুভব করেছে সে প্রাণ দিয়ে। তাতে রানীর আক্রোশ আরো বেশি। অবশেষে বিপ্লব, যুদ্ধ, অগ্নিদাহের মধ্য দিয়ে নিজের তৃষ্ণা ও আত্মাদরকে তিলে তিলে দুঃখের আগুনে পুড়িয়ে অরূপ-এর আনন্দকে আত্মার গভীরে উপলব্ধি করলেন সুদর্শনা। সেদিন তিনি সুরঙ্গমা ও ঠাকুরদার সমধর্মে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

অরূপরতন

পরবর্তীকালে কবি এই নাটকের সংক্ষিপ্ত সংহত রূপান্তর করেন অরূপরতন (১৩২৬) নামে। রাজা নাটকের মত অরূপ-রতন-এও সাংকেতিক ভাব-ব্যঞ্জনা নাটকীয় ঘটনা-সংহতিকে ব্যাহত করে নি। দুটি নাটকই একাধিকবার অভিনয়-সাফল্য লাভ করেছিল।

ডাকঘর

ডাকঘরে নাটকীয়তার চেয়ে সাংকেতিকতা নিবিড়তর। রবীন্দ্রনাথের গীতি-প্রতিভার উপলব্ধি-তন্ময় প্রত্যয় ঘনতম কাব্য-সুষমায় বিকশিত হয়েছে এই নাটকে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাংকেতিক নাট্যের মধ্যে ডাকঘর একটি —অসংখ্য ভাষায় এর অনুবাদও হয়েছে। অনেকের ধারণা, এতে রবীন্দ্র-নাথের বাল্যজীবনের বন্ধন-বেদনার সকরুণ রূপ মুক্তি পেয়েছে রুগ্ন নিরুদ্ধ বালক অমলের মধ্যে। ভৃত্য-রাজকতন্ত্রে বাঁধা বালক-কবির মুক্তি-বাসনার করুণ-মধুর পরিচয় ব্যক্ত আছে জীবনস্মৃতি-তে। অথচ, সেই বন্ধন-সীমাতেই কবির প্রাণে অসীম অনন্ত-সুন্দরের আভাস ধরা দিত ক্ষণে ক্ষণে। অমলের মনেও তেমনি সেই অপার অপরূপ অরূপের বার্তা এসে পৌঁচেছে প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যময় 'ডাকঘরে'র মধ্য দিয়ে। তাই রূপময় আকৃতি ক্ষীণ,—জীর্ণ হয়ে আসে তার দেহ-সীমায়।

চিকিৎসক এবং অমলের অভিভাবকেরা দেহের খাঁচায় তার মুক্তি-ভিক্ষু প্রাণকে বাঁধতে গিয়ে গৃহ-সীমায় তাকে আবদ্ধ করেন। অবশেষে, দেহাবসানের শেষ মুহূর্তে প্রহরী 'রাজার' আগমনবার্তা জানিয়ে যায় তাকে ; মৃত্যুর মধ্য দিয়ে,—রূপ-সমাপ্তির সার্থক উদ্‌যাপনের ক্ষণে অরূপ 'রাজা' এসে মুক্তি দেন অমলের মনের বদ্ধ বেদনাকে।

অচলায়তন নাটক ডাকঘরের পরে প্রকাশিত হয় ১৩১৯ বাংলায়। কিন্তু এর মূল রচনা হয়েছিল ১৩১৮ বাংলা সালে,—ডাকঘরের আগে। গীতাঞ্জলি-উত্তর সেই যুগের ভাবনা ছিল মুক্তি-বাসনার নির্দ্বন্দ্ব প্রত্যয়ে ঋদ্ধ। এই নাটকে রাজার ভূমিকা নিয়েছেন গুরু। অচলায়তনের উঁচু প্রাচীরের আড়ালে বাইরের আলো বাতাস মাথা খুঁড়ে মরে ; এখানকার অধিবাসীরা নিজেদের মনকেও অচলায়তনের মত এক-একটি ছোট অন্ধকূপে পরিণত করেছে। তাদের ভাবনা,—এমনি করেই গুরুর আবির্ভাব-দিনের জন্ত প্রস্তুত হবে তারা। সেই আকাঙ্ক্ষায় অর্থহীন শাস্ত্র-বাক্য মুখস্থ করে 'নির্বোধের মত' না বুঝে পরের কথার অনুসরণ করে চলে অন্ধের মত।

অচলায়তন ও 'গুরু'

হত্যা,—এমন কি আত্মহত্যাতেও দ্বিধা নেই, কারণ কিছুকেই তাদের কঠিন বোধ হয় না, অর্থহীন সংস্কারের অন্ধতা তাদের হৃদয়কে,—অনুভব-শক্তিকে করেছে রুদ্ধ। এমন পরিবেশে পঞ্চক ছিল মুক্তির দূত। সারাজীবনে অচলায়তনের শিক্ষার প্রথম পাঠও সে কণ্ঠস্থ করে উঠতে পারে নি ; অথচ, অচলায়তনের অধিনায়ক মহাপঞ্চকেরই সে সহোদর! অচলায়তনের বাইরে দ্বার নিরুদ্ধ ; তবু, পঞ্চক বারে বারে ছুটে যায় দর্ভক ও শোনপাংশুদের পাড়ায়,—অচলায়তনের অধিবাসীদের কাছে যারা অস্পৃশ্য। ওখানেই দাঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় হয় পঞ্চকের। কর্মবীর শোনপাংশুদের শ্রম-সাধনা দাঠাকুরের প্রাণস্পর্শে কর্মলীলা,— তথা আনন্দ-সাধনায় পরিণত হয়। অবশেষে দর্ভক ও শোনপাংশুদের নিয়ে তিনি অচলায়তনের কঠিন প্রাচীরে আঘাত করে ধূলিসাৎ করেন তাকে ;—সেই মুক্ত আলো-বাতাসে এসে মহাপঞ্চক দেখেন, শোনপাংশুদের যিনি দাঠাকুর, তিনি অচলায়তনের চিরসাধ্য 'গুরু'। পঞ্চক এবং মহাপঞ্চক একসঙ্গে লাভ করল তাঁকে। পঞ্চক বিদ্রোহ ও মুক্তি, মহাপঞ্চক নিষ্ঠা, এবং বন্ধন। নিষ্ঠার সঙ্গে বিদ্রোহের শক্তির মিলনে 'গুরুর'—জীবনের

অপরূপ শাশ্বত স্বরূপের পরিচয় হল সম্পূর্ণ। অচলায়তনের পরিবর্তিত রূপ 'গুরু' রচিত হয়েছিল ১৩২৪ বাংলা সালে।

৩। বিকাশকালের উপন্যাস ও গল্প

(ক) উপন্যাস

এ যুগের প্রথম উপন্যাস চোখের বালি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন—উপন্যাসটি "১৩০৭ সালের গোড়ার দিকে 'বিনোদিনী' নামে কবির খাতার মধ্যে খসড়া-করা অবস্থায় পড়িয়াছিল।" পরে ১৩০৮ সালের শুরু থেকে এক বছর সাতমাস ধরে নব পর্যায়ে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় চোখের বালি নামে। এটি রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা-ঋদ্ধ,—আগাগোড়া তাঁর কবি-প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত প্রথম উপন্যাস। শুধু তাই নয়—চোখের বালিতেই রোমান্টিকতার মোহ-মুক্ত হয়ে বাংলা উপন্যাস মনস্তত্ত্ব-জটিল নর-নারীর বাস্তব জীবন-পথে প্রথম পদক্ষেপ করেছে। বাংলা কথা-সাহিত্যে চোখের বালি এক নব-চেতনার,—নতুন রচনাঙ্গিকের পথিকৃৎ। এই উপন্যাসে কবির সমাজ-চেতনা বিপ্লবি-সমুচিত দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছে। নরনারীর জীবনে যৌন-প্রভাবের দেহ-মনোময় রহস্য-জটিলতার এমন স্থমিত-সাহসী ব্যাখ্যা এর আগে হয় নি কখনো বাংলা সাহিত্যে। কবির চোখে

চোখেরবালির নবীন দৃষ্টি : নূতন আঙ্গিক

এমন বস্তু-ঘন দৃষ্টি, সত্যকে তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার এমন সফল তৎপরতা প্রায় অ-কল্পিত। জীবনীকার প্রভাতকুমার এই সৃষ্টি-রহস্য ব্যাখ্যার সফল প্রয়াস করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি স্মরণ করেছেন নৈবেদ্য-যুগের বৈশিষ্ট্য;—ক্ষণিকার কল্পলোক-চারণের সঙ্গে তুলনা করেছেন নৈবেদ্যের জ্ঞান-বিচার-ঋদ্ধ প্রাণ-চেতনার। এই পর্যায়ে জীবনের অখণ্ড সত্যকে কবি জ্ঞান দিয়ে যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখেছেন,—সমস্ত যুক্তি-বিচারের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট জীবনের অভিজ্ঞতাকে। এই জীবন-দর্শনের পেছনে কবির সহজ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ছিল সদা-সচেতন। সেই সঙ্গে বিচার করে, তলিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার আকাঙ্ক্ষা যুক্ত হয়ে তথ্য-বিচারের মধ্য দিয়ে বস্তুময় জীবনের সত্যপরিচয়-লোকে পৌঁছান গেছে। উপন্যাসকে 'আধুনিক জীবনের মহাকাব্য' বলা হয়; কবির অন্তর-চেতনার সঙ্গে তথ্য-

বিচারের বস্তু-সন্ধান-প্রয়াস যুক্ত হয়ে জীবনে এক অখণ্ড মহাকাব্যরূপ রচিত হয়েছে চোখেরবালি-তে।

সুবৃহৎ উপন্যাস চোখেরবালি ;—প্রধানতঃ দুইজোড়া চরিত্রের জীবন-সমস্যার সীমায় বারে বারে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে,—মহেন্দ্র, বিহারী, আশা, বিনোদিনী। প্রদীপ্ততম নারী-ব্যক্তিত্ব যেন রূপ ধরেছিল বিনোদিনীর মধ্যে। মহেন্দ্রের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব হয়েছিল তার। কিন্তু, মহেন্দ্র বড়লোকের খেয়ালী ছেলে ; বিধবা মা এবং খুড়ি-মা, রাজলক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণার আবাল্য স্নেহে তার খেয়াল-খেলা স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছিল ; তাতে মায়ের ইন্ধনই ছিল প্রবল। কেবল খেয়ালের বশেই মহেন্দ্র বিনোদিনীর সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে দিল ,—আবার আবাল্য-বন্ধু বিহারীর জন্যে কনে দেখতে গিয়ে ঐ খেয়ালের বশেই আশাকে বিয়ে করে বসল। তারপর, তার দাম্পত্য-জীবন সমাজ-শৃঙ্খলা-শোভনতার মাত্রা ছাড়িয়ে অতি উল্লাসে স্ফীত হয়ে উঠল। মায়ের চিত্ত তখন বধূর প্রতি ঈর্ষায় উৎপীড়িত হয়ে উঠেছিল ,—আশাকে নিয়ে মহেন্দ্র মাত্রাজ্ঞান হারিয়েছিল মায়ের সম্বন্ধেও। দ্বিতীয়তঃ আশা অন্নপূর্ণার স্নেহাস্পদা—তাঁর ভাইঝি,—যে অন্নপূর্ণা রাজলক্ষ্মীর চেয়েও মহেন্দ্রের বেশি ভক্তি-ভাজন। ক্রমে. অন্নপূর্ণাকে কাশী-বাসিনী হতে হল ; বিধবা বিনোদিনী ক্ষীণ আত্মীয়তার সূত্রে আশ্রয় পেল রাজলক্ষ্মীর গার্হস্থ্যে। প্রধানতঃ বধূর প্রতি ঈর্ষার বশেই রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীকে মহেন্দ্রের যৌবনমত্ত চিত্তের সামনে ঠেলে দিয়েছিলেন ; বিনোদিনীর আক্রোশও ক্ষিপ্ত হয়েছিল। আশা বালিকা, আশা অসহায়, পর-নির্ভরশীলা ; পুরুষকে ভোলাবার—জয় করবার কোনো অস্ত্রেই শান দিতে শেখেনি সে। তবু কেন সে মহেন্দ্রকে পাবে ?—আর বিনোদিনী নারীত্বের সকল শক্তিতে দীপ্তিময়ী হয়েও কেন হবে বৈধব্য-পীড়িত,—বঞ্চিত ? এই অন্ধ আক্রোশ তাকে মত্ত করেছিল আশার হাত থেকে মহেন্দ্রকে কেড়ে নেবার অসংগত সাধনে। মহেন্দ্রের মধ্যে প্রবৃত্তিটাই বড। তাই, বিনোদিনী-আগুনে সে পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। যে আগুন জ্বলল, তাতে কেবল আশাই নয়,—রাজলক্ষ্মীর সংসারও পুড়ে ছাই হবার যোগাড় হল ; চারদিকে অগ্নিজ্বালা ও অন্তর্দাহ নিয়ে শান্ত রইল কেবল বিহারী। আশার সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল ;—কিন্তু

মহেন্দ্র মাঝে থেকে কেড়ে নিয়েছিল ভাবী বন্ধু-পত্নীকে। তাতে বিহারীর সচেতন মনে কোনো নালিশ দেখা দেয় নি; বরং মহেন্দ্রের জন্য আশার সম্বন্ধে দাবি ত্যাগ করে সে খুশিই হয়েছিল;—আবাল্য বন্ধুত্বের মাধ্যমে সে মহেন্দ্রে'র ছায়া হয়ে গিয়েছিল, নিজের পৃথক্ ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব-ও ছিল তার চেতন মনের অতীত। তবু, বিয়ের পরেও আশার প্রতি বিহারীর মনের গোপন দুর্বলতা স্নেহের স্বচ্ছ ধারায় প্রকাশিত হত। সে কেবল একদা বাগ্‌দত্তা নারী বলেই নয়,—আশা অন্নপূর্ণার স্নেহের পুত্তলি ছিল বলেও। অন্নপূর্ণার প্রতি বিহারীর ভক্তি ধ্যানীর সাধনায় পরিণত হয়েছিল। ফলে, মহেন্দ্র-বিনোদিনীর অন্ধ মত্ততা থেকে আশাকে রক্ষা করার সহজ-সংগত চেষ্টা করতে গিয়ে জটিল ঘটনাবর্তে জড়িয়ে পড়ল সে-ও। অন্যদিকে, মহেন্দ্রকে নিয়ে বিনোদিনীর উন্মাদনাতে অবসাদ দেখা দিল অচিরে। মহেন্দ্রর মধ্যে প্রবৃত্তির বুভুক্ষা আছে, নেই পুরুষের দৃঢ়তা ও সংযম। অথচ, নারী হিসেবে বিনোদিনী ব্যক্তিত্বময়ী; কেবলই লোভাতুরা নয়। মহেন্দ্রকে সে অকল্পনীয় আয়াসহীনতার মধ্যে করায়ত্ত করেছে;—তারপর দিনে দিনে বিষণ্ন বিরক্ত হয়েছে তার চরিত্র-দীন দুর্বলতায়। সেই সঙ্গে সদা কর্তব্য-সচেতন নির্লোভ বিহারীর সুপ্ত ব্যক্তিত্ব তাকে করেছে বিস্মিত আকৃষ্ট। তারপরে সারা উপন্যাস ব্যাপী ঝড়ের বেগ যখন স্তিমিত হল, শান্ত, আশাহত, অনুতপ্ত মহেন্দ্র তখন ফিরে এসেছে মা'র মৃত্যুশয্যার পাশে;—আশাকে আজ আবার ফিরে পেয়েছে;—কিন্তু, সে আশা তার বল্লভা প্রিয়া নয়; গৃহধর্মের কর্তব্যপরায়ণা কর্ত্রী। বিহারীর প্রীতি এবং শ্রদ্ধাও সে হারিয়েছে; বিহারী গিয়েছে বালিতে দুঃস্থ কেরাণীদের সেবাব্রতে। কিন্তু, ততদিনে তার মধ্যেও সুপ্ত পৌরুষ জেগেছে বিনোদিনীর নারীত্বের আঘাতস্পর্শে। তবু বিহারী যখন স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে চেয়েছে, বিনোদিনী তখন সে আহ্বান বরণ করে নিতে পারেনি। নর-নারী হিসেবে বিহারী-বিনোদিনীর জীবন হয়েছে স্বেচ্ছা-পীড়িত রিক্ততায় ব্যর্থ।

কাব্য-ধর্মী শিল্প-পরিণতি

এখানেই রবীন্দ্রনাথের বৈপ্লবিক দৃষ্টির সীমায়তি সম্বন্ধে অভিযোগ করা হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে,—চোখের বালির শিল্পী আসলে নৈবেদ্যের কবি। জীবনের যৌন দাবি ও তার জটিল বিকাশ-পন্থাকে স্বীকার করেও তিনি

জানেন,—ভোগেই ভোগের শেষ নয়; ভোগের লোভকে স্বেচ্ছায়,—স্ব-শক্তিতে ত্যাগ করতে পারাতেই মনুষ্যত্বের পূর্ণতা। বিহারী-বিনোদিনীর জীবনে ট্রাজেডির অন্তরালে এই পূর্ণতার কাব্যিক ব্যঞ্জনা একেবারে দুর্লভ নয়।)

চোখের বালির পরের উপন্যাস নৌকাডুবি ১৩১০-১১ সালের বঙ্গদর্শনে ক্রম-প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু, বাইরের এই হিসাব না জানা থাকলে যে-কোনো পাঠক ভেতরের পরিচয় দেখে নৌকাডুবিকে চোখের বালির পূর্বের রচনা মনে করতে বাধ্য। উপন্যাস হিসেবে কি কল্পনায়, কি রূপাঙ্গিকে নৌকাডুবি যথার্থই দুর্বল। এই দুর্বলতার কারণ হিসেবে অনেকে মনে করেছেন, নৌকাডুবি কবি-মানসের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার বশে লেখা নয়। সাময়িকপত্রের অতি-তাড়নায় মনকে জোর করে চালাতে গিয়েই এমনটা হয়েছে। চোখের বালির জীবন-সচেতনা ও বস্তু-বিচার-ক্ষমতা এখানে আবার আচ্ছন্ন হয়েছে রোমান্টিক কল্পনার উচ্ছ্বাসে। তাও আবার কষ্ট-কল্পনা। বিয়ের পরে বাড়ি ফেরার পথে দুটি দম্পতি নৌকা-ডুবিতে বিপন্ন হয়; দুর্ঘটনার ফলে এক বধূ অপর বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে, তারপরে রমেশ ও কমলা দীর্ঘ তিন মাস স্বামি-স্ত্রী রূপে বাস করে। তিন মাসের শেষে রমেশ হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করল কমলা অপরের বিবাহিতা বধূ—তার নিজের স্ত্রী নয়, অমনি সে তাকে পাঠিয়ে দিলে মেয়ে স্কুলে। কমলা কিছুই জানতে পারল না;—ততদিনে রমেশের প্রতি তার দাম্পত্য আকর্ষণ দুর্নিবার হয়ে উঠেছে। নানা ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে কমলা, এবং তার যথার্থ স্বামী নলিনাক্ষের মিলন ঘটেছে উপন্যাস শেষে;—সেই সঙ্গে নলিনাক্ষের একনিষ্ঠ শিষ্যা ও সম্ভাবিতা পত্নী হেমনলিনীর আত্ম-অপসারণের কারুণ্য রোমান্সের আর একটি দিককে ঘনীভূত করেছে। অথচ, নৌকাডুবির সমস্যা মোটেই রোমান্টিক নয়,—একান্তভাবে নরনারীর যৌন জীবনের জটিল সমস্যা। দীর্ঘ তিন মাস একত্র স্বামি-স্ত্রী রূপে বাস করার পরে দুটি যুবক-যুবতীর আত্মমোক্ষণের সমস্যা কেবল মনের দিক থেকেই আসে না,—তার দেহগত জটিলতাও অনস্বীকার্য। যে-মুহূর্তে গল্পটি সেই সমস্যা-কেন্দ্রকে পরিহার করে গেছে,—তখনই উপন্যাস-ধর্মের পলায়নবৃত্তি হয়েছে সুস্পষ্ট।

নৌকাডুবি

'নৌকাডুবির পরের উপন্যাস 'গোরা' ১৩১৪ থেকে ১৩১৬ বাংলা সালের মধ্যে লেখা হয়েছিল। রবীন্দ্র-উপন্যাস-সাহিত্যে গোরা অপূর্ব; বাংলা সাহিত্যেও অনন্য। গোরা-কে উপন্যাস আকারে মহাকাব্য বলা হয়; তার পরিধিও মহাকাব্যের মতই সুবৃহৎ। অতবড় উপন্যাস কবি আর একখানিও লেখেননি। কিন্তু ঐটিই বড় কথা নয়। (গোরা-র অভিনবতা তার রচনা-কালের বহিরঙ্গ জীবন-প্রভাব ও সমকালীন কবি-মনোভাবের দ্বারা সম: পরিমাণে চিহ্নিত হয়েছে। এই উপন্যাস রচনার সময়ে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের দুই বছর নিঃশেষিত হয়েছে; খেয়া কাব্য রচনারও এক বছর হয়েছে অতিক্রান্ত।) খেয়া-কাব্যের সূত্রপাত,—আগেই দেখেছি,—জাতীয় আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কর্মক্ষেত্র থেকে কবি-মনের বিমুখতার উৎসমূলে। এই বিমুখতাকে পলায়ন-পরতা বলা চলে না কিছুতেই; এ-ছিল কবির পক্ষে আদর্শের সাধনা। স্বদেশী আন্দোলনের মূলে ছিল জাতীয়তাবাদ। আর, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে কবি অনুভব করেছিলেন, জাতীয়তাবাদের আদর্শ মানবধর্মকে খণ্ডিত করে,—মানুষের সঙ্গে মানুষের বিবাদকে করে তোলে অবারিত। ভারতবর্ষের মানুষেরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের নামে বৃটিশশক্তিকে আঘাত করতে চেয়েছে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, আবার বৃটিশ জাতীয়তার নামে ইংরেজ শাসক উৎপীড়ন করেছে ভারতীয় প্রজাদের! তাতে দ্বন্দ্বের জটিলতাই বাড়ে, মনুষ্যত্ব হয় আহত, মানুষের উদ্ধার হয় না। (খেয়াতেই কবি বুঝেছিলেন,—মানব-ধর্মের মুক্তি মানব আত্মার সমৃদ্ধিতে,—জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সর্ব-জনীন মানব-প্রেমের শক্তিতে। এই সত্যবোধকে বাংলার, তথা ভারতের প্রথম জাতীয় সংগ্রামের ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করে গোরার প্লট পরিকল্পনা করলেন কবি।)

গোরা

সেকালের স্বাদেশিকতা-বোধের সঙ্গে হিন্দু-চেতনাও অঙ্গাঙ্গি-যুক্ত হয়েছিল,—সেদিন ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু জাতীয়-বুদ্ধি ছিল অভিন্ন। সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আনন্দমঠে দেশমাতৃকাকে হিন্দু শক্তির দৈবী-কল্পনায় পরিমণ্ডিত করেছিলেন। উনিশ শতক থেকেই জাতীয় আন্দোলনেও রাষ্ট্র-চিন্তা ও হিন্দুধর্ম-চিন্তা অভিন্ন হয়ে পড়েছিল। তাই একদিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে জাতীয়তা-বোধের প্রতিঘাত-স্পৃহা যেমন ছিল, তেমনি হিন্দু-

ধর্মবোধের অন্ধ সংস্কারও মাঝে মাঝে জড়িয়ে গিয়েছিল তার মধ্যে। খেয়া-উত্তর কবির মনো-ঋতুতে নিখিল-প্রেমের হাওয়া দিতে আরম্ভ করেছে, ধর্ম বলতে তিনি মানুষের ধর্মকেই উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছেন তখন থেকে। সে-ধর্মের প্রতিষ্ঠা নিখিল-মানব-প্রেমে। উপন্যাসের নায়ক গোরার জীবনে সাম্প্রদায়িক ধর্মসংস্কারের অর্থহীনতা চিত্রিত করে পরিণামী প্রেম-সৌন্দর্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন কাহিনী-শেষে। মানব-মুক্তি সন্ধানের পক্ষে সাম্প্রদায়িক ধর্ম-চেতনা বা সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবোধ কত অর্থহীন, তার জীবন্ত প্রতীক গোরা। জাতিতে সে আইরিশ, ভারতের তৎকালীন শাসক-দেশের নাগরিক। অথচ আশৈশব হিন্দুপরিবারে প্রতিপালিত হয়ে হিন্দুর নিষ্ঠা ও ভারতীয়ের জাতীয় চিন্তার গোঁড়ামি তাকে অন্ধ করেছিল। অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতার আর এক রূপ বিভাম্বিত হয়েছে বরদাসুন্দরী ও হারাণবাবুর সঙ্কীর্ণ ব্রাহ্ম-ধর্মবোধের অন্ধতায়। এই নীরন্ধ্র গোঁডামির মধ্যে গোরার জীবনে প্রথম মুক্তির আলো সুচরিতা। দিনে দিনে স্বাধীনতা-সংগ্রামের দুর্যোগ-ঘন মুহূর্তে গোরা-সুচরিতার প্রেমের বিকাশ ও পরিণতি ঘটেছে ধাপে ধাপে। তবু সংস্কারের গোঁডামি ঘুচতে চায় না, সেই চরম মুহূর্তে মহিমের মুখে গোরা নিজের সত্যপরিচয় শুনতে পায়। তারপরে সে-বিষয়ে যখনই নিঃসংশয় হয়েছে, সেই মুহূর্তেই ছুটে যায় সুচরিতার কাছে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ মন্তব্য করেছেন,—(সুচরিতাকে গ্রহণের মধ্য দিয়ে গোরার ভারত-হিত-ব্রতের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, কেবল তার আকার-প্রকার ও আদর্শের বদল হয়েছিল,—"সুচরিতার প্রেমই যেন তাহার বৈদ্যুতিক আকর্ষণের তেজে গোরার অন্তর্নিহিত সারাংশটিকে বাহ্যসংস্কারের কঠিন বহিরাবরণ হইতে মুক্তি দিয়া নিবিড় আলিঙ্গনে তাহাকে একান্ত করিয়া লইয়াছে।) তাহাদের বিবাহ দুই প্রজ্বলিত মানবাত্মার একান্ত মিলন।" খেয়ার কবি-মনোভাব প্রেমের রাখীতে মানবাত্মার মহা-মিলনের মালিকা রচনা করেছে। সেই আদর্শ, সেই প্রত্যয় গোরা উপন্যাসে বাঙালি জীবনের ঐতিহাসিক পটভূমিতে সর্বজনীন ব্যাপক আকারে প্রকাশ পেয়েছে। বিনয়-ললিতা, পরেশ বাবু, আনন্দময়ী, মহিম ইত্যাদি চরিত্র এবং শহর ও গ্রামবাংলার ব্যাপক জীবন-চিত্রায়ণ একে মহাকাব্যের ব্যাপ্তি দিয়েছে,

কাহিনী : জীবনাবেদন

সেই সঙ্গে কবির আত্মগত প্রত্যয়ের অবিচলতা দিয়েছে তাতে মন্ময় কাব্যের স্বাদ। উপন্যাসের আকারে গোরা কবির লেখা জীবন-কাব্য।

(খ) ছোটগল্প

যেমন উপন্যাস, তেমনি এ যুগের ছোটগল্পেও, আবেগ দিয়ে নয়, বিচার ও অভিজ্ঞতা দিয়ে জীবনকে নতুন করে প্রত্যক্ষ করার প্রেরণা বিশেষভাবে শিল্পরূপ পেয়েছে। ১৩০৭ বাংলা সালে 'গল্প' নামে একটি ছোট গল্পের সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল,—আসলে গল্পগুচ্ছ দ্বিতীয় খণ্ডের আদিরূপ এটি। এতে গ্রন্থিত অধিকাংশ গল্পই ১৩০২ সাল বা তার আগে লেখা। এ-গুলো মূলতঃ পদ্মাপারের ফসল,—উল্লেখ্য গল্পগুলির মধ্যে আছে জীবিত ও মৃত, সুভা, অতিথি, ক্ষুধিতপাষাণ, মেঘ ও রৌদ্র ইত্যাদি। ১৩০২ সালের পরে লেখা কয়টি মাত্র গল্প আছে, দুরাশা, অধ্যাপক, দৃষ্টিদান ইত্যাদি। এই সব গল্প ১৩০৫ সালে বা তার কাছাকাছি সময়ে লেখা হয়েছিল,—অর্থাৎ এগুলো চিত্রা-উত্তর আলোচ্য ঋতুর সৃষ্টি। ফলে, জীবনকে নিবিড়ভাবে অনুভব ও উপভোগ করার আনন্দই এই গল্পগুলির সব নয়,—তাকে বিচার করে,—তার অন্তর্বর্তী মনস্তত্ত্বকে খুঁটিয়ে দেখার আকাঙ্ক্ষা থেকেই এরা স্বাদে ও আঙ্গিকে পদ্মাপারের গল্প-গুচ্ছ থেকে বিশেষিত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে মনস্তত্ত্ব ও জীবন-সমস্যা বিশ্লেষণের এই প্রবণতা ঐতিহাসিক সাফল্য লাভ করেছিল নষ্টনীড়-এ। গল্পটি ১৩০৭ সালে লেখা হয়েছিল; চোখের বালি উপন্যাস রচনার প্রায় সমকালে। চোখের বালির প্রায় সমধর্মী জীবনসমস্যা আরো একধাপ যেন এগিয়ে গেছে নষ্টনীড়-এ, তেমনি মানবিক সংবেদনার মধ্যে তা সংহত-ও হয়েছে ছোটগল্পের ব্যঞ্জনাধর্মী সংক্ষিপ্ত আধারে। এ-যুগে লেখা অন্যান্য বিখ্যাত গল্পের মধ্যে আছে শুভদৃষ্টি, দর্পহরণ, মাল্যদান, মাষ্টারমশায় ইত্যাদি। কর্মফল গল্প কুন্তলীন পুরস্কারের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল, ১৩১০ বাংলা সালে। গল্পটি 'কুন্তলীন আফিস হইতে' পৃথক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

ছোট গল্প

৪। বিকাশ-যুগের গদ্য রচনাবলী

রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতই তাঁর গদ্য নিবন্ধ ও নানা-বিষয়ক গদ্য রচনাবলীও সংখ্যাতীত। সব কয়টির পৃথক আলোচনা সম্ভব নয়। কেবল, গ্রন্থিত রচনাবলীর প্রসঙ্গ উদ্ধার করেই বিরত হব। এই পর্যায়ের প্রথম প্রকাশিত গদ্য গ্রন্থ পঞ্চভূতেই (১৩০৪) রবীন্দ্রনাথের গদ্য সৃষ্টির বিশিষ্টতা নিঃসংশয় প্রকাশ পেয়েছে। ১২৯৯ বাংলা সাল থেকে ১৩০২ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে এই গদ্য রচনাগুলি লিখিত হয়েছিল ; পরে গ্রন্থাকারে সংকলিত হয় ১৩০৪ সালে। ফলে, রচনাগুলিতে একাধিক কবি-মনোভাবের প্রভাব থাকলেও, এদের সৃষ্টির মূলে পরিকল্পনার একটি অখণ্ডতা ছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবার সময় কবি সে কথা বিশদ্ করেছেন,—শাস্ত্রমতে পঞ্চভূতের সমষ্টিই জগৎ, মানুষও তাই। প্রত্যেক মানুষই প্রায় পাঁচটি মানুষের সাম্মিলিত ফল। এই পাঁচটি উপাদানকে কবি নাম দিয়েছেন,—ক্ষিতি, স্রোতস্বিনী, দীপ্তি, সমীর ও ব্যোম্।

গদ্য-নিবন্ধ পঞ্চভূত

এরা যথাক্রমে পঞ্চভূতের ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম্। এই পাত্র-পাত্রীদের নিয়ে একটি তর্ক-সভা গড়ে উঠেছে,—তার সভাপতি ভূতনাথ। ইনি স্বয়ং কবি ; পঞ্চভূতের অধিপতি ইনি! মানবের মধ্যবর্তী বিভিন্ন উপাদান, পাঞ্চভৌতিক উপকরণ নিয়েই অখণ্ড মানুষের প্রকাশ। ক্ষিতির মধ্যে আছে ভৌমিক (material) প্রবণতার উৎস ; অপ্-এর গুণ করুণা, প্রাণের বহমানতা ; তেজ-এর ধর্ম দীপ্তি,—জ্ঞান, উৎসাহ ; সমীরের অন্তর-চেতনার বৈশিষ্ট্য বায়বীয় লঘুতায় ; ব্যোম ব্যোমচারী ভাব-সর্বস্ব। ক্ষিতির সঙ্গে ব্যোম, অপ ও সমীরের সঙ্গে তেজ-এর সমন্বয়ের মধ্যেই মানুষের ভাব-সম্পূর্ণতা। পঞ্চভূতের ডায়েরিতে জীবনের যে-কোনো জিজ্ঞাসাকে আশ্রয় করে কবি তার বিচার করেছেন ক্ষিতি, অপ্ ইত্যাদির খণ্ড খণ্ড দৃষ্টিতে,তারপরে সকল খণ্ড-ভাবনার অখণ্ড সমাধান খুঁজেছেন ভূতনাথের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে। এ-কেবল বুদ্ধি নিয়ে খেয়াল-খেলা নয়,—কবির অনুভব দিয়ে জীবনের বিচার-সিদ্ধ রূপকে অনুভব করবার চেষ্টাও। কবি-মনীষীর বোধ-চেতনার প্রণোদনা অভিনব শিল্প-রূপ পেয়েছে পঞ্চভূতের ডায়েরিতে।

বস্তুতঃ, সর্বযুগে রবীন্দ্রনাথের সকল গদ্য রচনার মধ্যেই তাঁর কালজয়ী

মনীষা কবির অনুভবের ধারায় বিগলিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। 'শ্রীগোপাল হালদার পঞ্চভূতকে বাংলা ভাষার প্রথম Belle letters বলেছেন; কবির সব লেখাই তা নয় বটে; কিন্তু সর্বত্রই, এমনকি বিতর্কমূলক বিষয়ও তাঁর শিল্পি-প্রাণের স্পর্শে অভিনব কাব্য-স্বাদী হয়ে উঠেছে।

আলোচ্য কাল-সীমায় প্রকাশিত গদ্য-গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখ্য আত্মশক্তি (১৩১২), ভারতবর্ষ (১৩১২), রাজা-প্রজা (১৩১৫), সমূহ (১৩১৫), স্বদেশ (১৩১৫), সমাজ (১৩১৫), শিক্ষা (১৩১৫) ইত্যাদি। গ্রন্থাবলীর নামেই তাদের পরিচয় রয়েছে। সমকালীন বাংলা, তথা ভারতেও স্বাদেশিকতার তাৎপর্য ছিল স্বদেশ-আত্মার বাণী-মূর্তির সন্ধান।

'ভারতবর্ষ'-গ্রন্থাবলী ও শিক্ষা

শেষোক্ত গ্রন্থটি ছাড়া আর সবকয়টিরই বিচিত্র নিবন্ধে সমকালীন সমাজ, রাষ্ট্র ও দেশ-চেতনার আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে কবি-ধ্যানের শাশ্বত ভারত-চেতনা অখণ্ড রূপ পেয়েছে। 'শিক্ষা' নামক গ্রন্থে ভারতীয় শিক্ষা-সমস্যার আলোকে শিক্ষার সর্বজনীন চিরন্তন স্বভাবেরই প্রাণময় রূপ-চিত্র অঙ্কন করেছেন। এই গ্রন্থে কবির সুগভীর মনীষা আজও বিশ্ব-শিক্ষাবিদদের অনুধ্যানের বিষয় হয়ে আছে। স্বদেশ ও সমাজ সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলীতে আলোচনার চিন্তা-গভীরতা দেশ-কালাতীত মূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু, এই সব গদ্য লেখায় কবির হাতের শিল্পরচনার স্বাদও সংশয়াতীত। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠকের অকুণ্ঠ নিষ্ঠাকে আকর্ষণ করে নেয়, কেবল যুক্তির দৃঢ়তা দিয়ে নয়, প্রত্যয়ের একান্ত অবিচলতা দিয়েই।

আলোচ্য সময়ের সাহিত্য-আলোচনামূলক গ্রন্থাবলীতে এই বৈশিষ্ট্য সব চেয়ে বেশি বিকশিত হয়েছে। এদের মধ্যে আছে প্রাচীন সাহিত্য, লোক-

সাহিত্য-বিষয়ক গ্রন্থ

সাহিত্য, সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য ইত্যাদি। প্রথম দুটি গ্রন্থের বিষয়বস্তু তাদের নামেতেই প্রকাশিত। কেবল এই সঙ্গে স্মরণ করি, আধুনিক বাংলা, তথা ভারতেরও সাহিত্য-ভাবনায় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রাণমূল্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রথমে রবীন্দ্রনাথই;—আমাদের উপেক্ষিত গ্রামীণ লোকসংগীতের স্বর্ণ-লোকেরও দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন তিনি। প্রবীণ মনীষী অতুল গুপ্ত জানিয়েছেন,—তাঁদের ছাত্রজীবনে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজ অধ্যাপকেরা ইংরেজি

সাহিত্যের পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে ইংরেজ জাতির শাশ্বত প্রাণধর্মকে যেন রক্ত-মাংসের স্পষ্টতায় জীবন্ত করে তুলতেন ; অপর পক্ষে সংস্কৃত সাহিত্যের ক্লাস-এ তাঁদের কেবল ব্যাকরণ ও অলংকারের সূত্রই মুখস্থ করতে হত।

প্রাচীন সাহিত্য ও লোকসাহিত্য

সংস্কৃত সাহিত্যেও যে শাশ্বত ভারতীয় প্রাণের স্পন্দন ধ্বনিত হয়েছে, সে কথা প্রথম তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন প্রাচীন সাহিত্যে নিবদ্ধ রবীন্দ্র-রচনাবলীর সাহায্যে। অপরপক্ষে বাউল প্রভৃতি লোকসংগীতকে কবি প্রথম বিশ্বজনীন মর্যাদা দিয়েছিলেন তাঁর হিবার্ট বক্তৃতা ও ভারতীয় দর্শন-সভার সভাপতির ভাষণে। বিখ্যাত গগন হরকরা ছিলেন কবির প্রত্যক্ষ পরিচিত। কেবল মরমিয়া গান নয়, ছড়া, কবিগান প্রভৃতি লোক-সাহিত্যকে কবি অমরতা দিয়েছেন লোকসাহিত্য গ্রন্থে।

সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-তত্ত্ব বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ। কিন্তু, তত্ত্বের

সাহিত্য

চেয়ে অনুভবের সত্যই যে এই রচনার সর্বত্র অনুস্যূত হয়ে আছে, এ-কথা কবি নিজেই অকুণ্ঠ ভাষায় উল্লেখ করেছেন বারে বারে।

আধুনিক সাহিত্য গ্রন্থে আছে বিহারীলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র ইত্যাদি

আধুনিক সাহিত্য

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও তাঁদের সাহিত্য-কীর্তির সমালোচনা-প্রয়াস। বিচারের তীক্ষ্ণতার সঙ্গে অনুভবের অনন্য গভীরতা যুক্ত হয়ে এই রচনাকে যথার্থ সমালোচনার মর্যাদা দিয়েছে।

ব্যক্তিগত অনুভূতির সঙ্গে দার্শনিক ধ্যান-গম্ভীরতায় বিধৃত হয়ে কবির ধর্মচিন্তা একাধারে হয়ে উঠেছে অধ্যাত্ম সত্য, ও দার্শনিক পরাবিদ্যার

ধর্ম ও শান্তিনিকেতন প্রবন্ধাবলী

আকর। আলোচ্য সময়ে সংকলিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে আছে ধর্ম (১৩১৫), শান্তিনিকেতন প্রবন্ধাবলী প্রথম আটখণ্ড (১৩১৫-১৩১৬), নবম থেকে একাদশ খণ্ড (১৩১৭ সাল) দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খণ্ড (১৩১৮ সাল) চতুর্দশ খণ্ড (১৩২১ বাংলা সাল), পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ খণ্ড (১৩২২ সাল)।

এ সময়ে আত্মজীবনী ও পর-জীবনীমূলক গ্রন্থও কবি লিখেছিলেন একাধিক। চারিত্রপূজা (১৩১৪) আসলে ভারতবর্ষীয় ব্যক্তিত্বধর্মের নব-আবিষ্কার ও নবীন উদ্‌ঘাটন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অপরাজেয় পৌরুষ

ও অক্ষয় মনুষ্যত্ব, রামমোহন রায়ের আত্ম-নিহিত ভারতের পথিক-ধর্ম, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধ্যানে ঔপনিষদিক জীবনাদর্শের সত্য-রূপকে আবিষ্কার করে পূর্ণ মূল্যে উদ্ভাসিত করেছেন পাঠকের সামনে। চারিত্রপূজা ধ্যানীর আবিষ্কার এবং কবির সৃষ্টি,—একই সঙ্গে শিল্প ও সাধনা।

চারিত্রপূজা

জীবনস্মৃতিতে (১৩১৯ সাল) কবি নিজের জীবন নিয়ে শিল্প সাধনার নবীন প্রচেষ্টা করেছেন। জীবনস্মৃতি জীবনী নয়, নিজের অতীত জীবনের স্মৃতিচারণার মধ্যে কবি-প্রাণের আত্মলীলা-সন্ধান। গ্রন্থারম্ভে কবি বলেছেন—"স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক, সে ছবিই আঁকে।... বস্তুতঃ তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।" জীবনস্মৃতিতে স্মৃতির পটে নিজের জীবনের ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ,—ইতিহাস লেখেন নি।

জীবনস্মৃতি

নিজের জীবন নিয়ে ছবি আঁকবার আর এক অপরূপ চেষ্টা ছিন্নপত্র (১৩১৯)। জীবনস্মৃতির এক বছরে, একই মাসে ছিন্নপত্র গ্রন্থিত হয়েছিল ; একই মনোঋতুর প্রভাব আছে তাতে। প্রধানতঃ উত্তর-বঙ্গের জীবনের তীরে বসে লেখা অসংখ্য পত্রকে নিজে সম্পাদনা করে সংকলন করেছিলেন কবি এতে। ফলে, সম্পাদকের নির্মম ছুরির আঘাতে কবির ব্যক্তি-মনের স্পর্শ প্রায়ই তিরোহিত হয়েছে। বিশ্বভারতীর প্রকাশন বিভাগ রবীন্দ্র-শতবর্ষে সেই অতৃপ্তি মোচন করেছেন 'ছিন্ন পত্রাবলী' প্রকাশ করে। পত্র-সাহিত্যের মৌল স্বাদ কবি-সম্পাদিত ছিন্নপত্রে প্রায়ই দুর্লভ। অনেকে অভিযোগ করেছেন, পরবর্তীকালের কবি তাঁর অতীত জীবনকে যে স্বপ্ন-মূর্তিতে কল্পনা করেছিলেন, তারই আলোকে পুরাতন চিঠিগুলোকে নূতন করে কেটে-ছেটে-লিখে সম্পাদনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ ছিন্নপত্রের যথার্থ পরিচয় এখানেই ;—এটিও স্মৃতির পটে আঁকা জীবনের ছবি। এই গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্যও অতুল্য ; উন্মেষ-যুগের কাব্য ও ছোটগল্পের অনেকগুলির রচনার মূল-নিহিত প্রবণতা ও পটভূমিকে এই চিঠিগুলি তথ্যের সঙ্গে উদ্ধার করেছে।

বিচিত্র প্রবন্ধে (১৩১৪) কবি নিজের জীবনকে নয়,—আপন অতল-গভীর শিল্পিসত্তাকে নিত্য নূতন করে এঁকেছেন বিচিত্র বিষয়ের মধ্য দিয়ে। এটি রবীন্দ্রনাথের লেখা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-স্বাদী গদ্য প্রবন্ধ-গ্রন্থ।

বিচিত্র প্রবন্ধ

রবীন্দ্র-রচনার পরিণতি যুগ

১। পরিণতি-যুগের কাব্য

গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির ঋতুর পরে রবীন্দ্র-কাব্যে নতুন ঋতুর সূচনা 'বলাকা' নিয়ে। এখানেই রবীন্দ্র-চেতনায় পরিণতির সুর জেগেছে প্রথম। মাটির তলায় বাডতে বাডতে বীজ একদিন অঙ্কুর হয়ে দেখা দেয় মাটির ওপরে; তারও পরে চলে তার বেড়ে ওঠার সাধনা,—অঙ্কুর একদিন মহামহীরুহে পরিণত হয়। তারপর সে আর বাড়ে না; বাইরের বৃদ্ধি ও বিকাশ পূর্ণ হয়ে হয় স্তব্ধ। গাছের অন্তর্নিহিত শক্তি কিন্তু তখনো থেমে থাকে না; বেড়ে ওঠার পর তখন গাছের জীবনে চলতে থাকে হয়ে-ওঠার সাধনা। সে হয়ে-ওঠা কেবল ফলে-ফুলে-পত্রে,—বাইরের প্রকাশে নয়,—অন্তরে অন্তরে, নাড়িতে নাড়িতে ঘন থেকে ঘনতর রসের সঞ্চয়ে। রবীন্দ্র-কবি-প্রতিভার বিকাশ-পরিণতির পক্ষেও সেই একই কথা। উভয় ক্ষেত্রেই, পরিণতির চরম ক্ষণেও যার বিকাশ, সে ঐ বীজের ভেতরকার মৌল শক্তিরই। নিজের বিশেষ দেশ-কালের ভূমিতে দাঁড়িয়ে, আপন চৈতন্যের মধ্যে জীবনের দেশ-কালাতীত সর্বজনীন সত্য স্বরূপটিকে খুঁজে দেখাই রবীন্দ্র-কবি-স্বভাবের মূলগত প্রবণতা,—একথা বলেছি। চিত্রা-যুগে আবেগ দিয়ে, নৈবেদ্য-যুগে জ্ঞান-কর্ম অভিজ্ঞতার মধ্যে সেই সত্যের পরিচয় আবিষ্কার করেছিলেন কবি। এবারে, গীতাঞ্জলি-যুগের ভাব ও জ্ঞানের সত্য, উপলব্ধির সত্যে,—আত্মার সত্যে পরিণত হয়েছে :—

রবীন্দ্র-রচনায় পরিণতির স্বরূপ

"বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।"

কবির পক্ষে এ-অনুভব আজ একান্তভাবে আত্মার আত্মীয় পরম সত্য; কারণ, আজ আর,—

"গোপনে প্রেম রয়না ঘরে,
আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে।
সবার তুমি আনন্দ ধন, হে প্রিয়,
আনন্দ সেই আমারো।"

উপলব্ধির এই আনন্দময় সম্পূর্ণতাই গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি-যুগের পরম সম্পদ। অনাপেক্ষিক শিল্প-বিচারে এই কাব্য-ত্রয়ীর মূল্য যাই হোক, কবি-চেতনার মহীরূহ-রূপ পূর্ণতা পেয়েছে এই পর্যায়ের ফলশ্রুতিতে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাসে এই সত্য একান্ত মূল্যবান। এর পরে বাইরের প্রকাশের একটি মাত্র ধাপ লক্ষ্য করি,—সে ঐ মানস পরিণতির রূপ-সম্পূর্ণতার। সেই ধাপ বিকশিত হয়েছে বলাকা থেকে মহুয়া পর্যন্ত কাব্য-ধারায়। তারপরে বাইরের দিক থেকে আর পরিবর্তন নেই; কেবল অন্তর-চেতনার পরিণতি চলেছে, কবির মগ্ন-চৈতন্যের গহনে, ঘন থেকে ঘনতর রস-শক্তির আনন্দ-সঞ্চয়ে। সৃষ্টির মধ্যে কবি-কর্মের যুগ শেষ হয়েছে বলাকা-পর্বে; তারপরে নিজের মধ্যে নিজের হয়ে-ওঠার আনন্দ-সাধনা। কিন্তু, কবি-কর্মের এই শেষ পর্যায় কর্ম-সমাপ্তির নয়,—কর্ম-সম্পূর্ণতার। তাই, বলাকা কাব্যের প্রাথমিক কবিতাবলীতে নির্বন্ধন, অকারণ কর্ম-উচ্ছ্বাসের আবেগ-স্ফীতি রয়েছে; অন্যদিকে এই কর্ম-প্রচেষ্টায় পূর্ণতার,—পরিণামী সত্য-বোধের আনন্দ-সুন্দর রূপ ক্রম-প্রকট হয়েছে বলাকা থেকে পূরবী-মহুয়া-র পরম্পরিত ধারায়।

পরিণতি-মুখের কাব্য বলাকা

বলাকায় নবীন যৌবনের আহ্বান শুনেছেন কবি,—'যৌবনের পত্র' পেয়েছেন :—

"পউসের পাতা ঝরা তপোবনে
আজি কী কারণে
টলিয়া পড়িল আসি বসন্তের মাতাল বাতাস;
* * *
বহুদিনকার
ভুলে যাওয়া যৌবন আমার
সহসা কি মনে করে

পত্র তার পাঠায়েছে মোরে
উচ্ছৃঙ্খল বসন্তের হাতে
অকস্মাৎ সংগীতের ইঙ্গিতের সাথে।

* * *

লিখেছে সে—
এসো এসো, চলে এসো বয়সের জীর্ণ পথশেষে,
মরণের সিংহদ্বার
হয়ে এসো পার;
ফেলে এসো ক্লান্ত উপহার।"

দেহের বহিরঙ্গে বয়সের জীর্ণতা পথ-শেষে এনে দাঁড় করিয়েছে। তবু, অন্তরঙ্গে জেগে উঠেছে যৌবনের নব অনুভব; যৌবনের এই শক্তি দেহের রিক্ততার মধ্যে শেষ হয়ে যায় না; দেহাধারকে বিদীর্ণ করে মৃত্যু-তীর্ণ অমরতার আসনে হয় চির-প্রতিষ্ঠিত। অজরামর-অক্ষয় সত্যের উপলব্ধিতে বলিষ্ঠ আত্মার এ যৌবন-শক্তি। এবার থেকে এই আত্মশক্তিতেই গতির পথে কবি-প্রাণের নবীন অভিযাত্রা। বলাকায় তার সূচনা। নব-যাত্রা-পথের ইতিহাসে 'বলাকা' আর এক ঋতু-সন্ধির কাব্য। গীতাঞ্জলি-যুগের আত্মগুহান্বিত একান্ত আন্তর উপলব্ধির গোপন জীবন-লোক থেকে নিরাবরণ বিশ্বলোকে বেরিয়ে আসার প্রথম বেদনা ও উচ্ছ্বাস এই কাব্যের প্রথমাংশে বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে আছে। অবশ্য চেতনার গোপনতা থেকে মনকে টেনে বার করবার এই চেষ্টায় বাইরের প্রেরণারও একটা ইতিহাস আছে।

১৩২১ বাংলা সালে বলাকা-গুচ্ছের কবিতা রচনার শুরু, প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের দানব-লীলায় তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে পশ্চিমের আকাশ। তার একবছর আগে নোবেল পুরস্কার দিয়ে প্রতীচ্যের জীবন-লক্ষ্মী প্রাচ্যের কবিকে বরণ করে নিয়েছিলেন নিজের প্রাণ-লোকে। নোবেল পুরস্কার পাবার কিছুদিন আগে কবি ব্যাপকভাবে পশ্চিম ভ্রমণ করে এসেছিলেন। মহাযুদ্ধের মরণান্তিক প্রস্তুতি তখন চল্‌ছে; একদিকে প্রাণের কী অফুরন্ত শক্তি তার মাঝে দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ছিল—আর একদিকে প্রাণ দিয়েও প্রাণ-নাশের সে কী ভীষণ সর্বনাশা প্রয়াস! কবিকে তা অভিভূত করেছিল। তারপরে যুদ্ধ যেদিন বাঁধল, এবং তার লেলিহ অগ্নিশিখা পৃথিবীর মর্মে মর্মে,—মানব-ধর্মের মূলে

বলাকা-কাব্যের পূর্ব-সূত্র ও ভাব-পরিণাম

জ্বালা ধরিয়ে দিল, তখন আপন সত্য-উপলব্ধির দাহহীন আলোক-বর্তিকা নিয়ে মানুষের জীবন-ভূমিতে,—কর্ম-ভূমিতে এসে না দাঁড়িয়ে তাঁর উপায় ছিল না। রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ ভারতীয়তার সাধক-কবি ; ভারতবর্ষের শাশ্বত জীবন-মূল্য তাঁর কাব্য-কবিতায় নবীন বিশ্বাসে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু, আজ তিনি বিশ্বের কবি ; নোবেল পুরস্কার দিয়ে কেবল তাঁর অতুল কাব্য-কীর্তিকেই নয়,—তাঁর মরণজয়ী প্রত্যয়কেই বরণমাল্য দিয়েছিল মৃত্যু-পথ-যাত্রী প্রতীচ্য পৃথিবী। তাই, সভ্য পৃথিবীর মরণ-লগ্নে আগুনের পথে ছুটে বেরোবার এলো নতুন আহ্বান :—

এ আহ্বান অমোঘ ; নিভৃত আত্মার নির্মোক ভেদ করে কবিকে বেরিয়ে আস্‌তেই হয়েছে,—তাতে উল্লাস অপার,—নতুনের পায়ে নিজেকে অঞ্জলি দেবার সাধন-বেদনাও নিরবধি :—

"ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা
ঝংকার-মুখরা এই ভুবন-মেখলা,
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।
নাড়িতে নাড়িতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি,
বক্ষে তোর উঠে রণরণি।
নাহি জানে কেউ
রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ
কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা।"

বেরিয়ে আসার পেছনে বাইরের দাবি ছিল,—কিন্তু একবার বিশ্ব-জীবনের পথে কবি-প্রাণ বেরিয়ে যখন পড়েছে,—তখন নিজ আত্মার অক্ষয় প্রত্যয়ের পাথেয় দিয়েই পথের কড়ি দিয়েছে মিটিয়ে,—

তখন :—

"শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।"

তাই,—

"এতদিনে আবার মোরে
বিষম জোরে ডাক দিয়েছে আকাশ পাতাল।

লাঞ্ছিতেরে কে রে থামায় ?
ঘর-ছাড়ানো বাতাস আমায় করল মাতাল।"

কিন্তু, এই সব চলা,—সব সাধনার পেছনে ছড়িয়ে আছে গীতাঞ্জলি-যুগের উপলব্ধির আনন্দ-প্রত্যয়,—"আমায় দেখ্‌বে বলে তোমার অসীম কৌতূহল. নইলে ত এই সূর্যতারা সকলি নিষ্ফল।"—নিজের সেই অনন্ত পরিচয়কে নব-পরিচিত করবার সাধনার পথে বেরিয়েছেন এবার গীতাঞ্জলির কবি। 'বলাকা'র একদিকে গতি,—অপর দিকে মুক্তি-পরিণতির ধ্রুব প্রত্যয় সমসূত্রে বাঁধা পড়েছে।

বলাকার পরের কাব্য 'পলাতকা' (১৩২৫)। পলাতকা আসলে কবিতার আধারে গল্প ;—নিত্য-দিনের চোখে-দেখা জীবনের দরদ-স্নিগ্ধ সুরভি-সার। জীর্ণ-দেহের পর্ণ-পুটে চির-যৌবনের অক্ষয় প্রেমানুভব নিয়ে জীবনের পথে বেরিয়েছেন কবি এবার,—জীবনের বিরুদ্ধে নালিশ থাকলেও আক্রোশ নেই কোথাও ; কিন্তু তার প্রতি করুণা ও মমতা অপার। তাই, দুঃখী জীবনের তাপ-গভীর বেদনা করুণা-সুন্দর রূপ পেয়েছে,—'ফাঁকি', 'নিষ্কৃতি' প্রভৃতি কবিতায়। পলাতকার কবি-মনোভাবের সুর 'শেষ গান'-এ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :—

পলাতকা

"তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের সূর্যডোবার বেলায়
তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকৃতে দিনের আলো—
বলে নে ভাই, এই যে দেখা, এই যে ছোঁওয়া, এই ভালো এই ভালো।
এই ভালো আজ এ সংগমে কান্না হাসির গঙ্গা-যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।
এই তো ভালো ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া এই ভাষায়,
তারার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে-পড়া নূতন প্রাণের আশায়।"

বিদায়-পথ-যাত্রী অক্ষুব্ধ কবি-প্রাণের জীবন-সম্ভোগের রস-কাব্য পলাতকা।

পলাতকার পরে অনেক দিন আর কবিতা লেখা হয় নি ;—তিন বছর পরে ১৩২৮ বাংলা সালে শিশু ভোলানাথ-এর কবিতা-গুচ্ছ রচিত হতে আরম্ভ করে। অনেক দিনের পরে মনে অকস্মাৎ শিশু-চেতনা আবার জেগে উঠেছে। কিন্তু, শিশুমনের এই

শিশু ভোলানাথ

জাগরণ অকারণ নয়; এই কাব্য-রচনার অব্যবহিত পূর্বে দীর্ঘ দিন য়ুরোপ-আমেরিকায় ঘুরে (১৯২০-২১) সদ্য দেশে ফিরেছেন কবি তখন। নূতন এই কাব্য রচনার প্রসঙ্গে পরে তিনি নিজে বলেছেন,—"আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই 'শিশু ভোলানাথ' লিখতে বসেছিলুম। কিছুকাল আমেরিকার প্রৌঢ়তার মরুপারে ঘোরতর কার্যপটুতার পাথরের দুর্গে আট্‌কা পড়েছিলুম। দেয়ালের মধ্যে কিছুকাল সম্পূর্ণ আট্‌কা পড়লে তবেই মানুষ স্পষ্ট করে আবিষ্কার করে, তার চিত্তের জন্যে এতবড়ো আকাশের ফাঁকাটা দরকার। সেদিন আমি আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে-শিশু আছে, তারই খেলার ক্ষেত্র লোকে-লোকান্তরে বিস্তৃত। এই জন্যে কল্পনায় সেই শিশু-লীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশু-লীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।" এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ 'শিশু ভোলানাথে'র সারা দেহে ছড়িয়ে আছে।

এর দীর্ঘ দিন পরে এল পূরবীর কবিতা-গুচ্ছ,—আরো প্রায় চার বছর পরে (১৩৩২)। পূরবী কাব্যের দুটি ভাগ,—এক পূরবী, আর এক পথিক। 'পথিক' পর্যায়ের কবিতাগুচ্ছ যেমন সংখ্যায়, তেমনি ভাবেও মুখ্য। ১৩৩২ বাংলা সালে কবি পেরু-সরকারের আমন্ত্রণে দক্ষিণ আমেরিকা গিয়েছিলেন;—যাওয়া এবং ফিরে আসার পথে লেখা হয়েছিল এই পর্যায়ের অধিকাংশ কবিতা। এখান থেকেই 'করে-ওঠার' সাধনার ফাঁকে ফাঁকে কবির 'হয়ে-ওঠা'র পালা অঙ্কুরিত হতে আরম্ভ করেছে যেন। বাইরে শান্ত, অন্তরে অনন্ত এই নবীন যৌবনের শক্তি নিয়ে কবি নিজের অতীত জীবন-লোকে ফিরে ফিরে তাকিয়ে দেখেছেন;—বারে বারে আবিষ্কার করেছেন সেই প্রথম কৈশোর-যৌবনের অতিক্রান্ত দিনের নতুন মূল্য। অতীতের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে নতুন করে নিজের মধ্যে নিজে হয়ে উঠেছেন দিনে দিনে:—

পূরবী

"দুয়ার বাহিরে যেমনি চাহিরে মনে হল যেন চিনি—
কবে নিরুপমা ওগো প্রিয়তমা, ছিলে লীলা-সঙ্গিনী।
কাজে ফেলে মোরে চলে গেলে কোন্ দূরে,
মনে পড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধুরে?

ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে, বাজাইলে কিঙ্কিণী,
বিস্মরণের গোধূলি ক্ষণের আলোকে তোমারে চিনি।"

নতুন জীবন, নতুন যৌবন,—নতুন করে হয়ে-ওঠার আনন্দ-বিস্ময়; তারই মধ্যে লুকিয়ে থাকে ফুলের মাঝখানে কালো ভ্রমরের মত কালো-ঘন বেদনা :—

"দেখো না কি হায়, বেলা চলে যায়, শেষ হয়ে এল দিন,
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ!"

নতুন অনুভবের আনন্দ-দীপ্তি এসেছে জীবনে,—সেই সঙ্গে ঘনিয়ে আসছে সন্ধ্যার অন্ধকার;—"যৌবন বেদনা-রসে উচ্ছল দিনগুলির" ওপরে ঘনিয়ে আসবে কালের যবনিকা। তাতে নালিশ নেই; কবি আজ আত্মসমাহিত-চেতন। কিন্তু, ছেড়ে যাবার উদাস নিষ্ক্রিয় বিষণ্ণতা ছড়িয়ে আছে পূরবীর সারা কাব্য-দেহে,—সদ্য বৃষ্টি-ধৌত সূর্যাস্তের রক্তিম বেদনার মত।

পূরবীর পরে 'গানের বই' প্রবাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল (১৩৩২);—আর লিখিত হয়েছিল 'লেখন' (১৩৩৪), জাপান ভ্রমণকালে যার প্রথম সূচনা।—'কণিকা'র মত ছোট ছোট কবিতায় কবি-প্রাণের স্বচ্ছ অনুভব অপরূপ ব্যঞ্জনা পেয়েছে লেখন-এর কবিতাবলীতে :—

লেখন

"কল্লোল-মুখর দিন ধায় রাত্রি-পানে।
উচ্ছল নির্ঝর চলে সিন্ধুর সন্ধানে।
বসন্তে অশান্ত ফুল পেতে চায় ফল
স্তব্ধ পূর্ণতার পানে চলিছে চঞ্চল।"

লেখন-এর অধিকাংশ কবিতা লেখা হয়েছিল অটোগ্রাফ্ দেবার উদ্দেশ্যে।

বনবাণী কবিতাগুচ্ছের রচনা শুরু হয় ১৩৩৪ বাংলা সালে; কিন্তু সারা হতে লেগেছিল ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত। পরিণতির দিক থেকেও এটি মহুয়া-উত্তর ঋতুর রচনা। বলাকা-র যৌবন-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি মহুয়াতে (১৩৩৬ সাল)। ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ থেকে পৌষের মধ্যে অধিকাংশ কবিতা লেখা হয়েছিল। মহুয়ার শুরু হয়েছিল 'ফরমায়েস'-এর ধাক্কায়। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলী থেকে কিছু সংখ্যক প্রেমের কবিতা বেছে বিবাহে উপহার দেবার উপযোগী একটি কবিতা-

মহুয়ার উৎস

সংকলন প্রকাশ করার প্রস্তাব হয়েছিল। কথা ছিল, এই সংকলনের উপযোগী কয়েকটি নূতন কবিতাও কবি লিখে দেবেন। কবিতা বাছাই করা হয়েছিল,—নামও রাখা হয়েছিল নূতন সংকলনের,—'বরণডালা' বা 'রাখী'। কিন্তু, সে-সংকলন প্রকাশিত হয় নি কখনো;—নতুন কয়েকটি কবিতা লিখতে গিয়ে "অনেকগুলি কবিতা" লেখা হয়ে গিয়েছিল। অথচ, ততক্ষণে বাইরের ফরমায়েস-এর উদ্দেশ্য কবি ভুলে গেছেন,—ভেতরের প্রেরণায় নতুন প্রেমের কবিতা নতুন ঋতুর স্বাদ-গন্ধ নিয়ে দেখা দিয়েছে। কবি নিজে এ-সম্বন্ধে বলেছেন,—"মহুয়ার কবিতাগুলিও লেখবার বেগে ফরমায়েসের ধাক্কা নিঃসন্দেহেই সম্পূর্ণ ভুলেছে—কল্পনার আন্তরিক তড়িৎ-শক্তি আপন চিরন্তনী প্রেরণায় তাদের চালিয়ে নিয়ে গেছে।……নতুন লেখার ঝোঁক যখন চিত্তের মধ্যে এসে পড়ে তখন তারা পূর্বদলের পুরানো পরিত্যক্ত বাসায় আশ্রয় নিতে চায় না, নতুন বাসা না বাঁধতে পারলে তাদের মানায় না, কুলোয় না।"

'মহুয়া' একান্তভাবে প্রেম-কবিতার গুচ্ছ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রেম-কবিতার ইতিহাসে মহুয়া অভূতপূর্ব এবং অনন্য। সন্ধ্যাসংগীত-এর যুগ থেকেই কবির রচনায় প্রেমাকুতির পরিচয় বিচিত্র আকারে ধরা পড়েছে; অপরিণতির যুগের রচনাবলীতেও তাই। প্রথম-যৌবনের প্রণয়-বাসনা অনাবৃত প্রকাশ পেয়েছে 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে। ঐটিকে যৌবন-প্রেম-উল্লাসের কাব্য বলা চলে। তারপরের প্রায় সকল কাব্যেই রবীন্দ্র-প্রেমানুভবের বিচিত্র পরিণত পরিচয় বিকশিত হয়েছে। আর, সাধারণভাবে রবীন্দ্র-প্রেমচেতনার প্রধান বৈশিষ্ট্য তার নৈর্ব্যক্তিকতায়। 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের লেখিকা মৈত্রেয়ী দেবীকে নাকি কবি বলেছিলেন,—"যাকে তোমরা ভালবাসা বল, সে-রকম করে আমি কাউকে কোনোদিন ভালোবাসি নি। আমি বৃহৎ সংসারে বাস করেছি, প্রিয়জনের অন্ত ছিল না, আর আজ তো আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়ে তোমরা যারা পর, তারাই আমার বেশি আপনার হয়ে উঠেছ। কিন্তু একথা ঠিক, বন্ধুবান্ধব সংসার স্ত্রীপুত্র কোনো কিছুই কোনো দিনই আমি তেমন করে আঁকড়ে ধরিনি।……তা যদি না হত, যদি জড়িয়ে পড়তুম, তা' হলে আমার সব নষ্ট হয়ে যেত। কোনো বন্ধনই আমার

মহুয়ার প্রেম-চেতনা

শিকল হয়ে বাঁধে নি কোনোদিন। চিরদিনই আমি মনে মনে উদাসী।"—প্রেমিক রবীন্দ্রনাথের পরিচয় এই আলোচনায় স্পষ্ট। কোনো ব্যক্তি বা রূপ-মূর্তিকেই তাঁর প্রেমের শ্রেষ্ঠ অঞ্জলি দেন নি কবি। কড়ি ও কোমল-এ রূপের প্রতি কবির আকূতি দেখা গেছে,—কিন্তু সে-রূপ কল্পনাময় দেহান্বিত। সোনারতরী-চিত্রায় সেই দেহ-বিলাস অনন্তে বিলীন হয়েছে। তারপরে, দেহ-মুক্ত প্রেমের সাধনা ধাপে ধাপে চলেছে কবির জীবনে। মহুয়া-পূর্ব গীতাঞ্জলির অধ্যাত্ম উপলব্ধি তাঁর প্রেমকে জন্ম-জন্মান্তরের অন্তহীন লোকে বিস্তারিত করেছিল,—বলাকা-যুগের কবি-চৈতন্য তাকে দিয়েছিল 'বিশ্বময় ছড়ায়ে'। সহজ-উদাসীর মনে ধ্যানীর মুক্তর আনন্দ ব্যাপ্ত হয়েছিল। মহুয়ার প্রেম বৈরাগী নয়,—অনন্তহীনতার নিরন্তর উপলব্ধির আনন্দ-সাগরে কবির সে প্রেম-চেতনা ভাসমান।

কবি নিজে মহুয়া-কবিতাবলীতে প্রেমের দুটি পৃথক্ রূপ দেখেছেন,—একটিতে "প্রণয়ের প্রসাধনকলা মুখ্য। আর একটিতে ভাবের আবেগ প্রধান স্থান নিয়েছে,—তাতে প্রণয়ের সাধন-বেগই মুখ্য।" কিন্তু, উভয়শ্রেণীর কবিতাতেই কবির আসক্তি-হীন প্রণয়-চেতনা আপন অনন্ততার প্রত্যয়ে আনন্দিত। মহুয়ার মূল ঋতুর কবিতাবলী ছাড়া সমধর্মিতার জন্য 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের কয়েকটি কবিতা গ্রন্থিত আছে এই কাব্যে। আরো কিছু কবিতা আছে,—"সেগুলি ঋতু-উৎসব পর্যায়ের।"

কবিতা-পবিচয

২। পরিণতি যুগের নাট্য-সাহিত্য

আলোচ্য যুগে অনেক কয়টি পুরাতন নাটকের নবরূপ দিয়েছিলেন কবি। এই সব রচনার অনেক কয়টিই ভাবের বিচারে, কিংবা নাট্য-রসের স্বাদুতায় অভিনব নয়। অতএব তাদের নূতনতর আলোচনা প্রয়োজনীয় নয়। যে-কয়টি নাটক যথার্থ নূতন হয়ে উঠেছে তাদের মধ্যে আছে প্রায়শ্চিত্তের কাহিনী-ছায়া অবলম্বনে লেখা মুক্তধারা, আর 'রাজা ও রানী'-র রূপান্তর তপতী। এদের পৃথক পরিচয় দেওয়া যাবে যথাস্থানে। অপেক্ষাকৃত অনুল্লেখ্য নাটকগুলির মধ্যে আছে,—গুরু, অরূপরতন, ঋণশোধ, পরিত্রাণ;—এরা যথাক্রমে অচলায়তন,

নাট্য-রচনায় পূর্বানুস্মৃতি

রাজা, শারদোৎসব ও প্রায়শ্চিত্ত নাটকের পরিবর্তিত রূপ।, পূর্বে এদের প্রাসঙ্গিক পরিচয় দিয়েছি। গোড়ায় গলদ-এর নবরূপ 'শেষরক্ষা'-ও এই পর্যায়েরই রচনা।

গৃহপ্রবেশ ও শোধবোধ

এই পর্যায়ের আরো দুটি দুর্বল নাট্য-রচনা রয়েছে গৃহ প্রবেশ (১৩৩২ সাল) ও শোধবোধ (১৩৩৩)। এরা যথাক্রমে কর্মফল ও শেষের রাত্রি নামে ছোটগল্প দুটির অতি-রঞ্জিত দুর্বল নাট্য-রূপ।

ফাল্গুনী

রবীন্দ্রনাথের পরিণতি যুগের প্রথম নাটক ফাল্গুনী (১৩২১)। একদিক থেকে শারদোৎসবে যে নাট্য-ভাবনার শুরু, তারই পরিণতি ফাল্গুনীতে। দুঃখের মূল্য দিয়ে আনন্দের অধিকার পেতে হবে, এই প্রত্যয় শারদোৎসব পর্বের মত ফাল্গুনীর-ও প্রধান বক্তব্য। কিন্তু, তাহলেও ফাল্গুনী শারদোৎসব নয়; এ-টি বলাকা-ঋতুর ফসল; কবি এর প্রথম নামকরণ করেছিলেন বসন্তোৎসব। বলাকার কবির জীবনে ও মননে যৌবন-প্রৌঢ়ীর দাহহীন যে দীপ্তি আলোকিত হয়ে উঠেছিল,—তারই আনন্দরূপ ফাল্গুনী। তাই এ নাটকের উপাদানে সংঘাত ও সংলাপ নেই,—আছে সংগীত ও সংলাপ-গীতি। ধ্যানীর তন্ময়তার সঙ্গে অন্বিত রসিকের আনন্দ-উল্লাস ফাল্গুনীর প্রাণ। প্রাণ-ধর্মের সত্যরূপ ব্যাখ্যা করে কবি বলেছেন,—"জগৎটার দিকে দেখলে দেখা যায় যে, যদিচ তার উপর দিয়ে যুগ যুগ চলে যাচ্ছে, তবু সে জীর্ণ নয়,—আকাশের আলো উজ্জ্বল, তার নীলিমা নির্মল। ধরণীর মধ্যে রিক্ততা নেই, তার শ্যামলতা অম্লান—অথচ খণ্ড খণ্ড করে দেখতে গেলে দেখি ফুল ঝরছে, পাতা শুকোচ্ছে, ডাল মরছে। জরামৃত্যুর আক্রমণ চারিদিকেই চলেছে, তবুও বিশ্বের চির-নবীনতা নিঃশেষ হল না। Facts-এর দিকে দেখি জরা, মৃত্যু, Truth-এর দিকে দেখি, অক্ষয় জীবন, যৌবন। শীতের মধ্যে এসে যে-মুহূর্তে বনের সমস্ত ঐশ্বর্য দেউলে হল বলে মনে হল, সেই মুহূর্তেই বসন্তের অসীম সমারোহ বনে বনে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল।" কবির জীবনে শীতের জড়তাকে অতিক্রম করে যে অজর-অক্ষয় যৌবনের দোলা লেগেছিল বলাকায়, তারই আনন্দোৎসব ফাল্গুনীর বসন্তোৎসবে।

রবীন্দ্র নাট্য-প্রবাহে নব-চেতনার প্রবর্তনা ঘটল আর একবার মুক্তধারায়

(১৩২৮)। নতুন জীবন-সমস্যার প্রেক্ষিতে পুরাতন প্রত্যয় নবীন মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করল। মুক্তধারার মূল কাহিনী-কাঠামো প্রায়শ্চিত্ত নাটক থেকে নেওয়া। কিন্তু তার আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক্ ;—বহির্জীবনের ঐতিহাসিক ঘটনা-প্রবাহ এবং অন্তর্জীবনের বিশেষ মনোঋতুর প্রভাব এই নাট্য-রচনাকে পূর্বাপর থেকে বিশেষিত নূতনত্ব দিয়েছিল। মুক্তধারা রচনা-সমাপ্তির সময় জানুয়ারী ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে। ১৯২০-২১-এ কবি য়ুরামেরিকা ভ্রমণ করে এসেছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে। শিশু ভোলানাথ প্রসঙ্গে দেখেছি,—সেখানকার জীবনযাত্রা তাঁর সৃজনশীল চিত্তকে ক্লান্ত, ক্লিষ্ট করেছিল। যুদ্ধের সময়ে ছিল মানব-মূল্য-বোধহীন পৈশাচিকতার হত্যালীলা। যুদ্ধের পরে পুনর্গঠনের নামে আবার চল্‌ল দানবীয় যান্ত্রিক পেষণ। যুদ্ধ-সময়ের সকল ক্ষয়-ক্ষতিকে পুরিয়ে তুল্‌বার নামে প্রতীচ্যের সকল জাতিই যন্ত্র-চালিত শিল্প-প্রগতির অন্ধ প্রচেষ্টায় মেতেছিল। তাতে উন্নতির নামে প্রচুর বিত্ত ও বস্তুর সঞ্চয় গড়ে উঠ্‌ছিল। কিন্তু, তার মূল্য দিতে হচ্চিল প্রতি দেশের সাধারণ মানুষকে ; জাতীয় উন্নতির নামে স্বেচ্ছাকৃত আত্ম-বঞ্চনা ও আত্ম-পীডনের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছিল তাদের ঘাড়ে। কী ধ্বংসের উন্মত্ততায়, কী সংগঠনের অন্ধ নেশায় মানবের মূল্যকে ছাপিয়ে চলেছিল দানবের উল্লাস। তাই, যন্ত্র-সভ্যতার প্রতি কবির মন বিমুখ হয়ে উঠেছিল ;—সমসাময়িক চিঠিতে এ কথা বারে বারে বলেছিলেন। মুক্তধারা লেখা হয়েছিল দেশে ফিরে। তখন ভারতবর্ষেও নতুন শক্তির স্রোত উত্তাল হয়ে উঠেছে ;—গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম জীবন-রূপ রচনা করেছেন ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে। এ-পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে জাতীয়তাবাদের প্রাবল্য, আর মানবতা-বোধের অভাব কবিকে পীড়িত করেছিল। মহাত্মাজীর বিপ্লব-সূচনায় কবি নতুন আশার স্বপ্নলোক রচনা করতে লাগ্‌লেন ;—রাজনীতির আন্দোলন সৃষ্টি করতে গিয়ে মহাত্মা নির্ভর করলেন জন-চেতনার ওপরে,—সত্য ও অহিংসার ওপরে। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে মহাত্মা গণ-চেতনার তথা মানব-ধর্মবোধের প্রথম উদ্গাতা। ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রে অসহযোগ-নেতার এই ভাব-বিভূতি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

মুক্তধারায় নবীন জীবন-বোধ

যন্ত্রশিল্পী বিভূতিকে দিয়ে উত্তরকূটের রাজা মুক্তধারা ঝর্ণার’ ’পরে মস্ত বাঁধ বাঁধিয়েছেন; যন্ত্রশক্তির দাপটে উত্তরকূটের লোকেরা যত পায়, ততই অন্ধ ভক্তি নিবেদন করে ঐ যন্ত্র-দানবেরই পায়ে। অন্যদিকে শিবতরাই-এর গরীব চাষীরা হয় নিরন্ন; ঝর্ণার মুখে যন্ত্রের বাঁধ তাদের মাঠকে শুকিয়েছে,—ফসলকে দিয়েছে মেরে, তাদের তৃষ্ণার জল কণ্ঠতালুকে শুকিয়ে যায় লুপ্ত হয়ে। যন্ত্রের শক্তিতে অন্ধ রাজা তাদের প্রাণের আবেদনকে স্তব্ধ করতে চায় শক্তির মত্ততা দিয়ে। ধনঞ্জয় বৈরাগী তাদের মধ্যে মুক্তির আন্দোলনকে তোলে জাগিয়ে। সে মুক্তি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নয় কেবল, নিজেদের শক্তির ওপরে দাঁড়িয়ে ওঠার,—আত্মারও মুক্তির। চারিদিকে যখন বিরোধের ধোঁয়া ফাঁপিয়ে উঠেছে, তখন অভিজিত,—মুক্তধারার তীরে যে মুক্ত শিশুকে কুড়িয়ে পেয়ে রাজা সন্তানের আদরে মানুষ করেছিলেন, মুক্তধারার সন্তান সেই অভিজিত নিজের আত্মদান করে বাঁধকে ভেঙে দিল,—স্রোতের সঙ্গে নিজেও গেল মুক্তির আনন্দে ভেসে। এই পরিসমাপ্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে কবি লিখেছিলেন,—“যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করেছে, অতএব প্রাণ দিয়েই সেই যন্ত্রকে অভিজিত ভেঙেছে, যন্ত্র দিয়ে নয়। যন্ত্র দিয়ে যারা মানুষকে আঘাত করে, তাদের একটা বিষম শোচনীয়তা আছে—কেন না যে মনুষ্যত্বকে তারা মারে, সেই মনুষ্যত্ব যে তাদের নিজের ভিতরকার মানুষকে মারছে। আমার নাটকের অভিজিত হচ্ছে সেই মারনেওয়ালার ভেতরকার পীড়িত মানুষ। নিজের যন্ত্রের হাত থেকে নিজে মুক্ত হবার জন্যে সে প্রাণ দিয়েছে।”

মুক্তধারার প্লট ও শিল্পরূপ

মুক্তধারার এই ভাব-ব্যঞ্জনা সফল সাংকেতিকার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে উত্তরকূট ও শিবতরাইয়ের মধ্যবর্তী স্বার্থ-দ্বন্দ্বে নাট্য-সংঘাতও হয়েছে সুগঠিত।

মুক্তধারার এই কবি-চেতনা সম্পূর্ণতর ভাবরূপে বিভাম্বিত হল রক্ত-করবীতে। গ্রন্থ হিসেবে এর প্রথম প্রকাশ ১৩৩১ বাংলা সালে; কিন্তু রচনার খসড়া তৈরি হয়ে গিয়েছিল ১৩৩০ সালে,—শিলং-এ। তখন এর নাম ছিল ‘যক্ষপুরী’, পরে গ্রন্থ প্রকাশের সময় নূতন নাম দেন—রক্তকরবী। গেল য়ুরামেরিকা ভ্রমণের সময় থেকে মানবঘাতী যন্ত্র-সভ্যতার বিরুদ্ধে

কবির মন বিষিয়ে উঠেছিল,—মুক্তধারায় এ-বিষয়ে কবি-প্রাণের বাণী-উৎসার ঘটেছে। শিলং-এ থাকবার সময়ে প্রায়ই অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় যেতেন কবির কাছে, বোম্বাই অঞ্চলের শিল্পকেন্দ্রগুলি ঘুরে শ্রমিকদের অবস্থা নিজের চোখে দেখে তিনি সদ্য ফিরেছেন তখন। কবির কাছে সেই সব তথ্য বলতেন রাধাকমল, কবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনতেন। য়ুরোপের যন্ত্র-দানব ভারতের মানব-প্রাণকেও পিষে মারছে,—এই যন্ত্রণানুভবের অব্যবহিত প্রেরণায় 'যক্ষপুরী' বা রক্তকরবীর জন্ম। কিন্তু, এর মূলে ছিল বিশ্বব্যাপী অগ্রসরমান যান্ত্রিক বীভৎসতার বিরুদ্ধে বিশ্ব-মানবাত্মার প্রতিক্রিয়া। কেবল বিদ্রোহ নয়,—বিপ্লবোত্তর নব-জীবনের সংকেতও নিহিত রয়েছে রক্তকরবীর বক্তিমায়। রক্তকরবীর মূল বক্তব্য, "কর্ষণজীবী ও আকর্ষণ-জীবী" এই দুই সভ্যতার মধ্যেকার মৌল বিরোধ। রক্তকরবীতে কর্ষণজীবী সভ্যতার প্রতীক সবুজ ধান,—সবুজ প্রাণে ভরা পল্লী-প্রকৃতির লক্ষ্মীরূপ। সেখান থেকে রক্তকরবীর নায়ক-নায়িকারা ছিটকে এসে পড়েছে শোষণ-জীবী সভ্যতার ক্ষুধা-তৃষ্ণা, দ্বেষ-হিংসা, বিলাস-বিভ্রমে আকীর্ণ যক্ষপুরীর অন্ধ আকর্ষণে। লক্ষ্মী' দেবী,—তিনি দেন সম্পদ্‌,—শ্রী এবং হ্রী, সৌন্দর্য এবং কল্যাণ। কিন্তু যক্ষরাজ কুবের উপদেবতা,—তিনি দেন ধন,—তাল তাল সোনা; বস্তুর বুকে প্রাণের আলোক-সম্পদ জাগিয়ে তোলার সাধ্য তার নেই। তাই, তার নিষ্প্রাণ ধনলোলুপতা অন্ধ, কঠিন। মানুষকে যখন ধনলাভের এই প্রাণহীন যক্ষবৃত্তি পেয়ে বসে, তখন অন্ধ শক্তির রাক্ষসী প্রচণ্ডতায় মানুষকে সে মারে,—মারে নিজে নিজেকে। যক্ষপুরীর জালের আড়ালে বাঁধা-পড়া রাজা সেই নিজের জালের বন্ধনে যন্ত্রণা-পিষ্ট মানব-আত্মা। যন্ত্রের মধ্যে প্রবল শক্তি রয়েছে, মানুষের চেতনা যদি তার তলায় চাপা পড়ে না যায়, তা হলে যন্ত্রের পেষণ-শব্দ শুদ্ধ হয়ে তাতে সংগীতের সুর লাগে; রঞ্জনের আবির্ভাব যক্ষপুরীর মাটির তলায় সোনাকে দিয়েছিল গলিয়ে,—দুঃসাধ্য খোদাই-কর্ম খোদাই-নৃত্যে পরিণত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যন্ত্র-শক্তির বিরোধী নন,—যন্ত্রের আঘাতে মানুষের প্রাণকে শুকিয়ে মারাতেই তাঁর আপত্তি;—"যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের রুদ্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের

রক্তকরবী

মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত, সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে,—সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশি। ভুলেছে প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যে পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে রাখবার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে। এমন সময় সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল; প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর; প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধন-জালকে। তখন সেই নারী-শক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।" সমকালীন পৃথিবীর এক অতি জটিল জীবন-সমস্যাকে নিজের ধ্যান-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে তার শিল্প-পরিণাম নির্দেশ করেছেন। এই নাটকের প্রতীক-ব্যঞ্জনা যেমন অকল্পনীয় রসে সমৃদ্ধ, তেমনি তার নাট্য-সম্পদও অমূল্য। কবি-মনীষীর যৌথ চেতনার সৃষ্টি-রূপ রক্তকরবী পৃথিবীর সাহিত্য-শিল্পের অপরূপ বিস্ময়।

এই পর্যায়ে আর একটি উল্লেখ্য নাটক চিরকুমার সভা (১৩৩২)। কাব্যে তখন চলেছে পূরবী-উত্তর কাল। কিন্তু, চিরকুমার সভার পরিকল্পনা এই ঋতুর ফসল নয়। ১৩০৭-৮ সালে প্রথম উপন্যাস আকারে এর প্রকাশ ভারতী-পত্রিকায়। ১৩১১ সালে হিতবাদী সংস্করণ গ্রন্থাবলীতে ঐ নামেই পুরো গ্রন্থ প্রথম মুদ্রিত হয়। তারপরে ১৩১৪ সালে আবার প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের গদ্য-গ্রন্থাবলীতে; তখন উপন্যাসের নূতন নাম হয় প্রজাপতির নির্বন্ধ। উপন্যাস রূপে চিরকুমার সভা-র পরিকল্পনা সাময়িক পত্রের ফরমায়েস-এর মুখে। কবির কাছে একটি সামাজিক প্রহসন দাবি করা হয়েছিল ভারতী পত্রিকার পক্ষ থেকে। বাংলার শিক্ষিত সমাজে তখন সন্ন্যাস-ব্রতের ঘোর লেগেছে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে,—সেবার জন্য, স্বদেশ-হিতের জন্য বৈরাগ্যের কঠোর সাধনায় উন্মুক্ত হয়েছিল বাঙালি তরুণের মন। যে-কোনো কারণেই হোক্ না কেন, জীবনে সুখকে অস্বীকার করা কবি-ধর্মের আদর্শের অভিমত ছিল না। তিনি ভোগের জন্যে সুখকে চান্‌নি কোনোদিন; জীবনের দুঃখ সাধনা দিয়ে আনন্দকে জয় করার ব্রত তাঁর।—তাতে

চিরকুমার সভা

দেহ-মনকে উপবাসী রাখলে চলে না। সংগ্রামের,—আনন্দের রসদ যোগাতে হয় তাদের। বস্তুতঃ বাঙালি তরুণদের এই সাময়িক বৈরাগ্য-চেতনাকে প্রহসন-রূপ দিতেই চিরকুমার সভার প্রথম জন্ম। পূরবী-উত্তর যুগে তা যখন নাট্য-রূপ পেয়েছে তখন বিবাগী-প্রৌঢ়তার বক্ষ-দীর্ণ-করা চির-যৌবনের সন্ধান পেয়েছেন কবি বলাকা-পূরবীর কবিতায়। সত্যকে,—প্রেমের চিরন্তন রূপকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দ-বৈভব এই কৌতুক-নাট্যের সারাদেহে ছড়িয়ে আছে। তাই, 'চিরকুমার সভা' উপন্যাসের চেয়ে নাটক অনেক বেশি শিল্প-সফল ; রবীন্দ্রনাথের একটি অত্যুজ্জ্বল নাট্য-সৃষ্টি এটি।

চিরকুমার সভা ও শোধবোধ-এর ক্ষীণ ব্যবধান পেরিয়ে লেখা হয় তপতী (১৩৩৬)। এটি 'রাজা ও রানী'র নব-সংস্করণ, পরিবর্তনের কারণ কবির ভাষায় উল্লিখিত হয়েছে রাজা ও রানী প্রসঙ্গে। প্রথমে 'ভৈরবের বলি' নাম দিয়ে প্রচলিত আঙ্গিকেই নাটকটির রূপান্তর সাধন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মনে তখন নূতন ঋতুর দোলা লেগেছে, পুরাতন ধারা অচল হল ; সম্পূর্ণ রূপান্তর নিয়ে দেখা দিল তপতী, নতুন ভাবনার বার্তা বয়ে। তপতী 'মহুয়া'র সমকালীন রচনা, একদিকে সাংকেতিকতার আভাসে নাট্যরস যেমন ঘন হয়েছে, তেমনি প্রেমের তপস্বী স্বভাবটিও বিমূর্ত হতে পেরেছে রানী সুমিত্রার ভূমিকায়। এদিক থেকে তপতী নামটিও সার্থক ব্যঞ্জনাময়।

ভৈরবের বলি এবং তপতী

তপতীর আগেই দুটি নৃত্য নাট্য 'নটীর পূজা' (১৩৩৩) ও 'ঋতুরঙ্গশালা' (১৩৩৪) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। কবি-মনের এই ঋতুতে লেখা আরো কয়েকটি ঋতু-লীলা-বিষয়ক নৃত্য-গীতিনাট্য, শেষ বর্ষণ (১৩৩৩), বসন্ত (১৩৩৩), ও নবীন (১৩৩৭)।

নৃত্য নাট্য-গুচ্ছ

পরিণতিযুগের কথাসাহিত্য

ক। পরিণতিযুগের উপন্যাস

চতুরঙ্গ উপন্যাস দিয়ে এই যুগের কথা-রচনার শুরু। পৃথক্ পৃথক্ গল্পের আকারে সবুজ পত্রে ১৩২১ বাংলা সালের চার সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল চতুরঙ্গ ;—যথাক্রমে জ্যাঠামশায়, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস নামে। গল্প হিসেবে 'জ্যাঠামশায়', অর্থাৎ শচীশের জ্যেষ্ঠতাত জগমোহনের জীবন-চিত্রে

একটা স্বয়ম্পূর্ণতা আছে। কিন্তু, গল্প সেখানে থামে নি,—শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাসের জীবন-কথার অংশগুলির সঙ্গে গ্রথিত হয়ে একটি অখণ্ড জীবন-রূপ গড়ে তুলেছে। (যেমন আঙ্গিক, তেম্‌নি জীবন-চেতনা ও প্রকাশ-শৈলীর অভিনবতায় 'চতুরঙ্গ' অপূর্ব। 'চতুরঙ্গ' নামের মধ্যেই ভাবনার সফল ব্যঞ্জনা রয়েছে,—গোটা উপন্যাস-এ যে অখণ্ড জীবন-রূপ আভাসিত হয়েছে তার অঙ্গ চারটি,—জ্যাঠামশায়, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস। গোটা গল্পটির কথক একা শ্রীবিলাস ; কিন্তু প্রত্যেকের জীবন-রূপকে পৃথক্ পৃথক্ স্বাতন্ত্র্যের অখণ্ডতায় পরিচায়িত করেছে সে,—যেন শ্রীবিলাসের জবানিতে নায়ক-নায়িকারা নিজেদের আত্ম-পরিচয় অনাবৃত করেছে। একই মূল প্লট্-এর সঙ্গে চারটি জীবনের অখণ্ড যোগ,—অথচ নিজ নিজ জীবনকথা বিবৃত করতে গিয়ে কখনো কেউ-কারো পুনরাবৃত্তি করে নি। গল্প-বলার এক অপরূপ দক্ষতা দেখিয়েছেন কবি এতে ; সেই সঙ্গে গল্পের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছেন নাটকীয় সজীবতা।)

চতুরঙ্গের আঙ্গিকরূপ

চতুরঙ্গ উপন্যাসে রচনাশৈলীর এই অপূর্বতাই সব নয়, এখান থেকেই রবীন্দ্র উপন্যাসে মনন-দীপ্ত ব্যঞ্জনাধর্মী কাব্য-উপন্যাস রচনার শুরু। কবির কথা উদ্ধার করে আগে বলেছি, তাঁর গদ্য রচনার মধ্যেও,—তথা সব রচনাতেই প্রকাশ পেয়েছে 'কবি-মাত্র'-সত্তার সৃজনশৈলী। শারদোৎসবের কাল থেকেই নাটকে এই অমিশ্র কবিতা-ধর্মের উদ্ভব। কিন্তু, রবীন্দ্র-উপন্যাস-সাহিত্যের কাব্য-ধর্মিতালাভ পূর্ণিত হয়েছে চতুরঙ্গে এসে। তার অর্থ এই নয় যে, উপন্যাস রচনায় বাস্তবকে একান্ত বর্জন করে কবি কেবল কল্পনার স্বপ্ন-লোকে বিচরণ করেছেন। এ-পর্যন্ত রবীন্দ্র-সাহিত্য-সাধনার ইতিহাসে দেখেছি, নিজের সৃষ্টির পসরা নিয়ে কবি এসে বসেছেন চলমান জীবন-স্রোতের তীরে। জীবনের সঙ্গে তাঁর মনের যোগ নিজের চোখে তাকিয়ে দেখার মাধ্যমে,—একান্ত প্রত্যক্ষ সে যোগ। কিন্তু, সেই বস্তু-জীবন-স্রোতের নৈর্ব্যক্তিক ফটোগ্রাফার নন কবি ;—নিজের শিল্পি-মনের আইডিয়া, আদর্শ, অভিজ্ঞতা-চেতনায় তুলি ডুবিয়ে চোখে-দেখা জীবনকে নতুন করে এঁকেছেন জীবনের এখানে তিনি চিত্রশিল্পী,—বস্তু-রূপের নয়,—চেতনা-সিঞ্চিত বস্তু-

কবি-মনীষীর প্রথম উপন্যাস-সৃষ্টি

স্বরূপের। বলা-বাহুল্য, এই চেতনার জন্মভূমি কবির মনোলোক। নিজের চেতনার রঙে রাঙিয়ে চলমান বস্তু-জীবনের অখণ্ড রূপ-রচনা করেছেন তিনি। এতে কবির কল্পনার চেয়ে, মনীষীর মনন ও ধ্যানীর প্রত্যয়ের বর্ণ-বিচিত্রতা কম নয়, বরং বেশি। তাই, চতুরঙ্গ থেকেই রবীন্দ্র-উপন্যাসের বাচনভঙ্গি কেবল শব্দার্থময় নয়,—প্রতীক এবং সংকেতধর্মী।

চতুরঙ্গ লেখা হয়েছিল বলাকা-সমকালীন যুগে। জীবনীকার প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,—"বলাকায় যাহা ছন্দ, ফাল্গুনীতে তাহা সংগীত, চতুরঙ্গে তাহাই কাহিনী।" বলাকার মননশীলতা, গতি ও মুক্তি-কামনা এবং বিশ্বজনীন অমূর্ত প্রেম-চেতনায় চতুরঙ্গ-ও প্রদীপ্ত। শচীশের জ্যাঠামশাই জগমোহন তাকে রক্ষা করেছিলেন পৈতৃক ধর্মসংস্কারের অন্ধ নিষ্ঠুরতা থেকে। জগমোহন মানবধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন;—আনুষ্ঠানিক-ধর্ম বিচারে তিনি ছিলেন নাস্তিক। শচীশ জ্যাঠামশায়ের আদর্শকে একদিন প্রাণপণে গ্রহণ করেছিল;—তার জন্যে মূল্যও দিতে চেয়েছিল জীবনে। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পরে সেই জীবনাদর্শ জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মত ঝরে পড়ল শচীশের চেতনা থেকে। রসের সাধনায় সে ডুব দিল লীলানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব নিয়ে। ঐ আদর্শের জন্যেও প্রাণ দিতে পারত শচীশ সেদিন। এমন সময় এল দামিনী; রস-সাধনার অন্ধ আকুলতার প্রতি তার বিদ্বেষ ও ঘৃণা অপরিসীম; কিন্তু শচীশের প্রতি তার নারী-প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ও উৎকণ্ঠা ছিল উদ্যত। ধর্মের উন্মাদনায় শচীশ একদিন পালিয়েছিল দামিনীর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে; আবার ফিরে এসেছিল তারই নারী-রূপের আকর্ষণে। শচীশের অনুরোধে দামিনী এবার নিজেকে জড়িয়ে দিল লীলানন্দের রস-সাধনায়,—সে কেবল শচীশেরই আকর্ষণে,—তার প্রেমে। তারপর এল ঘনদুর্যোগ; সব লণ্ড-ভণ্ড হয়ে গেল নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যায়। একদিন নিভৃত পর্বতগুহায় দামিনীর প্রেম-মিনতি-করুণ বক্ষে পদাঘাত করে শচীশ নিজেকে মুক্ত করে আনল;—সেই আঘাতের আলোকে দামিনী প্রেমের যথার্থ স্বরূপ আবিষ্কার করল শ্রীবিলাসের অন্তরতলে। তারা বিবাহিত হল,—দামিনীর অনুরোধে শচীশ এল সমর্পণ করতে। দামিনী শ্রীবিলাসকে বলেছিল,—"আমার গুরুকে আমি বারবার প্রণাম করি। তিনি আমার স্বপ্নের ঘোর ভাঙাইয়া

চতুরঙ্গ

দিয়াছেন।…সুন্দরকে মারিতে গিয়াছিল, তাই অসুন্দরটা বুকে লাথি খাইয়াছে।" 'বুকে লাথি' খেয়ে দামিনীর বুকে সুন্দর জেগে উঠেছিল মনের গহনে ; তাই, শ্রীবিলাসের হাতে তার আত্মসমর্পণ প্রেমের বেদীতে জীবনের শেষ অঞ্জলি রচনা। এই অনুভূতিকে প্রকাশ করে শ্রীবিলাস দামিনীর মৃত্যু শেষে বলেছে,—"আমি গৃহী হইবার সময় পাইলাম না ;… আমি যাকে কাছে পাইলাম সে গৃহিণী হইল না ; সে মায়া হইল না, সে সত্য রহিল, সে শেষ পর্যন্ত দামিনী।" আর দামিনীর মধ্যে সুন্দরের এই প্রকাশ তার গুরুর,—শচীশের সুন্দর-চেতনার পরিণাম। জ্যাঠামশায়ের ধর্ম, লীলানন্দের ধর্ম. দামিনীর আকর্ষণ,—সব কিছু জীর্ণ হয়ে গিয়ে শচীশের মধ্যে আত্মার ধর্ম সর্বজনীন প্রেমের বিশ্বরূপে বিকশিত হয়ে উঠেছে। শচীশ আজ অনুভব করেছে,—"একদিন বুদ্ধির উপর ভর করিয়া দেখিলাম সেখানে জীবনের ভার সয় না ; আর একদিন রসের উপর ভর করিলাম, দেখিলাম তলা বলিয়া জিনিসই নাই।"…"আমার অন্তর্যামী কেবল আমার পথ দিয়াই আনাগোনা করেন—গুরুর পথ গুরুর আঙিনাতেই যাওয়ার পথ।" তাই, জ্যাঠামশাই বা লীলানন্দ স্বামী,—কারো গুরুগিরিই দাগ কাটতে পারল না শচীশের মর্মের মূলে। শচীশ তার নিজের ধর্ম আবিষ্কার করে বুঝেছে,— "তিনি রূপ ভালোবাসেন তাই কেবলি রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত, তাই তাঁর লীলা বন্ধনে, আমরা বদ্ধ সেই জন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে।"—অরূপ-ধ্যানী মানব-চৈতন্যে মুক্তির আনন্দ-পথ বেয়ে চতুরঙ্গের কাহিনী পরিণামে বলাকার কবির মনোলোকে এসে সম্মিলিত হয়েছে। চতুরঙ্গের উপন্যাস-আঙ্গিক তাই সুগঠিত যদি নাও হয়, তার জীবন-বোধের কাব্য-সুষমা তবু অখণ্ড-সম্পূর্ণ।

ঘরেবাইরে চতুরঙ্গের অব্যবহিত পরের রচনা ; ১৩২২ সালের শুরু থেকে এগার মাস ধরে উপন্যাসটি সবুজপত্র-তে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থনার সময়ে মূল রচনাকে অনেকটা পরিবর্তিত করেছিলেন। ঘরেবাইরের রচনা-শৈলী ও মনন-কল্পনায় কবি-ধর্মিতা আরো ঘনবদ্ধ হয়েছে, অথচ তার ঔপন্যাসিক লক্ষণও চতুরঙ্গের চেয়ে সুগঠিত। কারণ,—"যে কালে লেখক জন্মগ্রহণ করেছে সেই কালটি লেখকের ভিতর দিয়ে হয়তো আপন উদ্দেশ্য

ফুটিয়ে তুলেছে। লেখকের কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করছে।" অর্থাৎ সমকালীন জীবনের একটি সামাজিক পাবিবারিক সমস্যা, নরনারীর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার প্রেক্ষিতে নব-রূপায়িত হয়েছে। অবশ্য, সেই জটিলতা এবং সমস্যার রূপায়ণ ও পরিণতি পথে শিল্পীর তুলিকা মনীষী কবি-ভাবুকের চেতনার দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়েছে।

ঘরেবাইরে

উপন্যাসটি লেখা হয়েছে নিখিলেশ, সন্দীপ ও বিমলার ডায়ারির আকারে। চতুরঙ্গে শ্রীবিলাসের জবানিতে বিভিন্ন চরিত্র নিজেদের কথা বলেছে। এখানে ঔপন্যাসিক চরিত্রগুলির বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে তাদের নিজ নিজ ডায়ারির মাধ্যমে। নিখিলেশ মধ্যযুগীয় বনেদি পরিবারের সন্তান; পুরুষেরা সেখানে আতসবাজি খেলেছেন পরিবারের অর্থ ও লালসা নিয়ে; নারীদের তারা পত্নীর মর্যাদা দেন নি, কিন্তু স্বামীর অধিকার নিয়ে করেছেন উৎপীড়ন। নিখিলেশ এই পরিবারের ছেলে হলেও উচ্চশিক্ষিত, আধুনিক রুচিতে দীপ্ত;—মানবতার আদর্শবাদে চিরবিশ্বাসী। সেই আদর্শবাদ অনেকটা হয়ত বাল্যের অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া হিসেবেই বাস্তবতার সীমা ছাড়িয়ে উন্মার্গ মুখী হয়েছিল। বিমলাকে বিয়ে করে তার নৈতিক নিষ্ঠা ছিল অবিচল। কিন্তু, স্বামীর অধিকারকে, বৈবাহিক বন্ধনের দাবিকে সে কখনও উপস্থিত করেনি স্ত্রীর কাছে। তার ফলে বরং নিজের যথার্থ ভূমিকাটিকে বিমলার মনে সুদৃঢ় করার কর্তব্য থেকেও বিচ্যুত হয়েছে। বিমলাকে সে বলেছিল,—"আমি চাই, আমি কথাও কইব না চুপও করব না, তুমি একবার বিশ্বের মাঝখানে এসে সমস্ত বুঝে নাও। এই ঘরগড়া ফাঁকির মধ্যে কেবল মাত্র ঘর-করনাটুকু করে যাবার জন্যে তুমিও হও নি, আমিও হই নি। সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয়, তবেই আমাদের ভালোবাসা সার্থক হবে।" কিন্তু, সত্যের পরিচয় আবিষ্কার করতেই নিখিলেশ ভুল করেছিল জীবনে। 'ভালোবাসা কিছুটা অত্যাচার করে, কিছুটা অত্যাচার চায়-ও।' প্রসঙ্গান্তরে এ-কথা বলেছেন স্বয়ং কবি। নারী-প্রেমের পক্ষে এ-কথা আরো বেশি সত্য;—পুরুষের জীবনে তার অন্নপূর্ণার আসন। কিন্তু, নিজের অধিকারের অকুণ্ঠতায় সে আসনে

বস্তু-জীবন ও আদর্শ-কল্পনা

প্রতিষ্ঠালাভ করা তার পক্ষে অসম্ভব; পুরুষের প্রেমের অভিষেকে, তার দাবি ও আকাঙ্ক্ষার আলোকে জীবনের বেদীতে নারী-ভূমিকার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ। বিমলা বাঙালি নারীর সেই সহজ-সুন্দর ভূমিকার অলোক-সামান্যতা প্রত্যক্ষ করেছিল নিজের মায়ের মধ্যে;—তাই, বঞ্চিতার দীর্ঘশ্বাস নিয়ে তার কথারম্ভ,—মাকেই স্মরণ করে:—"মাগো, আজ মনে পড়ে তোমার সিঁথির সিঁদুর!"—স্বামীর প্রেমের দাবির রক্তিমাভায় তার নিজের সিঁথির সিঁদুর তেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি। এমন সময়ে,—অন্নপূর্ণার রিক্ততার মুহূর্তে এল সন্দীপ। প্রথম থেকেই নারীর রক্ত-মাংসের দেহ-মনের প্রতি তার ইমোশন্যাল আকাঙ্ক্ষা ও দাবি সীমাহীন,—অকুণ্ঠ! কিন্তু, সন্দীপ সুকৌশলী; এক মুহূর্তেই চিরাচরিত জীবন-সংস্কারের কেন্দ্রভূমিতে আঘাত করে না সে। নারীর কাছে পুরুষের প্রথম দাবি সে উপস্থিত করে স্বদেশ-মাতৃকার নামে। বিমলার মধ্যে 'অন্নপূর্ণা নারী' হতাশায় ব্যর্থ হয়ে বসেছিল,—তার সব দেবার আহ্বান কোনোদিন আসে নি কোনো কর্মী পুরুষের অন্তর-ভূমি থেকে। ফলে, এই প্রথম আহ্বান তাকে পাগল করে তুল্‌ল,—সন্দীপের কৃত্রিমতাকে আবিষ্কার করবার সাধ্য ছিল না তার। অন্যদিকে দেশকে সে চেনে না, কিন্তু, নারী-চিত্তের ভাবালু অন্ধতা ছিল দেশ-প্রীতির অনুভবকে কেন্দ্র করে। একে সন্দীপের আহ্বানে ছিল দ্বিধাহীন কামনার অমোঘতা, তার সঙ্গে স্বদেশ-সেবার প্রসঙ্গ যুক্ত হয়ে, বিমলার নারীত্বের দ্বারে এ-যেন এল রুদ্রের আহ্বান। সে পথে নাম্‌ল,—সমাজ, সংস্কার,—সর্বশেষে নিজের হৃদয়কেও ভাঙ্‌তে লাগ্‌লো। নিখিলেশের পক্ষ থেকে চরম মুহূর্তেও প্রতিরোধ এল না,—এলো না স্ত্রীকে রক্ষা করবার পৌরুষ-প্রবৃত্তি। অথচ, সে সবই দেখ্‌ছিল,—বুঝ্‌ছিলও সবই—তার যন্ত্রণা বহন কর্‌ছিল প্রাণে-প্রাণে। অবশেষে স্বদেশের নামে সন্দীপের জন্যে টাকা চুরি করতে গিয়ে, এবং চুরি করে,—দুঃসহ দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে বিমলা আত্মস্থ হবার সুযোগ পেল;—অনুভব করলো,—স্বামীর প্রেমের ঘরে,—নিজের হৃদয়ের ঘরেও সে চুরি হতে দিয়েছিল। দুর্যোগের মধ্য দিয়ে নিখিলেশেরও আদর্শবাদী মনে বাস্তবের স্বরূপ ধরা পড়্‌লো। কিন্তু সকল ভুলের যেখানে অবসান, সেখানে মিল্‌লো কি দুজনে ঠিক!

জীবন-সমস্যার এই সাংকেতিক জিজ্ঞাসার মুখে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি।

'ঘরেবাইরে'র গঠন ও শৈল্পিক অখণ্ডতা প্রশ্নাতীত ; চতুরঙ্গের সকল দুর্বলতা এখানে ভাব-রূপে পূর্ণতা পেয়েছে। তবু, এই উপন্যাস নিয়ে একদা প্রবল তর্কের ঝড উঠেছিল ; কারণ সন্দীপ-চরিত্রে ছিল সমকালীন স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেতৃ-রূপায়ণ। অভিসন্ধি, ইমোশন ; উচ্ছ্বাস এবং লোলুপতা সন্দীপকে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে জীবনের যে পথে নিয়ে গিয়েছিল, তাকে স্বাধীনতা-সংগ্রামীর মূর্তি বলে স্বীকার করলে ইতিহাসের দরবারে অপরাধী হতে হবে। সকালের জীবন-ইতিহাসে বস্তুতঃ সন্দীপ থাকৃতেও পারে,—না-ও থেকে থাকৃতে পারে ; ঘবেবাইবে র পক্ষে সে প্রসঙ্গ অপরিহার্য নয়। আসল কথা, ক'বি লক্ষ্য করৃছিলেন,—স্বদেশ-প্রেমেব নামে সংকীর্ণ জাতীয়তার উন্মাদনা প্রেমকে খণ্ডিত, হৃদয়কে বিমূঢ় করে তুলতে চাইছিল ; বাজনৈতিক ধর্ম, তথা ব্যক্তিক ধর্মের নামে বিশ্ব-প্রেমের ধর্মকে অস্বীকার করাব বীভৎস সম্ভাবনা সন্দীপের মধ্যে ধবা পড়েছে,—আর সেই বিশ্বজনীন প্রেমেরই সাধক-রূপ প্রত্যক্ষ করি নিখিলেশ-এব আদর্শে। তার সঙ্গে বিমলার তপস্যার আকাঙ্ক্ষা যেদিন যুক্ত হল,—সেই দিনই 'ঘরেবাইরে' র দ্বন্দ্বাবসান।

ঘরেবাইরে র শিল্প স্বরূপ

ঘরেবাইবে-র পরের উপন্যাস যোগাযোগ রচিত হয় প্রায় বারো বছর পরে ; ১৩৩৪ সালে বিচিত্রা পত্রিকায় শুরু হয় এর প্রথম প্রকাশ। ঘরে-বাইরে রচিত হয়েছিল বলাকা-উত্তব যুগে, পলাতকা লেখার সূচনা হয় নি তখনো। আর, যোগাযোগ রচনাব সমকালে শুরু হয়েছে মহুয়াব কবিতা লেখা। যেমন ঘরেবাইরে-তে তেমনি যোগাযোগ-এও নর-নারীর জীবন-সমস্যার সকল-কালীন স্বাতন্ত্র্য-জটিল পরিচয় সন্ধান করে ফিরেছে শিল্পি-মনীষীর সন্ধিৎসু মন। মধুসূদন ঘোষাল অর্থ-প্রমত্ত,—একপুরুষে ধনী। ধন-সঞ্চয় প্রাণের জন্যে ; সে কথা অনুভব করবারও আগে ধনের অন্ধ সাধনায় সে প্রমত্ত হয়েছিল। তাই, ধনের অঙ্ক যতই গগনচুম্বী হতে লাগ্‌ল, মনে রসের উৎস ও অনুভব তত তিলে তিলে গেল শুকিয়ে,—ধনের তলায় মানব-প্রাণ হয়ে এল মুমূর্ষু। এমন সময় কুমুদিনীর সঙ্গে তার বিয়ে হল,—বিগতযৌবনে। কুমুদিনী বিপ্রদাসের বোন এবং শিষ্যা। এদের পরিবারে লক্ষ্মীর আসন অবিচল ছিল দীর্ঘদিন,—লক্ষ্মী ছিলেন বরদাত্রী,—তাঁর দানের কল্যাণ-আলোকে

যোগাযোগ

এদের পারিবারিক প্রাণশক্তি হয়েছিল নির্বাধ। বিপ্রদাসের যুগে লক্ষ্মীর আসন টলেছিল; কিন্তু যুগ-যুগব্যাপী প্রাণের উজ্জ্বলতা সেই ক্ষতির সঙ্গে তাল রেখেই যেন হয়ে উঠেছিল আরো প্রদীপ্ত। কুমুর সঙ্গে প্রথম থেকেই মধুসূদনের সংঘাত বাঁধল,—প্রাণের সঙ্গে ধনের! কুমুর সংস্পর্শে মধুসূদনের মধ্যে পৌরুষের আকাঙ্ক্ষা জেগেছে;—সে দিতে চায়, পেতেও চায়। কিন্তু, তার জানা নেই,—পেতে হলে দিতেও জান্‌তে হয়। আর, বারে বারেই তার দানের চেষ্টা রূঢ় ব্যর্থতার মধ্যে বিবর্ণ হয়ে পড়ে। কারণ, দাতা মধুসূদন প্রাণের ভাষা জানে না,—বোবা, মরা ধনের সাধনাই ত সে করেছে কেবল! চরম সংঘাতের মধ্যে কুমু দাদার কাছে ফিরে এসেছিল,—মনে মনে প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করেছিল,—স্বামীর ঘরে যাবে না আর। তবু যেতে হল ভাগ্যের 'যোগাযোগ'-এ;—দিনকয় পরেই তার জান্‌তে বাকি ছিল না,—মধুসূদনের ছেলেও তখন তার মাতৃ-গর্ভে।

সেই ছেলের,—অবিনাশ ঘোষালের বত্রিশ বছরের জন্মদিনে গল্পের সূত্রপাত হয়েছিল।—বিচিত্রা-য় তাই এ-উপন্যাসের প্রথম নাম ছিল তিনপুরুষ। মধুসূদন, তার পিতা আনন্দ ঘোষাল ও পুত্র অবিনাশ মিলিয়ে তিন-পুরুষের গল্পই ফেঁদেছিলেন কবি মনে মনে। কিন্তু, সমকালীন জীবন-চিন্তার প্রভাবে গল্প মোড় ফিরেছে,—নামও তাই আপনা থেকে গেছে পাল্‌টে।

শেষের কবিতা রচিত হয়েছিল ১৩৩৫ বাংলা সালের শেষভাগে,—যোগাযোগের পরের রচনা এটি। শিল্প-কর্ম হিসেবে শেষের কবিতা নিখুঁত রচনা,—আর রবীন্দ্র-কথা-সাহিত্যের ইতিহাসে বোধ হয় সুন্দরতম সৃজন-রূপ। এর কারণ, উপন্যাসের আঙ্গিক-নিরপেক্ষভাবে শেষের কবিতা একটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর কবিতা-রূপ;—অথচ গল্পের প্রচ্ছদে, জীবন-চিন্তার অখণ্ডতায় এবং চরিত্র-চিত্রণের নির্বন্ধন গতিশীলতায় উপন্যাসের স্বাদও অভঙ্গ হয়ে আছে গোটা গ্রন্থে। মহুয়ার প্রায় সমকালীন রচনা শেষের কবিতা; মহুয়ার ঋতু মনে নেমেছে পুরোপুরি। তাই, প্রেমের সাধন-দীপ্ত সত্যস্বরূপ শেষের কবিতা-তেও নূতন আকার পেয়েছে।

শেষের কবিতা

বিশেষতঃ প্রেম-সত্যের দেহ-বন্ধন-মুক্ত, রূপহীন দ্যুতি সম্বন্ধে কবির সমকালীন নিঃসংশয় প্রত্যয় অখণ্ড কাব্য-রূপ পেয়েছে মিতা

ও বন্যার যৌথ-জীবনে। 'মিতা' ও 'বন্যা' নাম দুটির মধ্যেও নর নারীর প্রেমানুভবের ব্যঞ্জনা-সংকেত রয়েছে বলে মনে করি। লাবণ্যের নারী-চেতনার অতলে অমিত কেবল 'মিতা',—বস্তুক সম্পর্কের দাবি সে অনুভবের পক্ষে অবাস্তব নয়, অসম্ভব-ও। মিতার কাছে লাবণ্য কেবল 'বন্যা',—প্রাণের গভীরে প্রেমের পাত্রকে প্রতি মুহূর্তে পূর্ণ করে তোলে সে,—কিন্তু সেই পূর্ণতার মধ্যে বাঁধা পড়ে থাকে না,—দেয় না ধরা। তাই, কেতকীকে জীবনের যে ভূমিকায় গ্রহণ করে অমিত, লাবণ্যের ভূমিকার সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই,—একটির দ্বারা অপরটি খণ্ডিত বা বঞ্চিত হয় না,—কোনোটিতেই লাগে না অসত্যের বিন্দুমাত্র স্পর্শ। অন্যদিকে শোভনলালের সঙ্গে বিবাহিত হয়েও লাবণ্য অমিতকে লিখ্‌তে পারে,—"তোমারে যা দিয়েছিনু, সে তোমারি দান।"

এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতেরা 'Platonic love' এর তত্ত্ব আলোচনা করে থাকেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের পক্ষে বড় কথা,—নিজের বা পরের প্রতিপাদ্য কোনো তত্ত্ব-কথাই তাঁর রচনায় প্রধান হতে পাবে নি কখনো। কবির জীবন-সম্ভব প্রত্যয়ের অখণ্ডতা শেষের কবিতায় বিমল সম্পূর্ণতা পেয়েছে,—তাই শেষের কবিতা সফল কথাসাহিত্য নয় কেবল,—সফলতর জীবন-কবিতাও।

(খ) পরিণতি যুগের ছোটগল্প

এই পর্যায়ের ছোটগল্পের মৌল স্বভাব রূপ পেয়েছে গল্পসপ্তক নামক সংকলনে। রবীন্দ্রনাথ গল্পগুচ্ছের নানা সংস্করণে গল্প-সূচীর অদলবদল করেছেন বারে বারে। সেই পরিবর্তন বর্তমান প্রসঙ্গে অবশ্য-আলোচ্য নয়। কবি-মানসের সমকালীন ঋতু-পরিচয়ের সন্ধান গল্পসপ্তকেই পাওয়া যাবে। হালদার গোষ্ঠী, হৈমন্তী, বোষ্টমী, স্ত্রীর পত্র, ভাইফোঁটা, শেষের রাত্রি ও অপরিচিতা,—এই কয়টি গল্প সংকলিত হয়েছে তাতে। সব কয়টি গল্পই ১৩২১ বাংলা সালে লেখা;—কালের দিক থেকে সেটা গীতালি-উত্তর বলাকার ঋতু। গল্পের মননে প্রেম ও জীবন-চেতনার অনন্তব্যাপ্তির ব্যঞ্জনা দুর্লভ নয় প্রায়ই,—বিশেষ করে হৈমন্তী, বোষ্টমী ইত্যাদিতে। বিশেষ বলেই এদের পৃথক্

ছোটগল্পে পরিণতির ধর্ম

উল্লেখ করা গেল—সব গল্পেই চেতনার সাধারণ সাধর্ম্য আছে। অন্যদিকে শরীরে যেন রয়েছে পলাতকার গল্প-বলার আঙ্গিক। প্রেমের মুক্তি-কামনায় পরিচিত সমাজ-সম্পর্কের বন্ধন-মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা,—নারী-চিত্তের আবর্ত-ময়তার মধ্যে নবীন জীবনার্তিব সৃষ্টি করেছে। বোষ্টমী, স্ত্রীর পত্র,—ইত্যাদি গল্পে এই ভাবনাব বিশেষিত প্রকাশ। আরো গোটাসাতেক গল্প রচিত হতে দেখি ১৩২৪ থেকে ১৩২৬ সালের মধ্যে; নবতর প্রত্যয় বা রূপ-চেতনার পরিচয় তাতে সুদৃঢ় নয়।

৪। পরিণতি যুগের গদ্য রচনা

আলোচ্য পর্যায়ে গ্রন্থিত প্রথম দুটি পুস্তক সঞ্চয় এবং পবিচয় ১৩২৩ বাংলা সালে প্রথম প্রকাশিত হলেও এদের ভেতরকার প্রবন্ধগুলি আসলে পূর্ব-ঋতুর ফসল,—এদের অধিকাংশের মূল রচনাকাল ১৩১৮-১৯ বাংলা। গীতাঞ্জলি উত্তর সে যুগে কবির মন সত্য-উপলব্ধির দৃঢ় প্রত্যয়ে আত্মস্থ। ফলে, ধর্ম ও মানব-জীবন-মূল সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব বোধ ও ব্যাখ্যা এই সময়ে নিঃসংশয়ে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছিল। নৈবেদ্য-যুগে ভাবতীয় ঔপনিষদিক ধর্ম-চেতনারই অনুবর্তন করেছিলেন, এবারে তাকে কবি মিলিয়ে নিলেন আত্মার স্বতন্ত্র আকাঙ্ক্ষা ও উপলব্ধির অনুসারে। এই ধর্মবোধের আলোকে সমকালীন সমাজের নানা আন্দোলন ও আদর্শেব বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেছেন। ফলে, প্রবন্ধগুলি কেবল ধর্ম-বিষয়ে আবদ্ধ হয়ে থাকে নি, সমাজ-সমস্যার নানাদিককেও করেছে উন্মোচিত। এইসব প্রবন্ধাবলীতে দার্শনিক-মনীষার মননের সঙ্গে ধ্যানী কবির উপলব্ধি যুক্ত হয়ে স্বাদ এবং রূপের অনন্যতা সৃষ্টি করেছে।

সঞ্চয় ও পরিচয়

এছাড়া, এই সময়ে যাত্রা-পথের দুটি দিনলিপি বা পত্র-সমষ্টি প্রকাশিত হয়েছিল,—জাপানযাত্রী (১৩২৬) এবং যাত্রী; আর প্রকাশিত হয়েছিল ভানুসিংহের পত্রাবলী (১৩৩৬)। এইসব লেখার মধ্যে একদিকে পাওয়া যায় কবির সমকালীন জীবন-যাত্রা ও রচনা-প্রবাহের খুঁটিনাটি পরিচয়। ইতিহাসের দিক থেকে এরা অমূল্য। তাছাড়া, এইসব লেখায়, ব্যক্তি-কবি প্রায়ই ধরা পড়েছেন,—নিজের গোপন স্বভাবধর্ম নিয়ে। রবীন্দ্র-পাঠকের পক্ষে এইটুকু সবচেয়ে বড়

দিনলিপি ও পত্রাবলী

লাভ। কারণ, নিজের বিপুল সৃষ্টির মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্বকে আড়াল করার দিকেই কবির ঝোঁক ছিল বেশি। তাঁর শিল্প-রচনাবলীর মধ্যে পাই কবিকে ;—আর এইসব গদ্য রচনায় দেখতে পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথকে।

এ-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ গদ্য রচনা লিপিকা (১৩২৯) ;—সমগ্র রবীন্দ্র-সৃষ্টির ইতিহাসে এই গদ্যকাব্য তুলনা-রহিত। কবি নিজে একে তাঁর গদ্য-কবিতা রচনার প্রথম প্রয়াস বলে অভিহিত করেছেন,—বলেছেন, গদ্য-কবিতার সাজ এর নেই। "ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি—বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।" লক্ষ্য করলে দেখব,—'লিপিকা'র অনেক রচনাতেই চেষ্টা করলেও গদ্য-কবিতার রূপ পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে না। সেখানেই বরং তাদের স্বাদের অভিনবতা। গদ্যের দেহে কবিতার এমন প্রাণ-উজাড়-করা আত্মদান অভিনব কেবল নয়,—অবিশ্বাস্য! রবীন্দ্র-রচনাতেও ঐ একবারই তা সম্ভব হয়েছিল, তারপরে আর হয় নি। লিপিকা গদ্য, না গদ্য-কবিতা, এ-সংশয় জাগে কেবল একটি কারণে,—রূপের বিচার তার শিল্প-প্রাণের পক্ষে অবান্তর হয়ে গেছে। অরূপের আনন্দলীলার অনির্বাচ্যতা যার মর্মগত, রূপের প্রসঙ্গে তাকে চিহ্নিত করা গেল না,—লিপিকার স্বাদুতার বৈশিষ্ট্য এখানেই। প্রথম সৃষ্টির সময়ে এই রচনাগুলিকে কবি 'কথিকা' নাম দিয়েছিলেন। কিছু কথা বা 'গল্প-কণা', কিছু আবেগ, কিছু অনুভব ও উপলব্ধি,—আর সব কিছুতেই কথার মাধ্যমে নিরঙ্গ সৌন্দর্যের বাসনাহীন তৃষ্ণার উজ্জ্বলতাকে ধরে তোলার ধ্যানী-লীলা,—এই সবেতেই লিপিকার পূর্ণ পরিচয়।

লিপিকা

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

রবীন্দ্র-প্রতিভার পূর্ণতা-র যুগ

রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইতিহাসে পরিণতি-যুগের পরে এসেছে পূর্ণতা। মানুষের জগতে,—জীব-জগতেও দেখি,—প্রথমে চলে একটানা বিবর্তন ও পরিণতি। তারপরে, পরিণতি যখন একবার শেষ হয়, অর্থাৎ দেহ-মনের আরো পরিণত হবার সম্ভাবনা যখন হয় নিঃশেষিত, তখনই—তৎক্ষণে শুরু হয় বিনষ্টির ধারা। কিন্তু, রবীন্দ্র-কবি-চেতনায় বিনষ্টির অবসাদ বা ক্লান্তি কোথাও একান্ত হয়ে পৌঁছোয়নি। দেহে রোগ-জরা-মৃত্যুর পরোয়ানা এসেছে ক্রমে ক্রমে, কিন্তু কবির মনকেও যদি-বা তা কখনো কখনো স্পর্শ করে থাকে, তাঁর কবি-আত্মা ছিল সকল জৈব স্পর্শের অতীত। জীবজগতে বিচরণ করেও কবি সেই আত্মার সত্যকে,—জীবন-ধর্মের মূলগত অজরামর সত্যকেই খুঁজে ফিরেছেন,—আবিষ্কার করেছেন সোনারতরী-চিত্রা, নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি এবং বলাকা-পূরবী-মহুয়া-ঋতুর ধাপে ধাপে। এই সব কিছুর মধ্য দিয়ে একবার যখন সেই অক্ষয় সত্য-ধর্মে তাঁর প্রত্যয় পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন থেকে আরো নূতন পরিণতির সম্ভাবনাও ছিল না,—প্রয়োজনও হয়েছিল লুপ্ত। কিন্তু, সেই সত্য-বোধের আলোক-লোক থেকে কবি আর বিচ্যুত-ও হন নি। একে কোনো লোকোত্তর প্রত্যয় বা শক্তি বলে মনে করবার কারণ নেই। মানুষের আদি-অন্তহীন জীবন-ধারাকে ইতিহাসের অখণ্ডতায়, বিজ্ঞানের তথ্য-দৃষ্টিতে, দর্শনের যুক্তি-চিন্তায় প্রতিফলিত করে, সম্পূর্ণ করে দেখবার জ্ঞানলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কবির মগ্ন-চৈতন্য। উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিচার এবং মনন। তাই, বিশ্ব-জীবনের চিরকালীন স্বভাবকে কেবল আবেগ দিয়ে নয়, জ্ঞান দিয়ে, ধ্যান দিয়ে সুনিশ্চিতভাবে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন তিনি। ফলে, আরো জানবার, আরো পাবার প্রেরণা যেমন লুপ্ত হয়েছিল,—তেমনি সত্যের ধ্রুবত্বে চিরপ্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকার সাধনাও চলছিল মনে মনে। সমকালীন ইতিহাসের বিচিত্র প্রেক্ষাপটে সেই অক্ষয় ধ্রুব সত্য-বোধকেই

রবীন্দ্র-প্রতিভার পূর্ণতার স্বরূপ

নিত্য-নব রূপ দিয়েছেন কবি। এই পর্যায়ের রচনাবলীর ধ্যান এবং বিশ্বাস মূলতঃ অবিচল, অনন্য; তাদের যা-কিছু অভিনবতা, সে কেবল জীবন-প্রেক্ষিতের বিচিত্র নবীনতায়।

১। পূর্ণতাধর্মী কাব্য-কবিতা

এই পূর্ণতাবোধের ধ্রুব তপস্যার শুরু বনবাণীতে (১৩৩৮ বাংলা)। নিজেব আশ্রম-গৃহের চার পাশে যে-সব "বোবা বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে, তাদের ডাক" কবির মনে পৌঁচেছে। সেই ডাকের মধ্যে কবি আবিষ্কার করেছেন বিশ্বের আদিমতম সত্য-জিজ্ঞাসার আকুলতাকে; সেই জিজ্ঞাসার সঙ্গে তাঁর নিভৃত আত্মার জীবন-জিজ্ঞাসুতা অন্বিত হয়েছে.—"আরণ্যক ঋষি শুনতে পেয়েছিলেন গাছের বাণী—বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ। শুনেছিলেন, যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। তাঁরা গাছে গাছে চিরযুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন, কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ—প্রথম-প্রাণ তাব বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে?……সেই প্রথম প্রাণ-প্রৈতির নব-নবোন্মেষশালিনী সৃষ্টির চিরপ্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীরভাবে বিশুদ্ধভাবে অনুভব করার মহামুক্তি আর কোথায় আছে?" নিজের প্রাণের গভীরে প্রথম-প্রাণ-প্রৈতির সুনিশ্চিত বিশুদ্ধ অনুভব নিয়ে কবি-চেতনা এখান থেকেই পূর্ণতার মহামুক্তিময় পথে পদক্ষেপ করেছে। প্রকৃতির মূলে মহাপ্রাণের অতলতা এবং অনন্তব্যাপ্তিকে কবি নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করেছিলেন। সেই সঙ্গে উদ্ভিদ-প্রাণের প্রকৃতি সম্পর্কে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কারের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কবির উপলব্ধির সূত্রে যুক্ত হয়ে প্রত্যয়কে প্রমাণিত করে দেখার আনন্দ-সাধনায় লিপ্ত হয়েছে।

বনবাণী

বনবাণীর পরে পরিশেষ (১৩৩৯) থেকে নতুন ঋতু না হলেও, নতুন স্বাদ ও রূপের কবিতা দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। 'বনবাণী' আসলে মহুয়া-ঋতুরই অগ্রসৃতি;—মহুয়ার তপঃপূত রুদ্র-প্রেমানুভূতি বিশ্বের গহন অতল থেকে নতুন বাণী, নতুন বিশ্বাস-প্রেরণা নিয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু, এবার,—পরিশেষ রচনার কাল থেকে কবি-চিত্ত পৃথিবীর গহন-গোপনে নয়,—আত্মার নিভৃত মর্মলোকেও নয়,—সমকালীন পৃথিবীর ওপরতলায়,—

তার অজস্র-জটিল সমস্যার পাকে পাকে নিজের সত্যোপলব্ধিকে জড়িয়ে নবীন কবিতার ধারাকে করেছে উৎসারিত। একদিক থেকে এই পর্যায়ের রচনাবলীতে কবির বস্তু-সচেতনা এবং সমকালিক জীবনের সঙ্গে অতি-সম্পৃক্ততা ছিল প্রায় অভূতপূর্ব। পরিশেষ-এর অধিকাংশ কবিতাবলী লেখা হয়েছিল ১৩৩৯ বাংলা সালে; কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ঐ একই বছরে। খ্রীস্টাব্দের হিসেবে সে ছিল ১৯৩২। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে কবি রুশ-দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। সেকালের পৃথিবীর পক্ষে বিপ্লবী রুশ-রাষ্ট্রের নব-জন্ম ছিল এক অপার বিস্ময়। মহামৃত্যুর অমারাত্রি পেরিয়ে নূতন জাবনাদর্শ-বোধের অরুণালোক তখন নতুন আশা ও বিশ্বাসের সৃষ্টি করছিল সবে। ইতিহাসের সেই আদর্শ-স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ ঘটে ওঠেনি তখনো। সেই সময়ে রুশিয়ার সাম্যের আদর্শ,—সর্বমানবের কল্যাণের উদ্দেশ্যে গুটিকয় উচ্চ-শীর্ষ মানুষের অতি-উন্নতি নিরোধের চেষ্টা, কবির চিত্তকে দোলায়িত করে তুলেছিল। কবির পক্ষে সেই অকল্পিত-পূর্ব অনুভবের বিস্ময়-দোলা ঐতিহাসিক রূপ পেয়েছে 'রাশিয়ার চিঠি'তে (১৩৩৮ সাল)। সমকালীন শিল্প-সৃষ্টিতেও এই বিস্ময়-ভাবনার ছাপ পড়েছে। ফলে, অনেকে মনে করেছেন, রুশ-বিপ্লবের প্রভাবই আজন্ম কল্প-লোকবাসী কবিকে বস্তু-জীবনের অভিমুখী করেছিল;—এমন কি এই প্রসঙ্গে কবি-কর্মের 'পরে রাজনৈতিক মতবাদের দম্ভ-স্ফীতি স্রষ্টার ধ্যানকে পর্যন্ত আপন কুক্ষিভুক্ত করার অসঙ্গত প্রয়াস করেছে। অথচ, রুশদেশ কিন্তু সেদিনো কবিকে প্রত্যক্ষ করেছে, "avoiding all political struggle, absorbed in his deep meditation."

বনবাণী-উত্তর সৃষ্টির নবীনতা

মূল কথা, আদি-অন্তে সম্পূর্ণ বিস্তারিত কবি-চেতনার বিকাশ ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি বিশেষ পর্যায়কে অতি মূল্যায়িত করে দেখতে গেলে বিভ্রান্তি এবং অনৃত-কথন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অপর পক্ষে, এ-পর্যন্ত আলোচিত ইতিহাসের ধারা লক্ষ্য করলে দেখব,—রবীন্দ্র-কবি-চেতনা কখনোই বস্তু-জীবন-বিমুখ ছিল না। নিজের দেশ-কালের দ্বারা বিশেষিত জীবন-স্রোতের তীরভূমিতে বসে অনন্ত দেশ-কালের,—চিরন্তন সত্য-জীবনের ধ্যান

বনবাণী-উত্তর সৃষ্টির জীবন-ভূমি

করেছেন কবি। ফলে, তাঁর সকল রচনাই সমসাময়িক জীবনের বৃন্তে শাশ্বত সর্বজনীন জীবন-ধর্মের কোরক-রূপকে ধারণ করে রেখেছে। এ-দিক থেকে রবীন্দ্র-রচনার সকল পর্যায়েই বস্তু-স্পর্শ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে জড়িয়ে—ছড়িয়ে আছে। আলোচ্য-কালে,—কবি-জীবনের শেষ দশ বছরের সৃষ্টির মধ্যে বস্তু চিন্তা অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতা পেয়েছে, তার অনেকগুলি কারণের মধ্যে কবির রুশিয়া সন্দর্শনও একটি। কিন্তু, এই ঘটনাকেই সকল মূল্যের শ্রেষ্ঠ মূল্য দিতে গেলে একদেশ-দর্শিতার দোষ ঘটবেই ঘটবে। আসলে, পৃথিবীতে জীবন-ধারণের জৈব-প্রয়োজন নির্বাহের সমস্যা সর্বাপেক্ষা জটিল হতে আরম্ভ করে সে-যুগ থেকেই সর্বপ্রথম। ১৯১৪-১৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্ব-যুদ্ধের পীডন পৃথিবীর অর্থনৈতিক জীবন-মানের ওপর সর্বপ্রথম রূঢ়তম আঘাত হানে। তারপর ১৯৩০-৩১ খ্রীস্টাব্দ থেকেই পৃথিবী-ব্যাপী অর্থনৈতিক জীবনের অবক্ষয় করাল রূপ ধরে সারা ভারতে,—তথা বাংলাদেশেও ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জীবনের মূলভূমিতে ভাঙন সৃষ্টি করতে শুরু করেছিল। অথচ, উনিশ শতকীয় বাঙালি-রেনেসাঁসের জন্ম, বিকাশ ও সম্পূর্ণতার একটিমাত্র ভিত্তি ছিল ঐ মধ্যবিত্ত সমাজ। পৃথিবীব্যাপী এই সর্বময় বিনষ্টির অংশীদারিতেই সেকালের ভারতের বাস্তব জীবন-জটিলতার শেষ হয় নি। নূতন সমস্যা দেখা দিয়েছিল,—ভারতের পরাধীনতার যন্ত্রণা ও স্বাধীনতা লাভের সর্বস্বপণ সংগ্রামের মধ্যে। ১৯৩০-৩১ খ্রীস্টসাল নেহরু কংগ্রেসের যুগ,—ভারতের নবজাগরণ ও ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রজাপীড়নের ইতিহাসে এক নবতর অধ্যায় সূচিত করেছিল। সারা পৃথিবীতে, তথা ভারতের ইতিহাসে, বস্তু-সচেতন জীবন-জটিলতার সেই অতুল্য বিক্ষেপ কবি-মনকে নূতন মতে ও পথে আলোড়িত করে তুলেছিল। তাঁর চিরপুরাতন,—চিরন্তন জীবন-প্রত্যয় সেই অপূর্ব আলোড়নের পথ বেয়ে নবীন স্বাদের, নতুন গন্ধের ফল-ফুল সৃষ্টি করেছে ঝাঁকে ঝাঁকে।

'পরিশেষ' আসলে ঋতু-সন্ধির কাব্য; নবীন প্রকৃতির কবিতা রচনার সৃজন-লোকের প্রবেশ-দ্বার। তাই, এই কাব্যের কবিতাগুচ্ছে ভাব ও রূপের বিচিত্রতা রয়েছে। কিছু-সংখ্যক কবিতায় আছে আত্ম-সন্ধান ও আত্ম-মূল্যায়নের প্রয়াস। বৃহৎ বিশ্বের প্রেক্ষিতে নিজের সৃষ্টির চিরন্তন

মূল্য-সন্ধান করে ফিরেছেন কবি তাঁর রচনা-প্রবাহের ধাপে ধাপে। পূর্ণতা পর্বের একটি সাধারণ লক্ষণ হয়ে দেখা দিয়েছে বিশ্ব-ধ্যানী কবির এই আত্ম-সন্ধিৎসা। পৃথিবী থেকে বিদায়ের প্রাক্কালে নিজের পূর্ণ পরিচয়টুকু যাচিয়ে দেখে নেবার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা রয়েছে এই চেষ্টার মূলে। সেই সঙ্গে বিশ্ব-বিবর্তনের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞান ও বিশ্ব-সত্যের নির্বিশেষতা সম্পর্কে কবির ধ্যানময় উপলব্ধি নিজের সম্বন্ধেও নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়নের প্রয়াসী হয়েছে এই পর্যায়ে। ঋষি-মনীষীর এই ধ্যান-ঋদ্ধ প্রজ্ঞা নিয়ে আত্ম-পরিচয় ঘোষণা করলেন কবি :—

নিখিলের অনুভূতি
সংগীত সাধনা মাঝে রচিয়াছে অসংখ্য আকৃতি।
এই গীতি পথ-প্রান্তে, হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
আরতির সান্ধ্য ক্ষণে ; একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্ম বাঁশি,—এই মোর রহিল প্রণাম।"

পরিশেষ

পরিশেষের কিছু সংখ্যক কবিতা, প্রিয়জনের বিবাহ ইত্যাদিতে সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে রচিত। কিন্তু, ঐ সব ক্ষেত্রেও পরিশেষ-ঋতুর নৈর্ব্যক্তিক মনন ও উপলব্ধির ছাপ প্রায়ই অস্পষ্ট নয়। আর এক শ্রেণীর কবিতায় সমকালীন ভারতীয় জীবন-ঝটিকার উত্তাল তরঙ্গ-ক্ষেপ কবি-মনের দৃঢ় বিশ্বাসে দীপ্ত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এদের মধ্যে বিখ্যাত হয়ে আছে 'বক্সাদুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি' এবং 'প্রশ্ন' কবিতা দুটি। প্রথমটির ভাব-বিষয় কবিতার নামেই প্রকাশিত ; দ্বিতীয় কবিতাটি লিখিত হয় ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের শুরুতে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের পরে গান্ধীজির অপ্রত্যাশিত গ্রেপ্তারের পর। বাস্তব সংগ্রামের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত কবিতাবলীতেও বস্তু-স্বরূপদর্শী কবির অবিচল প্রত্যয় এই কবিতাগুলিতেও অসংশয় ব্যঞ্জনা পেয়েছে।

পরিশেষের কিছু গাথা-কবিতায় গদ্য-ছন্দের ব্যবহার আছে ; আর প্রথম চেষ্টাতেই সেই ব্যবহার সফল কবিতারূপ পরিগ্রহ করতে পেরেছিল ; 'বাঁশি' এই পর্যায়ের একটি জনপ্রিয় কবিতা। পরবর্তী কাব্য 'পুনশ্চ'র কবিতাবলীতেই গদ্যছন্দের রচনায় কবির উদ্দেশ্য পূর্ণতা পেয়েছে ; 'লিপিকা'র প্রথম গদ্য-কবিতার জন্ম,—যদিও সমুচিত ছন্দ-সজ্জা নেই

তাতে,—এ-কথা কবি নিজে বলেছেন। পরিশেষ-এ গদ্য-কবিতার ভাব ও রূপ-সজ্জা প্রথম সুচিহ্নিত শরীর লাভ করেছে। রূপের সঙ্গে ভাবেরও পূর্ণতা ঘটে প্রথম 'পুনশ্চ'তে। গদ্য কবিতার দেহ-মনের ধর্ম ব্যাখ্যা করে 'পুনশ্চ'র ভূমিকাতে কবি বলেছিলেন,—"গদ্য-কাব্যে অতি-নিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্য-কাব্যে ভাষায় ও প্রকাশ-রীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে, তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেকদূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি" গদ্য-পদ্য নির্বিশেষে পুনশ্চ-র প্রায় সকল কবিতাতেই 'গদ্য-রীতির' এই 'অসংকুচিত' গতি অবারিত হয়েছে। পরিশেষ-এর গদ্য-কবিতার মত পুনশ্চর অনেকগুলি কবিতাও কথিকাধর্মী। তাতে সাধারণ বস্তুময় জীবনের প্রতি কবির সুগভীর মমতার পরিচয় জড়িয়ে আছে,—'ক্যামেলিয়া', 'সাধারণ মেয়ে' ইত্যাদি কবিতা তার নিদর্শন। তা-ছাড়া, নিরবধি কালের দরবারে নিজের সাধনার নৈর্ব্যক্তিক মূল্য সন্ধানের যুগ-প্রবণতাও রয়েছে কিছু সংখ্যক কবিতায়। 'নূতন কাল'কে ডেকে কবি বলেছেন,—

গদ্য কবিতাগুচ্ছ ও পুনশ্চ

"আমার বাণীকে দিলেম সাজ পরিয়ে
তোমাদের বাণীর অলংকারে ;
তাকে রেখে দিয়ে গেলেম পথের ধারে পান্থশালায়
পথিকবন্ধু, তোমারি কথা মনে করে।
যেন সময় হলে একদিন বল্‌তে পারো
মিট্‌লো তোমাদেরো প্রয়োজন,
লাগ্‌লো তোমাদেরও মনে।"

বিচিত্রিতা প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪০ বাংলা সালে; এটি কবিতা ও ছবির সমন্বয়। এর আগে দেশে-বিদেশে কবির চিত্র-প্রদর্শনী প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল; কিছু সংখ্যক চিত্রকে উপলক্ষ্য করে এবার কবির কল্পনা মুক্ত-পক্ষ হয়েছে বিচিত্রিতায়। ৩১টি কবিতা ও ৩১টি ছবির সমন্বয় ঘটেছে এতে। কবিতাগুলি

বিচিত্রিতা

এবারে এসেছে পদ্যের সাজ পরে। কাব্যটি শিল্পগুরু নন্দলাল বসুকে উৎসর্গিত।

বিচিত্রিতার পরের গ্রন্থিত কাব্য শেষসপ্তক (১৩৪২ সাল); ভাব ও রূপের দিক থেকে এটি 'পুনশ্চ'র অনুবৃত্তি,—সেই ধারার পরিণতি-ও। 'শেষ-সপ্তক', আসলে 'শেষ-রাগিণীর গান',—কবি অন্ততঃ তাই মনে করেছিলেন। তাঁর ৭৪ বছরের জন্ম দিনে এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এর পরে আর হয়ত লেখা হবে না,—কথার উৎসের সঙ্গে বুকের নিশ্বাসটুকুও হয়ত হবে চির-নিরুদ্ধ। তাই, একদিকে সকরুণ মমতা-বোধ নিয়ে অতীতের জীবন-লোকে চলে স্মৃতি-চারণ। আর একদিকে সমাগত প্রায় মৃত্যু-সম্ভাবনা সত্ত্বেও মোহমুক্ত মনে নিজের সত্য মূল্য সন্ধানের করুণাঘন নৈর্ব্যক্তিক প্রয়াস কবিতাগুলির দেহে এবং প্রাণে সৃষ্টি করেছে ধূসর গৈরিক এক অপরূপ উৎকণ্ঠা :—

> "যাব লক্ষ্যহীন পথে,
> সহজে দেখ্‌ব সব দেখা
> শুন্‌ব সব সুর
> চলন্ত দিন-রাত্রির কলরোলের মাঝখান দিয়ে।
> আপনাকে মিলিয়ে নেব
> শস্যশেষ প্রান্তরের সুদূর বিস্তীর্ণ বৈরাগ্যে।
> ধ্যানকে নিবিষ্ট করব ঐ নিস্তব্ধ শালগাছের মধ্যে,
> যেখানে নিমেষের অন্তরালে
> সহস্র বৎসরের প্রাণ নীরবে রয়েছে সমাহিত।"

শেষ-সপ্তক প্রকাশিত হয়েছিল পঁচিশে বৈশাখে; আর 'বীথিকা' প্রকাশিত হয় ১৩৪২ সালের ভাদ্রমাসে। এতে আগের দুবছরের প্রায় ছাপ্পান্নটি কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে,—ঐ গুলিতে মহুয়া, পরিশেষ, বিচিত্রিতার সুর জড়িয়ে আছে। বাকি ২২টি কবিতা লেখা হয় ১৩৪২-এর আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাসের মধ্যে। শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় বলেছেন,—ঐ বাইশটিই আসলে "বীথিকা কাব্যের খাস দরবারের মধ্যে পড়ে।" বীথিকার কবিতা লঘু, মুক্ত, পদ্য ছন্দে লেখা। ভাব-চেতনা নতুন পরিপ্রেক্ষিতে পুরাতনকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে,—তাতে

বীথিকা

আছে অতীত লীলা ও অনাগত সম্ভাবনায় অপার বিস্তৃত আত্ম-সত্যকে খুঁজে দেখার প্রয়াস ;—সেই সঙ্গে জীবনের সত্য প্রেক্ষিতের স্বরূপ-চেতনাও হয়ে আছে অনাবৃত।

বীথিকার পরে 'পত্রপুট' (১৩৪৩) ; তারপরে 'শ্যামলী'ও গ্রন্থিত হয়েছিল একই সালে। পুনশ্চ ও শেষ-সপ্তকের গদ্য-কবিতা রচনার প্রকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে এই দুটি কাব্যে। এর পরে বিশুদ্ধ গদ্য-কাব্য আর লেখেন নি কবি। এই দুটি কাব্যের কবিতায় মনীষী, ধ্যানী এবং কবির সম্পূর্ণতম বিকাশ ঘটেছে যুগপৎ। বস্তু-বিশ্বের যথার্থ রূপ-চিন্তনের সঙ্গে সঙ্গে মূল-নিহিত শাশ্বত বিশ্বসত্যের ধ্যান, এবং সেই সঙ্গে আত্মসংবিৎ-এর আলোকে প্রতিফলিত করে তাদের শিল্প-রূপায়ণ। অখণ্ড-অবিনাশী সত্য-সুন্দরের যুগলরূপ মূর্তি ধরেছে এই দুটি কাব্য-কবিতায়! পত্রপুট-এর সুবিখ্যাত পৃথিবী কবিতা সম্বন্ধে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন,—"এই কবিতাটি যেন পৃথিবীর স্তব—গদ্য-ছন্দে লিখিত বলিয়া রসগ্রহণে কোনো বাধা হয় না, এমনই তাহার গতিচ্ছন্দ। যে সৌন্দর্য-সম্ভোগ কবির আবাল্যের সংস্কার ও সাধনা তাহারই ভাষাময়ী মূর্তি এই কবিতা।" কেবল সুন্দরী পৃথিবীর কল্প-স্তোত্র নয় এই কবিতা,—ইতিহাসের যুগে যুগে যে পৃথিবী "ললিতে কঠোরে" বিপরীত,—তার শাশ্বত নৈর্ব্যক্তিক রূপায়ণের ভিত্তির 'পরে আত্মস্থাপন ক'রে ধ্যানী কবি বলেছেন,—

পত্রপুট ও শ্যামলী

"শুভে-অশুভে স্থাপিত তোমার পাদপীঠে,
তোমার প্রচণ্ড সুন্দর মহিমার উদ্দেশে
আজ রেখে যাব আমার ক্ষত-চিহ্ন-লাঞ্ছিত জীবনের প্রণতি।"

পত্রপুটের পৃথিবী যেমন বন্দনাগান,—শ্যামলীর 'আমি'-ও তেমনি আত্মস্তোত্র ; সোঽহং তত্ত্বের সত্যরূপ কবির চেতনার রঙে এ হ'য়েছে নিত্য-কালের রসসিক্ত ;—পান্না হয়েছে সবুজ, "চুনি উঠল রাঙা হয়ে।"

'ছড়ার ছবি' কাব্যটি শিশুদের জন্যে লেখা ;—১৩৪৪ সালে দ্বিতীয়বার আলমোড়া বাসকালে লেখা হয়েছিল। নন্দলাল বসুর আঁকা কয়টি ছবির প্রেরণাকে আশ্রয় করে ছড়ার আকারে শিশু-কবিতা লেখা শুরু হয়। প্রভাতকুমার জানিয়েছেন,—"নন্দলালের ছবিগুলি কবিতা লিখিতে তাঁহাকে প্রেরণা দিয়াছিল নিঃসন্দেহেই ;

ছড়ার ছবি

কিন্তু কাগজে আঁকা ছবির বাহিরে বৃহত্তর চলতি ছবিও তাঁহাকে কয়েকটি কবিতা লিখিতে উদ্রিক্ত করে।" পূর্ববর্তী শিশু-কবিতাবলী বা অন্যান্য কাব্য থেকেও এই কাব্যের স্বাদের অভিনবতা সম্পাদন করেছে ছড়ার ছন্দ। কবি লিখেছেন,—"ছড়ার ছন্দ প্রাকৃত ভাষার ঘরোয়া ছন্দ। এ ছন্দ মেয়েদের মেয়েলি আলাপ, ছেলেদের ছেলেমি প্রলাপের বাহনগিরি করে এসেছে।" ছড়ার ছবিতে ছেলেমি প্রলাপের অর্থহীন গভীর অর্থাবহতার দোলা বাইরের রূপে ও মনের অনুভবে নতুন রকমের দোল দিয়েছে।

প্রান্তিক

প্রান্তিক প্রকাশিত হয় ১৩৪৪ সালের পৌষ মাসে। ইতিমধ্যে ভাদ্র মাসে কবি মুমূর্ষু হয়েছিলেন; সমগ্র পৃথিবী তাঁর জীবন সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েছিল। রোগ-ভোগ থেকে সেরে উঠেই প্রান্তিক-এর কবিতাগুচ্ছ লিখতে আরম্ভ করেন। মৃত্যু-তীর্ণ নব-জীবনে অনুপ্রবেশের উৎকণ্ঠা এই কবিতাগুচ্ছের সাধারণ লক্ষণ। তা ছাড়া, সদ্য-পরিচিত মৃত্যু-অনুভবের অবচেতন স্মৃতিকে অনেকটা তত্ত্বের আধারে টেনে তোলার চেষ্টাও আছে প্রান্তিকে:

"আজি মুক্তি মন্ত্র গায়
আমার বক্ষের মাঝে দূরের পথিক চিত্ত মম,
সংসার যাত্রার প্রান্তে সহমরণের বধূ সম।"

সেঁজুতি

সেঁজুতি প্রকাশিত হ'য়েছিল ১৩৪৫ বাংলা সালে। ছড়ার ছবির যুগ থেকে এ পর্যন্ত একটি-দুটি করে সঞ্চিত, অথচ গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ধরা হয়েছে এই কাব্যগ্রন্থে। নামকরণ সম্বন্ধে কবি লিখেছিলেন,—"সন্ধ্যাবেলার প্রদীপ হিসাবে ও'র মানেটা ভালো।" এর থেকেই কবিতাগুচ্ছের ভাবমুল্য স্পষ্ট হতে পারবে। বিশেষ করে প্রান্তিক-উত্তর কালে লেখা জীবন-মৃত্যুর রহস্য-সন্ধানী কবিতাগুলি সেঁজুতি-র সুরের স্পষ্ট স্বভাব-ব্যঞ্জক। জন্মদিন কবিতাটি তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

সেঁজুতির পরের কাব্য প্রহাসিনী,—১৩৪৫ সালের পৌষ মাসে প্রকাশিত হয়। নামেতেই কাব্য-স্বভাবের পরিচয় আছে। প্রহাসিনীর কবিতাগুচ্ছ লঘু সহাস। কবি-ভাবনা কিন্তু সর্বত্র লঘু নয়, আপাত-পেলবতার অন্তরালে সমকালীন জীবন-চিন্তায় প্রবাহ বয়ে গেছে ফল্গু-ধারার মত। প্রহাসিনী

থেকেই দেখি,—তার আগেও আছে ক্বচিৎ-কখনো,—আত্মপরিচয়-সন্ধানী কবি বিরোধীপক্ষের দৃষ্টির আলোকে নিজের মূল্য নতুন করে যাচাই করে দেখতে শুরু করেছেন। পবিশেষ-পূর্ব যুগ থেকেই বাংলা সাহিত্যে অর্থ-দৈন্য পীড়িত যৌবনের অবিশ্বাস অবারিত হয়েছিল। কল্লোল পত্রিকার (১৩৩০) তরুণ লেখক গোষ্ঠীকে আশ্রয় করে এই অবিশ্বাসী গতি-উন্মাদনা প্রথম দানা বেঁধে ওঠে। তারপরে দেখা দিতে চেয়েছে বস্তুবাদী নতুন বিশ্বাসের অঙ্কুর। বিদেশী জীবন-ভাবনার প্রতিধ্বনিও তাতে সুপ্রচুর ছিল। তাছাড়া ছিল ভঙ্গি-প্রাধান্য;—আর শিল্প-চেতনার অসংশয়িত অন্বয়হীন উদ্‌ভ্রান্তি। তাতে আগন্তুকদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কবি শংকা প্রকাশ করেছেন,—অন্যদিকে নিজের আজীবন সাধনার মূল্য সন্ধান করতে চেয়েছেন বিদ্রোহী তরুণ-মনের বিরূপতার আলোকে। বস্তুবাদী কবিতার নামে "প্রোলেটারিয়েট্ সাহিত্য"-কৃতির অপূর্ণতার প্রতি কটাক্ষ আছে প্রহাসিনীর শেষ কবিতায়।

প্রহাসিনী

"আকাশ প্রদীপ" প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৬ বাংলার বৈশাখ মাসে। এই কাব্য-স্বভাবের সফল পরিচয় দিয়ে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন,—এতে "কবিচিত্ত পুরানো দিনের স্মৃতির দেওয়ালি সাজাইয়া আছে।"—

আকাশ প্রদীপ

"ঠাকুরমা দ্রুততালে ছড়া যেত পড়ে,
ভাবখানা মনে আছে,—বউ আসে চতুর্দোলা চড়ে
আমকাঁঠালের ছায়ে।
গলায় মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পায়ে॥
বালকের প্রাণে
প্রথম সে নারীমন্ত্র আগমনী গানে
ছন্দের লাগালো দোল আধোজাগা কল্পনার শিহর দোলায়,"—

আকাশ প্রদীপের পরের গ্রন্থিত কাব্য নবজাতক;—প্রকাশকাল ১৩৪৭ বাংলার বৈশাখ,—খ্রীস্ট-বছরের সেটি ১৯৪০ অব্দ। পৃথিবী-ব্যাপী দ্বিতীয় বিশ্বসমরের অগ্নিতাণ্ডব তখন এগিয়ে গেছে বহুদূর। এই কাব্যের অনেকগুলি কবিতায় সমকালীন পৈশাচিকতার ছবি কলমের একটি-দুটি আঁচড়ে আশ্চর্য সম্পূর্ণ রূপ পেয়েছে:—

নবজাতক

"উপর আকাশে সাজানো তড়িৎ আলো—
নিম্নে নিবিড় অতি বর্বর কালো
ভূমি গর্ভের রাতে
ক্ষুধাতুর আর ভুরি-ভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্য নামিক পাতালে যেথায় জমেছে
লুটের ধন।"

জীবনের কদর্য বীভৎসতাকে যত দেখ্ছেন ততই তাকে সম্পূর্ণ করে জানার আগ্রহ জমছে মনে মনে। কোথাও-বা আক্ষেপ করেছেন, জীবনের এই অশুচি-অসুন্দর স্বভাবকেই এর আগে খুঁজে দেখেন নি বলে ;—'অপূর্ণ' 'রোমান্টিক্' ইত্যাদি কবিতা এই ধরনের মনোভাবের সফল প্রকাশক। সেই সঙ্গে এই দুঃখ-নির্জিত অন্ধকার থেকে মুক্তি-দাতা নবীন মুক্তিদূতকে,—'নবজাতক'কে করেছেন আহ্বান ;—"নবীন আগন্তুক,—নবযুগ তব যাত্রার পথে চেয়ে আছে উৎসুক!"

নবজাতকের পরে 'সানাই' (১৩৪৭)। বিশ্বব্যাপী মানুষ-পশুর হুহংকার তখনও জীবন-শিল্পীর প্রাণের যন্ত্রণাকে উত্তপ্ত করে রেখেছে ; তবে প্রথম আঘাতের আচ্ছন্নতা অনেকটা গেছে কেটে। সমকালীন জীবনের আবিলতা আঘাত করলেও কবি-চৈতন্যকে আপ্লুত করতে পারে নি ;—এই পরিচ্ছন্নতা-বোধ পূর্ণব্যঞ্জিত হয়ে আছে সানাই কাব্যে। কবি নিঃসংশয়ে বল্তে পেরেছেন,—"এ গলিতে বাস মোর, তবু আমি জন্ম রোমান্টিক্।"

সানাই

'রোগশয্যায়' কবিতাগুচ্ছ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৭ বাংলা সালের পৌষমাসে। মৃত্যু-রোগ দেহের ভেতরে দিনে দিনে ক্ষীণ-দুর্বল করে আনছিল প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের শক্তিকে। অথচ, রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময় পৃথিবীর অতীন্দ্রিয় স্বরূপকে কবি তো চিরকাল উপভোগ করেছেন ইন্দ্রিয়ের দ্বারপথে। তাই, দেহের অবসাদ মনেও ক্লান্তি জড়িয়ে আনে। এমন সময়ে পুজোর মুখে কালিম্পঙ্ গিয়ে হঠাৎ শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তাড়াতাড়ি তাঁকে কল্‌কাতায় আন্‌তে হয়। এই সময়কার রোগশয্যাতেই

'রোগশয্যায়' কবিতাগুচ্ছ লেখা হয়েছিল। রোগ-পাণ্ডুরতার সঙ্গে সঙ্গে বিষণ্ণ অতীতচারণ ও করুণা-উৎকণ্ঠিত ভবিষ্য-কামনা রোগশয্যায়-এর কবিতাগুচ্ছকে বিশেষিত করেছে।

রোগশয্যায়

রোগশয্যায় থেকে সেরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে লিখলেন 'আরোগ্য' (১৩৪৭) কবিতার গুচ্ছ। পূর্ণ সুস্থ আর কখনোই হন নি,—মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্বল্প-নীরোগতার অবকাশে সুস্থ দৃষ্টিতে পৃথিবীকে আর একবার,—শেষবার দেখে নিতে পারার সকরুণ আনন্দময় তৃপ্তি জড়িয়ে আছে এই কবিতাবলীতে :—

আরোগ্য

"এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা-কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।"

'জন্মদিনে' কবির জীবদ্দশায় গ্রন্থিত শেষ কাব্য। শেষ জন্মদিনের মুখোমুখি পৌঁছে,—১৩৪৮ বাংলা সালের ১লা বৈশাখে এই কাব্য প্রকাশিত হয়। নিজের জীবন ও সাধনার শেষ বিচারের চেষ্টা আছে এই কাব্যের কবিতাগুচ্ছে। 'ঐকতান' নামক কবিতার আলোচনা-বিচার প্রায় ঐতিহাসিক প্রাধান্য পেয়েছে। এই কবিতাটি 'নিন্দুকের প্রতি নিবেদন' বলেই মনে হয়। 'মানসী' কাব্যে এই নামে একটি কবিতাও কবি লিখেছিলেন। এখানে বলেছেন,—

"তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা—
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।"

জন্মদিনে

ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন,—"এ ক্ষোভ নিরর্থক। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা শুধু চিরন্তন মানবজীবনকেই নয় বিশ্ব-প্রকৃতির মহাপ্রাঙ্গণকেও উদ্ভাসিত করিয়াছে আনন্দালোকে। যে গুহায় সে আলোক পৌঁছায় নাই তাহার জন্য আক্ষেপ করা বৃথা।" মনে হয় কবির মর্মমূলে এ আক্ষেপ দানা বাঁধে

নি কখনো ;—এমন কি, 'ঐকতান' কবিতা রচনার বিশেষ মুহূর্তটিতেও নয়। জগতের বৃহত্তম সংখ্যক গণ-জনতার জীবন-দৈন্য বাস্তব মূর্তিতে আপন স্থান খুঁজে পায় নি কবির রচনায়,—তথাকথিত বস্তুবাদী শিল্পীদের এই নিন্দার উত্তরে কবি নিজের সাধনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন,—

"মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
ভেতরে প্রবেশ করি সে সাধ্য ছিল না একেবারে।"

জীবনের বিশেষিত গণ্ডিতে প্রতিষ্ঠিত থেকেও,—অপরতর জীবনের প্রাঙ্গণ-সীমা পর্যন্ত কবির সাধনা নিজের অধিষ্ঠানকে অবিচলিত করেছে। তার পরেও, আরো দূরে যাবার যে আহ্বান,—তা কবির যুগ-ইতিহাসে এসে পৌঁছায় নি। যথাকালে সেই অনাগত শিল্পীর ঐতিহাসিক অভ্যুদয়কে কবি আগে থেকে বন্দনা করে গেছেন। সেই সঙ্গে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন পরনিন্দক ভঙ্গিসর্বস্ব বাস্তববাদীদের অসংগত অকালপক্বতার প্রতি। সাহিত্যে জীবনের সৃষ্টি ইতিহাসের হাতের দান; জীবন-ইতিহাসের বিশেষিত পরিণতির অপেক্ষা না রেখে, আগে থেকে মতবাদ-পুষ্ট রচনাকে জোর করে গড়তে গেলে শিব না হয়ে তা হয় আর কিছু;—এ-কথা এই সময়কার পত্র-প্রবন্ধাদিতে কবি বার বার বলেছেন। 'ঐকতান' সেই প্রজ্ঞার কাব্যরূপ।

শেষলেখা

সবশেষের কাব্য 'শেষলেখা',—কবির মৃত্যুশেষে প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ সালে। শেষতম কবিতাগুচ্ছের সংকলন এটি। শেষ কবিতাটিতে মৃত্যুর তমসালীন আলোকে জীবনের করুণ আর্তধ্বনিটিকে শেষবারের মত জাগিয়ে তুলে বিদায় নিলেন যেন,—

"তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।"

২। পূর্ণতাধর্মী নাটক

রবীন্দ্রকাব্যে পূর্ণতাধর্মের পরিচায়ন উপলক্ষ্যে দেখেছি,—এ-যুগে নূতন পরিণতি নেই কোথাও। সকল যুগের সকল ভাব-পরিণতির সমবেত ফলশ্রুতি অখণ্ড পূর্ণতা পেয়েছে এই যুগের রচনায়। এই পর্যায়ে লিখিত

নাট্য-নাটিকার সংখ্যা মোটামুটি সাতটি; তাতে মাত্র দুটি ছাড়া আর সব কয়টিই পুরাতন রচনার পুনরাবৃত্তি। তবে, এদের স্বাদে নবীনতা আছে,—কবি-চেতনার পূর্ণতার অনুভব ছড়িয়ে আছে রচনাবলীর ভাব ও রূপে।

পূর্ণতাধর্মী নাটক

এই পর্যায়ের প্রথম নাটক শাপমোচন-এর মূক অভিনয় হয় ১৩৩৮ বাংলা সালে;—কবির সত্তর বছরের জয়ন্তী উৎসবে ছাত্রদের সম্বর্ধনার অঙ্গ হিসেবে। "যে আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া 'রাজা' নাটক, তাহারই কাব্যরূপে 'শাপমোচন' কবিতা, এবং তাহারই আভাস লইয়া এই দৃশ্যরূপ।"—বলেছেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।

শাপমোচন

তার পরের নাটক 'কালের যাত্রা'-তে দুটি পূর্ব-রচিত নাটিকার নব-রূপ গ্রন্থিত করে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উপহার দেন তাঁর জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে (১৩৩৯ বাংলা সাল)। 'কালের যাত্রা'-তে সংকলিত নাটিকা দুটি হচ্ছে,—(১) রথের রশি ও (২) কবির দীক্ষা। প্রথমটি ১৩৩০ বাংলা সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল প্রবাসী পত্রিকায়,—নাম ছিল 'রথযাত্রা'। 'কবির দীক্ষা' নাটিকায় পূর্ব পাঠ 'শিবের ভিক্ষা' নামে প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল ১৩৩৫ বাংলা সালের মাসিক বসুমতী পত্রিকায়। 'রথের রশি'-র গল্পে আছে,—রথযাত্রার দিনে হঠাৎ 'মহাকালের রথ' হল অচল। পুরুতের হাতের স্পর্শে রথ চললো না,—রাজাও পারলেন না রশি ধরে তাকে চালাতে। অবশেষে ডাক পড়লো চির-উপেক্ষিত, চিরলাঞ্ছিত শূদ্রদের। তাদের সমবেত শক্তির টানে এবার রথ এগিয়ে চললো অবলীলায়। কাহিনীর অন্তর্বর্তী ভাব-ব্যঞ্জনা ব্যাখ্যা করে কবি স্বয়ং লিখেছিলেন,—"...মহাকালের রথ অচল, মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো দুর্গতি কালের এটি গতিহীনতা। মানুষে-মানুষে যে সম্বন্ধ-বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ-টানার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানব-সম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদের-ই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহন রূপে, তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে

রথ সম্মুখের দিকে চলবে।”—সাম্যবাদের আদর্শ কবি-চেতনার হাতে নূতন রূপ পেয়েছে এই নাটকে; ইতিহাসের বিচারে লক্ষ্য করতে হয়, এই নাটিকার প্রথম পরিকল্পনা ও রচনা সমাপ্ত হয়েছিল কবির রুশযাত্রার পূর্বে।

কবির দীক্ষায় “যাহা আছে তাহা শুধু একটা তত্ত্ব, ত্যাগের কাব্যীয়-দর্শন।”—বলেছেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায়। এর নাট্য-কৃতির চেয়ে রূপক-প্রচেষ্টাই প্রবলতর।

এর পরে প্রায় একসঙ্গে প্রকাশিত হয় তাসের দেশ ও চণ্ডালিকা,—দুটিরই প্রকাশ কাল ১৩৪০ বাংলা সালের ভাদ্র মাস। প্রথমটির নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে গল্পগুচ্ছের “একটি আষাঢ়ে গল্প”-কে আশ্রয় করে,—গল্পটি ১২৯৯ বাংলা সালের রচনা। আপাত-দৃষ্টিতে একটি লঘু কৌতুক-রসান্বিত নাটিকা হলেও তাসের দেশের মূলে আছে সমকালীন বিশ্ব-জীবন-ভাবনার ব্যঞ্জনাঘাত। তাসের দেশের লোকেরা বাইরের স্পর্শদোষ বাঁচিয়ে চলতে চলতে নিজেদের ভেতরকার প্রাণ-শক্তিকে ক্ষীণ,—মুমূর্ষুপ্রায় করে তুলেছিল। রাজপুত্র-সদাগরপুত্রের দল বাইরে থেকে নতুন প্রাণের শক্তি নিয়ে এল অন্ধকার পুরীতে,—বিদ্রোহের পথ দিয়ে নবচেতনার আলোক প্রবেশ করল,—কৃত্রিম সংকীর্ণতার অচলায়তনকে দিল চূর্ণ করে। ভারতীয় চেতনার এক সময়কার রক্ষণশীল শুচিবায়ুগ্রস্ততার প্রতি হয়ত ব্যঞ্জনাময় কটাক্ষ রয়েছে এই নব-নাটিকার কল্পনায়।

তাসের দেশ

চণ্ডালিকা এই যুগের প্রথম নাটক, যার মধ্যে পূর্ব-রচনার ছায়াপাত ঘটে নি। বৌদ্ধ কথিকার একটি গল্পের সূত্রকে কবি নিজের মনোমত করে ঢেলে সেজেছেন। বুদ্ধ-শিষ্য আনন্দ চণ্ডালকন্যা ‘প্রকৃতি’র হাতের জলপান করেছিল,—তাকেই কেন্দ্র করে অস্পৃশ্যতার আদর্শকে আঘাতে আঘাতে বিচূর্ণ করে মানবতার মহৎ-ধর্মকে কবি প্রতিষ্ঠিত করেছেন এই নাটিকায়। পাঁচ বছর পরে এই নাটিকাই “নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা”-র নূতন নাম ও রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়।

চণ্ডালিকা

বাঁশরী এই যুগের একমাত্র নাটক যা কবি-চেতনার অমিশ্র-মৌলিক কল্পনার দান। রবীন্দ্র-নাট্য হিসেবেও এটি অনন্য-সদৃশ্য; নর-নারীর প্রণয়সমস্যার সামাজিক জটিলতাকে কেন্দ্র করে এমন নাটক কবি লেখেন

নি এর আগে। অথচ, সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে সমকালীন চিন্তা-কল্পনার কাব্যব্যঞ্জনাময় সাংকেতিকতা। কেবল নাট্য-সাহিত্যের সীমার মধ্যে বেঁধে দেখ্‌লে বাঁশরী-কে আকস্মিক রচনা বলে মনে হবে; কিন্তু এসময়কার গল্প-কবিতার সঙ্গে এই নাট্য-ভাবনার সংযোগ ঘনিষ্ঠ। বিশেষ করে, মনে হয়, বাঁশরী যেন দুই বোন ও মালঞ্চ নামক গল্পগ্রন্থিকা দুইটির-ই ভাবানুবর্তন। প্রথমে লিখেছিলেন দুইবোন (১৩৩৯-ভাদ্র); কয়মাস পরে, ঐ একই সালে লেখা হয় মালঞ্চ; আর বাঁশরী নাটিকা শান্তিনিকেতনে প্রথমে পড়ে শুনিয়েছিলেন ১৩৪০ বাংলা সালের বৈশাখ-প্রারম্ভে। এই রচনা-ত্রয়ীতে কালের সান্নিধ্য যেমন ঘনিষ্ঠ; ভাবের অনুষঙ্গ-ও তেমনি নিবিড। নর-নারীর প্রেম ও দেহাতুরতার পৃথক্ স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য খুঁজেছেন কবি এই তিনটি রচনায়; প্রেম ও দেহাসক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন নিজের ভাবনা ও অনুভবের সঙ্গে মিলিয়ে।

বাঁশরী

শেষের কবিতায় দেখেছি, নারীর প্রেম দেহের ক্ষুধাকে অস্বীকার করেও সর্বজয়ী হয়েছে;—অমিত এবং লাবণ্যের প্রণয়-মধুরতা সংসার-জীবনের বন্ধন ও দেহের দাবিকে অস্বীকার করেই হয়েছে সর্বাতিগ, সর্বকালীন। বাঁশরী এবং সোমশংকরের জীবনেও হয়েছিল তাই। গুরু পুরন্দরের অজ্ঞাত ইচ্ছা ও আদর্শ-সাধনের বেদীতে আত্মদান করেছে সোমশংকর ও সুষমা,—তাদের বিবাহ-বন্ধন অনুরাগ-লেশহীন,—প্রয়োজন-সর্বস্ব। সে প্রয়োজনের সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই তাদের,—পুরন্দরের আদেশই হয়েছে একমাত্র সম্বল। অথচ, বাঁশরীর দুর্লভ নারী-প্রাণের প্রচুরতা প্রাণ-বিচঞ্চল করেছিল সোমশংকরকে। সোমশংকরের বিবাহ-কথা বাঁশরীর প্রেমকে যেন চাবুক দিয়ে মারে; তবু বাইরে সে কঠিন; অবিচলতার ভান করে। সব সত্ত্বেও, চাপা কান্নার আভাস গোপন থাকে না তার কথায়, প্রতিশোধ নেবার জন্যে ক্ষিতীশের সঙ্গে নিজের বিয়ের প্রস্তাব পাকাপাকি করে নেয়। অথচ, ক্ষিতীশের পৌরুষকে সে উপেক্ষাভরা করুণার চোখেই দেখেছে চিরকাল। বিয়ের নিমন্ত্রণ পাঠিয়ে দেয় সোমশংকরের কাছে। কিন্তু, সোমশংকর যখন শান্ত কণ্ঠে বলে তার প্রেম ও ব্রত বিভিন্ন;—ব্রতের কর্তব্য প্রাণের প্রেমকে কোনোদিন স্পর্শও করতে পারবে না,—সেইদিন বাঁশরী শান্ত হয়ে যায়,—দাবাগ্নিমুক্ত ঘনবনানীর মত। কারণ, সে নিশ্চয় করে

জানে,—"ভালবাসার নীলামে সর্বোচ্চ দরই" পেয়েছে সে। মিলনের বন্ধনে নয়, প্রাণের তপস্যাতেই প্রেমের মুক্তি। তাই, সুষমাকে আর হিংসা করে না বাঁশরী,—বরং তাকে করুণা করে।

'বাঁশরী'-র বক্তব্য আসলে কবি-ভাবনার একটি দার্শনিক কল্পনাংশ।—কিন্তু, বাঁশরী চরিত্রের প্রাণোত্তাপ সমস্ত নাটকটিকে দিয়েছে যুগপৎ গতি এবং সুষমা। রবীন্দ্র-নাট্য-রচনার ইতিহাসে 'বাঁশরী' অভিনব,—অতুল্য!

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা

বাঁশরীর পরে চিত্রাঙ্গদা নাটিকা নূতন নৃত্যনাট্য-রূপ পায় ১৩৪২ বাংলা সালে; পুরাতনের নবরূপ নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা,—নূতন ভাবনারও বাহন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন,—যৌবনের "এ যেন সেই শক্তি, যাহার মধ্যে আলো আছে, তাপ নাই,—তেজ আছে দাহ নাই।"

শ্যামা

'কথা ও কাহিনী'র পরিশোধ নামক কাব্য-কথাকে নৃত্যনাট্য-রূপ দিয়ে ১৩৪৩ সালে কলকাতায় অভিনয় করা হয় নৃত্যনাট্য পরিশোধের। পরে বারে বারে পরিবর্তিত করে অবশেষে নৃত্যনাট্য শ্যামা নামে প্রকাশ করা হয় ১৩৪৪ বাংলা সালে।

৩। পূর্ণতা পর্যায়ের গল্প-উপন্যাস

এ-পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস রচিত হয়নি বলাই ভাল। দুইবোন ও মালঞ্চ-কে উপন্যাস বলা হয়,—কিন্তু আকৃতি ও প্রকৃতিতে এদের মধ্যে ছোট গল্পের লক্ষণই বেশি। একমাত্র উপন্যাসের পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে চার অধ্যায়-কে (১৩৪১ বাংলা সাল)। কিন্তু তা-ও আসলে কবির লেখা গল্প। উপন্যাসের সমস্যা-বিস্তারিত জীবন-পরিচয় রচনা করেন নি কবি এতে;

একটি উপন্যাস: চার অধ্যায়

অন্ত-এলার প্রেম-রোমাঞ্চকে করেছেন ঘন-নিবিষ্ট। কবিও বলেছেন,—"চার অধ্যায়ের যে দিক্‌টা আমাদের ভোলায় সে ওর কবিতা-অংশ। ওর ভাষায় লাগিয়েছি যাদু, সেইটের ভিতর দিয়ে তারা যে জিনিসটা পায়, সেটা ঠিক গল্পের বাহন নয়। অন্ত আর এলার ভালবাসার বৃত্তান্তটা লিরিকের তোড়া রচনা। নবেলের নির্জলা আবহাওয়ায় শুকিয়ে যেতে হয়ত দেরি হবে।" বাংলার অগ্নিযুগের রক্তিম পটভূমি প্রণয়-রোমান্সের লিরিক লালিমাকে

যেন আরো উজ্জ্বল-দীপ্ত করে তুলেছে। গদ্যে-লেখা জীবন-লিরিক হিসেবে চার অধ্যায় রবীন্দ্রসাহিত্যেও অতুল্য-সুন্দর।

দুইবোন ও মালঞ্চ চার অধ্যায়-এর অব্যবহিত পূর্ববর্তী রচনা। উপন্যাস হিসাবে সাধারণভাবে স্বীকৃত হলেও, আগেই বলেছি,—ঐ দুটিকে আমরা গল্পরূপেই বিচার করব। উপন্যাসের জীবন-বিস্তার এবং অনপনেয় জটিলতার আভাসও নেই এদের প্লট্-এ। বরং শেষের কবিতা উপন্যাসের জীবন-জিজ্ঞাসা যেন এখানে পূর্ণতা-পর্যায়ের অটুট প্রত্যয়ে আলোকিত হয়ে গীতধর্মী গল্প-রূপ পেয়েছে। দুইবোন্-এর শিল্প-পরিণতি মালঞ্চ; আসলে দুটি গল্পের প্লট্ একটিই। শর্মিলা বিবাহিত হয়েছিল; শশাঙ্ক-র জীবনে নিজের নারী-জীবনের সর্বাঙ্গ ছড়িয়ে দিয়ে পুরুষের প্রেমকে সে লুঠে নিয়েছিল,—তাকে করেওছিল দেহে-মনে চরিতার্থ। এমন সময় বিধির দুর্জয় আঘাত নেমে এল শর্মিলার দেহের ওপর। আর, তখনই ছোট বোন ঊর্মিমালা এসে শশাঙ্ককে দিতে চাইল নূতন মুক্তি,—নিজের দেহে-মনে, সেই সঙ্গে নিজে বাঁধা পড়লো শশাঙ্কের আকর্ষণে। শর্মিলা সবই বোঝে; নিজের স্বামীকে নিঃসহায়ে হারিয়ে ফেলার দীনতায় তার মধ্যেকার 'নারী' ক্ষণে ক্ষণে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। আবার তার নিজেরই অন্তরের 'দিদি' ছোটবোনের জন্যে সব হারাতে পারার তৃপ্তিতে স্মিত হাস্যে হয়ে ওঠে উজ্জ্বল। এমন সময় চরম মুহূর্তে শর্মিলা সবলা হয়ে ওঠে অতিলৌকিক শক্তির বলে, শশাঙ্ক-শর্মিলা পুনর্মিলিত হয়,—ঊর্মিমালা ছুটে যায় য়ুরোপের পথে।

দুইবোন

দুইবোন-এর প্লট্-এ যেমন, কবি কল্পনাতেও তেম্‌নি বিস্রস্ততা রয়েছে। একই বিবাহিত পুরুষের প্রতি তার স্ত্রী এবং দ্বিতীয়া নারীর প্রণয়-সংঘাত তীব্র হতে পারে নি দুটি বোনের মধ্যে; তা-ছাড়া শেষ মুহূর্তে শর্মিলার রোগমুক্তির আকস্মিকতা এবং সেই প্রসঙ্গে অতিলৌকিক শক্তির ব্যবহার গল্পের বাস্তব রসকেও ফিকে করেছে। মালঞ্চ-তে সেই অভাব পূরিত হল। এখানে নীরজা ও সরলার প্রণয়-দ্বন্দ্ব শশাঙ্কর বদলে কেন্দ্রিত হয়েছে আদিত্য'র মধ্যে। পুরুষ হিসেবে আদিত্য অনেক বেশি সক্রিয়,—বলিষ্ঠ এবং জীবন্ত। তাছাড়া, নীরজা ও সরলার নিঃসম্পর্কতা নীরজার রুগ্ন দেহমনের ঈর্ষাকে জ্বালাতপ্ত করেছে।

মালঞ্চ

নীরজার যন্ত্রণা যেমন মানবিক, তেমনি তার নাটকীয় সমাপ্তি ট্রাজেডি-নিবিড়। প্লটের এই সহজ পরিণতি গল্প-রসকে যেমন স্বচ্ছ করেছে,—কবি-কল্পনার অবাধ গীতি-সুধাপ্লাবন আর মালঞ্চ-পটভূমির পুষ্প-সুরভিত সৌন্দর্য 'মালঞ্চকে' ঘনতর সুন্দর করেছে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন,—দুইবোন, মালঞ্চ ও বাঁশরী-র জীবন-চিন্তার সমসূত্রে গাঁথা আছে শেষ গল্পের বই 'তিন সঙ্গী'। ১৩৪৬-৪৭ বাংলা সালে সাময়িক পত্রিকার প্রয়োজনে লেখা তিনটি গল্পকে একত্র গ্রন্থিত করে 'তিন সঙ্গী' নাম দেওয়া হয়।

তিন সঙ্গী

গল্প তিনটি যথাক্রমে রবিবার, শেষ কথা এবং ল্যাবরেটরী। নর-নারীর প্রণয় ও তার সামাজিক এবং দৈহিক জটিলতা নিয়ে কবির কল্পনা, ধ্যানীর জিজ্ঞাসা ও মনীষার বিচার শিল্প-সৃষ্টির এক অকল্পনীয় বিস্ময়-লোকে উত্তীর্ণ করেছে এই গল্প তিনটিকে। কবির লেখা শেষ পর্যায়ের গল্প গ্রন্থগুলির মধ্যে তিন সঙ্গী একদা প্রবল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল,—আজও সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত-মূল্য। কবির লেখা সর্বশেষ গল্প-সংকলন গল্পসল্প-র গ্রন্থন কাল ১৩৪৮ সালের ২৫শে বৈশাখ। আশ্চর্য হাল্কা-ভঙ্গির গল্পগুলির অভ্যন্তরে ছড়িয়ে আছে অতীন্দ্রিয়-প্রায় স্পর্শ-কাতর সুগভীর জীবনানুভবের স্পর্শ।

সে, গল্পসল্প ইত্যাদি

বাইরে থেকে মনে হয় বুঝি হাল্কা মেজাজের শিশু-গল্প ; কিন্তু কবি নিজে বলেছেন,—ছেলেরা এই গল্পের জগৎ দখল করতে চাইলেও "হাত ফস্কে যায়, আসলে এর ভেতরের খবর বড়দের জন্যই।"

গল্প-সল্প বাইরে থেকে শিশুমনকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, তবু অন্তরে অন্তরে গল্পগুলি বড়দেরই। আর 'সে' গল্প-গ্রন্থে ছোটদের গল্পের ভেতর থেকে বড়দের জন্যেও ভেসে আসে ইশারা। 'সে'-র গ্রন্থনকাল ১৩৪০ বাংলা সাল। রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবীর প্রতিপালিতা কন্যা নন্দিনীর (ডাকনাম পুপু) জন্যে রচিত হয়েছিল গল্পগুলি। অপরূপ শৈলীগুণে গল্পের জগতে বড় এবং ছোটদের মহলের বেড়া ভেঙে দিয়ে এক সর্বজনীন আনন্দলোক রচনা করে গেছেন কবি এই শেষ পর্যায়ের গল্পে।

এছাড়া আরো একটি সম্পূর্ণ গল্প আর দুটি গল্প-কাঠামো সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হলেও গ্রন্থিত হয় নি দীর্ঘদিন। অধুনা গল্পগুচ্ছ চতুর্থ খণ্ডের

অঙ্গীকৃত হয়েছে।—তাদের নাম যথাক্রমে প্রকৃতির পরিহাস, শেষ পুরস্কার আর মুসলমানীর গল্প। বিখ্যাত বদ্‌নাম গল্পটি ১৩৪৮ সালের প্রবাসীতে (জৈষ্ঠ সংখ্যায়) প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল,—অধুনা পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী একবিংশ চতুর্থ খণ্ড গল্পগুচ্ছে গ্রন্থিত হয়েছে।

৪। পূর্ণতার পর্বে গদ্য-রচনাবলী

যেমন অন্যান্য ধারায়, তেমনি এ-যুগের গদ্য রচনাতেও কবির কল্পনা এবং মনীষার ভাবনা পূর্ণতার উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁচেছে। পূর্ব-পূর্ব বারের মত এই পর্যায়েও রচনার বৈচিত্র্য ও সংখ্যাবাহুল্য প্রাচুর্যে পূর্ণ। ফলে, এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় কেবল সমুল্লেখ্য গদ্য-গ্রন্থগুলিরই আলোচনা সম্ভব, পৃথক্ পৃথক্ রচনার পূর্ণাঙ্গ আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়।

পূর্ণতাপর্বের গদ্য

আলোচ্য পর্যায়ের প্রথম প্রবন্ধ-গ্রন্থ মানুষের ধর্ম ১৩৪০ বাংলা সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কমলা বক্তৃতা। এই রচনায় রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্র ও আচার-সর্বস্ব ধর্মের সংস্কারকে অস্বীকার করে মানুষের আত্মার ধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষ যেখানে আত্ম-চেতনাময়,—সেখানে সর্বসাধারণের থেকে সে পৃথক্—একমেবাদ্বিতীয়। তাই, নিজের ধর্মকে তখন নিজের আত্মার ভেতর থেকেই উদ্ভূত করতে হয়,—কারণ, ধর্ম ত আত্মাকে ধারণ করে রাখবারই মৌল শক্তি। 'আমার ধর্ম' নামক প্রবন্ধে কবি বলেছিলেন, শাস্ত্রের ধর্ম, বিশেষিত আচার ও রীতি-নীতির ওপরে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম, তাঁর নিজের ধর্ম নয়, সে ধর্ম রয়েছে তাঁর আত্মার গভীরে। সর্বমানবের প্রসঙ্গে এই আত্ম-ধর্মের কথাই তিনি বল্‌লেন এবারে 'মানুষের ধর্ম'-তে। দার্শনিকের গভীর মনন কবির উপলব্ধির সূত্রে গাঁথা পড়ে ভাবে এবং ভাষায় দুর্লভ স্বাদুতার সৃষ্টি করেছে।

মানুষের ধর্ম

১৩৪৩ বাংলা সালে গ্রন্থিত হয় 'ছন্দ' সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী। কবি যে শুধু বিচিত্র ছন্দের স্রষ্টাই নন, বৈজ্ঞানিক রূপ-জিজ্ঞাসুও,—তার নিঃসংশয় প্রমাণ রয়েছে এই গ্রন্থে। বৈজ্ঞানিক নিয়মের ব্যাখ্যা ও প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে যুক্তির আনুপূর্বিকতা একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নি, অথচ সাহিত্যের স্বাদুতা ও উপলব্ধি

মমতাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এই রচনারও সর্বাঙ্গে। এই সঙ্গে, এখানেই স্মরণ করে রাখি, বাংলা ভাষা-পরিচয় গ্রন্থিকার। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ) এটি প্রথম প্রকাশিত হয়,—ছন্দতত্ত্বের পরে এই গ্রন্থে সঞ্চিত হয়েছে ভাষা-তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক-ঐতিহাসিক রূপায়ণ।

ছন্দ ও বাংলা ভাষা-পরিচয়

এই সময়কার ভ্রমণ-কাহিনী বা দিনপঞ্জীর মধ্যে আছে,—জাপানে পারস্যে (১৩৪৩), পাশ্চাত্য ভ্রমণ (১৩৪৩), পথে ও পথের প্রান্তে (১৩৪৫) এবং পথের সঞ্চয় (১৩৩৬)। জাপান যাত্রী এবং পারস্য ভ্রমণ,—এই দুটি রচনা সংকলিত হয় প্রথম গ্রন্থে। পাশ্চাত্য ভ্রমণ গ্রন্থে য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র (পরিবর্তিত সং) আর য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরীর (পুনর্মুদ্রিত) দ্বিতীয় খণ্ড একত্র সংকলিত হয়। পথের সঞ্চয়ে আছে ১৯১১-১২ খ্রীস্টাব্দে য়ুরোপ-আমেরিকা ভ্রমণকালে লিখিত পত্রাবলী। সকল রচনাতেই কবির ব্যক্তিত্ব-সুনিবিড় পথিক মনের পরিচয় রসান্বিত প্রকাশ পেয়েছে,—যেমন বর্ণনা, তেমনি ভাষা-ভঙ্গিতে।

ভ্রমণকাহিনা ও দিনপঞ্জী ইত্যাদি

এ-সময়কার সাহিত্য-তত্ত্ব বিষয়ক একমাত্র গ্রন্থ 'সাহিত্যের পথে' সংকলিত হয়ে প্রথম প্রকাশ লাভ করে ১৩৪৩ বাংলা সালে। সবুজ পত্রের শুরু থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী প্রায় কুড়ি বছরের সাহিত্য-বিষয়ক নিবন্ধাবলীকে বাছাই করে এই প্রবন্ধ-সংগ্রহ সংকলন করেছিলেন স্বয়ং কবি। তাঁর সাহিত্যবিষয়ক পুরাতন ভাবনা পরিণততম,—চিরন্তন রূপ পেয়েছে এই রচনাবলীতে। যেমন মনন, তেমনি রস-গভীরতায় এরা গভীর-সুন্দর। 'প্রাক্তনী' নামে প্রাক্তন-ছাত্রদের সভায় কথিত কবির অভিভাষণাবলীর এক সংগ্রহও প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৩ সালেই।

সাহিত্যের পথে ও প্রাক্তনী

শিক্ষাবিষয়ক কয়েকটি নিবন্ধও এই পর্যায়ে লিখিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, শিক্ষার বিকিরণ, শিক্ষার ধারা ইত্যাদি।

শিক্ষাবিষয়ক নিবন্ধ

রবীন্দ্র-জীবনে পূর্ণতা-পর্যায়ের সবচেয়ে বিস্ময়কর গদ্য রচনা দুইটি,—এক কালান্তর, আর-এক বিশ্বপরিচয়। দুইটি পুস্তকই গ্রন্থিত হয় ১৩৪৪ বাংলা

সালে। প্রথম গ্রন্থে আধুনিক বিশ্বের সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিষয়ক সর্ববিধ সমস্যাকে প্রত্যক্ষ করে,—কবি-মনীষীর দৃষ্টিতে তাদের ব্যাখ্যা, রূপায়ণ ও সমাধান করার প্রয়াস রয়েছে। মানব-ইতিহাস ও আধুনিক সভ্যতার এমন অনুপুঙ্খ, অথচ, অখণ্ড সম্পূর্ণ পরিচয়-রচনা এক পরম বিস্ময়কর ঘটনা।

কালান্তর

তার চেয়ে কম বিস্ময়কর নয় আজীবন সুন্দর-শিল্পীর পক্ষে বার্ধক্যের উপান্তে বসে 'বিশ্বপরিচয়' জিজ্ঞাসা। এই গ্রন্থটি বিশ্ব-রহস্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও আবিষ্কারের সমষ্টি। বিজ্ঞান-চিন্তায় কবি আত্মনিয়োগ করেছেন,—তাও পরিণত প্রৌঢ়াতে,—এ এক অকল্পনীয় ব্যাপার। কিন্তু, রবীন্দ্র-মানসের মৌল-স্বভাব প্রথমাবধি লক্ষ্য করলেই দেখব,—জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল সর্বদাই ছিল নিঃসীম,—নিরবধি। অথচ, বিশ্ব-পরিচয় লাভের আকাঙ্ক্ষায় নিছক নিরঙ্গ কল্পনার ওপরে নির্ভর করেন নি কখনোই। বিশ্ব-বিষয়ে ইতিহাসের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের তথ্যকে জেনে তারই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে অনুভব করতে চেয়েছেন বিশ্ব-সত্যকে। অতএব, বিশ্ব-ইতিহাস ও বিশ্ব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল আজন্ম। কালান্তরে,—অন্যান্য বহু গ্রন্থের মত কবির ইতিহাস-চেতনা আর একবার নবরূপ ধরেছে। বিশ্ব-পরিচয়ে বৈজ্ঞানিক দিদৃক্ষা সেই একবারই তাঁর হাতে পেয়েছে প্রথম বৈজ্ঞানিক রূপ।

বিশ্ব-পরিচয়

এই সময়কার আর একটি অবিস্মরণীয় গদ্য-রচনা 'সভ্যতার সংকট' কবির মৃত্যু-পূর্ব কালে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৮ বাংলা সালে। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের অন্ধতম অমালগ্নে মানব সভ্যতার সংকট, ও তার পরিত্রাণের মহা আশ্বাস রচনা করে কবি বিদায় নিলেন বিশ্ব-মানবের সভা-ভূমি থেকে।

সভ্যতার সংকট

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রানুবর্তন

রবীন্দ্রনাথ কেবল শিল্প-সাহিত্যেরই অতুল স্রষ্টা ছিলেন না,—নিজের যুগ ও জাতির জীবন-চিন্তাকেও তিনি সৃষ্টি করেছিলেন নিরবধি। তাঁর সন্ধিৎসু দৃষ্টি জীবন-তরঙ্গের প্রতিটি উত্থান-পতনে সচকিত হয়ে উঠেছে;—কাছে কিংবা দূরে, জীবনের প্রতিটি বিবর্তন পরিবর্তনে প্রাণ-মনে দিয়েছে সাড়া। ফলে, শিল্পি-প্রাণের স্পর্শ-কাতরতার টানে রবীন্দ্র-কাব্যের ভাব এবং ভাষা, উপলব্ধি এবং প্রকরণ ক্ষণে ক্ষণে নিত্য-নবরূপে বিবর্তিত হয়েছে। আর, প্রতি পর্যায়েই তাঁর কবি-কর্মে সমকালীন জীবনের প্রতিবিম্ব এমন স্বচ্ছ প্রাঞ্জল হয়ে ধরা পড়েছে যে, প্রতি যুগের জীবন-শিল্পী তাঁর ভাব-ভাষাকে অনুসরণ করার সহজ প্রলোভন অতিক্রম করতে পারেন নি। ফলে, দীর্ঘদিন ধরে কাব্য এবং বিচিত্র গদ্য রচনায় চলেছে রবীন্দ্র-সৃষ্টির অনুবর্তন।

সাহিত্যে রবীন্দ্রানুবর্তনের উৎস

এ-কালের শিল্পীরা সকলেই নিছক অনুকারী ছিলেন, এ-কথা মনে করবার কারণ নেই। তাঁদের মৌলিকতা-ধর্মী শিল্প-চেতনা রবীন্দ্র-প্রতিভার ভাব-রূপে অনুরঞ্জিত হয়ে নবমাধুরী অর্জন করেছে,—এখানেই তাঁদের বৈশিষ্ট্য। বর্তমান প্রসঙ্গে সেই বিশিষ্ট কবি-শিল্পীদের কথাই আলোচনা করব।

১। কাব্যে রবীন্দ্রানুবর্তন

একেবারে শুরুতে রবীন্দ্রপ্রভাবের মধ্যে ডুবেছিলেন কবির অনুজাত পারিবারিকেরা। এঁদের মধ্যে আছেন তাঁর স্নেহাস্পদ বলেন্দ্রনাথ, ঋতেন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি। সরলা দেবী এবং ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এই রবীন্দ্রানুস্মৃতি মুখ্যতঃ গদ্যের বাহনকেই আশ্রয় করেছিল। গদ্যের সঙ্গে কবিতা লিখেও স্মরণীয়তার দাবি করেছেন কেবল একজন,—তিনি বলেন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রানুবর্তনে ঠাকুর-পরিবার

বলেন্দ্রনাথ এঁদের সকলের মধ্যেই স্বল্পজীবী (১৮৭০-১৮৯৯) ছিলেন। গদ্য এবং পদ্য রচনায় তিনি ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করে গেছেন। পদ্যের

চেয়ে গন্থ লেখায় তাঁর দক্ষতা ছিল সমধিক। আর, কি বিষয়-চিন্তা, কি অনুভব, কি প্রকাশভঙ্গি,—সব দিক থেকেই বলেন্দ্রনাথের গন্থে রবীন্দ্র-রচনার স্বাদ যেন এক নবীন তারুণ্য আর কোমলতা নিয়ে দেখা দিয়েছিল। অন্যপক্ষে কবিতা-রচনায় বলেন্দ্র-নাথের স্বাতন্ত্র্য সীমিত হলেও সুস্পষ্ট ছিল। মাধবিকা (১৩০৩ বঙ্গাব্দ) ও শ্রাবণী (১৩০৪) কাব্যে এই সত্যের সমুচিত পরিচয় রয়েছে।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-পরিবারের বাইরে মহিলা-কবিদের মধ্যে প্রিয়ম্বদা দেবীর (১৮৭১-১৯৩৪) রবীন্দ্রানুবর্তন যেমন স্পষ্ট, তেমনি তাঁর রচনার স্বকীয়তাও সংশয়াতীত। বলেন্দ্রনাথের মতই প্রিয়ম্বদা দেবীও সনেট্ রচনায় বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। রেণু (১৩০৮), পত্রলেখা (১৩১৭), অংশু (১৩৩৪) প্রভৃতি এঁর লেখা কাব্য-গ্রন্থের মোটসংখ্যা পাঁচখানি।

প্রিয়ম্বদা দেবী

রবীন্দ্রানুসারী কবি হিসেবে যতীন্দ্রমোহন বাগচি, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও কালিদাস রায় এ-কালের সাহিত্য-পাঠকের কাছে সবিশেষ খ্যাত।

করুণানিধান ও কুমুদরঞ্জন বিশেষভাবে পল্লীকবি। করুণানিধানের (১৮৭৭-১৯৫৫) কবিতায় পল্লীপ্রকৃতির বহিরঙ্গ রূপ বিচিত্র চঞ্চল ছন্দের অভিঘাতে প্রকাশ পেয়েছে। এঁর কাব্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে আছে,—বঙ্গমঙ্গল (১৩০৮), প্রসাদী (১৩১১), ঝরাফুল (১৩১৮), শান্তিজল (১৩২০) প্রভৃতি।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

কুমুদরঞ্জন (১৮৮২) পল্লীর বনমালিকায় কৃষ্ণের বন্দনা করেছেন। তাঁর কবিতায় গ্রামের মেঠো সুরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৈষ্ণব ভাবানুরক্তি। এ র কবিতা-গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখ্য,—বনতুলসী (১৩১৮), উজানী (১৩১৮), বীথি (১৩২২), নূপুর (১৩২৭) ইত্যাদি।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

যতীন্দ্রমোহনের (১৮৭৮-১৯৪৮) রচনায় প্রত্যয়ের চেয়ে আবেগ ছিল মর্মস্পর্শী। শহরের কবি হয়ে গ্রামের প্রকৃতির হৃদ্য রূপ রচনা করেছেন তিনি। আর, সেই পটভূমিকায় মানুষের ছোট ছোট আবেগকে করে তুলেছেন হৃদয়-ভারাতুর। তাঁর কল্পনা ও প্রকাশ-ভঙ্গিতে রবীন্দ্র-রচনার ছাপ অতি স্পষ্ট। লেখা

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

(১৩১০), রেখা (১৩১৭), অপরাজিতা (১৩২০) ইত্যাদি যতীন্দ্রমোহনের সমুল্লেখ্য কাব্য-সংকলন। 'মহাভারতী' পর্যায়ের কবিতাগুচ্ছে রবীন্দ্রানুসরণে পুরাণ-কথার নবমূল্যায়নের প্রয়াস রয়েছে।

কালিদাস রায়

কালিদাস রায়ের (১৮৮৯) রচনায় সুগঠিত পদ্য-দেহে অনাড়ম্বর ভাবের প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর সহজ কবি-প্রাণতা বৈষ্ণব-বিশ্বাসের সহযোগে সমৃদ্ধ। তা ছাড়া, সংস্কৃত কাব্যালংকার-শাস্ত্রে প্রগাঢ় অধিকারের ফলে কবি-কথার প্রকাশ-ভঙ্গি, তথা ভাষা ও ছন্দের শৈলীতেও বলিষ্ঠতা সংযোজিত হতে পেরেছে। কুন্দ (১৩১৫), কিশলয় (১৩১৮), বল্লরী (১৩২২), ব্রজবেণু (১৩২২) প্রভৃতি কবিশেখর কালিদাস রায়ের উল্লেখ্য কবিতা-গ্রন্থ।

রজনীকান্ত সেন

কান্ত-কবি রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০) প্রধানতঃ গীতি-রচয়িতা হিসাবেই খ্যাত। কিন্তু, তাঁর গানগুলি উৎকৃষ্ট কবিতাও। রবীন্দ্রনাথের কণিকা কবিতাবলীর ভঙ্গিতে ছোট ছোট কবিতা-কণার মধ্যে নিজের মনোবেদনাকে নিভৃতে ধরে রেখেছিলেন তিনি। তাঁর গান ও কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়েছে বাণী, কল্যাণী, অমৃত ইত্যাদি নামে।

রবীন্দ্র-যুগে রবীন্দ্রানুবর্তন করেও স্বকীয়তার নিঃসন্দেহ পরিচয় দিয়েছেন দুজন কবি,—একজন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), আর একজন প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)। প্রমথ চৌধুরী প্রধানতঃ বিশেষিত গদ্য-রীতির প্রবর্তয়িতা রূপেই বিখ্যাত।

কবি প্রমথ চৌধুরী

কিন্তু, সনেট্ পঞ্চাশৎ ও পদচারণ-এ ধৃত তাঁর কবিতাগুচ্ছে রূপের স্বকীয়তা আছে,—মননেরও। প্রমথ চৌধুরীর প্রতিভা ছিল চিদ্‌বৃত্তি-প্রধান। জীবনকে তিনি দেখেছিলেন হৃদয়ের দরজা বন্ধ করে,—নিছক বুদ্ধির জানালা দিয়ে। আবেগহীন বুদ্ধির উজ্জ্বলতা ঠিকরে পড়েছে তাঁর কবিতার রূপে ও ভাবে। এদিক থেকে তাঁর সনেট্‌গুলি বিশেষভাবে তুলনারহিত।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সত্যেন্দ্রনাথের প্রকৃতিতে রোমান্টিক সৌন্দর্য-লিপ্সা ছিল। কিন্তু, জ্ঞানের চেষ্টাকৃত বৈভব, এবং ছন্দোসৌকর্যের সচেতন বিন্যাস প্রয়াসের অন্তরালে সেই সহজ ভাবানুভূতি অনেক সময়েই চাপা পড়েছে। তাই, মনে মনে কবিগুরুর ভাব-শিষ্য হয়েও,

প্রকাশধর্মের বিচারে সত্যেন্দ্রনাথ কেবল ছন্দশিল্পী। এঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য-সংকলনের মধ্যে আছে,—বেণু ও বীণা (১৩১৩), কুহু ও কেকা (১৩১৯), তুলির লিখন (১৩২১), অভ্র আবির (১৩২২) ইত্যাদি। সংস্কৃত, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় লেখা কবিতাবলীর বিচিত্র ছন্দ-সৌন্দর্য বাংলা কবিতার শরীরে সংযোজিত করে উল্লেখ্য সাধনা করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ।

সত্যেন্দ্রনাথের কবি-চেতনায় গুহায়িত রোমান্টিক জীবন-স্বপ্ন সুপ্রকাশিত রূপ পেয়েছে কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৮৭-১৯৩১) চপল-ভঙ্গিতে বিন্যস্ত সার্থক-গঠন কবিতাগুচ্ছে। এঁর একমাত্র প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থের নাম 'নতুনখাতা' (১৩৩০)।

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়

২। গদ্যে রবীন্দ্রানুবর্তন

(ক) গল্প-উপন্যাসে

কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অনন্যতা ছোটগল্প রচনায়। গল্প-সৃষ্টির পথে আলোচ্য যুগের শিল্পিকুলের মধ্যে প্রথম উল্লেখ্য হচ্ছেন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯১০) ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)। নগেন্দ্রনাথের গল্পের আকৃতি সুমিত ছোটগল্পের অনুরূপ না হলেও, তাতে প্লট ও বর্ণনার স্বচ্ছন্দ-গতি মনোরম। বয়সের দিক থেকেও নগেন্দ্রনাথ যেমন রবীন্দ্র-সমকালীন ছিলেন, তেমনি তাঁর গল্প-রচনাও বিষয় এবং শৈলীতে বহুলাংশে স্বতন্ত্র।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "প্রভাতকুমারের ছোটগল্পে বঙ্কিমের রোমান্স সৃষ্টির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রসসৃষ্টির সুষ্ঠু মিলন হইয়াছে।" প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ নির্দেশ ও উপদেশ নিয়ে গল্প রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। 'দেবী' নামক সুখ্যাত গল্পের প্লট-ও কবিই তাঁকে দিয়েছিলেন। প্রভাতকুমারের ভাষায় রবীন্দ্র-রচনার সরসতার ছাপ আছে, কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশ্বজয়ী কাব্যকলা-কুশলতা নেই। এদিক থেকে তিনি ছিলেন অনেকটা বঙ্কিম-পন্থী। রোমান্টিক বর্ণনা ও সরল সহজ প্লট-এর প্রাধান্য তাঁর গল্পের স্বাদুতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া, কোনো গভীর চিন্তার ছাপ নেই তাতে। এঁর অনেকগুলি গল্প-গ্রন্থের মধ্যে নব-কথা (১৩০৮), ষোড়শী

গল্প-লেখক
প্রভাত মুখোপাধ্যায়

(১৩১৩), দেশী ও বিলাতী (১৩১৭), গল্পাঞ্জলি (১৩২১), গহনার বাক্স (১৩২৮) ইত্যাদি উল্লেখ্য।

প্রভাতকুমার উপন্যাসও লিখেছিলেন; কিন্তু তাতে বিশেষিত দক্ষতার পরিচয় প্রকাশ পায় নি। গল্পের মতই উপন্যাসের প্লট-এও রোমান্টিক আকস্মিকতা আছে, কিন্তু প্রকাশের মধ্যে রয়েছে শিথিলতা ও অতিবিস্তার। গল্পকে জমাট করার পথে অবান্তর বাধাও কম ছিল না। যাই হোক, প্রভাতকুমারের লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে নবীন সন্ন্যাসী (১৩১৯), সিঁদুর কৌটা (১৩২৬), সতীর পতি (১৩৩৪) ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রভাতকুমারের উপন্যাস

ঠাকুর-পরিবারের রবীন্দ্রানুসারীদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ (১৮৬৯-১৯২৯) গল্প লেখায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। এঁর রচিত গল্প-গ্রন্থাবলীর মধ্যে আছে মঞ্জুসা, করঙ্ক, চিত্রালী ইত্যাদি।

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৩০) ছিলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলিও প্রধানভাবে ইতিহাস-রস-ঋদ্ধ। শশাঙ্ক, ধর্মপাল, করুণা ও ময়ূখ নামে চারখানি উপন্যাস লিখেছিলেন রাখালদাস।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি ও গদ্য-শিল্পী প্রমথ চৌধুরীর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বাংলা গল্প-রচনার ক্ষেত্রেও। ছোটগল্প-সৃষ্টির রাজপথ রচনা রবীন্দ্রনাথের হাতে যখন পূর্ণতা পায় নি, সেই আদি যুগে 'সাহিত্য' পত্রিকায় ইনি ফরাসী গল্পের অনুবাদ করেছিলেন 'ফুলদানী' নামে। তার ফলে বিদেশী গল্পানুবাদের দিকে একদল লেখকের মন ঝুঁকেছিল বিশেষভাবে। পরবর্তীকালে প্রমথ চৌধুরী 'চার ইয়ারী' কথা লিখে ছোটগল্পের জগতেও 'বীরবলী' শিল্প-কৃতির চমক সৃষ্টি করে গেছেন। এ ছাড়াও প্রমথ চৌধুরী বহুসংখ্যক মৌলিক গল্প লিখেছিলেন।

প্রমথ চৌধুরী

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে আর একদল নূতন গল্প-লেখকের অভ্যুদয় ঘটেছিল ভারতী-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। এঁদের রচনায় রবীন্দ্র-ভক্তির সূত্রে স্বকীয়তার বৈশিষ্ট্যও যুক্ত হয়েছিল। সম্পাদক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় যেমন এই

'ভারতী'-গোষ্ঠীর গল্প-উপন্যাস

শিল্পি-গোষ্ঠীর প্রাণ-স্বরূপ ছিলেন, তেমনি শিল্পি হিসেবেও নিজে ছিলেন এঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, এবং বাংলা গল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে সুখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে আছেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, ইন্দিরা দেবী (অনুরূপা দেবীর অগ্রজা), অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবী।

রবীন্দ্রযুগের কথা-শিল্পী হয়েও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) বাংলা সাহিত্যে অনন্যতার ভূমিকা আজও অধিকার করে আছেন। শরৎ-প্রতিভাকে বাংলার সাহিত্য-ইতিহাসে একদা আকস্মিক আগন্তুক বলে গণ্য করা হত। কিন্তু, আসলে শরৎচন্দ্র বাংলার জীবন-শিল্প-সাধনায় রবীন্দ্র-ধর্মেরই উদ্বর্তন করে গেছেন;—শিল্পি-চেতনার তীব্র স্বকীয়তার ফলে রবীন্দ্র যুগ-কথা শরৎ-সাহিত্যে বিচিত্র নূতন স্বাদের আকর হয়ে দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছরের জন্ম-জয়ন্তী উৎসবে প্রধান অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে ভাষণ দেবার সময় তিনি "সাহিত্যে গুরুবাদ" স্বীকার করেছেন;—দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইঙ্গিত করেছেন কবিকে নিজ শিল্প-জীবনের গুরু বলে; আর, শিল্প-সাধনার মন্ত্ররূপে নির্দেশ করেছেন 'চোখেরবালি'-কে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বস্তুতঃ, শিল্পাঙ্গিকের কথা বাদ দিলে শরৎচন্দ্র মূলতঃ ছিলেন রবীন্দ্র কবি-প্রত্যয়েরই উত্তরাধিকারী। অশীতিপর কবি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিঃশঙ্ক ঘোষণা করেছিলেন, "মানুষের শক্তিকে অবিশ্বাস করা আমি পাপ মনে করি।" আর, শরৎচন্দ্র তাঁর নিজের শিল্প-সাধনার পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন,—"লোকে বলে আমি পতিতাদেরও সমর্থন করি। সমর্থন আমি কিছুই করি নে। কেবল অপমান করতেই মন চায় না। আমি বলি, এরাও মানুষ; এদেরও নালিশ জানাবার অধিকার রয়েছে। এবং মহাকালের দরবারে এদেরও বিচারের দাবি একদিন তোলা রইল।" বস্তুতঃ শরৎচন্দ্র যেখানে নবজাগ্রত মানব-মূল্যবোধের দ্বারে নির্যাতিত মানুষের বিচারের দাবি উপস্থিত করেছেন, সেখানেই তিনি জন-চিত্তহর জীবন-শিল্পী। শরৎ-সাহিত্যে পুরা-প্রচলিত সামাজিক নীতিবোধ আহত হয়েছে,—এমন নালিশ এক কালে সুতীব্র হয়েছিল। বিতর্কে প্রবেশ না করেও, নিঃসংশয়ে বলা চলে,

রবীন্দ্র-কবি প্রত্যয়ের উত্তরাধিকারী

মানব-জীবনের চিরন্তন নীতিধর্মকে তিনি কোথাও তো লঙ্ঘন করেন-ই নি; বরং আগাগোড়া রচনায় অতি স্পর্শ-কাতর এক সুরুচি-বোধ নিয়ে সেই নীতি-ধর্মের অপরাজেয় মহিমাই ঘোষণা করে গেছেন। সন্দেহ নেই, শিল্প-সৃষ্টির প্রেরণা নিয়ে মানব-জীবনের অন্ধকার পথেই প্রয়াণ করেছিলেন শরৎচন্দ্র। কিন্তু, সেই অন্ধকারের অতলে ডুবে যায় নি তাঁর সৃজনী-চেতনা, —বরং তমসান্ধতার অতল থেকে প্রাণের অনির্বাণ দীপালোককে উদ্ভাসিত করে এনেছিল। বারবনিতা চন্দ্রমুখীর অন্তর থেকে তিনি আহরণ করে এনেছেন—'পারুর চেয়েও বড়' প্রেম-কল্যাণময়ী নারীকে; পিয়ারী বাইজীর মধ্যে আবিষ্কার করেছেন প্রেম-লজ্জা-বিনম্র রাজলক্ষ্মীকে, বরাভয়-দাত্রী জীবন-শক্তিকে; কুলত্যাগিনী মেসের ঝি সাবিত্রীর মধ্যে রচনা করেছেন নীতিধর্মের শাশ্বত সাধক উপেন্দ্রের বোনকে,—ভাই-বোনে যারা কোনো ছোট কাজ করে নি কখনো। বিশ্ব-জীবনের মহাশিল্পীকে উদ্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন,—

> "অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
> সেই তো তোমার আলো।
> সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো.
> সেই তো তোমার ভালো।"

শরৎচন্দ্র তাঁর শিল্পি-প্রাণের পূত অগ্নিশিখা থেকে দীপ্তি সংগ্রহ করে জীবনের দ্বন্দ্ব-বিরোধময় অন্ধকার থেকে শাশ্বত ভালোয় ভরা আলো জ্বালিয়ে তুলেছেন,—এখানেই তাঁর রবীন্দ্র-উত্তরাধিকার দাবির চরম সার্থকতা।

শরৎচন্দ্রকে সাধারণতঃ দরিদ্র লাঞ্ছিত জীবনের কবি,—সর্বহারাদের দরদী শিল্পী বলে অভিহিত করা হয়। শরৎচন্দ্র নিজেও জানিয়েছেন,— "এ জাবনে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, মানুষ যাদের চোখের জলের হিসেব নিলে না কখনো, তাদেরই বেদনা" তাঁর শিল্পি-চিত্তকে মুখর করে তুলেছিল। সর্ব-বঞ্চিত মানুষের রূপায়ণেও তিনি রবীন্দ্রযুগেরই শিল্পী,— মানব-আত্মার ধ্যানী রূপকার! এ-কালে আমরা আর্থিক দারিদ্র্যকেই প্রধানতঃ মানবিক দৈন্যের কারণ বলে মনে করি। আর, শরৎ-সাহিত্যেও দরিদ্রের সংখ্যা অগণন।

বেদনার্তের শিল্পী শরৎচন্দ্র

কিন্তু, সেই সৃজন-প্রবাহের অতল-গভীর থেকে সর্বরিক্ত মানবতার যে

হাহাকার ভেসে এসেছে, অর্থাভাবের সঙ্গে তার কোনো যোগই নেই। চরিত্রহীন-এ সাবিত্রীকে দেখি সতীশের কাছে ছুটে আসতে হয়েছে মাত্র ত্রিশটি টাকা চাইবার জন্যে ;—নতুন মনিব তার অসুখের সময়ে ওষুধ-পথ্যে যে-খরচ করেছিলেন, তা মিটিয়ে দিতে। কিন্তু, এই অর্থাভাব কোনো দীনতার ছাপ রেখে যেতে পারে নি তার দেহ-মনে। সতীশের অনুপস্থিতিতে তারই ঘরে স্নান-ধৌত দেহ-মন নিয়ে দেবী সাবিত্রীর মতই তাকে মহীয়সী দেখাচ্ছিল। 'পল্লী সমাজে' আকবর সর্দার হয়ত দরিদ্র ছিল, কিন্তু সে দারিদ্র্য তাকে করেছিল মহীয়ান্। 'জ্যেঠাইমা'র পরেই পল্লীসমাজের মহত্তম মানুষ আকবর সর্দার।

আর্থিক দারিদ্র্যের আঘাত একটি ছোট ও একটি বড গল্পের পরিণামকে স্পষ্ট প্রভাবিত করেছে,—এক 'মহেশ' আর এক 'অরক্ষণীয়া'। কিন্তু, মহেশ গল্পে গফুর-এর ট্রাজেডির সবটুকুই তার অর্থাভাবের জন্যে নয়,—সমাজের হাতে,—উচ্চ-জ উচ্চবিত্ত মানুষের হাতে হৃদয়হীন নির্মমতার আঘাত তার মানব প্রাণকে জর্জরিত করেছিল। সেই পৈশাচিক আঘাতের ক্রমিক রূঢ়তায় গফুরের মানব-চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে মুহূর্তের জন্য তার মধ্যে জেগে উঠেছিল পাশব হিংস্রতা ;—তারই যূপবেদীতে নিহত হয়েছে মহেশ। এ-সব কিছুই মুহূর্তের আত্মবিস্মরণের ফল, ঠিক পরমুহূর্তেই গফুরের মধ্যে ব্যথাহত মানব-প্রাণ আবার জেগে উঠেছে আর্তনাদের সঙ্গে। এখানে অর্থ-দীন গফুর, আর অর্থ-প্রাচুর্যময়ী পল্লীসমাজের রমা শরৎ-শিল্প-চেতনায় অভিন্ন সূত্রে গাঁথা। গফুরের মতই সর্বহারা হয়েছিল রমা,—গফুরেব মতই রিক্ততার লজ্জাদীর্ণ যাতনা নিয়ে তাকেও ঘর ছাড়তে হয়েছিল। অরক্ষণীয়ার কথাও প্রায় একই। শরৎচন্দ্রের সকল রচনাতেই মানবতার দরবারে নির্যাতিত মানব-প্রাণের আর্ত অভিযোগ উত্থিত হয়েছে। সকল লাঞ্ছনা, সকল গ্লানির অতল থেকে মানব-আত্মার অজরামর দ্যুতিকে আবার আলোক-দীপ্ত করে তুলেছেন তিনি। এখানেই শিল্পী শরৎচন্দ্র কেবল দীন-দরদী নন,—শাশ্বত মানব-দরদী। পরাভূত মানবতার বিজয়-কেতনধারী শরৎচন্দ্র জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে রবীন্দ্র-প্রেম-ধর্মেরই দীপ্ত উত্তরাধিকারী।

শরৎ-সাহিত্যে সর্বহারা

জীবন-চৈতন্যের সাধর্ম্যে কবি ও কথা-শিল্পী অভিন্ন। তাঁদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে জীবন-দৃষ্টির স্বকীয়তায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তি-জীবনের অভিজ্ঞতাকে সার্বিক জীবনাদর্শের বর্ণে অনুরঞ্জিত করে নির্বিশেষ বিশ্বজননীতা দিয়েছিলেন। একদা বঙ্কিম-উপন্যাসের চন্দ্রশেখর-প্রতাপ প্রভৃতি সম্বন্ধে কবি বলেছিলেন, "তাঁরা সকল দেশীয় সকল জাতীয় লোকই হতে পারতেন, তাঁদের মধ্যে জাতি ও দেশকালের বিশেষ চিহ্ন নেই।" রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সম্পর্কে আরো ব্যাপক অর্থে বলা যেতে পারে,--সর্বদেশ-কালের শাশ্বত সর্বজনীনতার চিহ্নের দ্বারা বিশেষিত। শরৎচন্দ্রের শিল্প-দৃষ্টি এর বিপরীত, তিনি যেন একান্তভাবে "বাঙালি আঁকতে-ই" বসেছিলেন। বাংলাদেশের সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তি-ধর্মকে পৃথক্ স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ করে জানা না থাকলে শরৎ-সাহিত্যের রসাস্বাদন প্রায় অসম্ভব হয়। দেশীয়তা ও কালানুগতার ছাপ সর্বাঙ্গে জড়িয়ে একদিকে বাঙালির প্রতিদিনকার তুচ্ছাতিতুচ্ছ জীবনানুভবের সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে বাঁধা পড়েছে এই সাহিত্য-প্রবাহ। আর একদিকে, বিশেষ দেশকালের সঙ্গে একান্ত অচ্ছেদ্যতার দরুণ অনিবার্য এক সীমায়তির সম্ভাবনাও জেগেছে তাতে। ফলে, সীমিত গণ্ডিতে বাঁধা জীবন-চিত্রায়ণের দরুণ শরৎ-সাহিত্যে আবেগের উৎস যেমন তীব্র, তেমনি গভীর। রবীন্দ্র-কাব্য-ভাবনায় সহজ আবেগের ব্যাপ্তি ঘটেছে বিশ্বচারণের অনন্ত নভোলোকে,—রবীন্দ্র-রচনায় অনন্ত ব্যাপ্তির মধ্যেও অতল গভীরতা লাভ সম্ভব হয়েছে কবির ধ্যান-মনীষাদীপ্ত বিশ্ব-চৈতন্যের প্রভাবে। শরৎচন্দ্রের জীবনাবেগে গভীরতা আছে, কিন্তু বাঙালি জীবনের সীমিত গণ্ডির বাইরে তার ব্যাপ্তি নেই। তাই, তাঁর রচনার শিল্প-দেহে সুচিন্তিত অবয়ব-বিন্যাস নেই, আবেগের স্ফীত উচ্ছ্বাস আপনা থেকেই আপনি যেন অঙ্গ ধরে' গল্পকে তার ঈপ্সিত পরিণাম-মুখে পৌঁছে দিয়েছে।

শরৎচন্দ্রের অনন্য স্বকীয়কতা

প্রথমাবধি শরৎচন্দ্রের সকল রচনারই এই বৈশিষ্ট্য,—বহিরাঙ্গিকের শিথিলতা আর অন্তরঙ্গে আবেগের প্রগাঢ়তা। শরৎচন্দ্রের রচনায় ছোটগল্প নেই বড় একটা। তার কারণ এই নয় যে, জীবনের খণ্ড-ক্ষুদ্র মুহূর্তকে তলিয়ে খুঁটিয়ে দেখ্‌বার সাধ্যের বিন্দুমাত্র অভাবও ছিল তাঁর,—তবু মুহূর্তের অনুভবকে অখণ্ড জীবন-মূল্যে উদ্ভাসিত করার রূপ-দক্ষতা বা পরিচ্ছন্ন

আঙ্গিক-চিন্তা তাঁর আবেগ-স্ফীত কল্পনার পরিপন্থী ছিল। তাই, বড়দিদি, পথনির্দেশ, রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে ইত্যাদি সব কয়টি গল্পই আসলে সংক্ষিপ্ত আকারের উপন্যাস,—বড়গল্প। চন্দ্রনাথ, পরিণীতা, পণ্ডিতমশাই প্রভৃতি গ্রন্থ-ও তাই। শরৎচন্দ্রের একমাত্র সার্থক ছোটগল্প মহেশ ; সেই গল্পের দেহেও আবেগের সহজ স্ফীতি দুর্নিবার হয়ে আছে।

'মন্দির' নামক গল্পটি শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত রচনা,—বেনামিতে ছাপা হয়েছিল (১৩১০)। ১৩০৯ বাংলা সালের কুন্তলীন পুরস্কার পেয়েছিল গল্পটি। দ্বিতীয় প্রকাশিত রচনা 'বডদিদি' ১৩১৪ সালে ভারতী পত্রিকার তিন সংখ্যায় ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়। প্রথম দুই সংখ্যায় লেখকের নাম ছিল না,—তখন অনেকেই বলেছিলেন,—গল্পটি রবীন্দ্রনাথের লেখা। তৃতীয় সংখ্যায় লেখকের নাম মুদ্রিত হয়। ১৩১৯ বাংলা সাল থেকে সাহিত্য-সাধনা ও রচনা-প্রকাশে নিয়মিত ভাবে তৎপর হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। ছোট-বড আকারের গল্প ও রোমান্স-এর কথা ছেড়ে দিলে চরিত্রহীন, শ্রীকান্ত, গৃহদাহ এবং শেষপ্রশ্ন শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে। চার খণ্ডে সমাপ্ত দ্বিতীয় গ্রন্থটি শিল্পীর জীবনীমূলক রচনা বলে অভিহিত হয়। হৃদয়দ্রাবী sentiment রচনায় দেবদাস ও পল্লীসমাজ-এর জনপ্রিয়তাও প্রায় অতুলনীয়।

শরৎ-সাহিত্যে চরিত্র-চিত্রণ

সকল রচনাতেই নিজের ব্যক্তি-জীবনের অভিজ্ঞতাকে শিল্পীর আবেগে গলিয়ে প্রাণরূপ দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। আর, আগে বলেছি, তাঁর নিজের আবেগ অভিজ্ঞতা, সব কিছু বাঙালি জীবনের সীমার মধ্যেই আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়েছিল। তাই, তাঁর অসংখ্য গল্প-উপন্যাসে নর-নারীর চরিত্রে একই জীবন-রূপের type অঙ্কিত হয়েছে যেন,—তাদের মধ্যে পৃথক্ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের নিশ্চিত পদক্ষেপ নেই। পুরুষ চরিত্রগুলি সুকঠিন দেহ এবং মনোবলের অধিকারী হয়েও প্রাণের অতলে অসহায় উদাসীন,—যেন সতীহীন শিবের মত। নারী সেখানে অন্নপূর্ণা। রুদ্র-পৌরুষের আত্ম-বিস্মৃত, এমন কি, কখনো কখনো আত্মনাশী শক্তিকে প্রাণের তপ্ত আশ্রয় দিয়ে কল্যাণ-স্নিগ্ধ সুন্দরতায় ভরে তোলার সাধনাই শরৎ-সাহিত্যে নারীর একমাত্র ভূমিকা। এই উপলক্ষ্যে নারীকে অনেক সময়েই সমাজ-ত্যক্ত, লাঞ্ছিত মূর্তিতে অঙ্কন করা হয়েছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নারী-চরিত্রগুলির

অনেক কয়টিই নায়কের বৈধী পত্নী নয়,—কিন্তু একনিষ্ঠ প্রেমের ব্যক্তিত্বে তাঁরা সতী-সাবিত্রীর বাড়া। অনিলা দেবী'র ছদ্ম নামে লেখা 'নারীর মূল্যতে'-তে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, "একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক্ একই বস্তু নয়, এ-কথা সাহিত্যের মধ্যেই যদি স্থান না পায়,—এ সত্য বেঁচে থাক্‌বে কোথায় ?" বাইজী রাজলক্ষ্মী ও কুলত্যাগিনী সাবিত্রীর জীবনে সাহিত্যের এই সত্যকেই অমর করেছেন শরৎচন্দ্র।

ভাষাশিল্পী শরৎচন্দ্র

কেবল জীবন-চিন্তার বিশিষ্টতায় নয়, প্রকাশ-ভঙ্গির স্বকীয়তাতেও তিনি ছিলেন অনন্য। আগে বলেছি, কি রচনাঙ্গিক, কি ভাষা সৃষ্টি, কোনো ক্ষেত্রেই সচেতন রূপ-চিন্তার অবকাশ শরৎ-চেতনায় ছিল না। ফলে, প্রাণের আবেগে প্রাণের কথাই বলতে গিয়ে তার প্রাঞ্জলতা যেমন মর্মস্পর্শী হয়েছে, তেম্‌নি বিশেষ কবিত্বগুণ-হীনতা সত্ত্বেও ভাষা-ভঙ্গী হয়েছে প্রাণরসে উচ্ছল—সুন্দর।

গুরুগম্ভীর গল্প-উপন্যাস রচনার এতাবৎ আলোচিত প্রেক্ষিতে স্মিত-উজ্জ্বল কৌতুক সহাসতার নবরূপ রচনা করেছিলেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরশুরাম। ভারতী পত্রিকায় লেখার হাতেখড়ি হয়েছিল

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কেদারনাথের (১৮৬৩-১৯৪৯)। রবীন্দ্র-স্নেহ-স্নিগ্ধ ছিল তাঁর সাহিত্য-জীবন। হাস্যরসাত্মক গল্প-উপন্যাস রচনায় তাঁর খ্যাতি একদা দূরপ্রসারী হয়েছিল। ভাদুড়ী মশাই, কোষ্ঠীর ফলাফল, 'আই হ্যাজ' ইত্যাদি কেদারনাথের জনপ্রিয় উপন্যাস। আমরা কি ও কে, কবুলতি, পাথেয় ইত্যাদি নামে তাঁর কয়েকটি ছোটগল্প সংকলনও রয়েছে।

পরশুরাম রাজশেখর বসুর (১৮৮০-১৯৬০) ছদ্ম নাম। লঘু ব্যঙ্গ-দীপ্ত কৌতুকের কুঠার হাতে তিনি বাংলা সাহিত্যের রস-সহাসতার জগতে প্রবেশ করেছিলেন। জীবনের সহজ, সম্ভাব্য উপাদানগুলির অন্তর্নিহিত

পরশুরাম

অসংগতিকে কৌতুকের উজ্জ্বলতায় উপস্থিত করে বাংলার গুরু-গম্ভীর কথা-সাহিত্য-জগতে একদা বুদ্ধি-সমালোকিত হাসির হুল্লোড় জমিয়ে তুলেছিলেন তিনি। গড্ডলিকা, কজ্জলি, হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি পরশুরামের বিখ্যাত গল্প-সংকলন।

ভাগলপুরের মাতুলালয়ে তরুণ শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র করে একটি সাহিত্য-

গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। এই গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে বিভূতিভূষণ ভট্ট পরবর্তীকালে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। ভারতীগোষ্ঠীর লেখিকা নিরুপমা দেবীর হাতেখড়ি-ও এখানেই। সম্পর্কিত মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮১-১৯৬০) স্বতন্ত্রসূত্রে সাহিত্যের আকাশে উদিত হয়েছিলেন। তবু, শরৎচন্দ্র তাঁর গুরুর ভূমিকা দাবি করেছেন,—উপেন্দ্রনাথও বয়োজ্যেষ্ঠ ভাগিনেয়কে অস্বীকার করেন নি।

৩। রবীন্দ্রানুবর্তনকালের গদ্য

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা গদ্যে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা স্নিগ্ধ-কোমল রূপ ধরেছিল বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায়। সাহিত্য ও চিত্র-সমালোচনা ছাড়াও ইনি চারুকলা ও সৌন্দর্য বিষয়ে নানা রকমের প্রবন্ধ লিখে গেছেন। তাঁর রচনায় প্রাঞ্জল মিতভাষণ সহজ কবিত্বে মণ্ডিত হয়েছে।

জগদানন্দ রায়

জগদানন্দ রায় (১৮৬৯-১৯৩৩) রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। বিজ্ঞানের খবরকে ছাত্রপাঠ্য সহজ-বোধ্য রূপ দিতে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথেরই প্রবর্তনায়। এঁর উল্লেখ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে, আছে প্রকৃতির পরিচয়, গ্রহনক্ষত্র, আলো ইত্যাদি।

যোগেশ বিদ্যানিধি

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (১৮৫৯-১৯৫৬) বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ভাষা-তত্ত্ব বিষয়ে তাঁর গবেষণা-প্রবন্ধ চিন্তা ও তথ্যের গভীরতায় অতুল্য। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক পরিচয় নির্ধারণে এঁর প্রবন্ধাবলী বিশেষ মূল্যবান্।

রবীন্দ্রযুগে রবীন্দ্রনাথের নিকট-সান্নিধ্যে বাস করেও দুজন শিল্পী রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত স্বতন্ত্র গদ্যরূপ সৃষ্টি করে গেছেন। এঁদের একজন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ, আর একজন সবুজপত্র-সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী,- বীরবল। অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-সাধনা প্রাণের নিগূঢ় ধ্যান-সঞ্জাত। তাঁর রচনার গভীরে প্রাণের তেজ ও আলো যেমন আছে, তেমনি ভাষার মধ্যে রয়েছে তুলির ধর্ম। শিল্পীর প্রাণের রসে পরিপূর্ণ আনন্দের অট্টহাসি যেন ভাষার শরীরে ছবির রূপ ধরেছে। অথচ, তাঁর অলক্ষ্য মূলভূমিতে রয়েছে বোধ ও

বোধির তীক্ষ্ণ দ্যুতি। ফলে, শিশুদের জন্যে লেখা তাঁর শকুন্তলা, ক্ষীরের পুতুল, রাজাকাহিনী, ভূতপরীর দেশে ইত্যাদি ছেলে-বুড়ো সকলেরই সমান উপভোগ্য হয়েছে। অবনীন্দ্র-নাথের ভাবনা-গভীর রচনাবলীর মধ্যে ভারত-শিল্প, বাংলার ব্রত ও বাগীশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী সমুল্লেখ্য। ঘরোয়া ও জোড়াসাঁকোর ধারে গ্রন্থ দুটিতে রানী চন্দের অনুলিখনে অবনীন্দ্রনাথের কথা ধরা পড়েছে। এগুলি শিল্পীর অতীত-জীবন-কথা,—রবীন্দ্র-অবনীন্দ্র-যুগের জীবন-ইতিহাসও।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গদ্যলেখক প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যে বীরবল নামে খ্যাত। এই নাম তিনি নিজে গ্রহণ করেছিলেন, এতেই তাঁর শিল্প-স্বভাবের পরিচয়। প্রমথ চৌধুরী 'বীরবলী' ঢং-এর গদ্য রচনার প্রবর্তক। সে গদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য চলিত রীতির বাংলা ভাষার প্রচলন। সাধুভাষাকে ছেড়ে বাংলা গদ্য আজ চলিত ঢং-এর প্রতি দিনে দিনে ঝুঁকে পড়েছে,—এই প্রবণতা বিশেষ ভাবে সবুজপত্র-সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর দান। রবীন্দ্রনাথও চলিত রীতির গদ্য নিয়মিতভাবে লিখ্‌তে আরম্ভ করেছিলেন সবুজপত্রের যুগ থেকেই। কিন্তু, ঐটুকু বীরবলী রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়; আপন স্বভাবে বীরবল অননুকরণীয়। হৃদ্‌-বিমুখ চৈতন্যোদ্ভাস প্রমথ চৌধুরীর ব্যক্তিত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। তাই, অবনীন্দ্রনাথের গদ্য লেখায় অতল প্রাণের অট্টহাসি যেমন শুনি, প্রমথ চৌধুরীর লেখায় তেমনি দেখি মন-ছাড়া মগজের হাসি; সুদীপ্ত বুদ্ধির বক্রকটাক্ষ ও স্মিত-স্পষ্ট উজ্জ্বলতা। বাগ্‌-বিন্যাসের এক অভিনব মস্তিষ্ক-ধর্মিতা তাঁর গদ্য ভাষাকে অননুকরণীয় করেছে। বীরবলকে যিনি কিছুটাও ধরে রাখ্‌তে পেরেছিলেন নিজের বাচনভঙ্গিতে, তিনি ডঃ অতুলচন্দ্র গুপ্ত। কিন্তু, তাঁর স্বকীয়তাও আবার অনন্য। বীরবলী বুদ্ধি-সমুজ্জ্বলতার সঙ্গে হৃদয়ের প্রসন্ন স্নিগ্ধতা যুক্ত হয়ে আছে তাঁর গদ্য ভাষায়।

প্রমথ চৌধুরী

বীরবলের প্রবন্ধ গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে,—বীরবলের হালখাতা, নানা কথা, বীরবলের টিপ্পনী ইত্যাদি। গল্প-শিল্পী হিসেবেও 'চারইয়ারি কথা'র শিল্পী প্রমথ চৌধুরী এক অদ্বিতীয় নূতন ধারার উদ্বোধক। পরবর্তী আরো অনেক গল্প-রচনায় এই সৃজন-কলাকৌশল অক্ষুণ্ণ থেকেছিল।

কবিতার জগতে 'সনেট্ পঞ্চাশৎ' তাঁর তুলনারহিত কীর্তি।

বাংলা কথা সাহিত্য ও গদ্য শিল্পায়নে প্রমথ-ধারার অনুবর্তনে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয়তা ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৬১)। মননমুখ্য গল্প-উপন্যাসের অসাধারণ নিদর্শন হিসেবে এঁর গল্পের বই রিয়ালিস্ট (১৯৩৩) এবং বিখ্যাত উপন্যাসত্রয়ী—অন্তঃশীলা, আবর্ত ও মোহানা স্মরণযোগ্য। প্রবন্ধ গ্রন্থের মধ্যে চিন্তয়সি, কথা ও সুর ইত্যাদি প্রধান।

নূতন যুগ, নবীন জীবন, নব-সাহিত্য

রামমোহন রায় থেকে সুরু করে রবীন্দ্রনাথের মধ্যজীবন পর্যন্ত উনিশ শতকীয় বাঙালি রেনেশাঁসের ক্রম-বিকাশ পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হয়ে উঠেছে। বৃহত্তর বাংলার জীবনে সেই বিপ্লব-যজ্ঞ-বহ্নিতে সফলতম পূর্ণাহুতি নিবেদিত হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ নিরোধক আন্দোলনের সার্থক উদ্‌যাপনে। উনিশ শতকের বাঙালি 'নেশন-বাদে'র পূর্ণতা-ঋদ্ধ পরিসমাপ্তিও ঐখানেই। ১৯০৫ থেকে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই দেশব্যাপী আলোড়নের বিক্ষোভ উত্তপ্ত হয়েছিল। বলাবাহুল্য, উনিশ শতকের সকল জাগরণ ও বিপ্লবের পীঠ-ভূমি ছিল নগর বাংলা, আর তার একমাত্র অগ্নিহোত্রী সাধক ছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিকের দল। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত প্রায় অর্ধ-শতাব্দীতে এই নাগরিক বাঙালি সমাজের জীবন পতন-অভ্যুদয়ে বন্ধুরতম হয়েছিল। সিপাই বিপ্লবের শেষে ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা শিক্ষিত বাঙালি তরুণের মনে অনেক অসম্ভব আশার স্বপ্নাবেশ রচনা করেছিল;—ইংরেজ রাষ্ট্রশক্তির ন্যায়-নিষ্ঠা ও মানবিকতাবুদ্ধি সম্বন্ধে অতিমূল্যবোধ হয়েছিল সকল মাত্রার অতীত। কিন্তু, সে ভুল ভাঙতে দেরি হয়নি,—আর, তার জন্যে ভারত ও ইংলণ্ডবাসী ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কৃতিত্বই বেশি। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের আই. সি. এস্.-পদচ্যুতি এবং প্রিভিকাউন্সিল পর্যন্ত গিয়েও ন্যায়-বিচার লাভের অক্ষমতা ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি মনীষার ওপরে প্রথম রূঢ় আঘাত। ভারতবর্ষে জাতীয় চেতনার জন্মলগ্নে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রয়াসের সৃজনে সুরেন্দ্রনাথের একক শক্তি ছিল প্রায় অতুল্য। এই অগ্নিশিখাই ক্রমশঃ দীপ্ত হয়ে বঙ্গভঙ্গ-যুগে স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপক রূপ ধারণ করে। ১৯০৫ খ্রীস্ট-সালে হঠাৎ একদিন দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে ১৯১২ সালে আবার একদিন অনেকাংশে পুনর্মিলিত হল বাংলাদেশ। সেই সাত বছর ব্যাপী জীবন-যজ্ঞে বাঙালির আবেগধর্মী জাতীয়তাবাদের অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল। ত্যাগ, আত্মদান, সংকল্পের অনমনীয় দৃঢ়তা নিয়ে রাজশক্তির পাশব উৎপীড়ন বরণ ও সহন,—সব কিছু মিলে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি

তারুণ্য সেদিন দিকে দিকে ঐতিহাসিক কীর্তি রচনা করে ফিরেছিল। সেই সঙ্গে স্বদেশের ও স্বজাতির যথার্থ পরিচয় আবিষ্কারের দুর্লভ সুযোগ এসেছিল ব্রিটিশ বাংলার ইতিহাসে। মফঃস্বল ও গ্রাম-বাংলায় 'স্বদেশী ফেরি' করতে গিয়ে শিক্ষিত বাঙালি তরুণ প্রথম নিজের দেশবাসীর পরিচয় পেয়েছিল;—পরিচয় পেয়েছিল দৈন্য ও হতাশার মধ্যেও স্বয়ম্প্রকাশ তাদের সরলতা এবং সহজ মানবিকতার। মনের চোখে দেশের রূপ যত স্পষ্ট হয়েছে, দেশ-হিত-ব্রতের সাধনা ততই হতে পেরেছে বাস্তব ও যথাযথ।

বস্তুতঃ নানাদিক থেকেই বাঙালির সার্বিক জীবনে স্বদেশী আন্দোলনের ফলশ্রুতি অতুল্য। কিন্তু, অনেক উদ্দীপনা,—অনেক উৎসাহ ও আত্মদানের শেষে হঠাৎ একদিন আন্দোলনের প্রয়োজন নিঃশেষিত হয়ে গেল। তখন বাঙালি তারুণ্যের অগ্ন্যুত্তাপও আকস্মিক আশ্রয়হীনতার মধ্যে হয়ে পড়ল অবসন্ন। ভাঙা বাংলা জোড়া লাগল,—কিন্তু স্বদেশী আদর্শ পূর্ণ সফল হল না;—অথচ স্বদেশ-মুক্তির প্রেরণায় সেই আগুনকে জ্বালিয়ে রাখাও গেল না নানা কারণে। সব কিছু মিলে মনে হতে লাগলো, যত খড় পুড়লো, যত ছাই জমলো,—আগুন যেন জললো না তত। এই সহসা-অবসাদ-গ্রস্ততার মধ্যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় নূতন আকার ধরতে লাগলো। শিক্ষিত যুবকের সংখ্যা যত বাড়ল, চাকুরির সংখ্যা বাড়লো না তত; অথচ এই প্রথম বোঝা গেল, এদেশের ইংরেজি শিক্ষার এমনই গুণ, চাকুরি ছাড়া আর কোনো কাজের যোগ্যতা জন্মে না এতে; বরং সহজ কর্মক্ষমতা যায় কমে। ফলে বেকারির জন্ম ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত তরুণ মনের অবসাদ ক্রমশঃ হতাশ বিক্ষোভে পরিণত হল। ১৯১৪-১৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্বসমরের কল্যাণে সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্য আরো বিপর্যস্ত হল। যুদ্ধ-সমকালে ভারতবর্ষ প্রাণপণে ব্রিটিশ-সহায়তা করেছিল,—যুদ্ধশেষে মুক্তি মিলবে,—এই ভরসায়। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগ ও আনুষঙ্গিক অপরাপর দেশজোড়া দুর্ঘটনা সকল বিশ্বাসকে করল বিচূর্ণ। ঐ সময় থেকেই শিক্ষিত বাঙালির চেতনায় প্রত্যয়হীন বিক্ষোভ উদ্দাম হয়ে উঠতে থাকে। বিশেষ করে, ব্রিটিশ-শাসনের উষাযুগে বিকশিত স্বপ্নময় আশাবাদ ও সহজ প্রত্যয়-চেতনার বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধিতা তুমুল হয়ে ওঠে। শিক্ষিত তরুণের

নূতন যুগের শংকা ও অবসাদ

জীবন-সমস্যা যত নীরন্ধ্র হয়েছে, অবিশ্বাসের এই অন্ধকার ততই হয়েছে ক্রম-পুঞ্জিত। অসহযোগ আন্দোলনের নিপীড়ন ও ১৯৩০-উত্তর পৃথিবীব্যাপী আর্থিক মন্দার প্রভাবও এই পথে সীমাহীন।

তরুণ মনের এই প্রত্যয়হীনতা অন্ধ আক্রোশে বাংলা সাহিত্যে এক অ-পূর্ব-পরিচিত নৈরাশ্যবাদের সৃষ্টি করেছিল। বস্তুতঃ, একটা সময় এসেছিল, যখন অবিশ্বাস ও ঐতিহ্য-বিরোধিতাই বিশেষ করে আধুনিক বাংলা কাব্যের স্বাতন্ত্র্য-লক্ষণ বলে মনে করা হত। কিন্তু, ঐটুকুই সব নয়। আধুনিক বাংলা কবিতার স্বভাব বর্ণনা করে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন,—"একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা; সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের; আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান্ চিত্তবৃত্তি।" কেবল আধুনিক কবিতাতেই নয়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সকল শাখায় এই বিচিত্র-স্বাদুতা এক সাধারণ লক্ষণ। নবীনতা যেটুকু এসেছে, তার মূলে আছে অভিনব এক জীবনকে জানার "বিস্ময়ের জাগরণ।" সে জীবন আবহমান কাল থেকে ছড়িয়েছিল বাংলার পল্লীতে মফস্বলে,—কৃষক-শ্রমিকদের মধ্যে; যারা চিরকাল কাজ করে মানুষের ক্ষুধার অন্ন, লজ্জার বস্ত্র যুগিয়েছে। ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিক বাঙালি এই বৃহৎ জীবন-স্পন্দন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বৃন্তচ্যুত হয়েছিল। তাই, উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যেও দেখি সমাজহীন উগ্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিজয়-অভিযান। সমাজের বৃন্তে বাঁধা ব্যক্তি-মানুষের উপেক্ষিত, অথচ সুচিহ্নিত-স্বতন্ত্র রূপ দেখে এ-কালের শিল্পীরা বিস্মিত, ব্যথা-বিমূঢ় হয়েছিলেন। বহু রচনায়, বিশেষ করে রবীন্দ্র-উত্তর কথাসাহিত্যে সেই নব-জীবন-পরিচয়ের স্বাদুতা নবীন ভাব-রূপের সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছিল। আধুনিক সাহিত্য,—কি কাব্য, কি গদ্যের ক্ষেত্রে 'আধুনিক' কেবল এই বিশিষ্ট জীবন-চিন্তারই জন্য। অতঃপর সেই জীবন-স্বরূপকেই সন্ধান করব সাহিত্য-শৈলীর বিভিন্ন শাখায়।

আধুনিক সাহিত্যের বিচিত্র পরিচয়

১। নবীনতাধর্মী বাংলা কাব্য-কবিতা

বাংলা কাব্যে নূতন ঢং-এ নূতন কথা প্রথম বল্‌তে শুরু করেছিলেন কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মোহিতলাল মজুমদার। আধুনিক কবিতার আদি-

রূপকার যে তরুণ কবিদল আজ প্রৌঢ়তাভিমুখী, এই দুই কবিকে একদা তাঁরা গুরুর আসনে অভিষিক্ত করেছিলেন। সে গুরু-বুদ্ধি অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি।

তাহলেও, যতীন্দ্রনাথ (১৮৮৭-১৯৫৪) বাংলা কাব্যে 'মরুর কবি';—বাংলার শ্যামল আবহাওয়ায় ঊষর, রুক্ষ নৈরাশ্যের প্রথম রূপকার বলে আজও তিনি স্বীকৃত। আধুনিক কবিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্র-বিরোধিতা ছিল যতীন্দ্রনাথের কবিকর্মের প্রাণ। রবীন্দ্রনাথের কবিতার 'প্যারডি' নিয়েই বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রথম প্রতিষ্ঠা। কিন্তু, তাঁর বিরোধিতা ছিল অন্তরঙ্গ ভক্তের মত। মনে মনে যতীন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথেরই মত সৌন্দর্য-কল্পনার স্বপ্ন-লোভাতুর কবি। কিন্তু, ইতিহাসের হাতে জীবনের যে-রূপ কবি প্রত্যক্ষ করেছেন সেখানে,—

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

"বর্ণ-গন্ধ-গীতি-বিচিত্রিত জগতের নিত্য প্রাণস্পন্দ
কি স্বতন্ত্র মন্ত্রবলে পলে পলে হয়ে আসে বন্ধ।"

তাই, জীবনের কোমল-সুন্দর পরিণামে কবির কোনো বিশ্বাস নেই,—কোনো আস্থা নেই বিশ্ব-স্রষ্টার শিল্প-সংবেদনাময় সহৃদয়তার প্রতি। তাঁর চোখে-দেখা জীবনে ঈশ্বরের করুণাময়তার প্রমাণ সংশয়াচ্ছন্ন। অথচ মানুষের যন্ত্রণা-তপ্ততা ছিল সংশয়াতীত। তাই, সকল পুরাতন বিশ্বাসে অবিশ্বাস করে কবি বলেন,—

"সবার উপরে মানুষ সত্য, ঈশ্বর আছে বা নাই।"

যতীন্দ্রনাথের রোমান্টিক্ কবিমন অব্যবহিত জীবনভূমিতে নিরাশ্রয় ব্যথাহত হয়ে উচ্ছ্বসিত ক্ষোভে বিদ্রোহী হয়েছিল। তাই. যতীন্দ্রনাথের যৌবনকালের কবিতায় ছড়িয়ে আছে শুধু 'নাই নাই' ধ্বনি।—মরীচিকা (১৩৩০), মরুশিখা (১৩৩৪) এবং মরুমায়ার (১৩৩৭) কবি ছিলেন নেতিবাদী। কলাকর্মের প্রযুক্তিতে সেই নেতিবাদ ছন্দ-দোলায়িত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু, পরিণত প্রৌঢ়ীতে পৌঁছে সায়ম্-এর কবি নূতন প্রত্যয়ের ভূমি খুঁজে পেয়েছিলেন। যৌবনের উত্তাপ নিঃশেষিত হয়ে করুণার স্নিগ্ধতায় যে সুর সেদিন বাজল,—নতুন জীবন-প্রেক্ষিতে তা রবীন্দ্র-বিশ্বাসেরই প্রতিধ্বনি। কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত কবিতাগুচ্ছ

নিশান্তিকায় (১৩৬৪) সেই অনুভব ও জীবন-চিন্তা আরো ঘনিষ্ট। মরুভূমির কবি গঙ্গাসাগরে অবগাহন করে স্নিগ্ধ-প্রত্যয়ের প্রশান্ত মন নিয়ে বিদায় নিয়েছেন পৃথিবী থেকে।

'আধুনিক' কবিতা-গুরু হিসেবে মোহিতলাল মজুমদারের (১৮৮৮-১৯৫২) শিল্প-চেতনা অভিনব হলেও স্পষ্টতই ছিল 'ইতি-বাদ'-চিহ্নিত। একাদিক্রমিক রবীন্দ্র-বিরোধিতার চেয়ে মোহিতলালের কবি-সত্তায় স্বতন্ত্র সম্ভোগ-পিপাসাই ছিল মুখ্য। প্রেম-সৌন্দর্যের আজীবন পিপাসু হয়েও রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের ঋষির মতই ছিলেন ধ্যানী উদাসীন। তার প্রেম-চিন্তায় দেহোত্তরণের আকাঙ্ক্ষা একান্ত সুদীপ্ত, দেহ-সংগমনের উত্তেজনা নেই প্রায় কোথাও! অন্যপক্ষে মোহিতলাল ছিলেন প্রেম-ধ্যানের নয়, প্রেম-সম্ভোগের একাগ্র পিপাসু :-

মোহিতলাল মজুমদার

"দেহ ভরি কর পান কবোষ্ণ এ প্রাণের মদিরা,
ধূলা মাখি খুঁজি লও কামনার কাচ মণি হীরা।"

এই ছিল মোহিতলালের কাব্য-বাণী। এখানে কবি বস্তুবাদী; জীবনে প্রেম ও সুন্দরকে লাভ করতে গিয়ে তার দেহময় আধারকে পরিহার করার ফাঁকি তিনি স্বীকার করেন নি। তা-হলেও অন্তরে অন্তরে মোহিতলাল ছিলেন আদর্শবাদী সংযমী! নিজের ধ্যানকে তিনি তান্ত্রিক সাধনার সঙ্গে তুলনা করেছেন। দেহকে আঁকড়ে দেহোত্তীর্ণ-কে লাভ করার সেই সাধনায় তিনি সিদ্ধ হয়েছিলেন। মাঝে মাঝে আদর্শবাদী মনের করুণ উৎকণ্ঠা ছাড়াও, মোহিতলালের কবি-চেতনার সংযম তাঁর কাব্যদেহের প্রায় সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছে। ক্লাসিক্যাল রীতির ঋজু-কঠিন দেহাধারে রোমান্টিক কল্পনাকে তিনি দৃঢ়বদ্ধ রূপ দিয়েছেন, মোহিতলালের এ দাবি অনেকাংশে সত্য। স্বপন পসারী (১৩২৮), বিস্মরণী (১৩৩৩), স্মরগরল (১৩৪৩) এঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ।

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ-উত্তর বাংলা দেশে কাজী নজরুল ইস্‌লাম-এর (১৮৯৯) খ্যাতি নবযুগের কবি হিসেবে প্রায় সর্বাতিক্রমী ছিল। নজরুল-কে বাংলার 'চারণ কবি' বলা হয়,—এই বিশেষণেই তাঁর কবিধর্মের যথার্থ পরিচয়। নজরুল স্বভাব-কবি ছিলেন,—প্রাণের দুর্নিরোধ্য আবেগ যথেচ্ছ

উচ্ছ্বাসে নিজের প্রকাশ পথ বেছে নিয়েছে তাঁর কবিতায়। ফলে, তাঁর কাব্য-বিষয় যেমন একান্ত অকৃত্রিম প্রত্যয়-প্রগাঢ়, তেমনি প্রকাশধর্ম অতিমাত্রায় অসজ্জিত, উপেক্ষিত। অসহযোগের যুগে শিক্ষিত-অশিক্ষিত বাঙালির মনে জ্বালা ধরিয়েছিল নজরুলের কবিতা,—আজও তা প্রাণকে প্রদীপ্ত করে,—কিন্তু, সে কেবল শিল্পি-মনের অনাবিল উত্তাপের দাহ ও আলোকের প্রভাবে,—রীতি-সুন্দর কলা-কীর্তির গুণে নয়।[১] অগ্নিবীণা নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ; এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ-ও। কারণ, এই কাব্যেই তাঁর বিপ্লবী-চেতনার উল্লাস অনাবৃত প্রকাশে নিঃশেষিত হয়েছে। পরবর্তী কাব্য-প্রবাহ অনেকটা পরিমাণে পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি করেছে। কবি হিসেবে নজরুল রবীন্দ্র-চেতনার যথার্থ উত্তর-সাধক। রবীন্দ্রনাথের মতই তিনি সুদৃঢ় প্রত্যয়বান্ শিল্পী। ভগবানের নাম নিয়ে, তাঁর প্রতি অটুট আস্থায় ভর করে স্বার্থান্বেষী বিশ্বের সুচিরস্থায়ী মূল্যবোধের ফাঁকির 'পরে তিনি রূঢ় আঘাত করেছেন;—ভগবানের নামে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন এমন এক নবীন বিশ্বের,—বিশ্বাসের একান্ততায় ফাঁকি যেখানে বিচূর্ণ হবে বিপ্লবী শক্তির আঘাতে আঘাতে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যা 'প্রশ্ন', তাই নিয়েই নজরুলের 'ফরিয়াদ'। কবি-কনিষ্ঠ হিসেবে রবীন্দ্রনাথেরই তিনি উত্তরাধিকারী।

নজরুল ইস্‌লাম

বাংলা কবিতায় যথার্থ আধুনিকতা বলতে যা বুঝি, তার আদি সাধক হিসেবে জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, অজিত দত্ত প্রভৃতি কবি বিখ্যাত। বিশ শতকের তৃতীয় দশক ও তার পরেকার ভাবনার অনুষঙ্গে আরো যাঁরা স্মরণীয়, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে প্রভৃতি। কেবল কবিতার ক্ষেত্রেই নয়,—বাংলা সাহিত্যের সকল দিকেই নবীন আক্ষেপের আলোড়ন রচনা করেছিল কল্লোল পত্রিকা (প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ, ১৩৩০ বাংলা)। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কালিকলম ও প্রগতি। দীনেশরঞ্জন দাশ কল্লোল-এর সম্পাদক ছিলেন, প্রখ্যাত গোকুল নাগ ছিলেন তাঁর সহযোগী।

আধুনিক কবিতা ও কল্লোল যুগ

পূর্বোক্ত কবি-গোষ্ঠীর প্রথম কয়জন কল্লোল-কালিকলম-প্রগতিদলের শিল্পী রূপেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা কল্লোলের

মুখবন্ধে সম্পাদক দীনেশরঞ্জন কবিতা মাধ্যমে পত্রিকা-পরিচয় ঘোষণা করেছিলেন,—

"আমি কল্লোল শুধু কলরোল দিশাহীন,
অজানা জানার নয়নের বারি
নীল চোখে মোর ঢেউ তোলে তারি
পাষাণ শিলায় আছাড়িয়া পড়ি ফিরে আসি নিশিদিন।"

কল্লোল-গোষ্ঠীর শিল্পি-দলের অনিশ্চয়তা-শংকাতুর গতি-ক্ষুধার মূল প্রকৃতি এই কবিতায় সার্থক ব্যঞ্জনা পেয়েছে। আসলে এঁদের সকলেরই মনে ছিল দুর্বার এক রোমান্টিক গতি-পিপাসা। অথচ, সমকালীন জীবনের অর্থনৈতিক দৈন্য ও সামাজিক পীড়ন ছিল সেই রোমান্টিক গতি-উল্লাসের একান্ত পরিপন্থী। সেই সঙ্গে, আত্ম-পীড়নের জ্বালার মধ্যে বৃহত্তর কর্মী জনতার লাঞ্ছিত জীবন-পরিচয় আবিষ্কার করতে পারার উৎসাহ ব্যথাহত রোমান্স-কল্পনাকে নূতন খাতে প্রবাহিত করেছিল। অভিযাত্রী, কর্মী মানুষের সঙ্গ-কামনার রোমান্টিক উদ্দীপনায় পূর্ণ সেকালের কবিধর্ম প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪) 'প্রথমা' কাব্যে সফলতম প্রকাশ পেয়েছিল :—

প্রেমেন্দ্র মিত্র

"আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির,
আর ছুতোরের,
মুটে মজুরের
আমি কবি যত ইতরের।"

এ দাবি প্রথম যৌবনের উল্লসিত কল্পনার উল্লাস-সীমাতেই বদ্ধ রয়েছে 'প্রথমা'র কবির আকাঙ্ক্ষাকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবি-আত্মা অপ্রত্যাশিত নূতন পরিণতি দিয়েছে। বিরুদ্ধ প্রতিবেশে ব্যথাহত বিক্ষুব্ধ কবি-কল্পনা নূতন প্রত্যয়ের মধ্যে সমুদ্র-স্নান করে ফিরেছে,—'সাগর থেকে ফেরা'-য়। সেখানে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসাশ্রিত সত্য দৃষ্টির সঙ্গে একদা-বিদ্রোহী 'আধুনিক কবি'র অভিন্নতা বিস্ময়কর :—

"এই অকিঞ্চন পৃথিবীর মৃত্তিকায়
যে সূর্য বীজ তুমি রোপণ করো
তা ব্যর্থ হবার নয়

মোহাচ্ছন্ন বর্তমানের সমস্ত কুজ্ঝটিকা অতিক্রম করে
স্থদূর যুগান্তে তার সংকেত প্রসারিত।
মানবতার গভীর উৎসমূলে অক্ষয় তার প্রেরণা।
হে মহাকাল, তোমার অনন্ত পারাবারে
আমরা ক্ষণিকের বুদ্‌বুদ্।
তবু সেই সূর্যশিখা যে আমাদের আছে প্রতিফলিত
এই আমাদের গৌরব।"

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) ছিলেন এই কবি-গোষ্ঠীর সিদ্ধতম রূপকার। তাঁর প্রত্যয়াতুর, কল্পনা-তৃষিত মন রূঢ়তম প্রতিবেশেও স্বধর্মচ্যুত হয় নি; শাশ্বতির ঐতিহাসিক চেতনা থেকে হয়নি বিযুক্ত। পাখির বুকের মত প্রতপ্ত কোমলতা নিয়ে, বাধা-ভয়াতুর পাখির শঙ্কিত দৃষ্টি মেলে পাখির নীড়ের মত একটুকু বাসার সন্ধান করে ফিরেছে তাঁর নিভৃতচারী কবি-কল্পনা,—রুক্ষ, ঊষর, বিশ্বাসহীন বর্তমান-এর বক্ষোলীন হয়ে করেছে চিরন্তনের ধ্যান। টেনে-বাঁধা বীণার তারের মত একান্ত স্পর্শাতুর ছিল জীবনানন্দের শিল্প-চেতনা; ছিল গুণীর হাতের বীণার মত সুন্দর-পরিণাম-সৃষ্টির প্রত্যয়-ভূয়িষ্ঠ। তাই, বস্তুজগতের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের পটভূমিকে অস্বীকার করতে পারেন নি তিনি;—দুরন্ত ঝড়ের ঝাপটা থেকে নিজের প্রাণের ক্ষীণ আলোব প্রদীপকে বুকের গহনে বয়ে ফিরেছেন চিরকাল,—বাইরের জীবন-ভূমিতে বার করতে পারেন নি কখনো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, হিংস-অহিংস ভারতীয় বিপ্লবেব জ্বালা-তপ্ততা, তিরিশ-উত্তর আর্থিক মন্দা, এবং সবশেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিষবাষ্পাচ্ছন্নতার মধ্যে তাঁর সমুদ্যত-যৌবন থেকে উত্তর-যৌবন-মুখ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। বিশ্বজীবনের চূড়ান্ত আবিলতার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ বল্‌তে পেরেছিলেন, "এ গলিতে বাস মোর, তবু আমি জন্ম রোমান্‌টিক্।" কিন্তু, জীবনানন্দের কবি-চেতনার জন্মও যে ঐ গলির আবিলতায়,—জন্ম থেকে পরিণতি সবকিছু ঐ গলির অন্ধকারে! প্রাণের গভীরে না হলেও, রক্তের ধারায় সেই বিষাক্ততা স্পর্শ করেছিল তাঁকে;—"জন্ম-রোমান্টিক্" হবার উপায় ছিল না তাঁর। তাই, প্রাণের প্রত্যয়কে জীইয়ে রাখার সাধনায় রক্ত-ভোজী বিষাক্ত কীটের সঙ্গে তাঁকে আজীবন লড়্‌তে হয়েছে চেতনার শক্তি নিয়ে। তাই, কেবল

তাঁর কবি-ভাবনাই নয়, প্রকাশ এবং প্রযুক্তিও চৈতন্য-দীপ্ত। যেন নিজের অবচেতনাকেই কবি সম্বোধন করেছেন প্রতিটি কবিতায়। নিজেরই অন্তর-নিমীলিত 'স্ব-চেনতা' দিয়ে বলেছেন,—

"মাটি পৃথিবীর টানে মানব জন্মের ঘরে কখন এসেছি,
না এলেই ভালো হত অনুভব করে ;
এসে যে গভীরতর লাভ হলো সে-সব বুঝেছি
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে ;
দেখেছি যা হলো হবে মানুষের যা হবার নয়—
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।"

কেবল এই কারণেই, জীবনানন্দ একদা অর্থহীন দুর্বোধ্যতার দরুণ হাস্যাস্পদও হয়েছিলেন অনেকের কাছে। এখানেও তিনি তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের স-গোত্র। জীবনের যে-পথে তিনি চলেছিলেন, সেখানে সকলের সঙ্গে থেকেও তাঁর কবি-চৈতন্য ছিল নিঃসঙ্গ একক। সেই একাকিত্বের ভাষা জীবনানন্দের কবিতায় ; যার রূপ-কল্প ও বাগ্‌ভঙ্গি কেবল কবির দীপ্ত-চেতনার সহজ সৃষ্টি,—কেবল তাঁরই সহজ-বোধ্য। রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন,

জীবনানন্দ দাশ

"এ জীবনে আমি গাহিয়াছি বসি অনেক গান,
পেয়েছি অনেক ফল।
সে আমি সবারে, বিশ্বজনারে করেছি দান
ভরেছি ধরণীতল॥"

জীবনানন্দের পক্ষে শেষ দিন পর্যন্ত সে কথা বলবার উপায় ছিল না। নিজের জীবন-চেতনার যন্ত্রণাতপ্ততাকে বুদ্ধির আলোকে গলিয়ে নিজেরই মগ্ন-চৈতন্যের প্রত্যয়-লোকে বেদনার আহুতি রচনা করেছিলেন তিনি। তাই, কবির দুরবগাহ অনুভব-বৃন্তে যে কবিতা-কলিকার জন্ম, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ছাড়া আর কোনো যন্ত্র দিয়ে সেই দূর-বীক্ষণী স্বরূপ স্পষ্ট আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ জীবনানন্দের কবিতা-আস্বাদনের প্রসঙ্গেই বাংলা কাব্যে emotion ও intellect-এর হরি-হরাত্মকতা অপরিহার্য হয়েছিল। ঝরা-পালক, ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন, সাতটি তারার তিমির, শ্রেষ্ঠ কবিতা ইত্যাদি তাঁর স্মরণীয় কবিতাসঙ্কলন গ্রন্থ।

কল্লোল-যুগের আর একজন বিখ্যাত কবি বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮)। প্রথম পর্যায়ের কবিতায় অনিশ্চিত-গতি প্রথম যৌবনের উল্লাস ও উন্মাদনা অবারিত হলেও, কালে কালে এঁর কবিতা রচনা সুধীর, সংযত সাধনার রূপ ধারণ করেছে। দীর্ঘ পঁচিশ বছরেরও বেশি কাল ধরে 'কবিতা'-পত্রিকার সম্পাদনায় তাঁর সৃজন-ধর্মের নিষ্ঠা বহির্ব্যক্ত হয়েছে। অন্তরের সৌন্দর্য-তৃষ্ণা হয়েছে সুললিত বাগ্‌ভঙ্গিমায় রোমান্টিক্ লাবণ্যময় ভাবরূপ নিয়ে অভিব্যক্ত। কবি-চৈতন্যের বিকাশের দিক্ থেকেও 'বন্দীর বন্দনা' ও 'কঙ্কাবতীর' উদ্দীপনা 'শীতের প্রার্থনা, বসন্তের উত্তর'-এ প্রশান্ত প্রত্যয়-কিরণে কোমল-সুন্দর পরিণতি পেয়েছে।

বুদ্ধদেব বসু

সনেট-এর পিনদ্ধ দেহে আধুনিক কবিতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে অজিত দত্ত (১৯০৭) সুখ্যাত হয়েছিলেন। কেবল আধুনিক যুগেই নয়,—সর্ব-কালের বাংলা সনেট্-এর-ইতিহাসে অতুল্য হয়ে আছে তাঁর যৌবনদীপ্ত মনের কয়েকটি রচনা। পাতাল কন্যা, ছায়ার আল্পনা ইত্যাদি তাঁর উৎকৃষ্ট কাব্য।

অজিত দত্ত

বাংলা কাব্যে মনের সঙ্গে মননের আসনকে সমান মূল্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন জীবনানন্দ। কিন্তু, মননকে,—হৃদবৃত্তির বদলে একান্তরূপে চিদ্-বৃত্তিকে প্রাধান্য দিল যাঁদের কবিতা, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-৬১) এবং বিষ্ণু দে (১৯০৯) তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সুধীন্দ্রনাথকে বিশুদ্ধ মননধর্মা কবি বলা চলে না; অন্তঃসত্তার পরিচয়ে প্রত্যয়-প্রত্যাহত বিক্ষুব্ধ নাস্তিক ছিলেন তিনি;—অন্তরে অন্তরে প্রত্যয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল সুতীব্র। "অতিক্রান্ত শতাব্দীর পৈতৃক বিধাতাকে" ডেকে তাঁর যৌবনের-চেতনা আর্তনাদ করেছে;—

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

"হে বিধাতা
অতিক্রান্ত শতাব্দীর পৈতৃক বিধাতা
দাও মোরে ফিরে দাও অগ্রজের অটল বিশ্বাস।"

শুষ্ক চিত্তের প্রত্যয়-আর্তি যত আহত হয়েছে,—ততই মনের দুর্বলতাকে ঢাকতে চেয়েছেন কবি বুদ্ধির তীব্র আলোকিত কষাঘাত দিয়ে। প্রৌঢ়ী মুখের প্রত্যয়-স্নিগ্ধ কবিতাগুলিতে সুধীন্দ্রনাথের কবি-মন যেন শান্ত সুস্থ হয়ে উঠ্‌ছিল। ক্রন্দসী, সংবর্ত ইত্যাদি কবির উল্লেখ্য কবিতা-গ্রন্থ। এই প্রসঙ্গে

স্মরণ করে রাখা ভাল, উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাংলা কবিতার নবজন্মের যেমন ধাত্রীত্ব করেছে ইংরেজি-কবিতা-সাহিত্য-দর্শন, তেমনি বিশ শতকের এই নবজাত আধুনিক কবিতার চেতনায় ফরাসী কাব্য কবিতার প্রত্যক্ষ চর্চার প্রভাব রয়েছে। আধুনিক কবিদের এই অগ্রজ দল প্রায় সকলেই ফরাসী কাব্য-কলার অনুরক্ত,—অনুসারী-ও। সুধীন্দ্র দত্তের প্রসঙ্গে এ-কথা সবিশেষ স্মরণীয়।

বাংলা সাহিত্যে অমিশ্র মনন-ধর্মিতার কবি বলা চলে নিঃসন্দেহে বিষ্ণু দে-কে। টি এস্. এলিয়েটের কারুকৃতি তাঁর শিল্পভাবনাকে মূলাবধি আলোড়িত করেছিল। তাঁর কবি-চেতনা বুদ্ধির জগৎ থেকে কচিৎ নেমেছে হৃদয়-ধর্মের জগতে। কবি-দৃষ্টিও একান্তভাবে চৈতন্য-সমাশ্রয়ী। তাই, নিজ কবিতার মনন, চিন্তন ও প্রযুক্তিতেই নয়, বিদেশী কবিতার অনুবাদ-কাব্যেও তাঁর শিল্প-কলা অনন্য; এবং স্বকীয় সৃষ্টি ও অনুবাদ, উভয় ক্ষেত্রেই প্রায় সম-সফল। 'উর্বশী ও আর্টেমিস্', 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার', 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' ইত্যাদি তাঁর স্মরণীয় কাব্যগ্রন্থ।

বিষ্ণু দে

অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১) সুধীন্দ্রনাথের সমবয়স্ক, কিন্তু এঁদের কবি-ভাবনা ও কলা-শৈলী আমূল বিভিন্ন। অমিয় চক্রবর্তী প্রথমাবধি প্রত্যয়বান্ কবি,—তাঁর প্রযুক্তিতে মননশীলতার অতল-উৎসারিত মানব-ধর্মিতার স্বাদ অভিনব। কবির দৃষ্টিতে স্বপ্নের নিবিড় ঘনিষ্ঠতা, কিন্তু অভিজ্ঞতায় আছে বাস্তবের রূঢ় ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য এবং বিস্তৃতি-বৈচিত্র্য। কবিতার বিষয় ও প্রকৃতিতে তাই বিচিত্রতা আছে, প্রকাশ-রীতিতে আছে স্বতঃস্ফূর্ত সংস্কার-রিক্ততা। অথচ ভাবের নিবিষ্টতায় প্রায় প্রতিটি কবিতাই স্বপ্নাবিল সৌন্দর্যে নিভৃত। 'খসড়া', 'মাটির দেয়াল', 'পারাপার' ইত্যাদি তাঁর বহু পঠিত কবিতাগ্রন্থ।

অমিয় চক্রবর্তী

বাংলা কবিতার ইতিহাসে একদিন যাঁরা 'আধুনিক' এবং 'বিদ্রোহী' তরুণ বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন, আজ এঁরা সকলে প্রৌঢ়ী-সীমায়। ইতিমধ্যে তরুণতর রূপে আধুনিক কবিতা বিচিত্র রূপান্বিত হয়েছে একালের তরুণ কবিদের হাতে। ইতিহাসের ভাণ্ডারে এখনও তাঁদের স্থায়ী পরিচয় সঞ্চিত হয়নি,—আজও ইতিহাসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছুটে চলেছেন এঁরা।

তাই, এই তরুণতর শিল্পীদের প্রসঙ্গ এখানে অনুক্ত রাখব। কেবল, নূতন পথে চল্‌তে গিয়ে হঠাৎ যে কিশোর কবি-প্রাণ নিশ্চিহ্ন হল জীবনের পথ থেকে, তাঁর কথা স্মরণ করব। সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-৪৭) বাংলা কবিতার ইতিহাসে অতুল্য,—যেমন সেদিন ছিলেন, প্রায় তেমনি আজও। আগে দেখেছি, কী রাজনৈতিক, কী সামাজিক আন্দোলনে, —শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি বেকার জীবনের তপ্ততাই চিরকালীন অগ্নির রসদ যুগিয়েছিল। বস্তুত: আর্থিক দৈন্য ও অসাম্যই ছিল সেকালের জীবন-যন্ত্রণার একমাত্র না হলেও প্রধান কারণ। এই সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে বিশ শতকে তৃতীয় দশকের পর থেকেই বাঙালি বুদ্ধিজীবী তরুণদের কেউ কেউ মার্কস্‌বাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সদ্য-উদ্‌যাপিত রুশ-বিপ্লবের সফলতা তাঁদের উদ্দীপনাকে উৎসাহিত করেছিল। সেদিন থেকে, বাংলা দেশে মার্কস্‌বাদী রাজনৈতিক মত, মার্কস্‌বাদী কবি-শিল্পীর সংখ্যাও বেড়েছে দিনে দিনে। কিন্তু, নিছক তত্ত্ব বা রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে নয়, সাম্যের আকাঙ্ক্ষাকে যিনি উচ্ছ্বসিত প্রত্যয়ে রূপ দিতে পেরেছিলেন, সেই কবি ছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য! অসাম্য-পীড়িত মানুষের বিক্ষোভ ক্ষুব্ধ আগ্নেয়গিরির রূপ পেয়েছিল তাঁর চেতনায়; সেই সঙ্গে পার্থিব মানুষের ব্যথা-করুণ রূপটি পেয়েছিল পুঙ্খানুপুঙ্খ সুন্দর অভিব্যক্তি। 'ছাড়পত্র', 'ঘুম নেই' ইত্যাদি তাঁর কবিতাসংকলন হিসেবে বিখ্যাত।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

২। নবীনতা-ধর্মী কথাসাহিত্য

বাংলা গল্প-সাহিত্যে নবীনতা-ধর্মের সূচনায় কল্লোল-গোষ্ঠীর দান অতুল্য। প্রাচীন জীবন ও মূল্যবোধের প্রতি এঁদের বিশ্বাস সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছিল। নূতনকে সৃষ্টি করবার আগ্রহ ছিল অপরিসীম। কিন্তু, নবীন জীবন-চেতনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ অন্বয় ছিল না। তাই, প্রতীচ্যের সাহিত্য, অর্থনীতি ও মনস্তত্ত্ব-গ্রন্থাদির আশ্রয়ে আসলে এঁরা এক নব-রোমান্টিক জগৎ তৈরি করে ফিরছিলেন। শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত বলেছেন,—'অবশ্য নূতন আদর্শ-প্রবর্তনের তাগিদে এঁরা সেদিন আতিশয্য করেছিলেন অনেক ক্ষেত্রে। তাছাড়া যে মার্কস্‌বাদ্‌-প্রভাবে সমাজ-বিপ্লব ও ফ্রয়েড্‌-প্রভাবে চিন্তা-বিপ্লব

নবীনতাধর্মী কথাসাহিত্য

আনতে চেয়েছিলেন তাঁরা, তার সম্বন্ধে সম্যক্ অভিজ্ঞতাও ছিল না তাঁদের! তাই নূতনের নেশা যত বড় হয়েছিল, নূতন সৃষ্টি তত বড় হয় নি।"

আধুনিক কথা-সাহিত্যের প্রাণ-চেতনার পরিচয় এই উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট হয়েছে। কল্লোল-এর অন্যতম অধিনায়ক গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৩-১৯২৫) এই উপলক্ষ্যে স্মরণীয়। কল্লোল-এর প্রথম সংখ্যা থেকেই তাঁর 'পথিক' উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। কল্‌কাতার সংস্কৃতিমান্, ধনী, ফ্যাশনবেল নাগরিক সমাজে নর-নারীর সংযোগ, যৌন সম্পর্কের সমস্যা ইত্যাদিকে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ক্ষীণতম কাহিনী-সূত্রে গেঁথে পথিক-এর প্লট গঠিত হয়েছিল। গল্পের শিথিলতা ও আঙ্গিকের অপরিপাট্য সত্ত্বেও শিল্পি-মনের রোমান্টিক জীবন-চিন্তার দুঃসাহস আজও বিস্ময়কর মনে হয়। গোকুলচন্দ্র প্রতীচ্য পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে নূতন সমাজ, নূতন মূল্যবোধের স্বপ্ন দেখেছিলেন,—এখানে তাঁর শিল্প-চেতনা সেই ভঙ্গুরতার যুগেও ছিল স্বপ্ন-সম্ভব—গঠনমূলক।

গোকুল নাগ

প্রত্যক্ষভাবে কল্লোল-গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে না থাকলেও মণীন্দ্রলাল বসুর (১৮৯৭) প্রথম উপন্যাস 'রমলা' (১৯২৩) রোমান্টিক দৃষ্টি, ফ্রয়েডীয় জীবন-বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা ও স্পর্শাতুর আবেগের উচ্ছ্বাসে কল্লোলীয় তরুণদের ওপরে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছিল। মায়াপুরী, রক্তকমল, সোনার হরিণ ইত্যাদি তাঁর উল্লেখ্য গল্প-গ্রন্থ।

মণীন্দ্র বসু

কল্লোল-গোষ্ঠীর গল্প-উপন্যাস-লেখকদের মধ্যেও বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি কবি-কুলই প্রধান। তরুণ-শিল্পী অচিন্ত্যকুমারের (১৯০৩) প্রথম গ্রন্থ 'বেদে' পড়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখেছিলেন,—"তোমার কল্পনার প্রশস্ত ক্ষেত্র ও অজস্র বৈচিত্র্য দেখে আমি মনে মনে তোমার প্রশংসা করেছি। সেই কারণে এই দুঃখ বোধ করেছি, কোনো কোনো বিষয়ে তোমার অত্যন্ত পৌনঃপুন্য আছে,—বুঝতে পারি সেইখানে তোমার মনের বন্ধন। সে হচ্ছে মিথুন-প্রবৃত্তি।" কেবল অচিন্ত্যকুমার নয়, কল্লোল-গোষ্ঠীর বহু তরুণ-কথাশিল্পীর পক্ষে সেদিন একথা প্রায় সম-প্রযোজ্য বলে মনে হয়েছিল। ফ্রয়েড, হ্যাভলক এলিস্ প্রভৃতি যৌন-মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিতদের

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত

গবেষণার প্রথম উল্লসিত ব্যবহার এই অতিমাত্রিকতাকে সাধারণভাবে উৎসাহিত করেছিল। তবে, একথাও স্মরণীয় যে, অচিন্ত্যকুমারের শিল্পিমন প্রধানতঃ ছিল কবি-স্বভাবিত। কল্লোলযুগের উল্লেখ্য কবিদের মধ্যেও তিনি একজন। তাই, অতিশয় যৌন-সংঘট্টের প্রত্যক্ষ আবিলতা বহুলাংশে পরিস্রুত হয়ে, কাব্য-রসান্বিত এক নতুন স্বাদুতা সঞ্চারিত হয়েছে ভাষা-দেহকে আশ্রয় করে। ভাষার বৈদেহ ব্যঞ্জনা নিতান্ত দৈহিক বাসনা-কামনাতে রোমান্টিক স্বপ্ন-সম্ভার বিস্তার করেছিল। এঁর প্রায় সকল রচনার মধ্যেই বিচারের চেয়ে কল্পনা, বাস্তবদৃষ্টির চেয়ে রোমান্টিক কাব্য-ধর্ম সুনিবিড়। ঊর্ণনাভ, কাকজ্যোৎস্না, আসমুদ্র ইত্যাদি অচিন্ত্যকুমারের উল্লেখ্য উপন্যাস গ্রন্থ। ইতি এবং অকালবসন্ত দুইটি উৎকৃষ্ট ছোটগল্প-সংগ্রহ।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,—"অচিন্ত্য-বুদ্ধদেবের কবিত্ব উপন্যাসের মধ্যে সর্বব্যাপী, তাঁহাদের দৃষ্টি-ভঙ্গী ও বিশ্লেষণ-প্রণালী একান্ত-ভাবে কাব্যধর্মী।...মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ যেন কাব্যের সোনালী কাপড়ের সীমান্তে একটু ছোট পাড়; কবিতার তরঙ্গিত উচ্ছ্বাসকে রাখিবার জন্য একটু উচ্চ তট-ভূমি মাত্র।" অচিন্ত্যকুমারের চেয়ে বুদ্ধদেব বসুর সম্বন্ধে এ-কথা অনেক বেশি সত্য। কল্লোল-যুগের কবি বলেই নয়, আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে বুদ্ধদেব মধুস্বাদী বাগ্‌ভঙ্গী ও স্বপ্ন-কল্পনার সৃজন-দক্ষতায় অনন্য। তাঁর গদ্য-রচনাও দেহ-মন-প্রাণে কবিতার নির্মোক পরে নতুন সৌন্দর্যে ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে। বুদ্ধদেবের রচনায় "মিথুন প্রবৃত্তি"র প্রবলতা একদা বহু বিতর্ক ও বিরূপতার ঝড় তুলেছিল। আর, তার সবটুকুই অকারণ ছিল না। তবু, উপন্যাসের জাদু ঐ যৌন-বৃত্তির একান্ততার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর উপন্যাসে বিশ্লেষণের চেয়ে "কাব্যাভিষেকের" কিরণজাল স্মিত-উজ্জ্বল সুন্দরতার সৃষ্টি করেছিল। বুদ্ধদেবের উল্লেখ্য উপন্যাস-সাহিত্যের মধ্যে আছে রডোডেণ্ড্রনগুচ্ছ, যেদিন ফুটলো কমল, একদা তুমি প্রিয়ে, বাসর ঘর ইত্যাদি।

বুদ্ধদেব বসু

কল্লোলগোষ্ঠীর কবি-ঔপন্যাসিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন,—এমন একজন শিল্পী প্রেমেন্দ্রনাথ মিত্র। পদ্যে ও গদ্যে, গল্পে ও কবিতায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখনী সমগতিশীল। অথচ, গল্পের গায়ে কবিতার

স্বাদকে তিনি অতি-লিপ্ত হতে দেন নি। কল্পনা-ব্যাকুল জীবন-ধ্যানে যিনি কবি,—গল্পের বুননে তিনিই বস্তু-দ্রষ্টা বিচার পরায়ণ, বুদ্ধি-দীপ্ত তির্যক দৃষ্টি ও সৃজন-ক্ষমতার অধিকারী। 'পুন্নাম' কিংবা 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' ইত্যাদি গল্প অন্ধকার-তলশায়ী জীবনের প্রতি প্রেমেন্দ্র মিত্রের নৈর্ব্যক্তিক সত্যদৃষ্টিময় শিল্প-ভাবনার সুন্দর পরিচয় বহন করে। কথা-সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্পের লেখক হিসেবেই সমধিক সফল। বেনামি বন্দর, পুতুল ও প্রতিমা, ধূলিধূসর, মহানগর ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত গল্প-সংকলন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৭) তাঁর জীবনী-ধর্মী ভ্রমণমূলক গল্প রচনার জন্যেই আজ বেশি খ্যাত। 'মহাপ্রস্থানের পথে' বাংলা সাহিত্যে সর্বজনাদৃত গ্রন্থ। কিন্তু, চেতনার গভীরে তরুণ শিল্পী প্রবোধকুমারও ছিলেন কল্লোল-গোষ্ঠী-ভুক্ত। আদর্শবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, নরনারীর প্রণয়-সম্পর্কের বস্তু-পরিচয়-সন্ধান ও বিচার-প্রবণতা নিয়ে প্রবোধকুমার তাঁর যুগ-চেতনার দাবিকেই রূপায়িত করেছেন। এঁর প্রিয়বান্ধবী উপন্যাস একদা বহুল জনপ্রীতি অর্জন করেছিল।

প্রবোধ সান্যাল

কল্লোলগোষ্ঠীর কথাকারদের মধ্যে অকম্পিত নূতন জীবনের স্বাদ বয়ে এনেছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৩০৭)। বাংলা সাহিত্যে তিনি 'কয়লা কুঠির' শিল্পী। রাঢ়-বাংলার সীমান্তে কয়লা কুঠিতে যে সব সাঁওতাল 'অসভ্য' নর-নারীর বাস, তাদেরও 'বর্বর' জীবনের গভীরে আমাদেরই মত সুখ-দুঃখ প্রেম-ভালবাসায় ভরা একটি করে জীবন্ত প্রাণ রয়েছে, বাংলা সাহিত্যে এটুকু শৈলজানন্দের সফলতম আবিষ্কার। মানবধর্মের মৌল উপাদানগুলি মোটামুটি শাশ্বত ও সর্বজন-সাধারণ। শিক্ষা বা অশিক্ষা, জীবনের ভালো-মন্দ পরিবেশ চিরন্তন মানব-স্বভাবের ওপরে ছায়া ফেলে, কিন্তু তার সহজ ধর্মকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। এই কথাই স্পষ্ট এবং নূতন করে অনুভব করি শৈলজানন্দের অসংখ্য ছোটগল্পে। 'নারীর মন' গল্পে ভুলি, তার স্বামী পীরুমাঝি আর ভুলির ছোট কুমারী বোন টুরূণী-তে মিলে প্রণয়-ক্ষুধাতুর জীবনে যে নবীন সমস্যার জাল বুনেছিল নিজেদেরও অজ্ঞাতে,—তার জন্ম, বিকাশ ও পরিণাম আশ্চর্য রকমে রবীন্দ্রনাথের 'দুই বোন' গল্পেরই

সদৃশ। অথচ, ব্যক্তিত্ব ও পরিবেশের স্বাতন্ত্র্যগুণে গল্প দুটির স্বাদ ও বর্ণ কত বিভিন্ন,—কত আমূল পৃথক্! রবীন্দ্র-রচনার প্রেক্ষিতে শৈলজানন্দের কয়লা-কুঠির গল্প-মালা পড়লে বুঝি,—সাহিত্যের পাত্রে চিরন্তন জীবন-রসকেই আমরা আস্বাদন করি। কেবল দেশ-কাল-বিশোধিত বিভিন্ন পর্যায়ে জীবনের স্বাদ, বর্ণ, গন্ধে কালে কালে সেই চিরন্তন জীবন-সত্যই নিত্য-নবরূপ নিয়ে দেখা দেয়। কল্লোল-গোষ্ঠীর কথাকারদের মধ্যে একথা শৈলজানন্দের রচনাতেই অনুভব করি বিশেষভাবে। কারণ, তিনিই আলোচ্য গোষ্ঠীর প্রায় একমাত্র শিল্পী, বর্ণিতব্য জীবনের সঙ্গে যাঁর যোগ ছিল অন্তরঙ্গ—প্রায় অঙ্গাঙ্গি। তাই, 'আধুনিক' সাহিত্য-চেতনার সারস্বত কল্পভূমির অতিকাব্যিক অথবা বৌদ্ধিক যৌন-জীবন-চিন্তন তাঁর রচনায় প্রবেশ করতে পারে নি। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন,—"শৈলজানন্দের গল্পে যে বাস্তবতা পাই, তাহা 'আধুনিক' সাহিত্যের মার্কামারা বাস্তবতা নয়, বুদ্ধিমূলক কৃত্রিম বাস্তবতাও নয়, তাহা জীবনের বাস্তবতা।...এই জন্য তাঁহার গল্পের ও গল্পচিত্রের পাত্র-পাত্রীগুলি তাহাদের তুচ্ছ ও সংকীর্ণ জীবনকে যথাযথ অনুসরণ করিয়াও মৌলিক মানবত্বের অলৌকিক দ্যুতি-মণ্ডিত হইয়াছে।" শৈলজানন্দ সম্বন্ধে সত্যতর পরিচায়ন প্রায় অসম্ভব ;—তাঁর মা, সুমরু, জোহানের বিহা ইত্যাদি অসংখ্য-খ্যাত ছোটগল্প এই সত্যকেই নতুন করে প্রকাশ করেছে। মাটিরঘর, অতসী, বধূবরণ, রূপবতী, বিজয়া ইত্যাদি তাঁর বহু সংখ্যক গল্প উপন্যাস গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮) প্রথম যৌবনে কল্লোল-গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত হয়েছিলেন। পরে এক সময়ে 'প্রগতি সাহিত্য'—আন্দোলনের পুরোভূমিতেও তাঁকে দেখা গিয়েছে। কিন্তু, তাঁর জীবন-চিন্তার অনন্য গভীরতা সকল গোষ্ঠীর অতীত একক ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে তাঁকে। শৈলজানন্দ অচেনা নতুন জীবনকে নতুন যুগের সামনে উপস্থিত করেছেন। একদিক থেকে তারাশংকরের কীর্তিও প্রায় সমপথ-গামী। (বীরভূমের অখ্যাত লালমাটিকে,—লালমাটির বাউরি-সাঁওতাল চাষী-বাগ্দীদের বাংলা সাহিত্যের আমদরবারে নিত্যকালের প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন তিনি। তারাশংকরের বৈশিষ্ট্য তাঁর ইতিহাস-চেতনতায়। শিল্পী হিসেবে

শৈলজানন্দ মূলতঃ ছোটগল্পকার,—আর তারাশংকর ঔপন্যাসিক। অপার বিস্তৃত জীবন-সিন্ধুর রূপকে ক্ষণকাল ও ক্ষণ-জীবনের বিন্দুতে বিম্বিত করে দেখেছেন শৈলজানন্দ। আর, তারাশংকর বিশেষ ব্যক্তি-জীবনের চিত্রকেও ইতিহাসের অপার জীবন-পাথারে বিস্তারিত করে দেখেছেন। সেই ইতিহাসের বিচারে যুগ-সন্ধির শিল্পী তিনি। বাংলাদেশের ব্রিটিশ-পূর্ব যুগের ইতিহাস প্রধানতঃ ভূম্যধিকারী সামন্ততান্ত্রিকদের রচনা। প্রজাপীড়ন, জিগীষা, হঠকারিতা ও যথেচ্ছাচার দিয়ে দীর্ঘদিনের বাংলার ইতিহাসকে এঁরা কলঙ্ক-লিপ্ত করেছেন। তেমনি এঁদের বদান্যতা. আত্মত্যাগ ও সর্বস্বপণ জীবন-যজ্ঞের দীপ্তি এবং সৌরভও মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসকে ধারণ করেছিল।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশংকরের বাল্য-কৈশোর-যৌবনের সীমাভূমিতে এই সামন্ততন্ত্রের বিনাশ ও নতুন যন্ত্র-নির্ভর শিল্প-সভ্যতার সূচনা ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে চলেছিল। শিল্পীর চেতন ও অচেতন মনের ওপরে জীবনের এই ঐতিহাসিক বিনষ্টি, বিবর্তন ও নবসূচনার স্পষ্ট ছাপ পড়েছিল। রাঢ়ের এক লুপ্ত-বৈভব জমিদার বংশের সন্তান বিভগ্ন-প্রায় সামন্ততন্ত্রের প্রতি তারাশংকরের মমতা ছিল রক্তগত। নতুন যন্ত্র-শিল্পের উন্নত মহিমার সঙ্গেও তাঁর ব্যক্তিগত যোগ ছিল। তার চেয়েও বড় কথা, পুরাতনের প্রতি সহৃদয়তা নিয়েও নব-যুগ-চেতনার আহ্বান পৌঁছেছিল তাঁর মর্মলোকে। ফলে, সামন্ততন্ত্রের বিনষ্টি. যন্ত্র-শিল্পের অভ্যুদয় ও ভঙ্গুর ভূমি-নির্ভর জীবনের ওপরে তার প্রভাব, প্রসঙ্গত নবজাগ্রত জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাভূমিতে উপস্থিত করে তিনি প্রতিটি সমাজ-সমস্যা ও ব্যক্তি-জীবনের মূল্য সন্ধান করেছেন। জীবন-দৃষ্টির এই ঐতিহাসিক বিস্তার ও গভীরতা তারাশংকরের সকল উপন্যাস-গুলিকে প্রায়ই দুর্লভ এপিক্ লক্ষণান্বিত করেছে। এদিক থেকে গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম ও হাঁসুলিবাঁকের উপকথা অবিস্মরণীয়। এ-গুলি তারাশংকরের সুপরিণত রচনা। কিন্তু, তাঁর ব্যক্তি-জীবনের ছায়ান্বিত ধাত্রীদেবতা, কিংবা কালিন্দী-তেও এই এপিক্ লক্ষণের অঙ্কুর অনুপস্থিত নয়।

তারাশংকরের রচনার আর একটি বৈশিষ্ট্য তাঁর প্লট ও বিন্যাস-পদ্ধতির সুতীব্র নাটকীয়তায়। জীবনকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন পুরাতনের বিনষ্টি ও নবীন অভ্যুদয়ের সূচনা-লগ্নে। বিগতের প্রতি অনাগতের

অভিঘাত ও মহাকায় অতীতের আত্মরক্ষার মর্মন্তুদ প্রয়াসের প্রতিঘাতকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি মনে-প্রাণে। ফলে, তাঁর উপন্যাসগুলির মূল আবেদন কেবল 'কথা'-র নয়,—নাট্য-সংঘাতময়তারও। কালিন্দী উপন্যাস থেকেই এই দ্বন্দ্ব-ক্ষুব্ধ নাট্য-ধর্মের তীব্রসংহতি স্পষ্ট রস-রূপে অনুভূত হতে আরম্ভ করেছে। এই নাট্য-ধর্মই দুইপুরুষ-এ সার্থক কলা-রূপ ধরেছে। কিন্তু (তারাশংকরের নাট্যগুণান্বিত কল্পনার চরম অগ্নিপরীক্ষা হয়েছে তাঁর শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পগুলিতে। ব্যক্তি-মনের আবেগ-কম্পনে নয়, নিত্য-দেখা জীবনের আবিষ্কারের মুহূর্তেও আবর্ত-সঙ্কুল নাটকায়তা পরিস্ফীত করে তোলার দুঃসাধ্য দক্ষতায় তারাশংকরের ছোটগল্পগুলি মর্মদাহী হয়ে উঠেছে। এই গুণেই 'অগ্রদানী' পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পের সমাজে অশংকিত আসন পেয়েছে। জলসাঘর, পুত্রেষ্টি ইত্যাদি গল্পেও এই গুণের দীপ্ত সমন্বয়।)

তারাশঙ্করের ইতিহাস-ভূয়িষ্ঠ শিল্প-চেতনাতেও যথাস্থিত জীবন-রূপ দেখতে পারার সংহত-সীমিত রোমান্টিক লাবণ্য বিচ্ছুরিত হয়েছে 'রাইকমল' ও 'কবি' রচনায়। সেই সঙ্গে সন্দীপন পাঠশালা ও ধাত্রীদেবতা প্রভৃতি গ্রন্থ নিয়ে তারাশংকর একদা বাংলা উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

তাহলেও, আগেই বলেছি, শিল্প-রচনার ক্ষেত্রে তারাশংকর স্বয়ম্প্রতিষ্ঠিত,—প্রায় অনন্য। কিন্তু, বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে অমিশ্র অনন্যতার ভূমিকা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৩০০-৫৭ বঙ্গাব্দ)। কল্লোল-সমসাময়িক শিল্পীদের সমকালীন ছিলেন বিভূতিভূষণ। তাঁর লেখায় নূতন চৈতন্যের আলোক-উজ্জ্বলতা ছিল, কিন্তু সেকালের 'আধুনিক' চেতনার জ্বালা ও উত্তাপ ছিল না। বিশ শতকের প্রথমার্ধকালের পরিভাষায় বিভূতিভূষণ ছিলেন যথার্থ 'আধুনিক'। তাঁর রচনার মধ্যে ব্যক্তি-মানুষের অনন্য-পরিচয় সমাজের অচ্ছেদ্য বৃন্তে জীবনের কুসুম-সুষমা নিয়ে বিকশিত হয়েছে। এই অধ্যায়ের সুরুতে বলেছি, উনিশ শতকের উপন্যাস-সাহিত্য সাধারণভাবে ছিল সমাজ-চ্যুত উগ্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যময় জীবন-রচনায় ব্যস্ত। বিশ শতকের তৃতীয় দশক ও তারপরে নবীন জীবন ও নব-চেতনার তাড়নায় বাঙালি

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পীরা আবিষ্কার করেছেন সমাজের নীড়ে দোদুল্যমান ব্যক্তি-মানুষের নবীন রূপ। বিভূতিভূষণও সেই সামাজিক মানুষের কথাই বলেছেন; যারা বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে-ঘেরা পল্লী-নীড়ে অপার দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা ও সংগ্রামের মধ্যে জীবনের পথ চলে। চলতে চলতে জীবনের একদিন শেষ হয়, কিন্তু পথের শেষ দেখা যায় না;—সেই অনন্ত জীবনের পথে ঝড়ের রাতে অটুট প্রত্যয়ের ক্ষীণ প্রদীপ আড়াল করে এগিয়ে গেছেন 'পথের পাঁচালী'র শিল্পী। বিভূতিভূষণের চোখে-দেখা জীবনে দারিদ্র্য, অভাব, আশাভঙ্গের প্রচুরতা সীমাহীন। কিন্তু তাঁর জীবন-চিন্তায় কোথাও জ্বালা নেই—নেই কোনো অভিযোগের বিক্ষোভ। তাই বিভূতিভূষণের রচনা জীবনের সুখদুঃখ-আনন্দবেদনার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রূপায়ণে যেমন যথাযথ, বাস্তব, প্রাণচঞ্চল; তেমনি অকারণ জ্বালাতপ্ততায় উচ্ছ্বাসবিহীন। আসল কথা, নিজের শিল্পি-মনের আক্ষেপ বা উল্লাসকে তিনি কোনো কারণেই তাঁর চোখে-দেখা জীবনের বস্তু-রূপের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেন নি। বিভূতিভূষণের শিল্প-প্রকৃতিতে ছিল বিধাতার মত নৈর্ব্যক্তিকতা, ছিল বিধাতার মত অপার ধৈর্য-তিতিক্ষা,—আত্মসংহৃত যে ধীর সংযত প্রতীক্ষায় বিশ্বের আদিতম শিল্পী তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন অন্তহীন সৌন্দর্যের পসরা যুগ-যুগান্তর ধরে। এও সম্ভব হয়েছিল, ভারতীয় জীবন-চেতনার প্রতি শিল্পীর আত্মিক প্রত্যয়-প্রভাবে, আধুনিক ইতিহাস-বিজ্ঞান-চেতনার আলোকে যে মৌলিক প্রত্যয়ের নবমূল্যায়ন ঘটেছে তাঁর সকল রচনাসম্ভারে। 'দেবযান' নামক রোমান্স-কল্পনাময় উপন্যাস নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে, হিন্দুর জন্মান্তর ও কর্মবাদে অপার আস্থা ছিল বিভূতিভূষণের। ভারতবর্ষের চিরকালের প্রত্যয়,—এই জন্ম থেকে সুরু করে এই মৃত্যুর সীমাতেই জীবনের অবস্থান ও পরিণাম নিঃশেষিত হয়ে যায় না। অনাদিকালের আদিম উৎস থেকে সুরু করে অনন্ত কালের মহাপারাবার পর্যন্ত আদি-অন্তহীন জীবন-ধর্মের অভিসার। বিশ্ব-শিল্পীর হাতের সুরের নাচনে সেই মহাজীবন কালাসিন্ধুর অতলে ডুবছে এবং ভাসছে—সেই সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলেছে পরিণততর জীবনধর্মের অভিমুখে। এ-সত্য কেবল দর্শন বা অধ্যাত্ম-চিন্তারই আবিষ্কার নয়। আধুনিক বিজ্ঞান ও ইতিহাস এই সত্যকেই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছে। ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ প্রমাণিত করেছে, উদ্ভিদ ও জীবজন্তুজগতের

ক্রমান্বিত বিচিত্র পরিণতির ফলেই মানব-জীবনের অভ্যুদয় একদিন সম্ভব হয়েছিল। আধুনিক মনোবিজ্ঞান প্রতিপন্ন করেছে মনোধর্মের ক্রম-প্রসার ও পরিণতিকেই আশ্রয় করে সভ্যতা, তথা মানব-জীবন-ধর্মের প্রগতি অবারিত হয়ে চলেছে। বিভূতিভূষণ সেই অনাদি-অনন্ত জীবন-পথের পথিক বিধাতার সত্য পরিচয় পেয়েছিলেন নিজের চেতনার গভীরে—নিজের চৈতন্য-জাত প্রত্যয় সম্বন্ধে স্থিতধী হয়েছেন আধুনিক ইতিহাস-বিজ্ঞানের হাতিয়ার হাতে করে। তাই, পথের পাঁচালির সমাপ্তি অংশে বিশ্বজীবন-শিল্পীর আত্মপরিচায়ন কেবল অপরূপ মনে হয় না,—একান্ত বাস্তব, যথাযথ, সংগত এবং সম্ভাব্য বলেও মনে হয়,—"পথের দেবতা প্রসন্ন হাস্যে বলেন,—"মূর্খ বালক পথ ত আমার শেষ হয় নি, তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের বটতলায়, কি ধলচিতের খেয়াঘাটের সীমানায়!······ পথ আমার চলে গেল সামনে, শুধু সামনে·········দেশ ছেড়ে দেশান্তরের দিকে, সূর্যোদয় ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে, জানার গণ্ডী এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশ্যে············

"দিনরাত্রি পার হয়ে, জন্মমরণ পার হয়ে, মাস, বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে যায়······তোমার মর্মের জীবন-স্বপ্ন শেওলা ছাতার দলে ভরে আসে, পথ আমার তখনও ফুরায় না······চলে······এগিয়েই চলে।······

"অনির্বাণ তার বীণা শোনে শুধু অনন্তকাল আর অনন্ত আকাশ······"

জীবনের এই দুরবগাহ দুর্গমাভিসারের ধ্যান, তাঁর কাহিনী ও চরিত্র-গুলির মধ্যে আত্ম-উৎক্রান্তির সহজ প্রেরণা জাগিয়ে তুলেছিল। তাই, জীবনের দুঃখ যত দুঃসহ, বঞ্চনা যত ক্রূর হোক,—তার অতলে বিভূতি-ভূষণের জীবন-কল্পনা কখনো রুদ্ধগতি হয় নি। হরিহরের মৃত্যু-তীর্ণ অপুর শ্মশান-অনুভবের মধ্যে এই উৎক্রান্তি-দীপ্ত জঙ্গম জীবনের পরিচয় ভাস্বর হয়ে আছে:—"সারাদিনের ব্যাপারে দিশেহারা অপুর মনে হইল, তাহার বাবার পরিচিত গলায় উৎসুক শ্রোতাগণের সম্মুখে কে যেন বসিয়া আবৃত্তি করিতেছে;—'কালে বর্ষতু পর্জন্যং পৃথিবী শস্যশালিনী।' যে বাবাকে সকলে মিলিয়া আজ মণিকর্ণিকার ঘাটে দাহ করিতে আনিয়াছে,—রোগে, জীবনের যুদ্ধে পরাজিত সে বাবা স্বপ্ন মাত্র, অপু তাহাকে চেনে না, জানে না—তাহার চিরদিনের একান্ত নির্ভরতার পাত্র, সুপরিচিত, হাসি-

মুখ বাবা জ্ঞান হইয়া অবধি পরিচিত সহজ সুরে সুকণ্ঠে প্রতিদিনের মত কোথায় বসিয়া যেন উদাস পূরবীর সুরে আশীর্বাচন গান করিতেছে,—

"কালে বর্ষতু পর্জন্যং,······"

বিভূতিভূষণের জীবন-চিন্তার এই অনন্তমুখীনতার পথে সঙ্গী হয়ে ফিরেছে তাঁর নিসর্গ-চেতনা। প্রকৃতির মধ্যে সীমাহীন জীবনের ধ্যান যেন অতলস্পর্শ মৌনতায় সমাহিত হয়ে আছে। সেই প্রকৃতির অতলে প্রবেশ করলে, ছোট-বড় সুখ-দুঃখে উদ্বেলিত-হৃদয় মানুষের মধ্যেও অনন্ত-ধ্যানী জীবন-রূপ যেন প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' সেই বিচিত্রব্যাপ্ত জীবনের পরিচয় আবিষ্কার করেছে আরণ্য মানুষের উপেক্ষিত জীবনেও। 'ইছামতী' উপন্যাসেও এই তিতিক্ষা-লীন জীবনের বাস্তব, অথচ অনন্ত-ধ্যানী রূপটিই যেন ফুটেছে রোমান্স-ঘন কল্পনার ঊষারুণ সৌন্দর্যে। 'অপরাজিত' পথের পাঁচালীরই অনুক্রম। মেঘমল্লার, মৌরীফুল ইত্যাদি সংকলনের ছোটগল্পেও শিল্পীর ধ্যান-প্রশান্ত বাস্তব-চেতনার পরিচয় সুস্পষ্ট।

আধুনিক কথাসাহিত্যের কথা কখনোই শেষ হবার নয়,—জীবনের মতই শিল্প-সাহিত্যের ধারাও নিরবধি। কিন্তু, আমাদের আলোচনার থামবার সীমা আছে। যাঁদের সাহিত্য-কীর্তি ইতিহাসের মণি-কোঠায় অবিচল আসন দখল করে বসে নি,—ইতিহাসের রথে ভর করে তারই নিরন্তর গতির সঙ্গে এগিয়ে চলেছে, ইতিহাসের হাতে তাঁদের দাবি গচ্ছিত রেখে এবার ছুটি নেব। কিন্তু, তার আগে অধুনা প্রৌঢ়-প্রায় আরো কয়জন 'আধুনিক' শিল্পীর কথা বলতেই হয়। প্রত্যয় ও প্রবণতার বিচারে আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্য বিচিত্রাচারী, তার প্রমাণ কল্লোল-গোষ্ঠীর রথিত্রয়ের পাশে শৈলজানন্দ, তারাশংকর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা-পরিচয় থেকে প্রতীয়মান হয়েছে। সেই বিচিত্র-চারিতার নবীন স্বাদ পরিবেশিত হয়েছে এইসব একক-সম্পূর্ণ শিল্পীদের রচনায়।

আধুনিক কথা সাহিত্যে নব নবতর বিচিত্রতা

রবীন্দ্র-উত্তর শিল্পীদের মধ্যে বনফুল (১৩০৬) সু-প্রবীণ। কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও নাটক,—সাহিত্যের এই সর্বমুখী সৃজন-লোকে তাঁর অধিকার অনন্যতর গৌরবে চিহ্নিত। ব্যক্তিগত জীবনে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। সাহিত্যের সাধনায় নতুন নাম নিয়েছেন 'বনফুল'। চিকিৎসক হিসেবে তাঁর প্রয়াস পরীক্ষণাগারের সীমায় আবদ্ধ। কিন্তু, সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে অখণ্ড-ব্যাপ্ত জীবনকে তিনি তাঁর অন্বীক্ষার অন্তর্ভূ‌ক্ত করেছেন ;—সারাটি জীবনই যেন তাঁর সাহিত্যিক পরীক্ষণের ল্যাবরেটরী। আধুনিক সাহিত্যে বুদ্ধি-দীপ্ত বিজ্ঞান-দৃষ্টির প্রসার বনফুল-এর সুমহৎ কীর্তি। এদিক থেকে বৈজ্ঞানিক-সমুচিত আঙ্গিক-চিন্তা তাঁর কাব্যে সুদৃঢ়-গভীর। যেমন কবিতায়, তেমনি নাটক-গল্প-উপন্যাসে, বনফুলের নব-নব রূপ-রীতির পরীক্ষণ চিরকালই অপূর্ব। নাট্যক্ষেত্রে শ্রীমধুসূদন ও বিদ্যাসাগর-এর মত জীবনী-নাট্য কেবল প্রকরণের দিক থেকেই নয়, শিল্প-ভাবনা এবং বিন্যাসেও অনন্য! উপন্যাসের ক্ষেত্রে বনফুলের নবাঙ্গিক-চারিতা প্রায় নিত্য নূতন। মৃগয়া, নির্মোক, রাত্রি, সপ্তর্ষি, অগ্নি, জঙ্গম, ডানা, মানদণ্ড বহু রচনার এই মাত্র কয়টির কথা স্মরণ করলেই বোঝা যাবে,—প্রতি রচনায় বনফুলের আঙ্গিক-চেতনা কত অভিনব নূতন হয়ে ওঠে। ছোটগল্পগুলির ক্ষেত্রেও তাই। তাছাড়া, এই ছোটগল্পগুলিই শিল্পীর ভাব-স্বভাবকে যেন স্পষ্টতম রূপ দিয়েছে। কেবল রূপ-চিন্তনে নয়, জীবন-ধ্যানেও বনফুল বৈজ্ঞানিকের মত নির্লিপ্ত,—অথচ সত্য-সন্ধিৎসু। জীবনের দুর্বলতার প্রতি সহৃদয় সংবেদনার সীমা নেই তাঁর, কিন্তু অন্যায় অপরাধের প্রতি বিরূপতাও সুতীক্ষ্ণ। যেমন গূঢ় বেদনার সকরুণ-ভাবনায়, তেমনি অপরাধপ্রবণতার প্রতি বুদ্ধি-সমালোকিত তির্যক ব্যঙ্গ-রচনায়—সর্বত্রই বনফুল সমান নির্লিপ্ত। ফলে, তাঁর রচনা,—বিশেষ করে গল্প-উপন্যাস বিবরণাত্মক নয় তত, যত নাট্য-ঘটনা-দীপ্ত। ঘটনার দু-একটি আঁচড়ে জীবনের সূক্ষ্ম অভাব বা অসংগতিকে বুদ্ধি-সরস চেতনার কাছে প্রাঞ্জল ব্যঞ্জিত করে তোলাই তাঁর মৌল স্বভাব। বনফুলের সৃষ্টিতে জীবনের আবেগ-কম্পনকেও বুদ্ধির আলোকে প্রতিফলিত করে আস্বাদন করতে হয়।

বনফুল

শিল্পী হিসেবে প্রমথনাথ বিশীর (১৯০১) প্রতিভা বনফুলের মতই প্রায় সর্বগ। গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতার সকল পথেই তাঁর গতি প্রায় সম-সফল। প্রমথনাথের শিল্প-চেতনার মধ্যেও বিচিত্র উপাদানের বিস্তার রয়েছে। জীবন-সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর

প্রমথ বিশী

তীক্ষ্ণ-সহৃদয় দৃষ্টি 'পদ্মা' ও 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার'-এর মত সফল, পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস গড়ে তুলেছিল। ঐ সব রচনায় মনের সঙ্গে মননের শক্তিও দুর্লক্ষ্য নয়। মননশীল প্রমথ বিশীর নূতন আর এক সত্তার পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে তাঁর ব্যঙ্গ-সরস নাটক ও ছোটগল্প-সাহিত্যের মধ্যে। সেখানে প্রমথনাথ নিজেকে পরিচায়িত করেছেন 'প্র. না. বি.' নামে। প্রমথ বিশীর চেতনার একদিক বোধ ও বোধির সমন্বয়ে জীবন-রস-নিবিড়। সেখানে তিনি কবি ও ঔপন্যাসিক। তাঁর আর একদিক প্র. না. বি.-র সৃষ্টি,— বুদ্ধির সঙ্গে কৌতুক-ব্যঙ্গের কষাঘাতে তা প্রদীপ্ত, উজ্জ্বল। ঋণং কৃত্বা, ঘৃতং পিবেৎ জাতীয় ব্যঙ্গনাট্য এবং প্র. না. বি.-র একাধিক "নিকৃষ্ট" গল্প-সংকলনে প্র. না. বি.-র প্রতিভা দীপ্ততম প্রকাশ পেয়েছে।

ব্যঙ্গ নয়, জীবন-স্নিগ্ধ কৌতুক রসের নতুন রসদ যোগানোর ভার নিয়েছেন একালে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৬)। বাংলা সাহিত্যের নতুন কালে কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়-পরশুরামের উত্তরসূরী তিনি। কিন্তু, পরিহাস ও কৌতুক রচনাতেও বুদ্ধির দীপ্তিমাত্র নয়, অনুভবের স্নিগ্ধতা বিভূতিভূষণের প্রধান রসদ। শিল্পী নিজে বলেছেন, করুণাঘন জীবন-রূপায়ণের প্রতিই তাঁর প্রাণের আকর্ষণ ছিল একান্ত। কিন্তু, বাংলাদেশ থেকে বহু শত মাইল দূরে বাঙালি জীবনের বস্তুভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুযোগ হারিয়েছিলেন। তাই, স্বল্প-জানাকে মনের দীপ্ত কৌতুকে আলোকিত করে রস-সহাস রূপ দিয়েছেন তাঁর রাণুর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগের গল্প-গুচ্ছে। অনুভবতপ্ত শিল্পিচিত্তের রস-নিবিড়তার পরিচয় আছে স্বর্গাদপি গরীয়সী, নীলাঙ্গুরীয় ইত্যাদি উপন্যাস গ্রন্থে।

বিভূতি মুখোপাধ্যায়

ব্যঙ্গ-তীব্র গদ্য-পদ্য রচনায় সজনীকান্ত দাসের (১৯০০-৬২) দক্ষতাও এ-যুগের সাহিত্যে অবিস্মরণীয়। সাহিত্যের স্রষ্টা হিসেবে এবং সাহিত্যিকের পরিপোষক ও গবেষক হিসেবে এঁর কীর্তি আজ সর্বজন-স্বীকৃত। শনিবারের চিঠির সম্পাদক রূপে এককালে সুশৃঙ্খল নবীন সৃষ্টিধারার প্রবর্তনে তাঁর প্রয়াস ছিল অতন্দ্র। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সন্ধি-লগ্নে—অর্থাৎ বর্তমান শতাব্দীর কুড়ির দশকে ও পরে রক্ষণশীলতার গুরুতর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল শনিবারের

সজনীকান্ত দাস

চিঠি। এদিক থেকে সজনীকান্ত কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি গোষ্ঠীর প্রতিপন্থী। বাঁধন-ভাঙার অতি-উচ্ছ্বাসে দ্বিতীয়োক্তদের উৎসাহ যেমন সংগতি ও ঔচিত্যের মাত্রা ছাড়িয়েছিল ঘনঘন, তেমনি আদর্শ, রুচি ও ঐতিহ্যের চেতনার প্রতি অতি অবধানতায় প্রথমোক্তদের প্রয়াসও আতিশয্য-দুষ্ট হয়েছিল প্রায়শঃ। স্বয়ং সজনীকান্ত একথা পরবর্তী সুস্থ যুগে স্বীকার করেছেন একাধিকবার, একাধিক প্রসঙ্গে। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে লক্ষ্য করবার বিষয় লেখকের সত্যনিষ্ঠা। নিজের সুনিশ্চিত আদর্শ-বোধের ব্যত্যয় ঘটেছে মনে করলে রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের মত ব্যক্তিত্বকেও তীব্র আক্রমণ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি তিনি। সন্দেহ নেই, এতে আতিশয্য ছিল। কিন্তু, পরস্পর-বিপরীত আদর্শ ও প্রবণতার অতিশয় সংঘাতেই যুগ-সন্ধির কেন্দ্র থেকে নূতন সুস্থিত চেতনার জন্ম হয়। এদিক থেকে শনিবারের চিঠি ও তার সম্পাদকের ভূমিকা অবশ্যই গণনীয়।

ছাত্রজীবন থেকেই ব্যঙ্গ-কবিতা রচনায় সজনীকান্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে গদ্য পদ্যে সেই ধারা সুগঠিত পরিণতি পেয়েছে। তাঁর কয়েকটি কবিতায় গুরুগম্ভীর অনুভবেরও সুষ্ঠু প্রকাশ ঘটেছে। বিচিত্র সাহিত্য-প্রবন্ধে লেখকের সন্ধিৎসু গবেষক মনের পরিচয় ছড়িয়ে আছে। অন্যান্য প্রসঙ্গ ছাড়াও বিভিন্ন সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলীর সম্পাদনা ও সাহিত্যসাধক চরিতমালার রচনায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় মনস্বী সজনীকান্তের পরিচয় স্পষ্ট।

অজয়, ক্যাড্‌স ও স্যাণ্ডেল, পথ চলতে ঘাসের ফুল, মধু ও হুল তাঁর কয়েকটি উল্লেখ্য গ্রন্থ।

অন্নদাশংকর রায় (১৯০৪) প্রথম গ্রন্থ লিখেছিলেন 'তারুণ্য' নামে,—বিলেতে আই. সি. এস. পড়বার সময়। সে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের কথা। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর নরনারীর প্রেম ও যৌবন-সমস্যার প্রতি অতি অবধানতার ছাপ আছে তরুণ শিল্পীর সে লেখায়। আগুন নিয়ে খেলা ও পুতুল নিয়ে খেলা-য় একই ধরনের জীবন-চিন্তন ক্রমশঃ পরিণত হয়েছে। কিন্তু, কথাশিল্পী অন্নদাশংকরের ঐতিহাসিক পরিচয় সম্পূর্ণ হয়েছে ছয় খণ্ডে সমাপ্ত সুবৃহৎ "সত্যাসত্য" উপন্যাসে।

অন্নদাশংকর রায়

গ্রন্থ-নামেই শিল্পীর ভাবনার পরিচয় রয়েছে। বৃহৎ-ব্যপ্ত মানব-জীবনের 'সত্যাসত্য' সন্ধানের ব্রত গ্রহণ করেছেন বুদ্ধি-দীপ্ত সহৃদয় শিল্পী। এক কথায় অন্নদাশংকরকে মানব-ধর্মের মানব ও প্রেমের তপস্যারত শিল্পী বলা যেতে পারে। গল্প উপন্যাসের প্লট-এ বিচিত্র ব্যক্তি-জীবনকে কেন্দ্র করে নিরবধি 'মানুষ'-এর পরিচয় সন্ধান করে ফিরেছেন তিনি। তাঁর সকল লেখার মধ্যেই চিরন্তন মানুষের প্রেরণা অক্ষয় হয়ে আছে। অন্নদাশংকরের শিল্পধর্মের আদর্শ,—প্রথমে মানুষ, তারপরে প্রেম,—তারপরে আর্ট। এপিক-উপন্যাস 'সত্যাসত্য'-তে এই আদর্শত্রয়ের ত্রিবেণী রচিত হতে পেরেছে। ছোটগল্প রচনাতেও অন্নদাশংকরের স্বকীয়তা উৎকৃষ্ট সাফল্যে সমৃদ্ধ। তা ছাড়া কবিতার ক্ষেত্রে পরিণত বয়সে রচিত 'উড়্কি ধানের মুড়্কি' কিংবা 'রাঙাধানের খৈ' প্রভৃতি ছড়া তাঁকে নবতর জনপ্রীতির অধিকারী করেছে। অন্নদাশংকরের কবিকৃতি কিন্তু যৌবনাবধিই সূচিত হয়েছিল এবং রাখী বসন্ত, নূতন রাধা ইত্যাদি তাঁর স্মরণীয় কবিতা সংকলন।

অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে (১৯০৮—১৯৫৬) নিয়েই আমাদের কথা শেষ। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে ইতিহাস পুরো রূপ ধরবার আগেই ইতিহাসের পথ থেকে সরে গেছেন তিনি মৃত্যুলোকে। 'অতসীমামী' ছোটগল্প লিখে তিনি বাংলা সাহিত্যের জগতে নতুন বিস্ময় ও জীবন-চিন্তার সূচনা করেছিলেন। কালে কালে বুদ্ধির সেই আলোকোজ্জ্বলতা, অনুভবের রক্তক্ষরা তীব্রতা, বিদ্রোহের অনির্বাণ জ্বালা তাঁর চেতনাকে মার্কস্‌-পন্থী প্রত্যয়ের প্রতি ক্রমশঃ আকৃষ্ট করেছিল। গোপাল হালদার ছাড়া আর কোনো প্রবীণ বাঙালি কথা-শিল্পীর লেখায় মার্কসবাদের এমন অকম্পিত প্রসার লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু, শেষদিকের কয়েকটি লেখা ছাড়া মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার কোথাও সচেতন মতবাদের ছায়া পড়ে নি। রাত্রির গহনে নিমগ্ন স্তব্ধ জীবনকে দিবালোকের চঞ্চলতার মধ্যে উদ্‌ঘাটিত করেছেন শিল্পী,—অন্ধতমসা-দীর্ণ ঊষার অভিমুখে। কিন্তু, সুনির্দিষ্ট পরিণামে বিশ্বাস করতে না পারায় মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিমিরাভিসার প্রায়ই নিরুদ্দেশ যাত্রার পর্যায়ে পৌঁছেছে। 'পদ্মানদীর মাঝি'র মহাকাব্যিক আঙ্গিক সেই অসীম

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়